অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাঽসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥

ইহারা কি কৌরবকুলের অঙ্কুর, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কুমারগণ নহে? এই বদন ইহাদের সপরিবারে গ্রাস করিল; আর যে নানা দেশের নৃপতিগণ ইহাদের সাহায্যের জন্য আসিয়াছে, তাহাদের কথা বলা যায় না, এমনিভাবে আপনি ইহাদের সংহার করিতেছেন; মদমত্ত হস্তীর দল আপনি ঘটঘট করিয়া (জলের ন্যায়) পান করিতেছেন, রণক্ষেত্রে যাহা কিছু সজ্জিত হইয়া আছে, সমস্তই আপনি গ্রাস করিতেছেন; যন্ত্রাদি মারণাস্ত্র, মুদ্গরসহ পদাতিক সৈন্যদল, এ সমুদয় আপনার মুখের মধ্যে বিলীন হইতেছে। (৩৯০)

কৃতান্তের যমজ ভ্রাতা সদৃশ কোটী কোটী শস্ত্র, যাহাদের এক একটি বিশ্বকে ধ্বংস করিতে পারে, তাহাদের সকলগুলি আপনি গ্রাস করিতেছেন; চতুরঙ্গ সেনা, অশ্বসংযুক্ত রথসমূহ আপনার দন্ত স্পর্শ না করিয়াই মুখবিবরে যাইতেছে। হে পরমেশ্বর, ইহাতে আপনার কি সন্তোষ হইতেছে? ভীষ্ম জ্ঞানী, যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও শৌর্যে যিনি নিপুণ, তাঁহাকেও দ্রোণের সহিত একসঙ্গে গ্রাস করিলেন; অহো, সহস্রকিরণ সূর্যের নন্দন বীর কর্ণও গেলেন! আর আমাদের পক্ষের সকলকেও জঞ্জালের ন্যায় উড়াইয়া দিলেন, দেখিতেছি। হায় হায় বিধাতা, একি হইল? ইঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া বেচারী জগতের মরণ ডাকিয়া আনিলাম।

পূর্বে অল্পবিস্তর যুক্তির সহিত উত্তমভাবে ইঁহার বিভূতির কথা বলিয়াছেন—তাহাতে হইল না, আমি বারংবার প্রশ্ন করিয়া মরিতে বসিলাম। অতএব ইহাই ঠিক যে, কপালের ভোগ কিছুতেই খণ্ডানো যায় না, আর যাহা হইবেই তদনুসারে বুদ্ধিও তেমনি হয়—লোকে আমাকেই দোষী করিবে, ইহা কিরূপে বন্ধ করা যাইবে? পূর্বে সমুদ্রমন্থনে অমৃত হস্তগত হইলেও দেবগণ সন্তুষ্ট হইলেন না,—ফলে কালকূট বিষ উঠিল। পরন্তু তাহাও এক হিসাবে তত ভয়ানক হয় নাই, কারণ তাহার প্রতিকার সম্ভব ছিল, আর ঐ সময় শম্ভু ঐ সঙ্কটে উদ্ধার করিয়াছিলেন; এখন এই জ্বলন্ত বায়ু ঘিরিয়াছে, কে এই বিষে ভরা গগনকে গ্রাস করিবে? মহাকালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কি করা সম্ভব? (৪০০)

এইভাবে অর্জুন দুঃখে ব্যাকুল হইয়া অন্তরে শোক করিতে লাগিলেন, পরন্তু এই প্রসঙ্গে ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। আমি বধকর্তা ও কৌরব বধ্য, এইরূপ যে ভ্রান্তি (মোহ) অর্জুনকে গ্রাস করিয়াছিল—তাহাই দূর করিবার জন্য শ্রীঅনন্ত নিজ স্বরূপ (বিশ্বরূপ) দেখাইয়াছেন; আর কেহই কাহাকেও বধ করে না, আমিই সকলের সংহারকর্তা—বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিবার ছলে শ্রীহরি ইহাই প্রকট করিলেন। ভগবানের এইরূপ মনোভাব পাণ্ডুসুত অর্জুন বুঝিতে পারিলেন না, এবং নিরর্থক তাঁহার কম্প বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

তাহার পর অর্জুন বলিলেন, দুই পক্ষের সৈন্যদল গগনে মেঘপুঞ্জের ন্যায় একসঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আপনার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে। কিংবা কল্পান্তে কৃতান্ত যখন সৃষ্টির উপর রুষ্ট

হইয়া পাতাল সহিত একবিংশতি স্বর্গই একসঙ্গে নাশ করে, অথবা দৈব প্রতিকূল হইলে সঞ্চিত বৈভব যেমন যেখানকার সেখানেই আপনা-আপনিই ব্যর্থ হইয়া যায়, তেমনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদল সব একসঙ্গে আপনার মুখে প্রবিষ্ট হইতেছে, পরন্তু কেহই মুখ হইতে বাহির হইতেছে না, কর্মের দুর্বার গতি দেখুন ; অশোকের নব পল্লব যেমন উষ্ট্রের মুখে চর্বিত হয়, তেমনি এইসব লোক আপনার মুখের মধ্যে নাশপ্রাপ্ত হইতেছে। পরন্তু মুকুটসহ মস্তকগুলি কেমন আপনার দংষ্ট্রার সাঁড়াশীর মধ্যে পড়িয়া চূর্ণ হইতে দেখা যাইতেছে। (৪১০) ঐ মুকুটের রত্ন কতক আপনার দাঁতের ফাঁকে সংলগ্ন রহিয়াছে, কতক চূর্ণ হইয়া জিহ্বার মূলে লাগিয়া আছে, কতক চূর্ণ হইয়া দংষ্ট্রার অগ্রভাগে লাগিয়া রহিয়াছে ; অহো, এই মহাকাল বিশ্বরূপ লোকের রক্তমাংসের শরীর গ্রাস করিয়াছে, পরন্তু দেহের মস্তকটি আলাদা একধারে রাখিয়া দিয়াছে। মস্তকই শরীরের মধ্যে নিশ্চিত উত্তমাঙ্গ, এইজন্য ইহাই শেষ পর্যন্ত মহাকালের মুখের মধ্যে অবশিষ্ট আছে।

অর্জুন পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে প্রভু, জন্মগ্রহণ করিলে কি আর অন্য কোনও গতি নাই ? সমস্ত জগৎ স্বতই এই মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে ; এ সমস্ত সৃষ্টি এই মুখের দিকে চলিয়াছে, আর ইনি যেখানে আছেন সেখানেই নিশ্চল হইয়া বসিয়া তাহাদের কবলিত করিতেছেন ; ব্রহ্মাদি সকলে উপরের মুখের মধ্যে বেগে প্রবেশ করিতেছেন, অন্য সাধারণ লোকসমূহ এধারের মুখের মধ্যে যাইতেছে ; অন্য সব প্রাণিগণ যেখানে উৎপন্ন হইতেছে, সেখানেই কবলিত হইতেছে, পরন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কেহই এই মুখ হইতে রক্ষা পাইতেছে না।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

মহানদীর প্রবাহ যেমন সহজে অতিশীঘ্র সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তেমনি সারা জগৎ চতুর্দিক হইতে আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছে ; প্রাণিগণ আয়ুপথে রাত্রি-দিবসের সিঁড়ি নির্মাণ করিয়া বেগে এই মুখে প্রবেশ করিবার সাধনা করিতেছে।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

পতঙ্গের ঝাঁক যেমন জ্বলন্ত পর্বতের গাত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি দেখুন, সমগ্র লোকসমূহ এই মুখের মধ্যে পড়িতেছে ; (৪২০) পরন্তু উত্তপ্ত লোহের উপর পড়িলে জল যেমন শুকাইয়া যায়, তেমনি যতকিছু এই মুখে প্রবেশ করিতেছে, সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, আর তাহাদের নাম-রূপ ব্যবহার মুছিয়া যাইতেছে।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

এত অধিক আহার করিয়াও ইঁহার ক্ষুধা কমে নাই, ইঁহার কি অসাধারণ জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছে ; রোগী জ্বর হইতে উঠিলে যেমন হয়, ভিখারী অকাল (দুর্ভিক্ষ) পড়িলে

যেমন করে, তেমনি ইঁহার জিহ্বাও আশ্চর্যভাবে ওষ্ঠ চাটিতেছে দেখিতেছি; আহারের নামে আর কিছুই এই মুখ হইতে বাঁচিল না, এই আশ্চর্য ক্ষুধা কেমন অপূর্ব দেখাইতেছে; সমুদ্রই কি গণ্ডূষ করিবে, না পর্বত গ্রাস করিবে, কিংবা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই কি মুখের (দংষ্ট্রার) মধ্যে ফেলিয়া দিবে? দিক্‌সমূহ কি গিলিয়া খাইবে? কিংবা নক্ষত্রগুলি চাটিয়া ফেলিবে?

হে প্রভু, এমনি আপনার লোলুপতা দেখা যাইতেছে, ভোগে যেমন কামনার বৃদ্ধি হয়, ইন্ধন দ্বারা অগ্নি যেমন অধিক প্রজ্বলিত হয়, তেমনি খাইতে খাইতে আপনার খাইবার প্রবৃত্তি বাড়িতেছে; একটি মুখ এতখানি বিস্তৃত হইয়াছে যে, ইহার জিহ্বাগ্রে ত্রিভুবন রহিয়াছে, —বড়বানলের মধ্যে যেন একটি কপিত্থ ফেলা হইয়াছে; এইরূপ বদনের সংখ্যা অপার, কিন্তু এত ত্রিভুবন কোথায়? যদি ইহাদের জন্য যথেষ্ট আহার্য না জুটে, তবে এত অধিক পরিমাণে মুখের সংখ্যা বাড়াইলেন কেন? দাবাগ্নি যেমন বনের মৃগগুলিকে ঘিরিয়া ফেলে, তেমনি বেচারী লোকসমূহ আপনার বদনের অগ্নির মধ্যে পড়িয়াছে। (৪৩০)

অহো, বিশ্বের অবস্থাও তেমনি হইয়াছে, জগতের কর্মফলেই এই দেবতার আবির্ভাব, যেন মহাকাল জগদ্‌রূপী জলচরগণকে ধরিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়াছেন; এখন এই অঙ্গ-প্রভার ফাঁদ হইতে চরাচর বিশ্ব কোন্ পথে বাহির হইবে? ইহা তো আপনার বক্ত্র নয়, ইহা জগতের পক্ষে একটি জ্বলন্ত চিতা, অগ্নি নিজের দাহিকা শক্তি দ্বারা কোন কিছু পোড়াইবে কি না তাহা জানে না, পরন্তু যাহার অঙ্গ স্পর্শ করে, সে প্রাণে বাঁচে না; শস্ত্র কি জানে তাহার তীক্ষ্ণতায় মৃত্যু কি করিয়া হয়? কিংবা বিষ যেমন নিজের মারকশক্তি জানে না, তেমনি আপনার উগ্রতা সম্বন্ধে আপনার কোন অনুমানই নাই, পরন্তু এদিকে সারা জগৎ নষ্ট হইতে চলিল!

হে প্রভু, আপনি তো বিশ্বব্যাপক, সকলের আত্মস্বরূপ এক আত্মা, তবে আমাদের কালসদৃশ হইয়াছেন কেন? আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি, আপনিও সঙ্কোচ না করিয়া আপনার মনে যাহা আছে, তাহা মুখে স্পষ্ট করিয়া বলুন; এই উগ্ররূপ আর কত বাড়াইবেন? হে তাত, আপনার কল্যাণময় ভগবৎরূপ স্মরণ করুন, নতুবা অন্ততঃ আমার উপর কৃপাদৃষ্টি পাত করুন।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌ ॥ ৩১ ॥

হে বেদবেদ্য, হে ত্রিভুবনের আদিকারণ, হে বিশ্ববন্দ্য, আপনি একবার আমার বিনতি শ্রবণ করুন, এই কথা বলিয়া অর্জুন তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিলেন, হে সর্বেশ্বর, শুনুন! (৪৪০)

আমি শান্তির জন্য বিশ্বরূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আর আপনি মহাকালের রূপ দেখাইয়া ত্রিভুবন গ্রাস করিতে উদ্যত। আপনি কে? এত ভীতিপ্রদ মুখগুলি কেন একত্র করিয়াছেন? আর সমস্ত হস্তেই বা শস্ত্র ধারণ করিয়াছেন কেন? ক্রোধে ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া আপনি গগনকেও ছোট করিয়াছেন, এবং চক্ষুগুলি ত্রাসদায়ক করিয়া আমাদের

ভয় দেখাইতেছেন। হে দেব, আপনি কৃতান্তের সহিত কেন প্রতিযোগিতা করিতেছেন? আপনার অভিপ্রায় কি তাহাই আমাকে বলুন। এই কথা শুনিয়া শ্রীঅনন্ত বলিলেন, আমি কে, এবং কেন এইরূপ করিতেছি, (আমার) হালচালই বা কিরূপ, এই প্রশ্ন করিতেছ?

শ্রীভগবান্ উবাচ—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

আমি সত্যই কাল, লোক সংহার করিবার জন্যই বর্ধিত হইতেছি, এবং সমস্ত গ্রাস করিবার জন্য চতুর্দিকে মুখ বিস্তার করিয়াছি। ইহাতে অর্জুন বলিলেন, হায় হায়, পূর্বের সঙ্কটে ত্রাসিত হইয়া ইঁহার কাছে প্রার্থনা করিলাম, এখন আরও ভয়ঙ্কর সঙ্কট উপস্থিত হইল। এইরূপ কঠিন বাক্য শুনিয়া অর্জুন নিরাশ হইয়া বিষণ্ণ হইবে জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, হে কিরীটী, পরন্তু আর একটি কথা আছে ; তাহা এই যে, তুমি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এই সংহাররূপ সঙ্কটের বাহিরে, ইহা শুনিয়া ধনুর্ধর অর্জুন মরিতে মরিতে প্রাণে বাঁচিলেন : তিনি মরণরূপ মহামারীতে পড়িয়াছিলেন, এখন পুনরায় সচেতন হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের বাক্য মনোযোগপূর্বক শুনিতে লাগিলেন। (৪৫০)

তখন ভগবান বলিতে লাগিলেন, হে অর্জুন, জানিও তুমি আমারই, অন্য সমস্ত বিশ্ব আমি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছি ; প্রচণ্ড বড়বানলে যেমন সমস্ত শেষ হইয়া যায়, তেমনি আমার মুখের মধ্যে সারা জগতেরও সেই অবস্থা তুমি দেখিতেছ।

পরন্তু ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই যে সৈন্যদল উপরে-উপরে আস্ফালন করিতেছে, ইহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ; ইহারা সব একত্র জমায়েত হইয়া আপনাদের শৌর্য ও পরাক্রমের অহঙ্কারে ফুলিতেছে, এবং নিজেদের সৈন্যদলকে যম হইতেও ভয়ঙ্কর বলিয়া বর্ণনা করিতেছে ; বলিতেছে—সৃষ্টির উপর সৃষ্টি করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়া মৃত্যুকে বধ করিব, আর এখন এই জগৎকে এক গণ্ডূষে পান করিব, সমগ্র পৃথিবী গিলিয়া খাইব, আকাশকে জ্বালাইয়া দিব, বায়ুকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিব ; এই চতুরঙ্গ সেনার বৈভব মহাকালের সহিত স্পর্ধা করিতেছে, ইহাদের পরাক্রমের অভিমান কতখানি বাড়িয়াছে দেখ ; ইহাদের বচন অস্ত্র হইতেও তীক্ষ্ণ, ইহারা অগ্নি অপেক্ষাও তীব্রতর দাহিকা শক্তিবিশিষ্ট দেখা যাইতেছে, ইহারা কালকূট বিষকেও হার মানাইয়াছে।

এই বীরগণ যেন চিত্রে অঙ্কিত, জলশূন্য বন্যার ন্যায়, কিংবা চন্দ্রের প্রতিবিম্বসদৃশ ; যেন মৃগজলের বন্যা আসিয়াছে ; ইহারা তো সৈন্যদল নহে, যেন কাপড়ের তৈয়ারী সাপ, যেন প্রাণহীন চামড়ার তৈয়ারী সুসজ্জিত পুত্তলিকাবাহিনী দাঁড়াইয়া আছে। (৪৬০)

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

বাস্তবিক পক্ষে যে শক্তিদ্বারা উহারা চালিত হইতেছে, সে সমস্ত আমি পূর্বেই হরণ করিয়াছি, এখন কুম্ভকারনির্মিত পুত্তলিকার ন্যায় ইহারা নির্জীব হইয়া আছে ; পুতুল নাচের

সূত্র ছিঁড়িয়া গেলে যেমন মঞ্চের উপরিস্থিত রজ্জু-চালিত কাষ্ঠপুত্তলিকা ঠেলা মারিলেই উল্‌টাইয়া পড়ে, তেমনি এই শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যের দলকে বিনাশ করিতে বেশী সময় লাগিবে না, অতএব এখন শীঘ্র সচেতন হইয়া উঠ।

তুমি গো-হরণের সময় একবার কৌরব সৈন্যদের উপর মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলে এবং মহাভীরু বিরাটপুত্র উত্তরের দ্বারা শত্রুর বস্ত্র হরণ করাইয়াছিলে; এখন সেই সৈন্যগণ নিস্তেজ হইয়া পূর্ব হইতেই মরিয়া রণক্ষেত্রে আসিয়াছে. ইহাদের সংহার কর এবং একাই শত্রু জয় করার যশের অধিকারী হও; আর শুধু শুষ্ক যশই নহে, সমগ্র রাজ্যই হস্তগত হইবে। হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথাঽন্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪॥

দ্রোণকে গ্রাহ্য করিও না, ভীষ্মকে ভয় করিও না, কর্ণের উপর কি করিয়া শস্ত্র চালনা করিব, তাহাও ভাবিও না। জয়দ্রথ সম্বন্ধে কি উপায় করিব, তাহাও তুমি মনে চিন্তা করিও না— অন্যান্য যে সব সুপ্রসিদ্ধ বীর আছে, তাহাদের সব এক-একটিকে চিত্রে অঙ্কিত সিংহের ন্যায় মনে করিবে, যাহাদের ভিজা হাতেই মুছিয়া ফেলা যায়। হে পাণ্ডব, এইভাবে এই যুদ্ধে মিলিত সৈন্যদল কিরূপ? ইহারা সমস্তই আভাসমাত্র, ইহাদের আমি পূর্বেই মুখের মধ্যে আকর্ষণ করিয়াছি। (৪৭০)

যখনই তুমি ইহাদের আমার মুখে পড়িতে দেখিয়াছ, তখনই ইহাদের আয়ু ফুরাইয়াছে, এখন ইহারা শুধু অসার খোলসমাত্র পড়িয়া আছে; অতএব তুমি শীঘ্র উঠ, আমি যাহাদের মারিয়াছি তাহাদের শেষ (বধ) কর, মিথ্যা শোক-সঙ্কটে পড়িও না: স্বয়ং লক্ষ্য (নিশানা) খাড়া করিয়া যেমন তাহা ক্রীড়াচ্ছলে বাণদ্বারা বিদ্ধ করা হয়, তেমনি দেখ, তুমি শুধু নিমিত্ত-মাত্রই; যে সব অমঙ্গল প্রকট হইয়াছিল, তাহা সব শেষ হইয়াছে, এখন অর্জিত রাজ্যের সহিত যশ উপভোগ কর; আত্মীয়গণ যখন অহঙ্কারে স্ফীত (উন্মত্ত) হইয়া পরাক্রমে দুর্মদ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই শৌর্যশালী রিপুগণকে আমি বধ করিয়াছি; হে কিরীটী, এই কথা বিশ্বের পটের উপর লিখিয়া রাখিয়া বিজয়ী হও। সঞ্জয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫॥

জ্ঞানদেব বলিতেছেন: এইভাবে পূর্ণমনোরথ সঞ্জয় কৌরবনাথ ধৃতরাষ্ট্রকে এই সমস্ত কথা বলিলেন; স্বর্গলোক হইতে গঙ্গার প্রবাহ বাহির হইয়া যেমন প্রচণ্ড খল খল শব্দ করিয়া নীচে নামিয়া আসে, তেমনি গুরুগম্ভীর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, অথবা মহামেঘসমূহ যেমন একসঙ্গে গর্জন করিতে থাকে, কিংবা ক্ষীরসমুদ্র যেমন মন্দরাচলের মন্থনে গুমগুম শব্দে নিনাদিত হইয়াছিল, ঐ প্রকার গম্ভীর মহানাদের সহিত তখন বিশ্বের আদিকারণ অনন্তরূপ, শ্রীকৃষ্ণ এই বাক্য বলিলেন। (৪৮০)

অর্জুন তাহার সামান্যই শুনিতে পাইলেন, এবং তাহাতে তাঁহার সুখ কি ভয় দ্বিগুণ হইল তাহা বলিতে পারি না, পরন্তু তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ; সঙ্কুচিতভাবে কিঞ্চিৎ নত হইয়া, করজোড় করিয়া বারংবার তাঁহার ললাট শ্রীকৃষ্ণের চরণে ঠেকাইতে লাগিলেন। তখন কিছু বলিতে গেলে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতেছিল, ইহা সুখ কি ভয় তাহা আপনারাই বিচার করুন। পরন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জুনের এইপ্রকার অবস্থা হইয়াছিল, ইহা আমি এই শ্লোকের পদ হইতেই বুঝিয়াছি। তখন এইভাবে ভীত হইয়া পুনরায় চরণ বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন : অর্জুন উবাচ—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

আপনি নিজেই বলিয়াছেন, 'আমিই কাল, এবং বিশ্ব গ্রাস করা আমার খেলা'—আপনার এই বাক্য আমি অটল সত্য বলিয়া মানিয়াছি ; পরন্তু হে প্রভু, আপনি কাল হইয়া আজ স্থিতির সময়ে জগৎকে গ্রাস (সংহার) করিতেছেন, ইহা বিচারের সহিত মিলিতেছে না ; অঙ্গের তারুণ্য সরাইয়া কি করিয়া বৃদ্ধাবস্থা আনা যায় ? এইজন্য আপনি যাহা করিতে চাহিতেছেন, তাহা প্রায় অসম্ভব। হে অনন্ত, দিবসের চারি প্রহর পূর্ণ না হইতে সূর্য মধ্যাহ্নেই অস্ত যায় না। দেখুন, আপনি যে অখণ্ডিত কাল, তাহার তিনটি অবস্থা আছে, আর সে তিনটিই নিজ নিজ সময়ে প্রবল। (৪৯০)

যখন 'উৎপত্তি' হয়, তখন 'স্থিতি' ও 'প্রলয়' লুপ্ত থাকে, আর স্থিতির সময় 'উৎপত্তি' ও 'প্রলয়'কে দেখা যায় না ; আর পরে 'প্রলয়ে'র সময় 'উৎপত্তি' ও 'স্থিতি' লুপ্ত হয়—এই অনাদি রীতির কোন কারণেই ব্যতিক্রম হয় না ; সম্প্রতি জগতে পূর্ণ ভোগের স্থিতি চলিতেছে, এখন যে আপনি ইহাকে গ্রাস করিতেছেন, ইহা আমার মনে লাগিতেছে না।

তখন ভগবান সঙ্কেতে বলিলেন, এই দুই সৈন্যদলেরই পোষণকার্য শেষ হইয়াছে (আয়ু ফুরাইয়াছে), তাহাই তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম, অন্য লোকের মরণ যথাকালেই হইবে—জানিবে ; শ্রীঅনন্ত ভগবান সঙ্কেতে এই কথা বলিতেই অর্জুন পুনরায় সমস্ত বিশ্বের পূর্ববৎ স্থিতি দেখিলেন ; তখন অর্জুন বলিলেন, হে দেব, আপনি বিশ্বকে চালনা করিবার সূত্রধার, এই জগৎ পুনরায় পূর্বস্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে ; পরন্তু হে শ্রীহরি, দুঃখসাগরে পড়িলে যেমন ভাবে আপনি উদ্ধার করেন, আপনার সেই কীর্তি আমি স্মরণ করিতেছি ; আপনার কীর্তি বারংবার স্মরণ করিয়া আমি মহাসুখ উপভোগ করিতেছি, এবং হর্ষামৃত-তরঙ্গের উপর গড়াইতেছি।

হে দেব, জীবিত থাকিবার জন্য এই জগৎ আপনার প্রতি অনুরাগ পোষণ করে, আর দুষ্ট লোকগণ নাশপ্রাপ্ত হয় ; হে হৃষীকেশ, ত্রিভুবনের রাক্ষসগণের আপনি মহাভয়স্বরূপ,—এইজন্য তাহারা দিগন্তের ওধারে পলায়ন করিতেছে ; (৫০০) এতদ্ভিন্ন অন্য সুরসিদ্ধ কিন্নরগণ, এমন কি সারা চরাচর আপনাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া নমস্কার করিতেছে।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

হে নারায়ণ, রাক্ষসগণ আপনার চরণে প্রণত না হইয়া পলায়ন করিল, ইহার কারণ কি? আর আপনাকে কেনই বা প্রশ্ন করিতেছি, ইহা তো আমাদের জানাই আছে, সূর্যোদয় হইলে অন্ধকার কেমন করিয়া থাকিবে? আপনি স্বপ্রকাশের উৎপত্তিস্থান, আজ আপনাকে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এইজন্য অন্য সব জঞ্জাল সহজে দূর হইযাছে।

হে শ্রীরাম, এতদিন আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই, এখন আপনার গম্ভীর মহিমা উপলব্ধি করিয়াছি; যাহা হইতে নানা সৃষ্টির বিকাশ হয়, ভূতগ্রামরূপ লতার প্রসার হয়, সেই (বিশ্ববীজ) মহদ্ব্রহ্ম আপনার ইচ্ছা (মহাসঙ্কল্প) হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; হে দেব, আপনি নিঃসীম ও অনন্তগুণসম্পন্ন, আপনি নিঃসীম ও সদা স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব, আপনি নিঃসীম সাম্যের অখণ্ডিত অবস্থা, আপনি দেবাদিদেব; প্রভু আপনি ত্রিভুবনের জীবন, অক্ষর সদাশিব (নিত্য মঙ্গলস্বরূপ)—হে দেব, আপনি সৎ ও অসৎ, তাহার অতীত যে বস্তু, তাহাও আপনি।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

আপনি প্রকৃতি ও পুরুষের আদিকারণ মহত্তত্ত্বের সীমা, স্বয়ংসিদ্ধ, পুরাতন, অনাদি; আপনি সকল বিশ্বের জীবন, আপনি জীবের আশ্রয়, ভূতভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান কেবল আপনারই (হস্তে) আছে। (৫১০)

হে ভেদরহিত প্রভু, শ্রুতির নেত্রে যে স্বরূপ-সুখ অনুভূত হয়, তাহা আপনিই; ত্রিভুবনের আধারের আপনিই আধার; এই জন্যই আপনাকে পরম ধাম বলে, কল্পান্তে মহদ্ব্রহ্ম আপনার মধ্যেই প্রবেশ করে। অধিক আর কি বলিব? হে দেব, আপনি সমগ্র বিশ্ব বিস্তার করিয়া আছেন, অনন্তরূপ আপনার বর্ণনা কে করিতে পারে?

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

প্রভু, আপনি কোন এক বস্তু নন্, আর কোথায় আপনি নাই? আর কি বলিব? আপনি যেমন আছেন, তেমনিই আপনাকে নমস্কার করিতেছি; হে অনন্ত, আপনিই বায়ু, আপনিই নিয়ন্তা যম, প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থিত অগ্নিও আপনি, আপনি বরুণ, সোম, স্রষ্টা ব্রহ্মাও আপনি, পিতামহের পরম আদিজনকও আপনি; আর অন্য যে সব সাকার বা নিরাকার ভাব আছে, হে জগন্নাথ, আমি আপনার সেই সব রূপকেও প্রণাম করিতেছি।

এইভাবে পাণ্ডুসুত অর্জুন সানুরাগচিত্তে স্তুতি করিয়া পুনরায় কহিলেন, প্রভো, আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার। তাহার পর ঐ শ্রীমূর্তির আদ্যন্ত (মস্তক হইতে চরণ

পর্যন্ত) দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, প্রভো আপনাকে নমস্কার, নমস্কার ! এই চরাচর বিশ্বের সমস্ত প্রাণিগণকে অখণ্ডিতভাবে ঐ মূর্তির মধ্যে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, প্রভো, নমো, নমস্তে। (৫২০)

এইরূপ অদ্ভুত রূপ দেখিয়া আমিও আশ্চর্য হইতেছি, অর্জুন দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন, প্রভো নমো, নমস্তে ; অন্য কোনও স্তুতি স্মরণে আসিল না, চুপ করিয়াও থাকিতে পারিলেন না, প্রেমভাবে কেমন করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন, তাহাও জানিতে পারিলেন না ; কিংবহুনা, এইভাবে সহস্রবার প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে শ্রীহরি, আপনার সম্মুখে নমস্কার করি ; দেবতার সম্মুখ, পশ্চাদ্‌ভাগ আছে কি নাই—তাহাতে আমার কি প্রয়োজন ? তথাপি হে স্বামিন্, আপনার পশ্চাতেও নমস্কার করি ; হে দেব, আপনার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের বর্ণনা করিতে পারি না, সেইজন্য আপনার সর্বব্যাপক, সর্বাত্মক রূপকে নমস্কার করিতেছি ; হে অনন্তপ্রভাবশালিন্, হে অমিতবিক্রম, আপনি সর্বকালে সমান, আপনি সর্বদেশব্যাপক—আপনাকে নমস্কার ; সমস্ত অবকাশে আকাশ যেমন অবকাশ হইয়া আছে, তেমনি আপনি সর্বস্বরূপ হইয়া সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন ; কিংবহুনা, এই সারা বিশ্বই কেবল আপনার শুদ্ধ স্বরূপ, ক্ষীরসমুদ্রে যেমন শুধু দুগ্ধের তরঙ্গ ; অতএব হে দেব, আপনি সর্ব পদার্থ হইতে ভিন্ন নহেন, ইহাই আমার গভীর বিশ্বাস, আপনিই সর্বস্বরূপ। [ক্রমশঃ]

তোমার চাওয়া একটুখানি

শ্রীশান্তশীল দাশ

জেনেছি হে প্রিয় তুমি চাও না কিছু আর ;
তোমার চাওয়া একটুখানি, শুধু নয়নধার।
অনেক দিয়ে যারা তোমায়
ডাকে, সে-ডাক শোন না হায় ;
চোখের জলের মাল্যখানি দেয় যে উপহার,
মধুর হেসে সেই মালাটি নাও যে তুলে তার।

এতকাল যা ঘুরে ঘুরে করেছি সঞ্চয়,
জেনেছি তা তোমায় দেবার যোগ্য কিছুই নয়।
তুমি যে চাও অমূল্য ধন,
অশ্রুভরা দুইটি নয়ন ;
তাইতো যাচি, হে প্রিয় মোর, নামাও সকল ভার,
নয়নভরে দাও আঁখিজল অনেক বেদনার।

ধর্ম

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

'ধর্ম' শব্দটি এই দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকট এতই সুপরিচিত যে, ইহার অর্থ জানিবার জন্য প্রায় কাহারও অন্তরে অণুমাত্র আগ্রহও জন্মিতে দেখা যায় না। দেশের অধিকাংশ লোক ধর্মের প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল যে, কেহ যখন ধর্মের নামে খারাপ কিছুও প্রচার করিতে থাকে, তখন তাঁহারা এইরূপ খারাপ বিষয়কেও গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। ধর্মের স্বরূপ, বিভাগ, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অন্তরে কোন সুদৃঢ় ধারণা না থাকায় এক শ্রেণীর ধর্মবিরোধী লোক সম্প্রতি ধর্মের স্বরূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ অপব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ মানুষকে অধর্মের পথেই আকর্ষণ করিতেছে।

যে পুণ্যভূমি ভারতে চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা-ভাষণ প্রভৃতি নাই দেখিয়া গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস বিস্মিত হইয়াছিলেন, যে ভারতের অপরিমিত শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ সুপ্রাচীন ভাষা সংস্কৃতে তালা ও চাবির বাচক কোন শব্দ নাই দেখিয়া আজও বিশ্বের জ্ঞানিগণ বিস্ময় প্রকাশ করেন, এবং প্রাচীন ভারতে মানুষের সততার ফলেই ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার আবশ্যক হইত না বুঝিয়া তাঁহারা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিয়া থাকেন, সেই পুণ্যক্ষেত্র ভারতেও ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে ও ধর্মবিরোধী প্রচারের ফলে আজ জনসঙ্ঘের এক বিপুল অংশ বিবিধ পাপকার্যে লিপ্ত হইয়া চিরশান্তির আকর ভারতভূমিকে অশান্তির আগুনে দগ্ধ করিতেছে। এই অনর্থ হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণের মধ্যে প্রচার করা প্রয়োজন।

ধর্মের স্বরূপ

যে কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রেও ধর্মের স্বরূপ নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে জানিতে না পারিলে তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা সম্ভব হইবে না বুঝিয়া প্রথমেই আমরা ধর্মের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

'ধারণা করা' অর্থবোধক 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া ধর্ম শব্দটি সাধিত হইয়াছে। ইহার অর্থ—শৃঙ্খলাসমূহের ধারণ বা নিয়মানুবর্তিতা। শাস্ত্র বলেন :

ধারণার্থো ধৃঞিত্যেষ ধাতুঃ শাব্দৈঃ প্রকীর্তিতঃ।
দুর্গতি-প্রপতৎ-প্রাণিধারণাদ্ ধর্ম উচ্যতে॥

—শাব্দিকগণ বলেন, ধৃঞ্ ধাতুটি ধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহার ফলে মানুষ দুর্গতি ও পতন হইতে রক্ষা পায়, তাহারই নাম ধর্ম।

অন্যত্র আবার অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি যম, এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পাঁচটি নিয়ম, মোট দশটির পালনই ধর্ম নামে কথিত হইয়াছে। মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে আমরা এই সকল তথ্য জানিতে পারি।

মীমাংসাদর্শনের মতে, বেদাদিশাস্ত্রে বিহিত ধর্মসমূহের অনুষ্ঠানই ধর্ম (চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ)। বৈশেষিক দর্শনের মতে, যাহা হইতে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয় তাহারই নাম ধর্ম (যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ)। মহাভারতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নানাভাবে ধর্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে ধর্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন :

অহিংসা সত্যমক্রোধ আনৃশংস্যং দমস্তথা।
আর্জবং চৈব রাজেন্দ্র নিশ্চিতং ধর্মলক্ষণম্॥

—অনুশাসনপর্ব, ২২।১৯

—অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, দম (ইন্দ্রিয়সংযম) এবং সরলতাই ধর্মের নিশ্চিত লক্ষণ (পরিচায়ক)।

যুধিষ্ঠিরের মনে সংশয় জন্মিল : তিনি রাজা, গুরুতর অপরাধ করিলে প্রজাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতেই হইবে ; সুতরাং রাজাদের পক্ষে স্থল-বিশেষে নৃশংস না হইয়া উপায় নাই। রাজা যদি আনৃশংস্য-ব্রত গ্রহণ করিয়া অপরাধী-দিগকে দণ্ডদানে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে দেশে পাপের প্রাবল্য ঘটিবে। তিনি আরও চিন্তা করিলেন—সকল মানুষই যদি কঠোর-ভাবে দম বা ইন্দ্রিয়সংযম অবলম্বন করে, তাহা হইলে তো পৃথিবীতে আর নূতন প্রজার সৃষ্টিই হইবে না। তাহা ছাড়া আর্জব বা সরলতাও রাজধর্মের বিরোধী। রাজা সরল-প্রকৃতির হইলে কুটিল শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিবে ; প্রজাদের মধ্যেও অনেকে কুটিলতা অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রের শান্তির বিঘ্ন ঘটাইবে। সুতরাং যুধিষ্ঠির বুঝিলেন, পিতামহ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ধর্মের সাধারণ লক্ষণ ; দেশ-কাল-পাত্রভেদে হয়তো ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। নিঃসংশয় হইবার জন্য পুনরায় তিনি মহামনীষী পিতামহকে অনুরোধ করিলেন, 'পিতামহ ! আমি কিরূপ ধর্মের আচরণ করিব, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।' ইহার উত্তরে ভীষ্ম বলিয়াছেন :

অহিংসা সত্যমক্রোধো দানমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
অজাতশত্রো ! সেবস্ব ধর্ম এষ সনাতনঃ॥

—ঐ ১৬২।২৩

—হে অজাতশত্রো ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও দান এই চারিটির সেবা (অনুশীলন) কর ; এইগুলিই সনাতন (চিরস্থায়ী) ধর্ম।

মহাভারতের শান্তিপর্বে মহর্ষি ব্যাস তাঁহার প্রিয়পুত্র শুকদেবকে ধর্মাচরণ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়—ব্যাসের মতে ইন্দ্রিয়সংযমই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি বলিতেছেন :

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি বুদ্ধ্যা সংযম্য যত্নতঃ।
সর্বতো নিপতিষ্ণূনি পিতা বালানিবাত্মজান্॥
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চাপ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্ জ্যায়ঃ সর্বধর্মেভ্যঃ স ধর্মঃ পর উচ্যতে॥

—শান্তিপর্ব, ২৫৯।৩–৪

—ইন্দ্রিয়সমূহ অত্যন্ত অনিষ্ট উৎপাদক এবং ইহারা নিজ নিজ বিষয়েই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। পিতা যেমন বালক পুত্রগণকে সংযত করিয়া রাখেন, তদ্রূপ জ্ঞানের সাহায্যে ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের একাগ্রতা সম্পাদনই পরম তপস্যা। ইহা সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহাই পরধর্ম (শ্রেষ্ঠ ধর্ম) নামে অভিহিত হয়।

ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ East and West in Religion (P. 19) গ্রন্থে লিখিয়াছেন : Religion is a movement, growth ; and in all true growth the new rests on the old.—ধর্ম বলিতে গতি বিশেষ বা উন্নতি বুঝায়। আবার যথার্থ উন্নতির ক্ষেত্রে দেখা

যায়, সর্বত্রই পুরাতনের উপর নূতন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ উল্লিখিত গতি বা উন্নতি বলিতে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ যে সংযম বা নিয়মানুবর্তিতাকে বুঝিয়াছেন, পরবর্তীকালে তাঁহার লিখিত Religion and Society নামক গ্রন্থের একটি উক্তি হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। ঐ গ্রন্থে (P. 42) তিনি লিখিয়াছেন :

Religion is the discipline, which touches the conscience and helps us to struggle with evil and sordidness, saves us from greed, lust and hatred, releases moral power, and imparts courage in the enterprise of saving the world.

ধর্ম বলিতে নিয়মানুবর্তিতা-বিশেষকে বুঝায়। এই নিয়মানুবর্তিতা আমাদের বিবেককে প্রভাবিত করিয়া সর্ববিধ অন্যায় ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণা দেয়; লোভ, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা এবং ঘৃণা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করে; আমাদের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে এমন সাহস দান করে যে, তাহার ফলে বিশ্বজগতের কল্যাণের জন্য আমরা আত্মনিয়োগ করিতে পারি।

পশ্চিম দেশের মনীষীরাও ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে টাইলোর (E. B. Tylor) এবং ফ্রেজার (I. G. Frazer) মহোদয়দ্বয়ের মত দুইটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। টাইলোর তাঁহার Primitive culture (Part I; P. 424) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাঁহার মতে ধর্ম (religion) শব্দের সংক্ষিপ্ত অর্থ 'আধ্যাত্মিক সত্তায় বিশ্বাস' ('the belief in spiritual beings')। ফ্রেজার সাহেব তাঁহার The Golden Bough গ্রন্থে (P. 222) লিখিয়াছেন : 'a propitiation or conciliation of powers superior to man which are believed to direct and control the course of nature and a human life.' —যে অলৌকিক শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি এবং মানবজীবন পরিচালিত হয়, তাহার তুষ্টিসাধনের নামই ধর্ম।

Encyclopaedia Britannica নামক অভিধানে Religion বা ধর্মকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা—(১) প্রাথমিক (primitive) এবং (২) উচ্চস্তরের (higher)। উপরে যে দুইজন পাশ্চাত্য মনীষীর মতের উল্লেখ করিয়াছি, উক্ত অভিধানে তাহাদের দুইটিকেই প্রাথমিক ধর্মরূপে গণ্য করা হইয়াছে। উচ্চস্তরের ধর্মের কোন লক্ষণ উক্ত অভিধানে দেওয়া হয় নাই। উহার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে আবার ধর্মাচরণের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য দেখা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকদের ধর্মীয় আচার হইতে শীতপ্রধান দেশের লোকদের ধর্মীয় আচার অনেকটা ভিন্ন ধরনের। স্বগৃহে স্বাধীনভাবে থাকিবার সময় যে সকল আচার-অনুষ্ঠান অবশ্য পালনীয়, বিদেশে বা রাস্তায় থাকিলে তাহাদের সবগুলি পালন করা অবশ্য কর্তব্য নহে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা নির্দেশ দিয়াছেন। সুস্থ বলবান্ ব্যক্তির জন্য যে সকল ধর্মীয় আচার অবশ্য পালনীয়, রুগ্ণ বা দুর্বলের পক্ষে তাহাদের সবগুলি পালন করার প্রয়োজন হয় না।

সম্প্রদায়ভেদেও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ,

খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। হিন্দুর কাছে তাহার বিমাতা মাতৃবৎ পূজনীয়া; কিন্তু কোন কোন সমাজে বিমাতাকে বিবাহ করা চলে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামীর চিন্তাও মহাপাপ; কিন্তু তিব্বত প্রভৃতি কোন কোন দেশে ধর্মশাস্ত্রের বিধান-অনুসারেই একজন নারীর একই সঙ্গে চার পাঁচজন স্বামী থাকিতে পারে। গোমাংস হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্য; কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট ইহা বৈধ খাদ্য।

একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও প্রদেশভেদে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ অনেকক্ষেত্রে লক্ষিত হয়। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ মৎস্য ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না; কিন্তু মধ্য বা দক্ষিণ-ভারতের ব্রাহ্মণ মৎস্য ভক্ষণ করিলে তাঁহার জাতিনাশ ঘটে। উত্তর ভারতের হিন্দুদের নিকট মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করার চিন্তাও মহাপাপ; কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করা শাস্ত্রসম্মত।

কন্যকাং মাতুলানাঞ্চ দাক্ষিণাত্যঃ পরিগ্রহেৎ।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ; শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, অধ্যায়, ১০৫

বিভিন্ন শাস্ত্রে ধর্মের লক্ষণ-সম্বন্ধে নানা মত এবং বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন আচরণ দেখিয়া যাহাতে আর্যসন্তানগণ ধর্মসম্বন্ধে বিভ্রান্ত না হন, এই উদ্দেশ্যে ভগবান্ মনু পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন— বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং নিজের স্বাস্থ্য ও রুচি অনুযায়ী বৈধ আচরণ, এই সব কয়টিকেই ধর্মের মূল বলিয়া জানিবে।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্॥

—মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়

বলা বাহুল্য, রাজর্ষি মনু আর্যসন্তানদের জন্যই এই ধর্মের বিধান দিয়াছেন। প্রত্যেক হিন্দুর নিকট বেদ সর্বোচ্চ প্রমাণ। যে বিষয়ে বেদে কোনরূপ উল্লেখ নাই, সেই বিষয়ের জন্য স্মৃতিশাস্ত্রই প্রমাণ। যে বিষয়ে বেদ এবং স্মৃতি কোনটিতেই কোন উল্লেখ নাই, সেই বিষয়ে সজ্জনগণের আচরণই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য। কোন কোন বিষয়ে বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ দেখা যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নির্দেশই সমান আদরণীয় বটে, তবে আচরণকারীর স্বাস্থ্য এবং রুচির সঙ্গে মিলাইয়া তাহাদের মধ্য হইতে যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে—ইহাই ভগবান্ মনুর অভিপ্রায়।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, বেদাদি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিজের তথা জগতের হিতার্থে নিয়মানুবর্তিতার ভিতর দিয়া কর্ম করার নামই ধর্ম। বেদাদি শাস্ত্র বলিতে 'আদি' শব্দের মধ্যে অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থগুলিও অন্তর্ভুক্ত।

হিন্দুগণের পক্ষে বেদাদি শাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলাই ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলিয়াছেন: 'আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ।'

অবৈদিক ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের ধর্মমত যদি মানব-সভ্যতার প্রতিকূল না হয়, অপরের ধর্মমত সহ্য করিতে কুণ্ঠাবোধ না করে, নিরীহ মানব-গণের পবিত্র রক্তে পৃথিবী কলঙ্কিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্ররোচনা না দেয়, অপর ধর্মাবলম্বীদিগকে বলপূর্বক স্বধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি না করে, জাতি-

ধর্ম-নির্বিশেষে মাতৃজাতির প্রতি মাতৃবৎ সম্মান-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ না হয়, এবং মানবমাত্রেরই কল্যাণসাধনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করে, তাহা হইলে তাঁহারা নিজ নিজ ধর্মের নির্দেশ পালন করিয়াই ধর্মজগতে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। ঐ সকল ধর্ম বৈদিক ধর্মেরই অংশমাত্র—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ধর্ম ও অধর্মের বিভাগ

ভারতীয় মনীষিগণ সাধ্যধর্ম ও সাধনধর্মভেদে ধর্মকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। যম, নিয়ম প্রভৃতি সাধনধর্ম; ঐগুলি দ্বারা যাহা সাধিত হয়, তাহাই সাধ্যধর্ম।

ধর্ম পদার্থটিকে আবার (১) আধ্যাত্মিক, (২) আধিভৌতিক ও (৩) আধিদৈবিক ভেদে ত্রিধা বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে ধর্ম কেবলমাত্র মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত উৎকর্ষের বিধায়ক, তাহা দ্বারা প্রধানতঃ আত্মোন্নতিমাত্র সাধিত হয় বলিয়া তাহাকে আধ্যাত্মিক ধর্ম বলা যায়। ব্যক্তিগত মুমুক্ষা এবং আত্মোন্নতির সহায়ক বিবিধ সাধন-প্রণালী ইহার অন্তর্গত।

আত্মোৎকর্ষ, নিজের মুক্তি প্রভৃতির প্রতি বিশেষ মনোযোগী না হইয়াও যে ধর্মবলে মানব সর্বসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর হয়, তাহাই আধিভৌতিক ধর্ম। বিশ্ববিখ্যাত বহু ধর্মপ্রচারক এই ধর্ম সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবলমাত্র মানবজাতির মঙ্গল-সাধনের নিমিত্তই উপদেশ দিয়াছেন, আর কেহ কেহ আরও অধিক দূর অগ্রসর হইয়া জীবমাত্রেরই কল্যাণসাধনের জন্য নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। রাজধর্ম, সমাজধর্ম প্রভৃতি আধিভৌতিক ধর্মেরই অন্তর্গত। ভূত শব্দের অর্থ 'প্রাণী' (তুলনীয়:—সর্বভূতহিতে রতঃ)। তাহাদের কল্যাণ-সাধক ধর্মই আধিভৌতিক ধর্ম।

যে ধর্মের সাহায্যে মানুষ এক বা একাধিক দেবতায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার বা তাঁহাদের সাধনা বা পূজার ভিতর দিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং এইভাবে অন্যান্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের সম্মুখে একটি মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া গৌণতঃ তাহাদেরও আত্মোন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়, তাহাই আধিদৈবিক ধর্ম। হিন্দুদের বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীর অর্চনা এই ধর্মেরই অন্তর্গত।

আপাততঃ ধর্মের ন্যায় প্রতীয়মান, কিন্তু বস্তুতঃ ধর্মবিরোধী অনেক আচার-আচরণকেও আজকাল অনেকে ধর্মনামে চালাইয়া দেন এবং এইরূপ অধর্ম প্রচারের দ্বারা ধর্মের বিপর্যয় ঘটাইতে চাহেন। সাধারণ মানুষ মনে করে, এইগুলিও ধর্ম; সুতরাং তাহারা ধর্মভ্রমে অধর্মকেই আঁকড়াইয়া ধরে। অতএব এই প্রসঙ্গে অধর্মের স্বরূপ এবং বিভাগ সম্বন্ধেও দুই চারিটি কথা বলা প্রয়োজন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, বেদাদিশাস্ত্রসম্মত যে নিয়মানুবর্তিতা জনসাধারণের সর্ববিধ উন্নতির সহায়ক হয়, তাহাই ধর্মপদবাচ্য। বিপরীতক্রমে বুঝিতে হইবে যে, বেদাদি-শাস্ত্রবিরুদ্ধ, বিশ্বশান্তির প্রতিকূল, জনসাধারণের নৈতিক অবনতির সহায়ক যে নিয়মানুবর্তিতা বিভিন্ন স্থলে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা বস্তুতঃ অধর্ম।

এখানে সংশয় জন্মিতে পারে—কেবলমাত্র ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ধর্ম শব্দটিকে গ্রহণ করিয়া সুশৃঙ্খল যে কোন ধর্মকে ধর্ম নামে অভিহিত করিলে দোষ কি? নিয়মানুবর্তিতাই যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে দুর্দান্ত দলপতির অধীনে থাকিয়া, সুশৃঙ্খলভাবে চুরি ডাকাতি অথবা

নরহত্যাদি কার্য করিলে তাহাই বা ধর্মপদবাচ্য হইবে না কেন? দুর্বৃত্ত নরপশু কীচক-কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া যখন তেজস্বিনী পাণ্ডব-মহিষী দ্রৌপদী বিরাটরাজের সভায় বিচারপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন এবং রাজা বিরাট কীচকের বলবীর্যের কথা স্মরণ করিয়া তাহার শাস্তি-বিধানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন সেই বীরজায়া রাজা বিরাটকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন,

'দস্যূনামিব ধর্মস্তে ন হি সংসদি শোভতে।'

—হে রাজন্! তোমার এই দস্যুসুলভ ধর্ম (অর্থাৎ আচরণ) রাজসভায় শোভা পায় না। এই স্থলে দ্রৌপদী কর্তৃক দস্যুর আচরণও ধর্মনামে অভিহিত হইয়া নিন্দিত হইয়াছে।

মারীচের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধের সময়ে মারীচ ও শ্রীরাম উভয়েই রাক্ষস কর্তৃক কৃত নরঘাতন প্রভৃতি কর্মকে রাক্ষসোচিত-ধর্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন:

'ধর্মো হ্যয়ং দাশরথে নিজো নঃ।'
'ধর্মোঽস্তি সত্যং তব রাক্ষসায়ম্॥'

—ভট্টিকাব্য

উক্ত সংশয়ের উত্তরে আমরা বলিব যে, অনেক ক্ষেত্রে যেমন প্রাণঘাতিনী বিমাতাও মাতা বলিয়া কথিত হন, উল্লিখিত স্থলসমূহে তেমনি অধর্মও ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল অধর্ম বা নিন্দিত কর্ম ধর্মার্থী ব্যক্তিগণের অবশ্য বর্জনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবত-নামক মহাগ্রন্থে অধর্মের পরিচয়-প্রদান প্রসঙ্গে তাহার পাঁচটি বিভিন্ন শাখার উল্লেখক্রমে ইহাদের প্রত্যেকটি বর্জন করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিধর্মঃ পরধর্মশ্চাপ্যাভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্মজ্ঞোঽধর্মবত্ত্যজেৎ॥

—৭ম স্কন্ধ, ১৫।১২

—বিধর্ম, পরধর্ম, ধর্মাভাস, ধর্মোপমা এবং ধর্মচ্ছল এই পাঁচটি অধর্মের শাখা। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি সাধারণ অধর্মের ন্যায় এইগুলিকেও পরিত্যাগ করিবেন।

উল্লিখিত বিধর্ম প্রভৃতির লক্ষণও শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে; যথা—

ধর্মবাধো বিধর্মঃ স্যাৎ পরধর্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ॥
যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুম্ভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্॥

— ঐ ১৫।১১

—যাহা ধর্মের বিপরীত তাহাই বিধর্ম। অধার্মিক ব্যক্তিগণকর্তৃক প্রচারিত ধর্মকে পরধর্ম বলা হয়। নাস্তিকগণ ধর্ম নামে যাহা প্রচার করে, তাহা এবং অহঙ্কার উপধর্ম বা ধর্মোপমা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শব্দের নানার্থতার সুযোগ লইয়া ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ-সমূহকে ভ্রান্ত অর্থে গ্রহণ করার নাম ধর্মচ্ছল এবং আশ্রমধর্ম পালন না করিয়া স্বেচ্ছাচারী মানবগণ নিজেদের কল্পিত যে সকল বিধান ধর্মনামে পালন করে, তাহাই ধর্মাভাস।

ধর্ম এবং অধর্মের উল্লিখিত প্রকার, স্বরূপ এবং বিভাগ অবগত হওয়া ধর্মার্থী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্তব্য। [ক্রমশঃ]

অনামিকা

[ইন্দিরা দেবীর হিন্দী ভজন হইতে অনূদিত]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কী বলিব সখী—কে আমি, এসেছি কোথা হ'তে ? কিছু জানি না হায় !
প্রেমঝটিকায় ঝরা পাতা যায় সেথাই—সে ল'য়ে যায় যেথায়।

কেহ বলে—আমি রানী, কেহ বলে—প্রেমপাগলিনী, সন্ন্যাসিনী,
কেহ বলে—উদাসিনী, কেহ বলে—কুলত্যাগিনী, কলঙ্কিনী।
প্রেমসিন্ধুর একটি বিন্দু—নামধাম তার কে বা শুধায় ?
কী বলিব বল্—কে আমি, এসেছি কোথা হ'তে ? কিছু জানি না হায়।

প্রাণকান্তের নন্দনে আমি আধফোটা ফুল প্রেমশাখায় ;
কখনো সে গাঁথে আমারে মালায়, কখনো বা ফেলে দেয় ধূলায়।
তুচ্ছ ফুলের কী আছে কাহিনী ? ফোটে, হাসে, পরে ঝরিয়া যায়।
কী বলিব বল্—কে আমি, এসেছি কোথা হ'তে ? কিছু জানি না হায়।

বৃন্দাবনের বালা আমি, চিরদাসী সখী রাঙা পায় তারি,
যুগে যুগে তার সাধিতে লো প্রেম গাই তার নাম ঝংকারি'।
মীরা সখী, প্রেমকাঙালিনী—শুধু প্রেমলীলা তরে আসে ধরায়।
কী বলিব বল্—কে আমি, এসেছি কোথা হ'তে? কিছু জানি না হায় !

দ্বৈতাতীত স্তরে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

যে রহস্য মধুরিমা দ্বৈতাতীত একতা ভূমিতে
ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়, তারি কথা কহিবার ছিল সাধ
অন্তরে আমার। নিরন্তর বেদনায় অবনীতে
বাধাবিঘ্ন লয়ে কেন লভিলাম মায়ার সংঘাত।
ভাব মোর পেলনাক' ভাষা সে আনন্দ বর্ণিবারে ;
দ্বন্দ্ব বিপর্যয় আর সংশয়ের ঘন ছায়াপাত,
চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতা—এ বেদনা কহিব কাহারে ?

বিশ্বপ্রকৃতির সাথে অনন্তের সান্নিধ্য লভিতে
আশা-আবেগের সেতু রচিলাম নিজ ভাবনারে
উপলক্ষ্য করি ; মানবিক পরিণতি দূরে রাখি
এ চিত্তের কেন্দ্র হ'তে বিশ্ব-পরিধিরে রসে ঢাকি,
অসীমের অভিমুখে চিদ্‌ঘন স্তরে মোর মন
ছুটে যেতে যায় অনুক্ষণ ব্রহ্ম-বিহারের তরে।
ঐশ্বর্য মাধুর্য তত্ত্ব তথ্যে এসে হ'ল বিস্মরণ,
হৃদয়-অরণ্যে মোর আলোকের দিব্যধারা ঝরে।
উৎস হ'তে নদী সম বাহিরিয়া আত্মনিবেদন
লাগি মহাসিন্ধু অভিমুখে অগ্রযাত্রা চলে মোর,
বোধির অতীতলোকে ধ্যানেরহি আনন্দে বিভোর।

সিঁথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দ্বিতীয় বিবরণ

১৮৮৩ খৃঃ, রবিবার, ২২শে এপ্রিল। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের সিঁথির উদ্যানবাটীতে ব্রাহ্ম সমাজের ষাণ্মাসিক মহোৎসব ও বসন্তকালীন অধিবেশন। কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আগত ব্রাহ্মভক্তগণের সমাগমে উদ্যান-বাটী পরিপূর্ণ। আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত বেচারাম এসেছেন। প্রত্যূষ হ'তে বিবিধ ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চারিদিকে মহোৎসবের নির্মল আনন্দধারা প্রবাহিত।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। ভক্তবর শ্রীযুক্ত বেণী পালের সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণে ও ব্রাহ্মভক্তগণের আন্তরিক টানে তিনি আজ এখানে আসবেন। তাঁরই আগমন-প্রতীক্ষায় সকলে উৎসুক। এই সদানন্দময় সরল সুন্দর পুরুষকে যাঁরা পূর্বে দর্শন করেছেন, তাঁরা পুনরায় তাঁর পুণ্য দর্শন ও দিব্য সান্নিধ্য লাভের আশায় উদ্‌গ্রীব। যাঁরা ইতঃপূর্বে তাঁকে দর্শন করেননি, তাঁরাও তাঁর দর্শনলাভে কৃতার্থ হবেন, এই আশায় উন্মুখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকজন ভক্ত সেবকসহ দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘোড়াগাড়ি ক'রে অপরাহ্নে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সকলেই তাঁর শুভাগমনে অতিশয় আহ্লাদিত। তাঁরা পরম ভক্তিভরে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে সমাজগৃহে নিয়ে এলেন। ঐ গৃহের দক্ষিণের দালানে পূর্ব হতেই তাঁর জন্য বিশেষ আসন পাতা রয়েছে। ভক্তেরা ঐ আসনে তাঁকে সসম্মানে বসালেন এবং নিজেরা তাঁকে ঘিরে চারিদিকে বসলেন। সকলেই মহাপুরুষের সহজ সরল উপমাপূর্ণ দিব্য বাণী শ্রবণের জন্য আগ্রহাকুল। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদনে তাঁদের সঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গে রত হলেন। ভক্তগণ নিবিষ্ট চিত্তে তাঁর 'কথামৃত' পান করতে লাগলেন।

ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছেন। তিনি চমৎকার উপমা সহায়ে অতি সহজ সরল কথায় সেগুলির উত্তর দিচ্ছেন। তাঁর কথাগুলি সাধারণ পণ্ডিতগণের পুঁথিগত উক্তির মতো নয়; সমস্তই তাঁর দিব্য জীবন-বেদ হ'তে উদ্‌গীত এবং অপরোক্ষানুভূতিপ্রসূত। তাই তাঁর অমিয় বাণীর মর্ম সহজেই সকলে হৃদয়ঙ্গম করছেন। তাঁর কথামৃত পানে সমবেত প্রত্যেকেই বিমোহিত। উক্ত প্রসঙ্গের কিয়দংশ এখানে উদ্ধার করা যাক—

প্রশ্ন : মহাশয়, উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ : উপায় অনুরাগ, অর্থাৎ তাঁকে ভালবাসা, আর প্রার্থনা।

প্রশ্ন : অনুরাগ, না প্রার্থনা?

শ্রীরামকৃষ্ণ : অনুরাগ আগে, প্রার্থনা পরে।

এ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ গদ্‌গদকণ্ঠে পরম অনুরাগ ভরে গান ধরলেন—

'ডাক দেখি মন ডাকার মতো,
কেমন শ্যামা থাকতে পারে,
কেমন কালী থাকতে পারে॥'

আবার প্রশ্ন : সংসারত্যাগ কি ভাল?

শ্রীরামকৃষ্ণ : সকলের পক্ষে সংসারত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই, তাদের সংসারত্যাগ নয়।

প্রশ্ন : বৈরাগ্য কি ক'রে হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ : ভোগের শান্তি না হ'লে বৈরাগ্য হয় না।

প্রশ্ন : গুরু না হ'লে কি জ্ঞান হবে না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ : সচ্চিদানন্দই গুরু। যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে, সচ্চিদানন্দই ঐ রূপ ধারণ করেছেন। গুরু যেমন সেথো ; হাত ধরে নিয়ে যান। ভগবান দর্শন হ'লে আর গুরু-শিষ্য বোধ থাকে না।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল। সন্ধ্যার পর আচার্য বেচারাম ব্রহ্মোপাসনা পরিচালনা করলেন। উপাসনাকালে মাঝে মাঝে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হ'তে লাগলো। উপনিষদ্ থেকে নির্বাচিত অংশসমূহ সমস্বরে উচ্চারিত হ'ল। উপাসনা-শেষে শ্রীযুক্ত বেচারাম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপবিষ্ট হলেন এবং তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না, চুপ হয়ে যায়। অনন্তকে কে মুখে বোঝাবে ?'……'লবণ-পুত্তলিকা সাগর মাপতে গিছিলো, ফিরে এসে আর খবর দিলে না।'……'তাঁকে দর্শন হ'লে মানুষ আনন্দে বিহ্বল হয়ে যায়, চুপ হয়ে যায়। খবর কে দেবে ? বোঝাবে কে ?'… 'মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্বস্বরূপকে ভুলে যায়। সে যে বাপের ঐশ্বর্যের অধিকারী, তা ভুলে যায় ! তাঁর মায়া ত্রিগুণময়ী। এই তিন গুণই ডাকাত, সর্বস্ব হরণ করে ; স্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন গুণ। এদের মধ্যে সত্ত্বগুণই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্ত্বগুণও নিয়ে যেতে পারে না।'……'দয়া, ধর্ম, ভক্তি—এসব সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণ যেন সিঁড়ির শেষ ধাপ, তারপরই ছাদ। মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি সহজ-সরল অথচ নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ উক্তিগুলি শ্রবণে উপস্থিত সকলে বিমোহিত হলেন। শ্রীযুক্ত বেচারাম অন্তরের আকুল আবেগ সংবরণ করতে না পেরে, মহা উল্লাস ভরে ব'লে উঠলেন, 'বেশ সব কথা হ'ল !'

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'ভক্তের স্বভাব কি জানো ? আমি বলি, তুমি শুন ; তুমি বল, আমি শুনি। তোমরা আচার্য, কত লোককে শিক্ষা দিচ্ছ। তোমরা জাহাজ, আমরা জেলেডিঙ্গি।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উক্তি অতিশয় বিনয়পূর্ণ, নিরভিমানতার আন্তরিক প্রকাশ, অথচ অতি সরস। তাই সমবেত সকলেই ঐ কথা শ্রবণে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

তৃতীয় বিবরণ

১৮৮৪ খৃঃ ১৯শে অক্টোবর। ব্রাহ্মভক্তগণ সিঁথির সেই উদ্যানবাটীতে শরৎকালীন অধিবেশনে সম্মিলিত হয়েছেন। আচার্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্য সান্যাল, ত্রৈলোক্যের বন্ধু সদরওয়ালা (সব্‌জজ) প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত। উদ্যানবাটী ভক্তসমাগমে পরিপূর্ণ। সমগ্র পরিবেশ মহোৎসবের বিমল আনন্দে মুখরিত। সমাজ-গৃহটি পত্র, পুষ্প ও পতাকাদি দ্বারা অতি মনোরমভাবে সুসজ্জিত। ঐ গৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠে সুন্দর উপাসনাবেদী রচিত হয়েছে।

বৈকাল সাড়ে চারিটা। শ্রীরামকৃষ্ণ

দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘোড়াগাড়ি ক'রে এলেন। ভক্তগণ শশব্যস্ত হয়ে তাঁর গাড়ির নিকট উপস্থিত হয়ে ভক্তিনম্র মূর্তিতে তাঁর গাড়ি বেষ্টন ক'রে দাঁড়ালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে গাড়ী থেকে নামলে সকলে তাঁকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করলেন। ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি সমাজগৃহে এসে ঐ গৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ দালানে তাঁর জন্য রক্ষিত বিশেষ আসন অলঙ্কৃত করলেন। ভক্তগণ তাঁকে চারিধারে ঘিরে বসলেন। সকলেই তাঁর কথামৃত পানের জন্য উৎকণ্ঠিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ আসনে উপবিষ্ট হয়ে উপাসনা-বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আনত শিরে প্রণত হলেন। উপাসনার স্থান দেখে তাঁর অন্তরে শ্রীভগবানের উদ্দীপনা হয়েছে। তাই বেদীকে পরম শ্রদ্ধাভরে সম্মান প্রদর্শন করলেন।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য অতিশয় ভক্তিমান্ ও সুগায়ক এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। তাঁর মধুর কণ্ঠের ভাবপূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মহারা হন, ঈশ্বরীয় ভাবে নিমগ্ন হয়ে সমাধিস্থ হন। তিনি ত্রৈলোক্যের সঙ্গীত খুব ভালবাসেন এবং তাঁকে সাতিশয় স্নেহ করেন।

ত্রৈলোক্য গান ধরেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 'দে মা পাগল ক'রে'—গানটি গাইতে বললেন। তাঁর অনুরোধে ত্রৈলোক্য গাইছেন :

আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী),
আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে ॥
তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা,
ও মা ভক্তচিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে ॥

গান শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। ক্রমে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, সমাধিস্থ। তাঁর দেহ নিঃস্পন্দ, নিথর। কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার—সমস্তই যেন বিলুপ্ত হয়েছে। চিত্রার্পিতের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট, সহাস্যবদন, প্রেমানুরঞ্জিত নয়ন—অদ্ভুত প্রিয়দর্শন মূর্তি! এই অপরূপ সমাধি-চিত্র দর্শনে উপস্থিত সকলেই আত্মহারা। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হলেন। ঐ অবস্থায় তিনি ভাব-গদ্‌গদ স্বরে উপদেশ দিতে লাগলেন। কণ্ঠস্বর বিজড়িত, কথা অস্ফুট—মাতালের ন্যায় অস্পষ্ট। ঈশ্বর-প্রেমের সুরাপানে তিনি বিভোর, মাতোয়ারা।

তিনি বলছেন, 'ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না, তারে বাড়া আছে।……… এরা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী, তা বেশ। ……একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে, নয় নিরাকারে। তবে ঈশ্বরলাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হ'লে সাকারবাদীও ঈশ্বরলাভ করবে, নিরাকারবাদীও করবে। মিছরির রুটি সিদে ক'রে খাও, আর আড় ক'রে খাও মিষ্ট লাগবে। (সকলের হাস্য)……কিন্তু দৃঢ় হ'তে হবে, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হবে।…… একটার উপর দৃঢ় হ'তে হবে। ডুব দাও। না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।'

তাঁর ভাবাবস্থা ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হ'ল। তিনি সহজাবস্থা লাভ ক'রে নিজেই সুমধুর কণ্ঠে গাইছেন :

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে
পাবি রে প্রেম-রত্নধন ॥

আবার বলছেন, 'ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ! তাঁর প্রেমে মগ্ন হও।… ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়,

তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়। যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বলছি দর্শন হয়।—এ কথা কারেই বা বলছি, কে বা বিশ্বাস করে!······বই হাজার পড, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাঁকে পারবে না।······তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হবে না; যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা করো; কৃপা হ'লে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।'

সদরওয়ালা প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়! তাঁর কৃপা কারুর উপর বেশী, কারুর উপর কম কেন? তা হ'লে কি ঈশ্বরে বৈষম্য-দোষ রয়েছে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন: সে কি! ঘোড়াটাও টা আর সরাটাও টা। তুমি যা বলছো ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ঐ কথা বলেছিল। বলেছিল, 'মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কি কম শক্তি দিয়েছেন?' আমি বললাম, 'বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন— আমার ভিতর যেমনি, পিঁপড়েটির ভিতরও তেমনি। কিন্তু শক্তি বিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে। তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত, এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে আছে, তাই তোমার এত নাম।' দেখ না, এমন লোক আছে, একজনের ভয়ে পালায়। যদি শক্তি বিশেষ না হয়, লোকে কেশবকে এত মানতো কেন?

আবার প্রশ্ন: মহাশয়, আমাদের কি সংসার ত্যাগ করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ: না তোমাদের ত্যাগ কেন করতে হবে? সংসার থেকেই হ'তে পারে। তবে আগে দিনকতক নির্জনে থাকতে হয়। নির্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা করতে হয়। বাড়ির কাছে এমনি একটি আড্ডা করতে হয়, যেখানে থেকে বাড়িতে এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পার।······কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জনে থেকে সাধন করা চাই।

এ-প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন, 'ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ। হয়তো খেতেই পেলে না। তখন ঈশ্বর টিশ্বর সব ঘুরে যাবে।······ জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ জ্ঞান লাভ ক'রে সংসারে ছিলেন। এঁরা দুখানা তরবার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের।'

ঈশ্বরে যাতে অনুরাগ ভালবাসা হয়, তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তগণকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে বললেন।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য এ-প্রসঙ্গে বললেন, 'মহাশয়, এঁদের সময় কই; ইংরাজের কর্ম করতে হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন: আচ্ছা তাঁকে আম্মোক্তারি দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো। তিনি যা কাজ করতে দিচ্ছেন, তাই করো। বিড়ালছানার পাটোয়ারি বুদ্ধি নাই, 'মা মা' করে। মা যদি হেঁসেলে রাখে, সেইখানেই

পড়ে থাকে। কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে। মা যখন গৃহস্থের বিছানায় রাখে, তখনও সেই ভাব। 'মা মা' করে।

'সংসারের প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য কত দিন?'—সদরওয়ালার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'জ্ঞানোন্মাদ হ'লে আর কর্তব্য থাকে না ; তখন কালকের জন্য তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন অছি সেই নাবালকের ভার লয়। এ-সব আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জানো।'

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব উক্তি শ্রবণে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'আহা! আহা! কি কথা! যিনি অনন্যমন হয়ে তাঁর চিন্তা করেন, যিনি তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁর ভার ভগবান নিজে বহন করেন! নাবালকের অমনি অছি এসে জোটে। আহা, কবে সেই অবস্থা হবে! যাদের হয়, তারা কি ভাগ্যবান্!'

ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ আরও কত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ক'রে অবশেষে বললেন, 'কি এলোমেলো বকলুম! তবে আমার ভাব কি জানো? আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, আমি ঘর তিনি ঘরনী, আমি গাড়ি তিনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি রথ তিনি রথী ; যেমন চালান তেমনি চলি, যেমন করান তেমনি করি।'

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য আবার গান ধরলেন। সঙ্গে খোল করতাল প্রভৃতি বাজছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে মধুর নৃত্য করছেন। সঙ্কীর্তনানন্দে মুহুর্মুহুঃ ভাবস্থ হচ্ছেন। সমাধিস্থ অবস্থায় নিথর নিঃস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান। সহাস্যবদন, অপলক নেত্র। জনৈক ভক্তের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হলেন। পুনরায় তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করছেন। বাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়ে ত্রৈলোক্যের গানের সঙ্গে তিনি মধ্যে মধ্যে মধুর আখর দিচ্ছেন—

'নাচ মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে :
আপনি নেচে নাচাও গো মা ;
(আবার বলি) হৃদিপদ্মে একবার নাচ মা ;
নাচ গো ব্রহ্মময়ী, সেই ভুবনমোহন-রূপে॥'

ব্রাহ্মভক্তগণ তাঁকে ঘিরে তালে তালে নৃত্য করছেন। সকলেই প্রেমে মাতোয়ারা, ব্রহ্মগুণগানে বিভোর। অনেকে 'মা মা' ব'লে কাঁদছেন, সঙ্কীর্তন সাঙ্গ হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণ উপবেশন করলেন। ভক্তগণও তাঁকে বেষ্টন ক'রে উপবিষ্ট হলেন। এখন রাত্রি প্রায় আটটা। সমাজের সান্ধ্য উপাসনা এখনও হয়নি। আত্মভোলা মহাপুরুষের দিব্য সাহচর্যে সবাই আত্মহারা। কীর্তনানন্দে সমস্ত নিয়ম-বিধি ভেসে গিয়েছে।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে উপবিষ্ট। তিনিই সমাজের উপাসনা পরিচালনা করবেন।. গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী এসেছেন। আরও অনেক মহিলা-ভক্ত উপস্থিত। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনের জন্য ব্যাকুল। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্শ্বের একটি ঘরে গিয়ে মহিলাদের দর্শন দিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে দু-একটি কথাও বললেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে সসম্ভ্রমে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে ধন্য হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ বেদীতে উপবিষ্ট হয়ে যথারীতি প্রার্থনা আরম্ভ করলেন। বিজয় 'মা মা' ব'লে ব্রহ্মের আরাধনা করছেন। উপাসনা শেষ হ'ল।

এবার ভক্তসেবা। আহারান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে একান্তে ব'সে আলাপন করছেন ; শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয়ও উপস্থিত রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গত: শ্রীযুক্ত গোস্বামীকে বললেন, 'তিনি (ঈশ্বর) অন্তর্যামী! তাঁকে সরল মনে শুদ্ধ মনে প্রার্থনা কর। তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন। অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে তাঁর শরণাগত হও ; সব পাবে।'

রাত্রি দশটার পর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠলেন। সঙ্গে দু-একজন সেবক-ভক্ত। গাড়ি গাছতলায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। শ্রীযুক্ত বেণী পাল কিছু লুচি ও মিষ্টান্নাদি গাড়িতে তুলে দিতে এলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সবিনয়ে বললেন, 'মহাশয়! রামলাল আসতে পারেননি, তাঁর জন্য কিছু খাবার এঁদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি করুন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমতি দিতে পারলেন না।

বেণী পাল তখন বললেন, 'যে আজ্ঞা, আপনি আশীর্বাদ করুন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (বেণী পালের প্রতি)—'আজ খুব আনন্দ হ'ল। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ! যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়েও মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার। ধন্য তুমি, এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে!'

বেণী পাল পরম শ্রদ্ধাভরে চরণধূলি নিলে পর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক ভক্তগণসহ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যাত্রা করলেন।

ওয়েল্‌সে একটি স্মরণীয় দিন

শ্রীমতী রেণুকা সেন

তখন ছিল গুড্‌ফ্রাইডের ছুটি ; আমরা ক-জন মিলে বেড়াতে গেছি পর্বতমালা-শোভিত সমুদ্রমেখলা-সজ্জিত ওয়েল্‌সে। সত্যি অপূর্ব এই ওয়েল্‌স্ দেশটি, এখানকার মতো চমৎকার আরণ্যক দৃশ্যাবলী ইংলণ্ডে কোথাও দেখিনি। শহরের কোন আবিলতা আড়ম্বর নেই, সহজ সরল প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুকাল থেকে লালিত পালিত এখানকার মানুষগুলিও ঠিক যেন তপোবন-দুহিতা 'শকুন্তলা'র মতোই অনাড়ম্বর, সহজ ও স্বাভাবিক। আরও এক কারণে এই উপমাটি মনে এসেছিল। ইংলণ্ডে দেখে এলাম সাম্রাজ্যবাদের চোখ-ধাঁধানো জৌলুষ, অফুরন্ত জাঁকজমক এবং অভিজাত্যের অহমিকা—সব কিছু এক জায়গায় দানা বেঁধেছে, আর তারই অদূরে যেন আরণ্যক আশ্রম—এই ওয়েল্‌স্।

প্রথমে গিয়ে পৌঁছলাম উত্তর ওয়েল্‌সের রাজধানী ব্যাঙ্গর (Bangor)। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। আমাদের ওয়েল্‌স্ ভ্রমণের কেন্দ্রস্থল হয়েছিল এই শহরটি। এখান থেকে দর্শনীয় স্থানগুলি আমরা একের পর এক দেখে আসতে লাগলাম। স্নোডন (Snowdon), বেট্‌স্‌-ই-কোএড (Bettws-y-coed), এ্যাঙ্গলসি (Anglesey), হলিহেড (Holyhead), কন্‌ওয়ে (Conway), লান্‌-ডাডনু (Llandudno), বেথেস্‌ডা (Bethesda) প্রভৃতি স্থান সত্যি খুব সুন্দর লেগেছিল। এই বেথেস্‌ডাতেই আমাদের এক অদ্ভুতপূর্ব

অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যা কোন দিন ভুলতে পারব না।

বেথেস্‌ডা ছোট শহর, স্লেটের খনির জন্যই বিখ্যাত; খনির থেকে এই স্লেট কেটে নিয়ে এসে এরা গ্রেট্‌ব্রিটেন—তথা পৃথিবীর চারিদিকে চালান দেয়। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের যে স্লেটে হাতে খড়ি দেওয়া হয়, এগুলি ঠিক সেই স্লেট নয়, এই স্লেট ও-দেশের লোকেরা বাড়ীর ছাদে টালির মতো ব্যবহার করে। একদিন সকালবেলা সকলে মিলে এই স্লেটের খনি দেখতে বার হলাম বাসে ক'রে, সেখানে গিয়ে পৌঁছতে আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। খনির কাছেই এক হোটেলে আমরা ঢুকে পড়লাম। ওপরের মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক ক'রে আমরা খাবার টেবিলে বসলাম; সেই টেবিলে ওয়েল্‌স্‌-দেশীয় এক ভদ্রলোক—বছর ৫০।৫৫ বয়স, বেশ হোমরাচোমরা গোছের চেহারার—আগে থেকেই বসেছিলেন। আমরা তাঁর পাশে গিয়ে বসতে তিনি নিজে থেকেই ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আলাপ শুরু ক'রে দিলেন, 'আপনারা কোন্ দেশের লোক? কোথায় উঠেছেন? কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?' ইত্যাদি।

তাঁর পরিচয় জানলাম, তিনি হলেন সেই স্লেটের খনির একজন ম্যানেজার। ইতিমধ্যে আমাদের খাবার এসে গেল, আমরাও গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করলাম, মিনিট পাঁচেক বাদে সেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয় যে, খুব তাড়াতাড়িই তোমাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে? তোমরা কি সরকারী কাজকর্ম ঠিকমত চালাতে পারছ আজকাল?'

আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলাম, 'তার মানে? আপনি কি ভাবেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সেই ১৯৪৭ খৃঃ ভারতবর্ষ ছেড়ে না দিলে আরও কয়েক বছর সেখানে টিকতে পারত? তা কিন্তু মোটেই নয়। ভারতীয়-দের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলেই যে তারা ভারতবর্ষ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল, এ কথা কি আপনি জানেন না?'

ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ শুনেছি ইদানীং কিছু কিছু গোলমাল হয়েছিল। সে যাই হোক, তোমাদের দেশের এমন কিছু উন্নতি করতে পেরেছ কি? শুনেছি, ইংরেজ চলে আসার পর তোমাদেব সভ্যতা আবার সেই আগেকার মতো অবস্থায় ফিরে গেছে।'

আমবা তখন ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে তাজ্জব ব'নে গেছি। মুখে খাবার, না গিলতে পারছি, না ফেলতে পারছি—যাই হোক কোন রকমে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি কোন দিন ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়েছেন?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পড়েছি। ছোটবেলায় আমরা বিদ্যালয়ে পড়েছি যে, ভারতবর্ষের লোকেরা নিগ্রোদের মতোই অসভ্য ও বর্বর ছিল, পরে ব্রিটিশ রাজত্বে তারা আস্তে আস্তে সভ্য হয়ে উঠেছে। তবে তোমাদের দেশের কাছাকাছি চীনদেশ সম্বন্ধে পড়েছি যে, সেখানকার সভ্যতা বহু প্রাচীন, প্রায় দু-হাজার বছরের পুরানো।'

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি ভগবান বুদ্ধের নাম কখনো শুনেছেন কি?'

তিনি একটু ভেবে বললেন, 'বুঢা! বুঢা! হ্যাঁ, আমি শুনেছি যে, চীনদেশের লোকেরা এই বুঢার পুজা করে এবং লর্ড বুঢা যীশুখৃষ্টের মতো একজন ধর্মগুরু ছিলেন।'

'কিন্তু আপনি জানেন কি যে, লর্ড বুদ্ধের জন্ম ভারতবর্ষেই এবং তাঁর দেহত্যাগের

পরে তাঁর ধর্মমত চীনদেশে চালু হয়; আর আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে লর্ড বুদ্ধ ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন ?'

'কই না, সে কথা তো শুনিনি কখনও।'

'ইতিহাস কিন্তু সেই কথাই বলছে, হয়তো আপনি তা জানবার সুযোগ পাননি; সুতরাং বুঝতে পারছেন যে, আমাদের দেশের সভ্যতা চীনদেশের সভ্যতারই সমসাময়িক। তবে সে-কথা আপনারা কখনও পড়েননি, তার কারণ আপনাদের ইতিহাস বোধহয় রচনা করেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিক! তিনি যদি স্বেচ্ছায় ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী তাঁর দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতেন, তবে অনেক বছর আগেই হয়তো ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ ক'রত; এটাই আমার বিশ্বাস, ইংলণ্ডে আসার পর এই কথাটা মর্মে মর্মে অনুভব অনুভব করছি। কারণ বুঝেছি যে, এখানকার সাধারণ মানুষকে অজ্ঞ রেখেই সাম্রাজ্যবাদীরা অপর দেশগুলির উপর শাসন-কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে।

তিনি অবাক্ হয়ে খানিকক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন; তারপর দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন ক'রে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'এতদিন বাদে একটা মোটা কালো পর্দা আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল। আপনারা ঠিকই বলেছেন, ইংরেজরা ইচ্ছা করেই এতদিন বাইরের উপনিবেশগুলি সম্বন্ধে সত্য কাহিনী কিছুই আমাদের জানতে দেয়নি; উপরন্তু তারা সেই কাহিনী কালিমামণ্ডিত ক'রে আমাদের শিশুকাল থেকে শিক্ষা দিয়ে এসেছে। এ সবই তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে ইচ্ছাকৃত রচনা। আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি ওয়েল্স্‌কে নিয়েও তারা ছিনিমিনি খেলে চলেছে বহুদিন ধরে। কোন বিষয়েই তারা আমাদের মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে দেয় না। সব সময়েই আমরা তাদের অধীনে থেকে তাদের ইচ্ছামত চলাফেরা করি, এই তারা চায়। আমাদের তারা ঘৃণা করে, এবং মনে করে, আমরা তাদের অনেক পিছনে পড়ে আছি। কিন্তু এই ধরনের অত্যাচার বেশী দিন চালাবার সুযোগ তাদের আর হবে না। আমরাও স্বায়ত্তশাসন (Home rule) প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। ভারতবাসী এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক জাতিগুলি বিশেষ ক'রে যারা এতদিন ইংরেজদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে এসেছে, তাদের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা জানাই।' কথাগুলি বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠেছিল।

তারপর তিনি আমাদের অতি যত্ন সহকারে স্লেটের খনি দেখাতে নিয়ে গেলেন, সমস্ত ব্যাপার ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন এবং আসার সময় আমাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু স্লেট উপহার দিলেন স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। আমরাও সকলে তাঁর স্বাক্ষর (autograph) সংগ্রহ ক'রে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যাঙ্গরে ফিরে এলাম। ভদ্রলোকের জন্য একটি শ্রদ্ধার আসন চিরদিন অক্ষয় হয়ে রইল আমাদের মনের কোণে।

'ভয় হতে তব অভয় মাঝে'

শ্রীশুভ গুপ্ত

আর এক রবীন্দ্রনাথ আছেন—সব শোভন পেলব নম্র সৌন্দর্যের অন্তরালে এক ঋজু কঠোর নির্ভীক মানবাত্মার বাণীমূর্তি রবীন্দ্রনাথ—সব স্বপ্নচারণের অন্তরালে যাঁর অমোঘ সত্যদৃষ্টি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—'যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।' যারা স্বাধীন মনুষ্যত্বের অবমাননা-কারী, মহৎ আদর্শের প্রতি নির্লজ্জ স্বার্থপরতার বিদ্রূপে মুখর, তাদের বিরুদ্ধে যাঁর ক্ষমাহীন-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

'মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব,
ব'লে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ;
নাট্যের কবর-রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
ব'লে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়॥'
('জন্মদিন'--সেঁজুতি)

মৃত্যু-দেহলি-প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই কবিরই উপলব্ধি :

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।
('রূপ-নারানের কূলে'—শেষলেখা)

কিন্তু এ কবিকে আমাদের মনে পড়ে না। আমরা যারা জীবনের অর্ধসত্যে মুগ্ধ, যারা জীবন থেকে মৃত্যুকে, প্রাপ্তি থেকে সংগ্রামকে, আনন্দ থেকে বেদনাকে ভুলে থাকতে চাই—তারা পুরো রবীন্দ্রনাথকে চাই না। যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের 'ললিত-লবঙ্গ-লতা' সংস্কৃতি-চর্চার প্রধান পরিপোষক ব'লে আমরা মনে করি, তার উদ্দেশ্যেই কবির স্বপক্ষ ও বিপক্ষদলের বক্তব্য নিবেদিত। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ আমাদের কাছে প্রায় অবহেলিত।

তাই এই শ্রাবণের মেঘলোকে বিশবৎসর আগেকার কবির মৃত্যুদিনটিকে অবলম্বন ক'রে তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তার কথাই বারংবার মনে জাগছে। মৃত্যু তো কেবল দেহেরই নয় ; প্রাণহীন, সত্যহীন, বিবেকহীনের মৃত্যু আসল মরণের বহু আগেই ঘটে যায়। বহুকল্পদুর্লভ ব্যক্তি তাঁরাই, যাঁদের উদ্দেশ্যে বলা যায়—'এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ'—রবীন্দ্রনাথ সেই অমরাত্মাদেরই অন্যতম।

সাহিত্য চলমান জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মরতিমগ্ন হ'লে যে বিপদ দেখা দেয়, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় তার সূচনা দেখা যাচ্ছে। বছর দশেক আগেকার কাস্তে-হাতুড়ি ট্রেড-মার্কের কবিতার জায়গায় এখন বেশীর ভাগ কবির কাজ 'অবসন্ন চেতনার গোধূলি-বেলায়' কতকগুলি নির্জীব ভাব-রোমন্থন ; চিত্রকল্প (image)-ধর্মী কবিতার নাম ক'রে বিচ্ছিন্ন উপমার চিত্রসমষ্টির দ্বারা বক্তব্যকে

বিভ্রান্ত করা, জীবনে যেখানে প্রতিপদে নির্মম হতাশা ও লাঞ্ছনার গ্লানি—কবিতায় সেখানে কৃত্রিম রোমান্টিকতার মরীচিকায় বাস্তবকে ভুলে থাকা।

অথচ এই শতাব্দীর কবিগুরু (বাংলা-সাহিত্যের কথাই বলছি) সূক্ষ্মতম রসবিলাস থেকে মহত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা অবধি জীবনের সর্বস্তরের অনুভূতিকেই কাব্যরূপ দিয়েছেন। জাতীয় চিত্তসঙ্কটে তাঁর বাণী ও লেখনী কখনো স্তব্ধ হয়ে থাকেনি। হিন্দুমেলার যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন, জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ থেকে বক্‌সা দুর্গের বন্দীদের প্রতি অভিনন্দন-বাণী, 'আফ্রিকা'-র উদ্দেশ্যে মানবতার বেদনাগাথা-রচনা থেকে 'সভ্যতার সংকটে' ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উন্মোচন অবধি রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যে অন্যায়ের নির্ভীক প্রতিবাদ-কাহিনী আমাদের জাতীয় আদর্শের চির-উজ্জ্বল নিদর্শন।

এর পাশাপাশি বর্তমান বাংলাসাহিত্যের দিকে চেয়ে কি মনে হয় না যে, আমরা কবির বাণীকে কেবল উপযুক্ত সময়ে উদ্ধৃতির জন্যই রেখে দিয়েছি?

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি' ওঠে খর খড়্গাসম।
('ন্যায়দণ্ড'—নৈবেদ্য)

ওই ন্যায়দণ্ড যার হাতে নেই, তারই ললাট-লিপি—

এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—
('ত্রাণ'—নৈবেদ্য)

রবীন্দ্র-সাহিত্য মানবাত্মার এই অসম্মানের বিরুদ্ধে চিরবিদ্রোহী।

সে-সাহিত্যের একদিকে যেমন:

'রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি!'
('আমি চঞ্চল হে'—উৎসর্গ)

আর একদিকে তেমনি:

হে রুদ্র, তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী—
মরণনৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয়ডমরু বাজাব;
ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাব।
...
জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়;
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়।
...
তিমিররাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে।
('সুপ্রভাত')

এই অভীর মন্ত্র রয়েছে রবীন্দ্রজীবন-সাধনায়। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যা-সাগরের যোগ্য উত্তরাধিকারী এই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিহিত ছিল অপরাজেয় পৌরুষের

অনির্বাণ হোমানল। এই সুদৃঢ় চরিত্র-ভিত্তিকে ভুলে গিয়ে নিছক সৌন্দর্য-সাধনায় মগ্ন থাকাটা রবীন্দ্র-ভক্তির লক্ষণ নয়, সে-কথা আমরা যত বেশী মনে রাখব, ততই সাহিত্যে ও জীবনে সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের, কল্যাণের সঙ্গে রসবোধের এবং চারিত্রশক্তির সঙ্গে হৃদয়াবেগের সার্থক সম্মিলন ঘটবে।

সত্যনিষ্ঠ পৌরুষের একটি বড়ো লক্ষণ লোকৈষণার অভাব। সুদুর্জয় মনুষ্যত্বের দুর্গম পথযাত্রীর 'ক্ষুরস্য ধারা' যাত্রাপথে সিদ্ধিলাভের আগে অবধি সেই একাকী যাত্রার ইতিহাস। এই একাকিত্বেই যথার্থ বীরত্বের প্রকাশ। ইবসেনের 'An Enemy of the People'—নাটকের নায়ক একদিন আবিষ্কার করেছিল যে, 'মানুষ যখন সবচেয়ে একা, তখনই সে সবচেয়ে শক্তিশালী'। তেমন একটা নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্র-চরিত্রে কোথাও ছিল, তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন,

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে'—

ওই একাকিত্ব কোন অসহায় ব্যথাতুরের বেদনাসঞ্জাত নয়—পরম নির্ভীক জীবন-পথিকের নিঃসঙ্গ যাত্রা। দেশবিদেশের জয়মাল্যলাভে, আত্মীয়বন্ধুভক্তজনের অজস্র স্নেহপ্রীতির আলিঙ্গনে অথবা ঈর্ষাবিদ্বেষমূঢ় সমালোচনার কশাঘাতে—কোন কারণেই কবিচিত্তের এই পরম-নিঃসঙ্গতা-বোধ বিনষ্ট হয়নি। তাই কোন করতালির চাটুকারিতায় রবীন্দ্রহৃদয়ের বীরধর্ম বিচলিত হয়নি।

এ প্রসঙ্গে তাঁর দেহত্যাগের বৎসর ১৩৪৮ সালের নববর্ষের ভাষণ 'সভ্যতার সংকট' স্মরণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজের দোর্দণ্ড রাজপ্রতাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছিলেন, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে?—কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা ক'রে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে। অপেক্ষা ক'রে থাকব। সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট, সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ; কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা ক'রব। ......এই কথা আজ ব'লে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

মানুষের ভবিষ্যতের প্রতি এই বিশ্বাস বীরের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেরই আর একটি দিক ফুটেছে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনামূলক গানের ভাষায়। মানুষ তার মনুষ্যত্বের দ্বারাই নিজেকে নিজে ত্রাণ করবে—এই

অপরাজেয় মনুষ্যত্বই ভগবানের কাছে কবির প্রার্থনীয়—

'তোমার পতাকা যারে দাও,
তারে বহিবারে দাও শকতি'—
'বিপদে মোরে রক্ষা কর
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়'—
'ভয় হতে তব অভয় মাঝে
নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে,
সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হইতে নবীন জীবনে,
নূতন জনম দাও হে॥'

রবীন্দ্রসাহিত্যের এই বলিষ্ঠ প্রাণদ ভাবাদর্শের চর্চাই আজকের দুর্যোগাচ্ছন্ন জাতীয় চিত্তের পক্ষে বিশেষভাবে করণীয়। একদা জীবনের সহজ প্রশান্ত আনন্দলোকে মগ্ন থেকেই কবি তৃপ্ত হ'তে চেয়েছিলেন,—এমন সময় তাঁর কাছে জীবনের, জগতের, কর্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছুল—সে আহ্বানের পিছনে ছিল জগৎপিতার সংগ্রামের আহ্বান—সব জড়তা, সব কলুষ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘাতের আহ্বান—অন্তরের অন্তরে সেই শঙ্খবাণী কবি অনুভব করেছিলেন, আজীবন সেই শঙ্খনিনাদ তাঁর কাব্যে ঘোষিত হয়েছে

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব
আঘাত খেয়ে অচল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ॥

('শঙ্খ'—বলাকা)

বর্তমান বাংলাসাহিত্যে এই বাণী নূতন ক'রে ধ্বনিত হোক।

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
… …
মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক-মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

—রবীন্দ্রনাথ

'জীবন-দেবতা'র কবির প্রতি

'বৈভব'

আবার ফিরিয়া এল শ্রাবণ-পূর্ণিমা,
ঝুলনের সিক্ত মধুরিমা
মাখা আজ সজল আকাশে—
ব্যাকুল বাতাসে বাজে তারি সংবেদনা!
হে কবি, এমন রাতে তুমি আসিবে না
তোমার প্রাণের প্রিয়া পৃথিবীর ঘরে?
স্বর্গের অমৃত বুঝি নিল চুরি ক'রে
মরতের অমর কবিরে?
কবি, তুমি আসিবে না ফিরে?
এই তব প্রতিশ্রুতি? এই তব মিথ্যা অভিজ্ঞান:
'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'!

না জানি কোথায় কোন্ লোকে লোকান্তরে
চলিয়াছে তব অভিযান!
কে তোমারে বাঁধিবারে পারে?—
সারা বিশ্বে গগনে গগনে আছে তব ঠাঁই!
নীহারিকা তারায় তারায় চলেছে তোমার নিমন্ত্রণ!
তবু এ ধূলির ধরা
সাগর-সুনীলাম্বরা
ধরেছিল তোমারি কিরণ!
উজলি উঠিয়াছিল নয়ন যুগল,
চঞ্চলি উড়িয়াছিল শ্যামল অঞ্চল
তোমারি তো উচ্ছ্বসিত প্রাণে,
তোমারি জীবনময় সঙ্গীতে ও গানে
মুখরি উঠিয়াছিল এ ধরণীতল!

আজ তুমি কোথা কবি, হে চির ভাস্বর!
সারা পৃথ্বী হেরি আজ অন্ধকার—বড় ভয়ঙ্কর,
চারিদিকে শুনি শুধু 'শৃগালকুক্কুরদের কাড়াকাড়িগীতি'
এতটুকু আলো নাই, আশা নাই—মহামৃত্যুভীতি!

অতীতের উদয় উষায়
ওই দেখা যায়
কী অপূর্ব প্রথম বিকাশ !
জীবনের দেবতার ছন্দোময় লীলার বিলাস !
বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষ তরঙ্গিয়া ওঠে বারংবার
কী জানি তাহার ভাষা—কী বা ভাব তার !
শুধু শুনি—অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি কলরোলে পরিণত হয়,
আকাশে সাগরে মেঘে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিময় !
সন্ধ্যা ও প্রভাতবেলা অনন্ত সঙ্গীতে
হৃদয়-সমুদ্র যেন লাগে তরঙ্গিতে
নির্ঝরের ভাঙে স্বপ্ন—সে গুরু আহ্বানে,
ভাঙিয়া পাষাণ কারা—আকুল পাগলপারা
ডুবায়ে সকল দেশ—বহি চলে মহাসাগরের পানে !

সত্য শিব সুন্দরের অপূর্ব সাধনা
তারি উপাসনা,
সারাটি জীবন ভরি তাহারি ব্যঞ্জনা
বাজিয়াছে কত ছন্দে মহানন্দে—
সপ্তস্বরগ্রাম ভেদি তাহারি মূর্ছনা
শেষ হয়ে রেশ রেখে যায়
শত শত গীতি-কবিতায় !

সুন্দর—সে ধরা দিল ছন্দের বাঁধনে
কতভাবে কতরূপে আনন্দ-সাধনে—
'এল গন্ধে বরণে এল গানে
নব নব রূপে এল প্রাণে'—
কভু চুপে চুপে লুকায়ে চলিয়া গেছে
'নয়ন-ভুলানো' তব জীবনদেবতা,
সকালে ডাকিয়া ধীরে—সারাদিন কহেনি সে কথা।
তাহারি লাগিয়া রচিয়াছ কত গান—
কত না রজনী জাগি কত মান অভিমান,
তবু সে অন্তরযামী আসে নাই, দেয় নাই সাড়া—
তোমার জীবন ল'য়ে করিয়াছে খেলা
নদীতীরে—নির্জনমন্দিরে, সারাদিন—সারা সন্ধ্যাবেলা।

জীবন-দেবতা তব এসেছিল সুরের খেলায়—
জীবনের ভোরের বেলায়—
তার পর এসেছে কত না রূপে
অতি চুপে চুপে
তোমার নিভৃতবক্ষে মানসী মূর্তিতে
জাগ্রত সে যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে আনন্দস্ফূর্তিতে
এসেছে কত না বার—
আবরিয়া স্বরূপ তাহার।
জীবনদেবতা তব জাগে
নিতি নিতি নব অনুরাগে।
সে দেবতা কভু
পিতা মাতা সখা প্রভু—
কখন শ্রেয়সীরূপে দেখা দিয়া
প্রেয়সীরূপেও তব মোহিয়াছে হিয়া!
অন্তরে বাহিরে তব পুরুষ-প্রকৃতি যেন গিয়াছে মিশিয়া;
তাই বাজে বজ্র-কণ্ঠ সুকঠিন উদাত্ত সঙ্গীতে
কখন ছন্দের তাল ধরা দেয় সুকোমল নৃত্যের ভঙ্গীতে!
তোমার অন্তরে সকল ভাবের মেলা—
সর্বভাব করে সেথা খেলা
কবিচিত্ত—মাতৃবক্ষ যেন!
তাই, গ্রহণ করেছ সব, হে আনন্দময়!
বর্জন করিয়া মুক্তি সে তোমার নয়।

কখন বা দেখি, তুমি সাগর গভীর,
অনন্ত উচ্ছ্বাসপূর্ণ অথই অথির,
তথাপি বেলার সীমা করে না লঙ্ঘন,—
সে কোন্ বেদনা-ভরা অসীম ক্রন্দন?

অথবা আকাশ সম অতীব উদার—
আনন্দ-উজ্জ্বল, যার নাহি পারাপার;
খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি খেলিছে আনন্দে—
যেথা ঋতুচক্র নাচে অপরূপ ছন্দে।

হিমালয়রূপে তুমি দেখা দাও শেষে,
উন্নত প্রশান্ত শুভ্র ধ্যানময় ঋষিদের বেশে,
কণ্ঠে ল'য়ে তাঁহাদেরি মৃত্যুহীন বাণী—
ভরিয়া দিয়াছ তাহে ধরণীর স্বর্ণতরীখানি,
রচিয়া গিয়াছ তব 'শান্তিনিকেতন'—
বিশ্বমহামিলনের নব আয়োজন।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী—প্রস্তুতি

বিজ্ঞপ্তি ও আবেদন

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী পৃথিবীর সর্বত্র যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপনের আয়োজন হইতেছে। এইজন্য কয়েকটি কমিটি—বিশেষভাবে একটি সাধারণ কমিটি গঠনের আয়োজন করা হইতেছে, এই উপলক্ষে শীঘ্রই কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণের একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং ঐ সভায় এই বিষয়ে বিভিন্ন কার্যের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের নাম ঘোষণা করা হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী সাধারণ কমিটির অধ্যক্ষ (President) হইবেন এবং বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ সহকারী অধ্যক্ষ (Vice-Presidents) হইবেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল দেশের লোকই সাধারণ কমিটির সভ্য হইতে পারিবেন। সভ্য হইবার চাঁদা এককালীন মাত্র ২০৲ টাকা। একই পরিবারের দুই ব্যক্তি সভ্য হইলে ৩০৲ টাকা দিলেই চলিবে। ছাত্র ও স্কুল-শিক্ষকগণকে মাত্র ১০৲ টাকা দিতে হইবে। আমরা আশা করি, দলে দলে লোকে এই সাধারণ কমিটির সভ্য হইবার জন্য নাম তালিকাভুক্ত করিবেন এবং এই শুভ কর্মকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সহায়তা করিবেন।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

৪ঠা জুলাই, ১৯৬১ — সম্পাদক, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটি

প্রধান কার্যালয়, বেলুড় মঠ পোঃ (হাওড়া)

স্বামীজীর গ্রন্থাবলী-প্রকাশন

১৯৬৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতেছে। এ পর্যন্ত আমরা সংবাদ পাইয়াছি বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী, তামিল, তেলুগু ও মলয়ালম্ ভাষায় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের সাহায্য ও উৎসাহ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজীতে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। তামিল ও তেলুগু মাদ্রাজ মঠ হইতে, মারাঠী নাগপুর আশ্রম হইতে, গুজরাতী রাজকোট হইতে, হিন্দী মায়াবতী হইতে, মলয়ালম্ ত্রিচুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

বাংলায় এই গ্রন্থ-সংগ্রহ 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' নামে ১০ খণ্ডে উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা, পত্রাবলী (বাংলা ও ইংরেজীর অনুবাদ), বক্তৃতা (অধিকাংশই অনুবাদ), কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর, কবিতা প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইবে।

উদ্বোধনের এই সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের ২য় পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

নাগরিক সভা ও কমিটি-গঠন

আগামী ১৯৬৩ খৃঃ সারা পৃথিবীতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী কিভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা আলোচনা করিবার জন্য গত ৯ই জুলাই বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার (গোল পার্ক)-এ কলিকাতার নাগরিকগণ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক মহতী সভায় মিলিত হন।

সভার প্রারম্ভে ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার জাতীয় জাগরণে স্বামীজীর প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী তাহা আলোচনা করিয়া বলেন, গত ৬০ বৎসর ধরিয়া স্বামীজীর চিন্তাধারা ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণকে প্রভাবিত করিতেছে এবং এখনও বহু দিন করিবে। স্বামীজীর শতবার্ষিকী যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জাতির সর্বস্তরে কল্যাণশক্তি সঞ্চারিত হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

অতঃপর ডক্টর কালিদাস নাগ বলেন, স্বামী বিবেকানন্দকে আজ শুধু জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলেই চলিবে না, ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী বহন করিয়া আন্তর্জাতিক দিক দিয়াও তিনি ভারতকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'চিরন্তন হিন্দুধর্ম' বলিতে কি বুঝায়, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বসভায় তাহা শুনাইয়া গিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় যেন তাঁহার বাণী সার্থকভাবে প্রচার করিতে পারে।

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, এই উৎসব পালনের গুরুদায়িত্ব শুধু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নহে, এই দায়িত্ব সকল ভারতবাসী—তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ শুধু জাতীয়তাবোধের উদ্বোধক ছিলেন না, তিনি বিশ্বমানবতা-মন্ত্রেরও উদ্‌গাতা। তিনিই এ যুগে বিশ্বের সহিত ভারতের সম্মানজনক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ জনতাকে আহ্বান করিয়া বলেন, তাঁহারা যেন অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া এই বিরাট প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এতদর্থে দেশবাসীর নিকট তিনি ৩০ লক্ষ টাকার আবেদন জানান।

সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি সহায়ে স্বামীজীকে একটি বহুমুখী হীরকের সহিত তুলনা করিয়া বলেন, স্বামীজীকে এক এক জন এক এক ভাবে দেখে, তিনি সবগুলিরই সমষ্টি। কেহ তাঁহার ধর্মজগতের সাধনা ও সিদ্ধির দিকটাই দেখে, কেহ জাতীয় জাগরণের দিকটাই দেখে, আবার কেহ দেখে ভারতের পরাধীনতার যুগেও তিনি কিভাবে ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছেন। রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভের পর স্বামীজীর পরিকল্পিত যে কাজ শুরু হইয়াছে, তাহা আরও কঠিন। আজ আমাদের মানুষ গঠন করিতে হইবে। স্বামীজীর ধর্ম মানুষ-গড়ার ধর্ম। এই আয়োজন সার্থক হউক। স্বামী বিবেকানন্দ সারা বিশ্বের আপন জন, তবু তাঁহার শতবার্ষিকী উৎসব আয়োজনে কলিকাতাবাসীর এক বিশেষ দায়িত্ব আছে, কারণ এই শহরেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ এবং তাঁহার বাণী অনুধাবনের দ্বারাই এই 'ঋষিঋণ' পরিশোধ করা যাইতে পারে।

সভার শেষাংশে শতবার্ষিকী উৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের নিমিত্ত তিনটি কমিটি গঠিত হয়।

সাধারণ কমিটি

পৃষ্ঠপোষকগণ : ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডক্টর রাধাকৃষ্ণন, শ্রীজওহরলাল নেহরু, শ্রীরাজগোপালাচারী, এবং কাশ্মীর, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও গোয়ালিয়রের মহারাজা।

সাধারণ কমিটির সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ এবং সহকারী সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎস্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ও দেশবিদেশের বহু মনীষী।

সম্পাদক : স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
সহকারী সম্পাদক : স্বামী শাশ্বতানন্দ
শ্রীকালীপদ সেন
কোষাধ্যক্ষ : শ্রী বি. কে. দত্ত

সাধারণ সভ্যের তালিকায় দেশবিদেশের বহু মনীষী, সমাজসেবক, শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিকের নাম এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলির অধ্যক্ষগণের নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সাধারণ কমিটির সভ্য হইয়া এই মহা উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা হইয়াছে। যে কোন উৎসাহী ব্যক্তি এই কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন। ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে।

ডক্টর কালিদাস নাগ উল্লিখিত সাধারণ কমিটি গঠনের প্রস্তাব আনয়ন করেন, শ্রী সেন উহা সমর্থন করিলে উপস্থিত সকলে সহর্ষে উহা অনুমোদন করেন।

এইভাবে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রস্তাবিত কর্মসমিতি (Working Committee) শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সমর্থন করিলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ওয়ার্কিং কমিটি *

সভাপতি : মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন
সহ-সভাপতি : স্বামী বিশুদ্ধানন্দ
স্বামী মাধবানন্দ
সম্পাদক : স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
সহকারী সম্পাদক : স্বামী বিমুক্তানন্দ

সর্বশেষে ভূতপূর্ব পৌরপ্রধান (Mayor) শ্রীকেশবচন্দ্র বসু কার্যনির্বাহক (Executive Committee) সমিতির নাম প্রস্তাব করেন এবং বর্তমান মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার সমর্থন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়।

কার্যনির্বাহক কমিটি *

সভাপতি : বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়
সহ-সভাপতি : ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবি. কে. দত্ত

কমিটিগুলিতে প্রয়োজনমত সদস্য নির্বাচন করা চলিবে।

* স্থানাভাব বশতঃ কমিটিগুলির সাধারণ সদস্যদের নাম এখানে দেওয়া সম্ভব হইল না।

সমালোচনা

শ্রীপদ্যাবলী—শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রণীত এবং তৎসমাহৃত। প্রকাশক—শ্রীরাঘবচৈতন্য দাস, গিরিধারী কুঞ্জ, ১৮ গোপীনাথ বাগ, বৃন্দাবন (মথুরা), উত্তরপ্রদেশ। পৃষ্ঠা ২৪৩। মূল্য টাকা ২·২৫।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী কেবল মহাভক্ত ছিলেন না, তাঁহার অসামান্য বৈদগ্ধ্য তৎকৃত ১৮টি গ্রন্থে অতি চমৎকার ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' রসিকসমাজে একটি উচ্চাঙ্গের অলঙ্কারগ্রন্থ-রূপে সমাদৃত। শ্রীরূপ গোস্বামী একাধারে কবি, নাট্যকার ও দার্শনিক।

আলোচ্য 'পদ্যাবলী' তাঁহারই একটি সংগ্রহগ্রন্থ। ইহাতে বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সংস্কৃত কবির ভক্তিরসামৃতপূর্ণ শ্লোক সন্নিবিষ্ট। শ্রীরূপ গোস্বামীর স্বকৃত কতকগুলি শ্লোকও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা', 'ভজনমাহাত্ম্যম্', 'ভক্তবাৎসল্যম্', 'শ্রীমথুরামহিমা', 'শ্রীবৃন্দাটবীবন্দনম্', 'গোপীনাং প্রেমোৎকর্ষঃ', 'শ্রীরাধায়াঃ পূর্বরাগঃ', 'শ্রীকৃষ্ণবিরহঃ' প্রভৃতি বিষয়ক শতাধিক কবিতা ইহাতে আছে। প্রকাশক শ্রীরাঘব চৈতন্যদাস এই বইখানি প্রকাশ করিয়া রসিক ভক্তসমাজের সত্যই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পদ্যাবলীর হিন্দী টীকা রচনা করিয়াছেন শ্রীবনমালিদাস শাস্ত্রী। খুবই সহজ সুললিত হিন্দী। গ্রন্থারম্ভে শ্রীরূপ গোস্বামীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইয়াছে। ৩০টি ছন্দে ১১৫ জন কবির কবিতা ইহাতে সংগৃহীত। নিজের কবিতার নীচে লিখিয়াছেন 'সমাহর্তুঃ' —অর্থাৎ ইহার সংগ্রহীতা শ্রীরূপের।

প্রত্যেক শ্লোকের নীচে এক একটি অন্বয় দিলে শ্লোকগুলি আরও সুগম হইত। একটি শ্লোক উদ্ধার করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :

পদ্যাবলী-সমাহর্তা শ্রীরূপের কবিতা—

কদা বৃন্দারণ্যে মিহিরদুহিতুঃ সঙ্গমহিতে
মুহুর্ভ্রামং ভ্রামং চরিতলহরীং গোকুলপতেঃ।
লপন্নুচ্চৈরুচ্চৈর্নয়নপয়সাং বেণিভিরহং
করিষ্যে সোৎকণ্ঠো নিবিড়মুপসেকং বিটপিনাম্॥

সমালোচনার সীমিত পরিধিতে আর উদ্ধৃতি-প্রদানের অবকাশ নাই। সুদৃশ্য, সুমুদ্রিত এই ভক্তিমঞ্জুষা পরম আদরের বস্তু।

—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

সন্ধ্যামালতী—লেখক শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রকাশকমণ্ডলী কর্তৃক ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা ২৫ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১৯ ; মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থখানি তিনটি রচনার সমষ্টি। প্রথমটির নামানুসারে গ্রন্থখানির নামকরণ করা হইয়াছে। এই রচনাটিতে নাটকীয় ভাব ও ভাষার মাধ্যমে দুরূহ ভক্তি-তত্ত্ব সরস ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয় রচনা 'উলট পুরাণে' চিরনিন্দিত কৈকেয়ী চরিত্রকে নিপুণ তুলিকার দ্বারা এমনভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে যে, তিনি এখন নিন্দিতা না হইয়া বন্দিতা হইয়াছেন। তৃতীয় 'দ্বন্দ্বসনে দ্বন্দ্ব ক'রে যাও দ্বন্দ্বাতীত পারে' শীর্ষক প্রবন্ধে আপাতদৃষ্টিতে জগতের যে বৈষম্য প্রতি-নিয়তই চিন্তাশীল মানবকে বিভ্রান্ত ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে, তাহার একটি সুচিন্তিত মীমাংসার প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিষয়বস্তুর আলোচনার নৈপুণ্যে ও ভাষার পারিপাট্যে প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র ধর্মপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে নয়, সর্বসাধারণেরও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

—শিবপ্রসাদ আগরওয়ালা

তোমায় কী দিয়ে বরণ করি—শান্তশীল দাশ। প্রকাশক: গোপালচন্দ্র রায়, সাহিত্য সদন, এ-১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৪০, মূল্য টাকা ১·২৫।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের কবিতাবলীর ২৫টির সমাবেশ আলোচ্য পুস্তকে। বইটির নামকরণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই একটি বিখ্যাত গানের কলি দিয়ে। প্রত্যেকটি কবিতায় ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। একটি উদাহরণ:

সীমা দিয়ে যারা এ পৃথিবী গড়ে কারাগার,
আর সেই সীমা-ঘেরা ক্ষুদ্র রুদ্ধ গণ্ডীর ভিতর
বাস করে, কাঁদে হাসে, ভালবাসে,
করে হাহাকার,
শোনে নাকো অসীমের ডাক যেথা ওঠে নিরন্তর।
সে-অসীম-স্পর্শচ্যুত সীমা-খিন্ন অসংখ্য জীবন;
তাদের বেদনা তুমি শুনেছিলে, সে মূক ক্রন্দন,
তোমাকে দিয়েছে তাদের সে অক্ষম পরাজয়;
তুমি মানুষের কবি—এ তোমার সত্য পরিচয়।

রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকীর শুভলগ্নে প্রকাশিত বইটি আশা করি প্রাপ্য সমাদর লাভ করবে।

লহ প্রণাম—বিভা সরকার। প্রকাশক: শ্রীসুপ্রিয় সরকার, ১৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৪১; মূল্য টাকা ১·২৫।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রণামাঞ্জলি অর্পিত হয়েছে আলোচ্য বইটির 'পঁচিশে বৈশাখ', 'নবারুণ', 'শেষ ব্রাহ্মণ', 'একটি নমস্কার', 'হিমাদ্রি-প্রাণ', 'মহা মেঘে', 'বাইশে শ্রাবণ', মৃত্যুহীন' প্রভৃতি রসোত্তীর্ণ কবিতার মাধ্যমে। বইটিতে একটি সূচীপত্রের অভাব অনুভূত হয়।

শ্রীময়ী (নূতন মাসিক পত্রিকা) প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; রবীন্দ্রশত-জন্ম-বার্ষিকী—বৈশাখ, ১৩৬৮। সম্পাদনায় অঞ্জলি বসু ও নির্মল ভাই। পি ৬০৫, ব্লক 'ও' নিউ আলিপুর কলিকাতা ৩৩ হইতে নির্মল বসু কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য প্রতি সংখ্যা ৫০ নয়া পয়সা, বার্ষিক মূল্য (ডাক মাশুল সহ) ৬৲।

মোট ২৩টি গল্প কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের লেখা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে 'শ্রীময়ী' মাসিক পত্রিকা। বাংলা দেশের উর্বর ক্ষেত্রে বর্ষে বর্ষে বহু পত্র-পত্রিকা গজিয়ে ওঠে। আমরা আশা করি 'শ্রীময়ী' নতুন বলিষ্ঠ ভাব পরিবেশন ক'রে বাংলা দেশ ও সাহিত্যকে যথার্থ শ্রীমণ্ডিত করতে পারবে। আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি লেখার বিষয়বস্তু ভাব ও ভাষায় তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যথা: রবীন্দ্র-প্রণতি—জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর), জোড়াসাঁকোর ধারা সুরাজচন্দ্র দাশ, শ্রীশ্রীমা ও আধুনিক নারীসমাজ—উষাদেবী সরস্বতী।

উদয়াচল (১৩৬৭): প্রকাশক—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৭৯+২৫।

বিভিন্ন বিষয়ের ২৫টি বাংলা এবং ৯টি ইংরেজী লেখা স্থান পেয়েছে এবারের 'উদয়াচল' পত্রিকায়। লেখাগুলি সুনির্বাচিত। 'আমাদের বর্তমান সমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দ', 'স্বামী বিবেকানন্দের সেবাদর্শ' এবং 'Swami Vivekananda: His plan to build up a new India প্রবন্ধে স্বামীজীর ভাবাদর্শ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'The Ashrama: Its growth and development' প্রবন্ধে আশ্রমের ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী হরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৮শে জুন অপরাহ্ণ ৪টায় স্বামী হরানন্দ (তারানাথ মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে ৬৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৫ মাস যাবৎ তিনি আন্ত্রিক পক্ষাঘাতে (intestinal paralysis) শয্যাগত ছিলেন।

১৯১৩ খৃঃ তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২১ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। তাঁহার দেহ-নির্মুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী সেবানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৬ই জুলাই বেলা ১১টার সময় স্বামী সেবানন্দ (গণেশ মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে ৫৮ বৎসর বয়সে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় দেহত্যাগ করেন। কিছুকাল ধরিয়া তিনি হাঁপানিতে (cardiac asthma) ভুগিতেছিলেন। স্বামী সেবানন্দ অন্ধ ছিলেন।

১৯২৫ খৃঃ ২২ বৎসর বয়সে তিনি বারাণসী সেবাশ্রমের কর্মী-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও গত ৩৬ বৎসর যাবৎ স্বামী সেবানন্দ সেবাশ্রমে খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

উৎসব-সংবাদ

বালিয়াটী (ঢাকা): শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ভজন-সঙ্গীত এবং ২০শে প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও অপরাহ্ণে নগরকীর্তন হইয়াছিল। ২১শে জ্যৈষ্ঠ ঊষা-কীর্তন এবং পূর্বাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং ভজন হয়। মধ্যাহ্নে দরিদ্রনারায়ণসেবা হয়; প্রায় দুই সহস্র ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে সেবাশ্রমের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয় এবং অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। তৎপরে শ্রীহরলাল রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় যুবকগণ কর্তৃক একদিন যাত্রাভিনয় হইয়াছিল।

মালদহ: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৪শে হইতে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ পাঁচ দিবসব্যাপী বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে তিন দিন বর্ধমানের শ্রীঅহিভূষণ ঠাকুরের চণ্ডী-কীর্তন হয়। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে দুইদিন দুইটি বক্তৃতা দেন।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, ভজন এবং পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ হয়। ঐ দিন বিকালে রামায়ণ কীর্তন ও সন্ধ্যার পর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা কীর্তন হয়। এই উৎসবে পশ্চিম দিনাজপুর, পূর্ণিয়া জেলা এবং মালদহের দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু ভক্ত ও সাধুদের সমাগম হইয়াছিল।

কার্যবিবরণী

রাঁচি: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (জানুআরি '৬০—মার্চ '৬১) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আশ্রমটি মোরাবাদী পাহাড়ের পাদদেশে সুন্দর পরিবেশে

অবস্থিত। ১৯৩০ খৃঃ হইতে ইহা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে জনসেবায় রত।

আশ্রম-পরিচালিত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৫,৫২৬। দরিদ্র ২,৪১৮ জন রোগীকে ঔষধসহ পথ্যও দেওয়া হয়। বায়োকেমিক ও বিশেষ প্রয়োজনীয় এলোপ্যাথিক ঔষধও চিকিৎসালয়ে রাখা হইয়াছে।

স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী ১৪টি গ্রামের ১,৬২০ জনকে পনর দিন অন্তর জনপ্রতি ১½ পাঃ হিসাবে ৫ মাস যাবৎ গুঁড়া দুধ দেওয়া হয়। দরিদ্র বালক-বালিকাদের মধ্যে ১০০ নূতন জামা প্যাণ্ট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

গ্রন্থাগারে ইংরেজী হিন্দী বাংলা ও সংস্কৃতে ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের সুনির্বাচিত ১,৫৪৭ বই আছে। পাঠাগারে ১৪টি সংবাদপত্র এবং ৬৫ খানি হিন্দী ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্র রাখা হয়। পাঠাগারে দৈনিক গড়ে ২৫ জন পাঠক পড়াশুনা করেন। গ্রন্থাগার হইতে ৫১২ পুস্তক গ্রাহকদের পড়িতে দেওয়া হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ১৩টি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ২০৮টি আশ্রমে এবং ২৮টি আশ্রমের বাহিরে ধর্মবিষয়ে ক্লাস করা হইয়াছিল। লাইব্রেরী-হলে সুধী বক্তাগণ সমাজ ও কৃষ্টি বিষয়ে ১৩টি ভাষণ দেন। শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র ও ম্যাজিক লণ্ঠন দেখানো হয় এবং ৩৩টি সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়।

কানপুর: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (জানুআরি '৬০—মার্চ '৬১) বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের কার্যধারা তিন ভাগে বিভক্ত (১) ধর্ম ও সংস্কৃতি (২) শিক্ষা (৩) চিকিৎসা।

আশ্রমে দৈনন্দিন পূজা ও ভজন এবং রবিবার সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা হইয়া থাকে। আশ্রমের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়।

আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪৯৮। গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ৫,৩৫০; ৫,০২১ পুস্তক পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে দাতব্য চিকিৎসালয়ে নূতন ৩২,৫৯২ এবং পুরাতন ১,২৪,৮৫৭ রোগী চিকিৎসিত হয়। সার্জিক্যাল: নূতন ৩,১৮৩ এবং পুরাতন ১১,৬০১। অস্ত্রোপচার: সাধারণ—১,৩১৪, বিশেষ—৫৮; ইঞ্জেকশন—৭,১৮৪; ইলেক্ট্রোথেরাপি—৫০; ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনা—২২৫। গড়ে দৈনিক ৩১৮ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে একটি এক্স্-রে প্ল্যাণ্ট ক্রয় করা হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র

কেন্দ্রাধ্যক্ষ: স্বামী নিখিলানন্দ; সহকারী: স্বামী বুধানন্দ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং রাজযোগ ও গীতার ক্লাসও যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

এপ্রিল: অমরত্ব; হিন্দুনীতিশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব; আভ্যন্তরিক স্থৈর্য লাভের উপায়; হিন্দুধর্মে কর্ম ও পুনর্জন্ম; বর্তমান জগতের জন্য বুদ্ধের বাণী।

মে: চরম একত্ব; ক্ষুদ্র অহং হইতে বৃহৎ অহং; ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ; দৈনন্দিন জীবন কিভাবে আধ্যাত্মিকতায় ভরিয়া তোলা যায়?

ইওরোপে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ জার্মান গবর্নমেণ্টের অতিথিরূপে গত জুন মাসের প্রথম দিকে পশ্চিম জার্মানি পরিভ্রমণ করেন। বন্, মার্বুর্গ, গটিন্‌গেন্, হামবুর্গ ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া তিনি ঐ সব স্থানে ভারত-তত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মসম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বন্ (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বর্তমান ভারতে নব জাগরণ'। বন্-স্থিত ভারতীয় দূতাবাসে তিনি 'বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। [H. S.]

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

ইম্ফল: গত ১০ই ও ১১ই জুন স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রথম দিন অপরাহ্ণে মণিপুর ও ত্রিপুরার কমিশনারের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় স্তোত্রপাঠ ও ভজনের পর বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন এবং 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী' বিষয়ে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারা বিবৃত করিয়া সকলকে মানবসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে বলেন।

দ্বিতীয় দিন পূর্বাহ্ণে পূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন ও ভজন হয়। ৫৫০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আরতি ও ভজনের পর উৎসব সমাপ্ত হয়।

বাঁশাটী (মেদিনীপুর): গত ১৪ই ও ১৫ই জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা, নাম-সংকীর্তন, 'কথামৃত'-পাঠ, কথকতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবে জয়রামবাটী মাতৃমন্দির ও কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসিগণ যোগদান করেন।

কার্যবিবরণী

হাওড়া: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের (৪, নস্করপাড়া লেন, কাসুন্দিয়া) কার্যবিবরণী (এপ্রিল '৫৪—মার্চ '৫৯) আমরা পাইয়াছি।

১৯১৬ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমে নিয়মিত পূজা, ভজনাদি এবং বিশেষ দিনে বিশেষ পূজা ও জন্মোৎসবাদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় ধর্মসভা হইয়া থাকে।

গ্রন্থাগারে ৩,৯০০ বই আছে, পাঠাগারে ৩টি দৈনিক এবং ১০টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪০। আশ্রম-পরিচালিত বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন বর্তমানে বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য (কলা)—তিনটি বিষয়ে শিক্ষাব্যবস্থার অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে।

আশ্রম কর্তৃক রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডার ও দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়। আলোচ্য পাঁচ বৎসরে ৪৪,০৯১ (নূতন ২৪,৩৩২) রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং দরিদ্রদিগকে বস্ত্র, কম্বল ও জামা দেওয়া হয়।

লুপ্ত নগরী

আদি সপ্তগ্রামে গ্রীকোরোম্যান (Greco-Roman) সংস্পর্শের কয়েকটি নিদর্শন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এগুলি একটি লুপ্ত নগরীর উপর নূতন আলোক সম্পাত করিতেছে। অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীতীরে এই নগরীটি অবস্থিত ছিল। গঙ্গার প্রধান প্রবাহ এক সময়ে সরস্বতী নদী দিয়াই প্রবাহিত হইত।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে বর্তমান ত্রিবেণীর দুই মাইলের মধ্যে এই মধ্যযুগীয় নগরী অবস্থিত ছিল বলিয়া এতদিন অধিকাংশ ঐতিহাসিকের ধারণা ছিল। কিন্তু এই নূতন আবিষ্কারের ফলে আদি সপ্তগ্রামও 'গঙ্গাহৃদির' (Ganga-ridea) একটি প্রসিদ্ধ বন্দররূপে উদ্‌ঘাটিত হইল। ইহা ছাড়া এই নগরীটি গঙ্গানদীর

মোহানায় অন্যান্য বন্দরের ন্যায় বিদেশের সহিত সাংস্কৃতিক সম্বন্ধে যুক্ত ছিল বলিয়া দাবি করিতে পারে।

গত যে মাসে গ্রীকো-রোম্যান যুগের জুয়া-খেলার পাত্র (rouletted dishes) ও সুঙ্গ-কুশান যুগের চকচকে কালো মৃন্ময় পাত্রসহ ২,০০০ বছরের পুরাতন টুকরা টুকরা বিভিন্ন ধরনের মৃৎশিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরও কতকগুলি আকর্ষণীয় সুন্দর ধরনের বাসন-কোসনে এককেন্দ্রিক বৃত্তসকল অঙ্কিত থাকায় বোঝা যাইতেছে যে, তাম্রলিপ্ত হরিনারায়ণপুর ও চন্দ্রকেতুগড়ের মতো এই স্থানেও ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর অঞ্চলের নাবিকদিগের যাতায়াত ছিল। (সঙ্কলিত)

মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা

হুগলি জেলার অন্তর্গত আঁটপুর গ্রামে—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজীর জন্মস্থানে মন্দির-নির্মাণ কমিটির আহ্বানে গত ১৬ই জুন (২রা আষাঢ়) শুক্রবার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় সংকল্পিত মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর যথারীতি স্থাপন করেন। ঐ সময়ে কলিকাতার ও স্থানীয় বহু ভক্ত এবং বেলুড় মঠ ও বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের বহু সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। ভিত্তিস্থাপনের পূর্বে ঐ স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা, চণ্ডীপাঠ ও হোম সম্পন্ন হয়। সমবেত সাধু ও ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের পূত চরণস্পর্শে পবিত্র আঁটপুর গ্রামের মাহাত্ম্যাদি কীর্তন করেন।

পরলোকে ডাঃ অঘোরচন্দ্র ঘোষ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ডাক্তার অঘোরচন্দ্র ঘোষ গত ১লা জুলাই তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং পরম ভক্তিমান্ ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি সিভিল সার্জেন হইয়াছিলেন এবং বাংলার বিভিন্ন জেলায় সরকারী কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া দক্ষতার সহিত কার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা পরম শান্তি লাভ করুক—ইহাই প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বর্ণপ্রভা গুপ্তার ৺কাশীপ্রাপ্তি

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১০ই জুন রাত্রি ১২-৪৫ মিঃ সময়ে কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগের পরিচালিকা (superintendent) স্বর্ণপ্রভা গুপ্তা (ছোট মা) ৮০ বৎসর বয়সে ৺কাশী লাভ করিয়াছেন। ক্যান্সার (cancer) রোগে আক্রান্ত হইয়া তিন মাস তিনি শয্যাগতা ছিলেন। গত ৩৬ বৎসর যাবৎ তিনি সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগের কাজ অতি দক্ষতার সহিত চালাইয়া আন্তরিক সেবা ও পরিচর্যার জন্য 'ছোট মা' নাম অর্জন করিয়াছিলেন। স্বর্ণপ্রভা পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন।

অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি অপূর্ব ধৈর্য ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন। সুদীর্ঘকাল সাধনভজনে কাটাইয়া শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি সজ্ঞানে ইষ্টনাম শুনিতে শুনিতে তাঁহারই পাদপদ্মে মিলিতা হইয়াছেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী ভাদ্রমাস হইতে 'উদ্বোধন'-গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করিবেন।

নবধা ভক্তি

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদংঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে ।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥

শ্রীভগবানকে লাভ করিতে গেলে ভক্তি একান্ত প্রয়োজন। এই ভক্তির বিভিন্ন রূপ। শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চভাব প্রসিদ্ধ। নবধা ভক্তির কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতাদিতে পাওয়া যায়, নবধা ভক্তি—যথা: শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্যভাব, সখ্যভাব, আত্মনিবেদন।

কোন ভক্তের মুখ্য সাধনা শুধু ভগবৎকথা শ্রবণ করা। কোন ভাগ্যবান্ ভক্ত আজীবন ভগবৎকথা কীর্তন করিবার সুযোগ লাভ করেন। আবার কোন মহাত্মা ভক্ত সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানকে স্মরণ করার সাধনা করিয়াই তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন। কৃচিৎ কেহ সাক্ষাৎভাবে তাঁহার শ্রীচরণসেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীভগবানের অর্চনা করা, বন্দনা করা, দাসভাবে বা সখাভাবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া—নবধা ভক্তির স্তরে স্তরে রহিয়াছে, আত্মনিবেদন সাধনার শেষ, ভগবানকে বাঁধিবার প্রেমরজ্জু।

প্রত্যেকটি ভাবের এক একটি আদর্শ বা দৃষ্টান্ত ভাগবতাদি গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কোন ভক্ত কবি সেগুলি আহরণ করিয়া ভাবগর্ভ শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন:

শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া মৃত্যু-অভিশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীভগবানকে লাভ করেন। শ্রীভগবানের কথা কীর্তন করিবার শ্রেষ্ঠ আচার্য অকামহত শ্রীশুকদেব! সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানকে স্মরণ করিবার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ভক্তরাজ প্রহ্লাদ। সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীভগবানের পদসেবার অধিকারিণী শ্রীস্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবী! শ্রীভগবানের পূজা করিয়া নিজের ও সকলের কল্যাণসাধন করিয়াছেন পৃথুরাজা। বন্দনার আদর্শ অক্রূর, দাস্যভাবের দৃষ্টান্ত হনুমান্, সখ্যভাবের অর্জুন। সর্বতোভাবে আত্মনিবেদনের সাধনা করিয়া বলি ভগবানকে লাভ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত সাধকশ্রেষ্ঠগণ এক এক প্রকার ভক্তির যথার্থ অনুষ্ঠান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন।

কথাপ্রসঙ্গে

'মামনুস্মর যুধ্য চ'

শ্রীকৃষ্ণের দুইটি রূপের সহিত আমরা পরিচিত—একটি প্রেমের, অন্যটি কর্মের ; একটি বৃন্দাবনের, অন্যটি কুরুক্ষেত্রের—মহাভারতের ; একটি ভাগবতের, অন্যটি গীতার। এ দুইটির মধ্যে কোনটিকে বরণ করিব, কোনটিকে বর্জন করিব—তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন। ভারত-বাসীর গ্রহণশীল মনে শ্রীকৃষ্ণের এই দুই মূর্তিই রহিয়াছে পরিপূরকরূপে। প্রেমরূপের আবার শান্ত-দাস্যাদি কত ভাব ! ভারতের আবালবৃদ্ধ-বনিতা শ্রীকৃষ্ণের নানাভাবের একটিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রীতিরস আস্বাদ করিতে চায় ; কেহ তাঁহাকে শিশু-সন্তানরূপে, কেহ সখারূপে, কেহ বা প্রেমিক হৃদয়দেবতারূপে তাঁহাকে আরাধনা করেন ! শ্রীমদ্‌ভাগবত এই শ্রীকৃষ্ণ-লীলা স্মরণমননের প্রধান সহায়ক !

বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত দেশীয় গবেষকগণ এই পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐতিহাসিক কৃষ্ণের কোন মিল খুঁজিয়া পান না ; অথচ শ্রীকৃষ্ণের মতো একটি বিরাট ব্যক্তি বা অভিব্যক্তিকে বাদ দিয়া ভারতের ইতিহাস ধর্ম সাহিত্য কাব্য—কিছুই রচনা করা সম্ভব নহে, এক দিক দিয়া বলা যায় শ্রীকৃষ্ণই ভারতের আত্মা !

শ্রুতি যাঁহাকে 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' বলিয়াছেন, তিনিই যেন চক্ষুকর্ণের গোচর হইয়া ভারতের মৃত্তিকায় বিচরণ করিয়া ইহাকে 'মহাভারতে' পরিণত করিয়াছেন। পুরাণকার যেন স্বচক্ষে দেখিয়া বলিতেছেন, বৃন্দারণ্যে সেই 'বেদান্তসিদ্ধান্তো নৃত্যতি'; শ্রীকৃষ্ণ সেই বেদান্তের সিদ্ধান্ত—পরব্রহ্ম ! নিজে তিনি গীতামুখে বলিতেছেন, 'বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্'—শ্রীরামকৃষ্ণমুখে এই দুরূহ তত্ত্বের সরল সমাধান পাই : বেদে যাকে 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম' বলেছে, পুরাণে তাঁকেই 'সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ' বলেছে। প্রথমটি জ্ঞানের ভাব, দ্বিতীয়টি প্রেমের মূর্তি—সর্বভাবসমন্বয়ের বিগ্রহ।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের আর এক রূপ। মহাভারতকে আমরা ঠিক পুরাণ বলিতে পারি না, আধুনিক পণ্ডিতগণ ইহা ইতিহাস বলিতেও দ্বিধা বোধ করিবেন, আবার ইহা রামায়ণের মতো কাব্য বা মহাকাব্যও নহে ! বোধহয় ইহাকে 'ভারতকৃষ্টির মহাকোষ' বলা চলে। সে যাহাই হউক, মহাভারত মহান্ ভারতের যথার্থ রূপ ব্যক্ত করিয়াছে—অনেকগুলি মহৎ চরিত্রের মাধ্যমে, তন্মধ্যে মহত্তম চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ ; কেহ তাঁহাকে মহামানব বলিবে, কেহ দেবমানব বা অবতার বলিবে। ভক্ত তাঁহাকে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা বলিয়া পূজা করিবে, দুর্বৃত্ত তাঁহাকে দেখিয়া কৃতান্ত মনে করিয়া কাঁপিতে থাকিবে। ভাগবতকার নানা অবতারলীলা বর্ণনা করিয়া তাই শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।

বেদান্তকে বলা হয় শ্রুতিশির, তেমনি গীতাকে বলা যাইতে পারে মহাভারতের মুকুটমণি ! যে বেদান্তে বা উপনিষদ্-মধ্যেই বেদের সার কথা রহিয়াছে, সেই উপনিষদের সার কথা আবার গীতামুখে নিনাদিত ! ঋষিদের অনুভূতি ভগবদ্‌মুখে উচ্চারিত হইয়া দ্বিগুণবলে বলীয়ান্ হইয়াছে, তাই গীতা মান্য —সর্বকালে সর্বদেশে ! গীতার মধ্যে রহিয়াছে শাশ্বত মানুষের জীবনসমস্যা ও তাহার

সমাধান! অর্জুন প্রতীকমাত্র, পৃথিবীর মানুষের প্রতিনিধি; সংসারের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভুল-ভ্রান্তি-ভয়ে ভরা একটি মানুষ—তাহার মনের সকল সংশয়, সকল সমস্যা লইয়া—শ্রেষ্ঠ গুরুর সম্মুখে উপস্থিত! শ্রীকৃষ্ণ সম্পদ্‌কালে অর্জুনের সখা, বিপদ্‌কালে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার রথের সারথি, সংশয়কালে তাহার জ্ঞানদাতা গুরু, সর্বকালে তাহার অন্তর্যামী ইষ্ট! অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীভগবান জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন!

গীতার শিক্ষাই আমাদিগকে ভাগবত জীবনের উপযোগী করিবে। গীতার কর্মযোগই আমাদের প্রস্তুত করিবে ভাগবতের প্রেম-যোগের প্রকৃত রহস্য বুঝিবার জন্য। নিষ্কাম প্রেমের তত্ত্ব বুঝিতে গেলে আগে নিষ্কাম কর্ম করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ এই দুই তত্ত্বের একটি পূর্ণ রূপ। বৃন্দাবনে তাঁহার নিষ্কাম প্রেমের লীলা, কুরুক্ষেত্রে তিনিই নিষ্কাম কর্মের কর্ণধার! প্রেমে ও কর্মে অনাসক্তিই জীবন-সমস্যা সমাধানের শুধু শ্রেষ্ঠ উপায় নয়—বোধ হয় একমাত্র উপায়। যতক্ষণ মানুষের আসক্তি, ততক্ষণ তাহার বন্ধন—দুঃখ ও ক্রন্দন! অনাসক্তি মানুষকে মুক্ত করে, মহান্ করে! আসক্তি মানুষকে ক্ষুণ্ণ করে, ক্ষুদ্র করে; কর্মে আসক্তি কর্মফলের প্রতি মানুষকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতে বলে—কর্মের ফল মনোমত হইলে সুখ, মনোমত না হইলে দুঃখ। অনাসক্ত কর্মযোগী সমদর্শী বিশ্বকর্মা—ঈশ্বর-ধর্মী। অনাসক্ত প্রেমিকের চাওয়া নাই, পাওয়া নাই। সে এক বন্ধনহীন প্রেম—যাহার অপর নাম 'আনন্দং ব্রহ্ম'। এই অনাসক্তির শিক্ষাই মনের বন্ধনভাব—জীবনের নিরানন্দভাব দূর করিতে পারে, ইহাই গীতার শিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষারই জীবন্ত মূর্তি।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধারম্ভের বিষম সংকটমুহূর্তে—জয়-পরাজয়ের আশা-আশঙ্কায় মনের দোদুল্যমান অবস্থায় স্বজন-গুরুজনের আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় কাতর—সর্বোপরি কুল-ধ্বংসের ভয়াল সম্ভাবনায় বিষণ্ণ অর্জুনের চিত্র গীতার পটভূমিকায় অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যেমনই করুণ তেমনই বাস্তব! মহাবীর অর্জুন বাস্তব জীবনপ্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া জ্ঞানবৈরাগ্যের কত কথাই বলিতেছেন!

শ্রীভগবান্ আদর্শ গুরুর মতো তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উৎসাহিত করিতেছেন। অন্তর্যামী তিনি—অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ, তিনি জানেন—অর্জুনের এই আলস্য-ভয়জনিত কর্মবিরতির ইচ্ছা বৈরাগ্যের ছদ্মবেশ, কর্ম হইতে পলায়নের চেষ্টা। সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া প্রচণ্ড তমোগুণ দেখা দিতেছে। অহিংসার আবরণে ঘোর কাপুরুষতা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে।

অর্জুনের অন্তর্নিহিত মহাবীর্যকে জাগ্রত করিবার জন্য মহাবীরকে তিনি 'ক্লীব' বলিয়া কটূক্তি করিলেন। তাহার যুক্তির অসারতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে আত্মতত্ত্ব—অমৃতত্ত্ব উপদেশ দিলেন। আত্মতত্ত্ব শুদ্ধচিত্তেই প্রতিভাত হয়; সকাম কর্মে মলিন চিত্ত উহা ধারণা করিতে পারে না। তাই শ্রীভগবান্ অর্জুনকে কর্মযোগ উপদেশ দিতেছেন, কর্ম কর, ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না; ইহা শুনিতে সহজ, কিন্তু জীবনে রূপায়িত করা কত সাধন-সাপেক্ষ, তাহা গীতার অধ্যায়ে অধ্যায়ে প্রকটিত হইয়াছে।

মানুষকে কাজ করিতে হইবেই, স্বার্থ লইয়া কাজ করিলে সংঘাত ও দুঃখ অনিবার্য, তাই শ্রীভগবানের শিক্ষা প্রথমতঃ কর্তব্যবুদ্ধিতে কাজ কর। এ সংসার কর্মক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্র, এ জীবন এক অবিরাম যুদ্ধ। যুদ্ধ করিতেই হইবে—শুধু ক্ষত্রিয় অর্জুনকে নয়, প্রত্যেকটি মানুষকে—শত্রু শুধু বাহিরে নয়, ভিতরেও! কিভাবে আমরা অন্তরে বাহিরের এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি, তাহারই ইঙ্গিত শ্রীভগবানের মহাবাণীর মধ্যে 'মামনুস্মর যুধ্য চ'—আমাকে স্মরণ কর, এবং যুদ্ধ কর, জয় অবশ্যম্ভাবী। এতদিন কাজ করিয়াছ স্বার্থে—এখন কর ঈশ্বরার্থে; এতদিন ভাল-বাসিয়াছ ক্ষুদ্র জীবভাবকে, এখন ভালবাস বিরাট ঈশ্বরভাবকে। এই বৃহৎ ভাবনার সহিত বৃহৎ কর্মপ্রচেষ্টা সংযুক্ত কর, জয় তোমার সুনিশ্চয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

গ্রীক পুরাণে শোনা যায়, প্রথমে শক্তিশালী উন্নততর টাইটানরা এই পৃথিবীতে বাস করিতেন, তারপর ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের আবির্ভাব হয়। বিংশ শতাব্দীর মানুষের তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীতে জাত ভারতীয় মনীষীদের টাইটান বলিয়াই মনে হয়! শরীরের দিক দিয়া নয়, মনের দিক দিয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিশ্চয় একজন টাইটান ছিলেন। আজ তাঁহার জন্মের শতবর্ষ-পূর্তিকালে আমরা তাঁহার অগণিত গুণাবলী স্মরণ করি।

প্রফুল্লচন্দ্রের মনীষাই বড় কথা নয়, মনীষা ও প্রতিভা আরও বড় বড় দেখা গিয়াছে, কিন্তু মানুষ ও মনীষার এরূপ অপরূপ সমন্বয় পৃথিবীর যে কোন দেশে, যে কোন কালে বিরল। বহু-ক্ষেত্রে দেখা যায় মনীষা মানুষকে ছাপাইয়া রহিয়াছে—কোথাও বা মানুষটিই মহৎ হইয়া দেখা দেয়, মনীষা চাপা থাকে। প্রফুল্লচন্দ্রে মানুষ ও মনীষা—জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমান তালে চলিযাছে।

বিজ্ঞানের শিক্ষক বা গবেষকের অভাব আজ হয়তো আর ততটা নাই। কিন্তু অভাব আছে দরদী আচার্যের, যিনি তাঁহার প্রচারিত আদর্শ নিজ জীবনে আচরণ করিয়া ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবেন, ছাত্রদিগকে যিনি পুত্র বলিয়া মনে করিয়া গর্ব অনুভব করিবেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার রসায়নের একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার লইয়া, এমন কিছু চমকপ্রদ নহে; কিন্তু কেহ যখন তাঁহাকে তাঁহার আবিষ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিত—তিনি সগৌরবে তাঁহার কৃতী ছাত্রদের দেখাইয়া দিতেন। গত অর্ধশতাব্দীব্যাপী ভারতীয় রসায়ন-গগনের প্রথম শ্রেণীর তারকাগুলি প্রায় সব প্রফুল্লচন্দ্রের আবিষ্কার!

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক পরিবেশে কি করিয়া প্রাচীন আদর্শের এই ত্যাগ ও তপস্যা-ময় জীবন গড়িয়া উঠিল—ইহাই এক পরম বিস্ময়! প্রফুল্লচন্দ্রে মিলন ঘটিয়াছে প্রাচীনের সহিত নবীনের, বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার সহিত আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের। পাশ্চাত্য গবেষণা-রীতির সহিত প্রাচ্য সাধনা-পদ্ধতির! বিজ্ঞানের গবেষণাগারেই তাঁহার জীবন সীমাবদ্ধ ছিল না। সাহিত্য অধ্যয়ন তাঁহার জীবনের আর একটি দিক। History of Hindu Chemistry (ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস) এবং Autobiography (আত্ম-জীবনী) তাঁহার মনের আর একটি বিশেষ দিক উদ্‌ঘাটিত করে। নাগার্জুন ও বার্থেলোর মধ্যে তিনি সেতু রচনা করিযাছেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—বিশেষ রসায়ন-গবেষণায় এ সাধনার মূল্য অপরিসীম।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মিলিত সাধনাতেও প্রফুল্লচন্দ্রের সকল শক্তি নিঃশেষিত হয় নাই। তাঁহার আর এক অপূর্ব সৃষ্টি 'বেঙ্গল কেমিক্যাল': এই আধুনিক শিল্প-প্রচেষ্টায় তিনি দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও কর্মক্ষমতাকে একটি ঘনীভূত রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের আর একটি গুণসম্পদ্—তাঁহার সরল অনাড়ম্বর দেশপ্রেম; রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নয়, দরিদ্র গ্রামবাসীদের কুটিরে কুটিরে আর্ত মানুষের সেবায় তিনি নিজেকে বিলাইয়া দিতেন। আজিকার দেশবাসী—বিশেষত আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি যদি এই শতবার্ষিক স্মরণের শুভক্ষণে, আচার্যের গুণাবলী স্মরণ করিয়া সেগুলির দু-একটিকেও জীবনে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করে, তবে নিশ্চয় বর্তমানের হতাশার ভাব কাটিয়া যাইবে—জাতি এক সবল সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবে।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

[প্রস্তাবিত কর্মসূচী]

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষজয়ন্তী উদ্‌যাপনের জন্য শতবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক নিম্নলিখিত কর্মসূচীর খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে :

সময় : ১৯৬৩ খৃঃ জানুআরি মাসে স্বামীজীর জন্মতিথির দিন বেলুড় মঠে এই শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন হইবে এবং বর্ষব্যাপী উৎসব ১৯৬৪ খৃঃ জানুআরিতে সমাপ্ত হইবে।

স্থান : (১) এই বৎসর ভারতে ও ভারতের বাহিরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) এই কেন্দ্রগুলি স্থানীয় কমিটি ও ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে ও সহযোগিতায় যত বেশী স্থানে সম্ভব উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, সাধারণ গ্রন্থাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে এবং জনসাধারণকে তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকায় যথাযোগ্যভাবে এই উৎসবের আয়োজন করিতে অনুরোধ করা হইবে।

উদ্বোধন : শতবার্ষিকীর শুভ উদ্বোধনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজের সর্বজনীন প্রীতি ও শুভেচ্ছার বাণী প্রচারিত হইবে। বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রিকায় ও প্রচার-পত্র সাহায্যে ইহা ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রচারিত হইবে। ভারতে ও অন্যান্য দেশে বেতারের মাধ্যমেও প্রচারের চেষ্টা করা হইবে।

বাণী-প্রচার : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান, সমিতি প্রভৃতির সহযোগিতায় ভারতে ও ভারতের বাহিরে স্বামীজীর শিক্ষা ও ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা আলোচনা ও সভার ব্যবস্থা করা হইবে।

প্রকাশন : (১) একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইবে। 'বিশ্ব-চিন্তাধারায় স্বামী বিবেকানন্দের দান' সম্বন্ধে এই পুস্তকের ভূমিকায় থাকিবে 'পৃথিবীর কৃষ্টি ও চিন্তাধারায় যুগে যুগে ভারতের প্রভাব' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ।

(২) স্বামীজীর সমগ্র গ্রন্থাবলী (বাণী ও রচনা) যতগুলি বেশী সম্ভব ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করা হইবে।*

(৩) স্বামীজীর বক্তৃতা ও রচনার নির্বাচিত একটি সঙ্কলন যত অধিকসংখ্যক ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় পারা যায়, প্রকাশ করা হইবে।

(৪) স্বামীজীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হইবে এবং ইহার মূল্য ৫০ নয়া পয়সা করা হইবে।

(৫) স্বামীজীর একটি আলেখ্য-সংগ্রহ (Album) প্রকাশ করা হইবে।

---

* ইংরেজী ৮ খণ্ডে ইহা প্রকাশিত, ভারতের ৮টি প্রধান ভাষায় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

(৬) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইবে যে, প্রাথমিক ও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থায় যেন তাঁহাদের অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকে স্বামীজীর বাণী ও রচনা হইতে কিছু কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৭) বিভিন্ন স্তরের শিক্ষিত লোকের জন্য উপযোগী করিয়া স্বামীজীর জীবনী ও বাণী বিষয়ক সাহিত্য প্রকাশ করিতে হইবে।

স্থায়ী স্মৃতি : (১) স্বামীজীর পৈতৃক বসতবাটী ও জন্মস্থান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ঐ স্থানটিকে একটি উপযুক্ত স্মৃতি-মন্দিরে রূপায়িত করিতে হইবে।

(২) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে বিবেকানন্দ-জন্মশতবর্ষজয়ন্তী ভাষণমালা প্রদানের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে, বক্তৃতার বিষয় :

(ক) স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার বাণী (খ) যে কোন সংস্কৃতিমূলক বিষয়।

সভা ও সম্মেলন : (১) বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগের একটি সম্মেলন হইবে।

(২) বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং মিশনের গৃহী ভক্ত ও সদস্যদিগের এক সভা হইবে, ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত এবং মিশনের অনুরাগী ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণ করা হইবে।

(৩) সমন্বয় ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বারাণসী, প্রয়াগ বা কনখলে (হরিদ্বার) সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদিগের একটি সম্মেলন হইবে।

(৪) বেলুড়ে বা কলিকাতায় 'ধর্মমহাসভা' অথবা মানবজাতির সম্মেলন হইবে।

(৪) কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে মহিলা-ভক্তবৃন্দের একটি সম্মেলন হইবে।

সঙ্গীত-সম্মেলন : অখিল ভারত ভজনসঙ্গীত-সম্মেলন হইবে।

প্রদর্শনী : স্বামীজীর জীবন ও কর্মধারার উপর বিশেষ জোর দিয়া একটি সংস্কৃতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইবে।

তীর্থভ্রমণ ও শোভাযাত্রা : (১) স্বামীজীর পূতস্মৃতি-বিজড়িত কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানে তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থা করা হইবে।

(২) এতদুপলক্ষে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হইবে।

বিবিধ : (১) বিশেষ ধরনের স্মৃতি-পদক প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) বিভিন্ন সরকারকে (Government) স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীর স্মারক ডাক-টিকিট বাহির করিতে অনুরোধ করা হইবে।

(৩) স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে প্রামাণিক চলচ্চিত্র (Documentary film) প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) জনসাধারণের জন্য যাত্রা তরজা কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জীবন ও বাণী প্রচার করার আয়োজন করিতে হইবে।

চলার পথে

'যাত্রী'

এ পৃথিবীতে এসে তুমি বিচার চাও কেন বন্ধু! কিসের বিচার? কার কাছে বিচার?—মানুষের কাছে! সে তো 'খাদ' দিয়েই গড়া, সে তো সম্পূর্ণ নয়; সে তো তোমারই মতো এই সদাপরিবর্তনশীল পৃথিবীর চঞ্চল পটভূমিতে অস্থির-অশান্ত মন ও প্রাণ নিয়ে সদাই ব্যস্ত! সে তো স্থির নয়, ধ্রুব নয়; শুচিতার শুভ্রশিরে সে তো তার অভিযান এখনও শেষ না ক'রে এগিয়ে চলেছে মাত্র। মায়ার অন্ধকারে তার জীবন এখন তো মুগ্ধ—অরুণালোকের অপরূপতায় আজও তা ভাস্বর হয়ে ওঠেনি। সে হয়তো জানে যে, সে অমৃতের পুত্রদের একজন। কিন্তু সে জানা আজও তাকে ধূলামাটির চিহ্ন মুছিয়ে দিয়ে প্রেম-গাথার চিরন্তন ছন্দে, কিংবা ভূমার মহাস্পন্দনে নন্দিত ক'রে তোলেনি। তাই বলি, মানুষের কাছে বিচার চেও না, বরং মানুষের উপরে নিজেকে তুলে ধরে বিচারোত্তর অবস্থায় পৌঁছতে চেষ্টা কর।

নিজেকে তুলে ধর; নিজেকে ফুটিয়ে তোলো। শুচিতার জাহ্নবীধারায় নিজেকে অবগাহন করাও। নিয়ে যাও নিজেকে সেই জ্যোতির্ময়তার চিরসমাহিত ধ্যান-লোকে। চল, মানস-লোকের সেই অপার্থিবতায় যেখানে বিচার নেই—যেখানে বিচার চাইবার ইচ্ছাও নেই; চল সেই অপ্রমত্ত মানবিকতায় যেখানে বুদ্ধ শঙ্কর, চৈতন্য রামকৃষ্ণ তাঁদের জ্যোতিরুত্তম কল্যাণের ডালি নিয়ে নিত্যপ্রেমে সবাইকে আলিঙ্গন করতে দাঁড়িয়ে আছেন।

আবার বলি, মানুষের কাছে বিচার চেও না। আর যদি একান্তই বিচার চাও তো নিজেকে বিচার কর। মজ্জাগত ক্লেদকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে জানো। নিজেকে চেনার তপশ্চর্যায় নিজেকেই নিযোজিত কর। দেখবে, তোমার মনে—তোমার অন্তরাত্মার নিভৃত নিলয়ে এক পরম জ্যোতির দ্বার খুলে গেছে, আর সেই দ্বারের ভেতরে প্রবেশ করবার সময় তোমার মন স্বতই গেয়ে উঠেছে—

> নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্ত
> অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া
> উছল আনন আজিকে নহেক' ক্লান্ত
> জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

এই ভাবে নিজেকে সুধায় ভরিয়ে তোলো। আত্মপ্রবঞ্চনার মায়াজালে জড়িয়ে আছ—তা কেটে বেরিয়ে এস। আর তা যদি না পারো তো অসম্পূর্ণ মানুষের কাছে বিচার চাইতে গিয়ে ভুল ক'রো না। আর যদি তা না ক'রে মোহান্ধ হয়ে পথের যথার্থ নিশানা ভুলে বিপথে চল, তাহলে সব কিছুই তোমাকে ভুল পথ দেখাবে, মনে রেখো। সব কিছুই তখন তোমাকে শব্দারণ্যের আপাতমধুর জড়িমার আর্তপ্রবাহে টেনে নিয়ে আসবে। ফলে, তখন যে শুধু নিজেকেই হারাবে তা নয়, পরমপ্রাপ্তির ঐ লক্ষ্য যে ভগবান—তাঁকেও ভুল বুঝবে, তাঁকেও সন্দেহ করতে শিখে বলবে—'ভগবান তুমি নাই,

চোর করিতেছে চুরির বিচার তুমি দেখিতেছ তাই।'

তাই বলি, এই মায়ার পৃথিবীতে, এই সংসারের কুহকে, এই গরলে-ভরা আত্মীয়তার কুচক্রে প'ড়ে মানুষের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ো না। তার চেয়ে প্রজ্ঞাপারমিতার আনন্দ-লোকে নিজেকে টেনে এনে যোগাসনে বসিয়ে অমৃতত্বের সাধনা কর। তোমার দেশ, তোমার ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধ'রে এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছে। যে তা শুনেছে, যে তা মেনেছে সে 'মনু' হয়ে গেছে, আর যে তা মানেনি সে আজও যে তিমিরে সেই তিমিরে—সে আজও শত প্রলোভনের বীভৎসতার মাঝে মাণবকই থেকে গেল।

ভারতের মানুষ হয়েও তুমি কি ক'রে যে তোমার মৌলিক তত্ত্বসন্ধানের উৎসুকতাকে হারিয়ে ফেললে, তা ভাবতেই আশ্চর্য লাগে! আনুষঙ্গিকের বিকল্প জ্ঞান নিয়ে তুমি এতই মেতে রয়ে গেলে যে তোমার মধ্যকার সত্যানুভূতির নিজস্ব সম্পদ্‌টিকেও তুমি আর খুঁজে পাচ্ছ না। আকাশকুসুমের গন্ধ পাবার লোভে ছোটা যে ভুল—এটা কি একবারও ভেবে দেখবার অবসর হবে না তোমার জীবনে? আর, তা যদি এখনি—এই মুহূর্তেই না হয় তো আর হবে কবে? মহাকাল তো আর তোমাকে স্নেহে জড়িয়ে বসে নেই! সে যে তোমাকে প্রতিমুহূর্তেই মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর তুমি নিজেকে 'অভীঃ' জেনেও গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে নিজের মূল্যবান্ জীবনটাকে বৃথায় ফুরিয়ে ফেলছ! ছিঃ, তা কি হয়? অমৃতের পুত্র তুমি, তোমার কি সাজে এই মূঢ়তা—এই ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দেওয়া?

বুঝেছি, দিশাহারা তুমি। বুঝেছি, তোমার সুমুখে সত্যকার আদর্শের বর্তিকা নিয়ে কেউ পথ দেখায় না—তাই তুমি অন্ধকারে পথ চলো, হোঁচট খাও। কিন্তু একটু ধৈর্য ধর, একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও; একটু ভাবতে চেষ্টা কর; একটু 'তদেকশরণ' হয়ে আলোর সাধনা কর। দেখবে জীবনের এই অমানিশায় পথ-চলার ফাঁকেও কে যেন তোমায় আলো দেখিয়ে দেবে। ভাবছ—কোথা থেকে আসবে এই আলো; কেমন ক'রে এ আলো এসে পথ দেখাবে তোমায়! আত্মসম্বিৎ না হারিয়ে বিচার কর—সমাধান পাবে। দেখবে তুমি এতটুকু নও, এত সামান্য নও। তোমার মাঝে যে বীর্যবত্তা, যে অকুতোভয়তা রয়েছে, সেই আজ তোমাকে আলো দেখাচ্ছে। তোমার মাঝে এই শুভকে, এই কল্যাণকে, এই আলোককে ভগবান বলো, ব্রহ্ম বলো বা আত্মা বলো—তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু এ যে একান্ত তোমারই—এ যে তোমারই মনের রূপসাগরের অরূপ-রতন, তা কিন্তু তখন বুঝতে পারবে। তাই বলি, মানুষের কাছে বিচার চেও না; বন্ধু, নিজের ভেতরে বিচার খোঁজ। আর এইভাবে খোঁজাই হচ্ছে সাধন, ভজন, তপস্যা, ভগবানলাভ, ব্রহ্মানুভূতি, আত্মদর্শন—সব কিছু।

তাই বলি, চল পথিক, যথার্থ বিচারের পথে। চল 'নিজেকে' সম্বল ক'রে, অন্তরের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে সরিয়ে পরা-প্রাপ্তির অফুরন্ত রহস্যের পথে। মনে রেখো, তোমারই মনোগহনে তোমার শ্রেষ্ঠরত্ন লুকানো আছে। তুমি এতদিন সুপ্তির বিস্মরণে খোঁজনি, তাই পাওনি। সমুদ্রের লবণটুকু দিয়েই সমুদ্রের বিচার করেছ, তার তলায় ডুব দাওনি, তাই রত্নেরও সন্ধান পাওনি। এখন একবার ডুব দিয়ে দেখ, বুঝবে—সমুদ্র কেবল লোনা নয়, সে রত্নাকরও বটে। এই যে ডুব দেওয়া, এই যে বিচার করা, এই হচ্ছে যথার্থ পথ। চল, শীঘ্র চল এই পথে, এই রাজপথে। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ ঃ বিশ্বরূপ-দর্শন]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥

পরন্তু হে স্বামিন্, আপনাকে এই ভাবে আমি কখন জানিতাম না, তাই আপনার সহিত আত্মীয় সম্বন্ধীর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। (৫৩০)

অহো, ঘোর অন্যায় হইয়াছে, অমৃত দ্বারা আমি আঙিনা সম্মার্জন করিয়াছি, কামধেনুর বদলে বৃষভ (ষাঁড়) লইয়াছি, পরশমণি চিনিতে না পারিয়া তাহার দ্বারা গৃহের ভিত্তি তৈয়ার করিয়াছি, কল্পতরু দ্বারা ক্ষেতের বেড়া দিয়াছি। চিন্তামণির খনি চিনিতে না পারিয়া অনাদর করিলে যেমন হয়, তেমনি আপনার সান্নিধ্যের সুযোগ আত্মীয়তাব জন্য হেলায় হারাইয়াছি। আজিকার প্রসঙ্গই দেখুন, এই যুদ্ধ কি? এবং ইহার মূল্য কতটুকু? ইহাতে আমি আপনাকে সারথি করিতেছি! কৌরবের ঘরে মধ্যস্থতা করিতে আপনাকে দূত করিয়া প্রেরণ করিয়াছি! হে জাগ্রত ঈশ্বর, এই ভাবে আমাদের সুবিধার জন্য আপনাকে হেয় করিয়াছি। আপনি যোগিগণের সমাধি-সুখ-স্বরূপ, আমি মূর্খ, তাই তাহা জানিতে পারি নাই, হে দেব, আপনার সম্মুখে কত বিরোধ করিয়াছি।

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥৪২॥

আপনি এই বিশ্বের আদি কারণ, সভামধ্যে আপনাকে আত্মীয়তাসুলভ কত পরিহাসবাক্য বলিয়াছি। আপনার প্রাসাদে আপনার নিকট যথাযোগ্য সম্মান লাভ করিয়াছি, সম্মানিত না হইলে রুষ্ট হইয়াছি। হে শার্ঙ্গপাণি, আমি অনেক অন্যায় কার্য করিয়াছি, যাহার জন্য চরণ ধরিয়া আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত; আত্মীয়সুলভ স্নেহবশে আমি উল্টা বুঝিয়াছি, এই ভাবে হে বৈকুণ্ঠ, আমি ভুলই করিয়াছি। (৫৪০)

হে দেব, আমি আপনার সহিত ডাণ্ডাগুলি খেলিয়াছি, মল্লক্রীড়া করিয়াছি, পাশা খেলিতে গিয়া তিরস্কার করিয়াছি, উত্তেজিত হইয়া ঝগড়া করিয়াছি; উত্তম বস্তু দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা চাহিয়া বসিয়াছি। আপনাকে পরামর্শ দিয়াছি, কখন বলিয়াছি, 'আমি তোমার কে?' এমন অপরাধ করিয়াছি যে, ত্রিভুবনেও আমার স্থান হইবে না, পরন্তু হে প্রভু, ইহা স্বীকার করিতেছি, আমি না জানিয়া করিয়াছি। হে দেব, আপনি ভোজনের সময় স্নেহের সহিত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, পরন্তু আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। হে দেব, আমি নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার অন্তঃপুরে বিচরণ করিয়াছি, শয়নঘরে ঢুকিয়া আপনারই পাশে শয়ন

করিয়াছি, আপনাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিয়াছি! আপনাকে সাধারণ যাদব বলিয়া মনে করিয়াছি, আপনি চলিয়া যাইবার সময় আপনার নামে শপথ দিয়াছি।

আপনার সঙ্গে একাসনে বসা কিংবা আপনার কথা না মানা—ইহা প্রীতির আধিক্যে বহুবার ঘটিয়াছে, অতএব হে অনন্ত, এখন আর কী করিব? আমি অপরাধের রাশিস্বরূপ হইয়াছি। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যাহা কিছু আচরণ করিয়াছি হে প্রভু, আপনি মাতার ন্যায় তাহা ক্ষমা করুন। হে প্রভু, নদী কোন সময়ে কর্দমময় জল লইয়া আসিলে সমুদ্র তাহা গ্রহণ করিয়া কি ত্যাগ করিবে? বলুন। (৫৫০)

আমি প্রণয়ে বা প্রমাদ-বশতঃ আপনার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি, হে মুকুন্দ, আপনি তাহা ক্ষমা করুন। আর আপনার সহনশীলতার জন্যই পৃথ্বী এই ভূতগ্রামের আধার হইয়া আছে। সুতরাং হে পুরুষোত্তম, আমি আর কি বলিব? তথাপি হে অপ্রমেয়, আমি এখন আপনার শরণাগত, আমার এই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥

হে প্রভু, আমি এখন আপনার মহিমা যথাযথভাবে জানিয়াছি, হে দেব, আপনিই চরাচরের আদি। হে দেব, আপনি হরিহরাদির উপাস্য, বেদেরও গুরু। আপনি গম্ভীর (সুগভীর), আপনি সর্বভূতের একমাত্র আশ্রয়, সকলগুণসমৃদ্ধ, অপ্রতিম, অদ্বিতীয়। আপনার সমান কিছুই নাই—ইহা কি করিয়া প্রতিপাদন করা যায়? আপনিই এই আকাশ হইয়া আছেন, যাহা জগৎকে ধরিয়া আছে। আপনার সমান দ্বিতীয় কোন বস্তু আছে, ইহা বলিতেও লজ্জা হয়, আপনা হইতে বৃহত্তর কিছু কি করিয়া হয়? অতএব ত্রিভুবনে আপনি অদ্বিতীয়, আপনার সমান কিংবা আপনার বড় কেহই নাই, আপনার মহিমা অলৌকিক, ইহা বর্ণনা করিতে আমি অসমর্থ।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥৪৪॥

এইভাবে বলিয়া অর্জুন পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, তখন তিনি সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হইয়া (৫৬০) সগদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, প্রভু প্রসন্ন হউন, আমাকে অপরাধ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করুন। আপনি বিশ্বের সুহৃৎ, ইহা আত্মীয়তার অভিমানে মানিয়া লই নাই, আপনি ঈশ্বরের ঈশ্বর আপনার কাছে ঐশ্বর্য বর্ণনা করিয়াছি। আপনি স্তুতির যোগ্য, পরন্তু সভায় স্নেহবশতঃ আপনি আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিঃশব্দে তাহা শুনিয়াছি; আমার অপরাধের সীমা নাই, অতএব কৃপা করিয়া এই অপরাধ হইতে আমাকে রক্ষা করুন।

হে প্রভু, এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার যোগ্যতাও আমার নাই, পরন্তু পুত্র যেমন পিতার সহিত কথা বলে, অথবা প্রাণের প্রিয়জনের সহিত দেখা হইলে অন্তরের অনুভূত অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্কটের কথা নিবেদন করিতে যেমন কোন সঙ্কোচ হয় না, কিংবা যে প্রাণের সহিত আপনার সর্বস্ব নিজ পতিকে একেবারে অর্পণ করিয়াছে, সেই পতির সহিত মিলন হইলে

সে যেমন হৃদয় উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না, তেমনিভাবে, হে স্বামিন্‌, আমি আপনাকে বিনতি করিয়াছি, পরন্তু এই কথা বলিবার ইহা ভিন্ন অন্য একটি কারণও আছে।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥

হে দেব, আপনার কাছে নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে আমি বিশ্বরূপ-দর্শনের যে আবদার করিয়াছিলাম, আপনি তাহা মাতাপিতার ন্যায় স্নেহভরে পূর্ণ করিয়াছেন। গৃহের অঙ্গনে কল্পতরুর ঝাড় লাগাইয়া দিন, খেলিবার জন্য কামধেনুর বৎস আনিয়া দিন, পাশাখেলার জন্য নক্ষত্রগুলি পাড়িয়া দিন, বল খেলিবার জন্য আমার চাঁদ চাই—এইরূপ সমস্ত আবদার মাতার ন্যায় পূর্ণ করিয়াছেন! যে অমৃতের কণার জন্য এত কষ্ট করিতে হয়, আপনি তাহা বর্ষণ করিয়াছেন, তৈয়ারী ভূমিতে চিন্তামণিরূপ বীজ বপন করিয়াছেন। (৫৭০)

হে স্বামিন্‌, এই ভাবে আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, এবং আমার বহু বালসুলভ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, আপনার যে স্বরূপের কথা শঙ্কর বা ব্রহ্মা কানেও শুনেন নাই, তাহাই আমাকে দেখাইয়াছেন; উপনিষদ্‌ও যাহার সাক্ষাৎ পায় নাই, সেই গূঢ় মর্ম-গ্রন্থিও আপনি আমার জন্য খুলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

হে প্রভু, কল্পের আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত আমার যতগুলি জন্ম হইয়াছে, সেই সমস্ত জন্মে যদি উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে এইরূপ দেখিবার বা শুনিবার কথা পাওয়া যায় না। বুদ্ধির জ্ঞাতৃত্ব কখনই ইহার নিকট পৌঁছাইতে পারে না, অন্তঃকরণ ইহার কল্পনাও করিতে পারে না, তাহা চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবে, ইহা কি করিয়া হয়? ইহা অদৃষ্টপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব। হে প্রভু, সেই বিশ্বরূপ আপনি আমাকে দেখাইয়াছেন, হে দেব, তাহাতে আমার মন হৃষ্ট হইয়াছে। পরন্তু এখন এই ইচ্ছা অন্তঃকরণে হইয়াছে যে, আপনার সহিত আলাপ করিব, আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার সান্নিধ্য উপভোগ করিব। (৫৮০)

এই বিশ্বরূপের সহিত কি তাহা করা যায়? কোন্ মুখের সহিতই বা কথা বলিব? আর কাহাকেই বা আলিঙ্গন করিব? আপনার রূপের অন্ত নাই—অসংখ্য রূপ! বায়ুর সঙ্গে দৌড়ানো বা গগনকে আলিঙ্গন করা অসম্ভব, সমুদ্রের সহিত কি জলকেলি করা যায়? হে দেব, আপনার এই রূপ দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে, এখন ইহা সংবরণ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। সমস্ত চরাচর-কৌতুক দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া যেমন আনন্দে থাকা যায়, তেমনি আপনার চতুর্ভুজ মূর্তি আমার পক্ষে বিশ্রামদায়ক।

আমি সমগ্র যোগ অভ্যাস করিয়া এই রূপেরই অনুভূতি লাভ করি, সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও এই স্বরূপেরই সিদ্ধান্ত হয়, সকল যজ্ঞ করিয়াও এই ফলই প্রাপ্ত হই, শুধু ইহারই জন্য সকল তীর্থে ভ্রমণ, অন্য যাহা কিছু দান পুণ্য কর্ম করা যায়, তাহার ফলও আপনার এই চতুর্ভুজরূপ ফলপ্রাপ্তি। হে প্রভু, এই রূপের প্রতিই আমার অত্যধিক প্রেম, এই জন্য তাহা দেখিবার জন্য অধীর হইয়াছি, এখন শীঘ্র এই সঙ্কট হইতে মুক্ত করুন। হে জীবের মর্মজ্ঞ, সকল বিশ্বের আশ্রয়, পূজ্য, দেবাদিদেব, আপনি প্রসন্ন হউন।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥৪৬॥

আপনার অঙ্গকান্তি নীলোৎপলকেও রঞ্জিত করে, আকাশে রং ঢালিয়া দেয়, ইন্দ্রনীল-মণিরও দীপ্তি প্রকাশ করে, মনে হয় যেন পঞ্চরত্ন সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে, কিংবা আনন্দের দুইটি হস্ত বাহির হইয়াছে, মদনের শোভা যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে। (৫৯০) যাহার মস্তক মুকুটে অলঙ্কৃত, যেন মস্তকই মুকুট হইয়াছে, যেন অঙ্গের শোভা শৃঙ্গারকেই অলঙ্কৃত করিয়াছে; আকাশমণ্ডলে ইন্দ্রধনুর সীমার মধ্যে যেমন মেঘকে রঞ্জিত দেখা যায়, তেমনি হে শার্ঙ্গপাণি, বৈজয়ন্তীমালা আপনার অঙ্গ আবরণ করিয়া আছে; আপনার উদার গদা কেমন অসুরগণকেও কৈবল্যের প্রাচুর্য দান করে, হে গোবিন্দ, আপনার চক্র কেমন সৌম্য দেখাইতেছে! অধিক কি বলিব? হে স্বামিন্, আমি আপনার সেই রূপ দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, অতএব শীঘ্র সেই রূপ ধারণ করুন।

বিশ্বরূপ-দর্শনের আনন্দ ভোগ করিয়া তৃপ্ত আমার নয়ন এখন কৃষ্ণমূর্তি দর্শনের জন্য তৃষিত হইয়াছে, আমার চক্ষু সাকার কৃষ্ণরূপ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে চায় না, আর তাহা না দেখিলে এই বিশ্বরূপকে তুচ্ছ মনে করে; আমাদের ভোগ ও মোক্ষ দিবার জন্য আপনার শ্রীমূর্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, সুতরাং এখন এই বিরাট মূর্তি সংবরণ করিয়া সসীম সাকার মূর্তি ধারণ করুন।

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

অর্জুনের এই কথায় বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময় হইল, এবং তিনি বলিলেন, এরূপ অবিবেচক কাহাকেও তো দেখি নাই, তুমি কি অলৌকিক বস্তু লাভ করিয়াছ, তাহাতেও তোমার সন্তোষ হইল না, তুমি ভীত হইয়া অনমনীয় ব্যক্তির ন্যায় কেন কথা বলিতেছ? (৬০০)

আমি সহজভাবে প্রসন্ন হইলে নিজের সব কিছু ভক্তকে প্রদান করি, নতুবা অন্তরের গূঢ় রহস্য কাহাকে বলা যায়? আজ আমি তোমারি ইচ্ছায় অন্তঃকরণের সমস্ত গূঢ় রহস্য একত্র করিয়া এই বিশ্বরূপ রচনা করিয়াছি; তোমার প্রেম আমার এতখানি প্রসন্নতা উৎপাদন করিয়াছে যে, আমার পরম গুহ্য রহস্যের বিজয়নিশান জগতের সম্মুখে উড়াইয়াছি (স্বরূপ প্রকট করিয়াছি)।

দেখ, ইহাই আমার অপার পরাৎপর স্বরূপ, যাহা হইতে কৃষ্ণাদি অবতার উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাই জ্ঞানতেজের শুদ্ধ সত্তা, কেবল (শুদ্ধ) বিশ্বাত্মক, অনন্ত, অটল, আদিকারণ। হে অর্জুন, ইহা তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পূর্বে দেখে নাই, কারণ ইহা সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

এই স্বরূপের নির্ণয় করিতে গিয়া বেদ মৌনাবলম্বন করিয়াছে, যজ্ঞ (যজ্ঞকর্তা) যথার্থই স্বর্গ পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সাধকগণ আয়াসসাধ্য দেখিয়া যোগাভ্যাসকে শুদ্ধ (পরিণত) করিয়াছে, আর (শাস্ত্র) অধ্যয়নেও ইহা সুলভ নহে (অধ্যয়নেরও সামর্থ্য নাই)। সর্বাঙ্গসুন্দর সৎকর্ম, স্বকীয় আবেশে ধাবিত হইয়া, বহু শ্রম স্বীকার করিয়া সত্যলোক পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে

এবং স্বর্গ দেখিতে পারে ; আর যাহা দেখিলে তপস্যা ও সাধনা স্তব্ধ হইয়া উগ্রতা ত্যাগ করে, এইরূপ সাধনা দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ, সেই বিশ্বরূপ তুমি অনায়াসে দেখিয়াছ, ইহা মনুষ্যলোকে কেহই দেখিতে পায় না। জগতে আজ তুমিই ইহা দেখিলে। এই পরমভাগ্য—বিরিঞ্চিরও হয় নাই। (৬১০)

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌ মমেদম্‌।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

এই বিশ্বরূপ-দর্শনের জন্য আপনাকে ধন্য মনে কর, ইহা দেখিয়া কদাচ ভয় পাইও না, ইহা ব্যতীত অন্য কোন উত্তম বস্তু আছে, তাহা মনেও করিও না। অকস্মাৎ অমৃতে পূর্ণ সমুদ্র প্রাপ্ত হইলে কি কেহ ডুবিয়া যাইবার ভয়ে তাহা ত্যাগ করে? অথবা 'সোনার পর্বত এত বড়, ইহা দ্বারা কি করা যায়?' বলিয়া কি কেহ তাহাকে অনাদর (ত্যাগ) করে? দৈবযোগে চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গে ধারণ করিলে ভারী বোঝা হইবে বলিয়া কি কেহ তাহা ত্যাগ করে? কামধেনুকে পালন করা কঠিন বলিয়া কি কেহ তাহাকে তাড়াইয়া দেয়?

ঘরের মধ্যে চন্দ্রালোক আসিলে কি কেহ বলে, 'বাহির হইয়া যাও, তুমি দুঃখদায়ক'? কিংবা সূর্যকে কি কেহ বলে, 'ওধারে সরিয়া যাও, তোমার ছায়া কষ্টকর'? তেমনি এই মহাতেজরূপ ঐশ্বর্য তুমি দেখিযাছ, পরন্তু তুমি বৃথা বিচলিত হইতেছ কেন? পরন্তু হে ধনঞ্জয়, তুমি কিছুই বুঝিতেছ না, নির্বোধ তোমার উপর ক্রোধ করিয়া কি হইবে? অঙ্গ ছাড়িয়া তুমি ছায়াকে আলিঙ্গন করিতেছ কেন? যাহা আমার সত্য স্বরূপ তাহা দেখিয়া মনে ভীত হইয়া ভাবিতেছ ইহা আমার যথার্থ রূপ নহে ; ধারণ করা কৃত্রিম রূপ দেখিতে চাহিতেছ। (৬২০)

হে পার্থ, এখন হইতে এই চতুর্ভুজের প্রতি প্রীতি পরিত্যাগ কর, বিশ্বরূপের প্রতি আস্থা হারাইও না। ভয়ঙ্কর, বিশাল ও বিকৃত রূপ হইলেও তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। কৃপণ যেমন তাহার ধনসম্পত্তির উপর চিত্তবৃত্তি লাগাইয়া শুধু দেহের ব্যাপারগুলি করিয়া যায়, কিংবা নিজেই কোটরের মধ্যে অজাতপক্ষ শাবকগুলির কাছে নিজের প্রাণ রাখিয়া পক্ষিণী আকাশে উড়িয়া যায়, অথবা গাভী যেমন পাহাড়ের উপর চরিয়া বেড়ায়, পরন্তু তাহার চিত্ত ঘরে বৎসের উপর লাগিয়া থাকে, তেমনি হে পার্থ, তুমি এই বিশ্বরূপের উপর আপন প্রেম নিবদ্ধ কর।

বাহ্য সখ্যসুখ পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিবার জন্য আনন্দিত চিত্তে এই চতুর্ভুজ শ্রীমূর্তির ধ্যান কর, পরন্তু হে পাণ্ডব, বারংবার বলিতেছি, আমার একটি কথাও বিস্মৃত হইও না। এই বিশ্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধা কখনও হারাইও না। এই রূপ কখনও দেখ নাই বলিয়া তোমার যে ভয় হইয়াছিল, তাহা ত্যাগ কর, এবং তোমার সমস্ত প্রেম একত্র করিয়া ইহাকে (বিশ্বরূপকে) দাও।

অনন্তর বিশ্বতোমুখ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এখন তোমার ইচ্ছানুসারে পূর্বের রূপই তোমাকে দেখাইতেছি, সুখে দর্শন কর। সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

এই কথা বলিতে বলিতেই ভগবান পূর্বের মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেন, কি আশ্চর্য তাঁহার

প্রেম! শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ কৈবল্য-স্বরূপ বিশ্বরূপের ন্যায় তাঁহার সর্বস্ব অর্জুনের হস্তে তুলিয়া দিলেন, কিন্তু অর্জুনের তাহা ভাল লাগিল না। ক্ষুদ্র অশ্ব হস্তীকে বাধা দিলে যেমন হয়, অথবা ভাল রত্নের দোষ ধরিলে, বা কন্যা দেখিতে গিয়া 'মনে ধরিল না' (পছন্দ হইল না) বলিলে যেমন হয়, অর্জুনেরও তেমনি হইল! (৬৩০)

বিশ্বরূপের এই প্রকার দশা করিলেও অর্জুনের উপর তাঁহার প্রেম কেমন করিয়া বাড়িয়া গেল, ভগবান কিরীটীকে সর্বোত্তম উপদেশ দিলেন। স্বর্ণখণ্ড ভাঙিয়া ইচ্ছামত অলঙ্কার গড়াইয়া যদি তাহা মনে ভাল না লাগে, তবে যেমন পুনরায় গলাইয়া ফেলা যায়, তেমনি শিষ্যের প্রত্যয়ের জন্য কৃষ্ণত্ব ঘুচাইয়া ভগবান বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন, তাহা যখন অর্জুনের মনোমত হইল না, তখন পুনরায় কৃষ্ণরূপ হইলেন। এই প্রকার শিষ্যের আবদার-সহনশীল গুরু আর কোথায় আছে? পরন্তু সঞ্জয় কহিলেন, 'এ কেমন প্রেম জানি না!'

বিশ্ব ব্যাপিয়া চতুর্দিকে যে যোগতেজ প্রকট হইয়াছিল, তাহা ভগবান যে কৃষ্ণরূপ পুনরায় ধারণ করিলেন, তাহার মধ্যে সংবরণ করিলেন। 'ত্বম্'-পদ (সমগ্র জীবদশা) যেমন 'তৎ'-পদে (ব্রহ্ম-স্বরূপে) লীন হয়, অথবা বৃক্ষের রূপ যেমন বীজ-কণিকায় সমাহিত হয়, অথবা জাগ্রতের অনুভূতি যেমন স্বপ্নের মোহাবস্থা গিলিয়া খায়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যোগ সংবরণ করিলেন; হে রাজন্, সূর্যের প্রভা যেমন বিম্বে লীন হয়, কিংবা মেঘপুঞ্জ যেমন আকাশে মিলাইয়া যায়, অথবা সমুদ্রের জোয়ার যেমন সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়। (৬৪০)

অহো, কৃষ্ণাকৃতি হইতে যে বিশ্বরূপের ভাঁজ করা বস্ত্র তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা অর্জুনের প্রতি প্রেমে ভগবান খুলিয়া দেখাইয়াছিলেন। বস্ত্রের পরিমাণ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) এবং রং অতি উত্তম দেখিয়া গ্রাহকের (অর্জুনের) পছন্দ হইল, এবং সেইজন্য অধিকাধিক দেখাইলেন। এইভাবে যে বিশ্বরূপ বিস্তৃত হইয়া বহুরূপে বিশ্বকে জয় করিয়াছিল (ব্যাপিয়াছিল), তাহা মনোরম সৌম্য আকার ধারণ করিল।

অধিক কি বলা যায়? শ্রীঅনন্ত পুনরায় ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করিলেন এবং ভীত অর্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। স্বপ্নে স্বর্গে গিয়া হঠাৎ জাগ্রত হইলে যেমন হয়, কিরীটীর বিস্ময় তেমনি হইল; অথবা গুরুর কৃপা হইলেই যেমন সমস্ত প্রপঞ্চ-জাত বস্তুর অন্ত হয় এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের স্ফুরণ হয়, অর্জুনেরও তেমনি হইল।

তাহার মনে হইল, যে বিশ্বরূপের যবনিকা, যাহা শ্রীমূর্তিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা দূরে সরিয়া গিয়াছে, ইহা ভালই হইল; কালকে যেন জয় করিয়া আসিলাম, কিংবা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতকে অতিক্রম করিয়া আসিলাম, অথবা যেন আপন বাহুর সামর্থ্যেই সপ্ত সিন্ধু পার হইলাম; বিশ্বরূপের পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দেখিয়া পাণ্ডুসুত অর্জুনের চিত্তে এমনি অপার সন্তোষ হইল; সূর্য অস্ত যাইবার পর যেমন গগনে তারা দৃষ্টিগোচর হয় তেমনি উভয় পক্ষের সৈন্যদল অর্জুন দেখিতে লাগিলেন। (৬৫০)

তখন কুরুক্ষেত্রও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, দেখিলেন দুই পক্ষে সমবেত স্বগোত্র যোদ্ধাগণ সৈন্যনিচয়ের উপর অস্ত্রশস্ত্র-বর্ষণে উদ্যত, সেই যুদ্ধোদ্যমের মধ্যে রথ তেমনি স্থির হইয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি রথাগ্রে উপবিষ্ট এবং স্বয়ং নীচে দণ্ডায়মান। অর্জুন উবাচ—

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

তখন অর্জুন যাহা চাহিয়াছিলেন, সেই রূপই দর্শন করিলেন, এবং বলিলেন, প্রভু, এখন মন শান্ত হইল। বুদ্ধি জ্ঞানকে হারাইয়া ভয়ে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, অহঙ্কারের সহিত মন দেশছাড়া হইয়াছিল; ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের স্বাভাবিক গুণধর্ম ভুলিয়াছিল, বাক্ প্রাণহীন হইয়া মৌন হইয়াছিল, এইভাবে এই শরীর দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল; ইহারা সব পুনরায় নিজ নিজ ভাবে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, এখন শ্রীমূর্তি-দর্শনে আমি যেন জীবন ফিরিয়া পাইলাম।

এইভাবে সুখানুভব করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, আপনার মনুষ্যরূপ দেখিলাম। হে ভগবান, আপনার এই যে রূপ দেখাইলেন, ইহা যেন অপরাধী সন্তানকে বুঝাইবার জন্য মাতৃস্তন্য পান করাইলেন। হে প্রভু, আমি বিশ্বরূপের সমুদ্রে হস্ত দ্বারা তরঙ্গ মাপিতেছিলাম। এখন আপনার এই শ্রীমূর্তির তীরে আসিয়া উঠিয়াছি।

হে দ্বারকাপুরপতি সুহৃদ্, ইহা তো শুধু আপনার মূর্তি দর্শন নহে। ইহা যেন আমার ন্যায় শুষ্কতরুর উপর মেঘের বর্ষণ হইল। (৬৬০) স্বাভাবিক তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়াছিলাম। এ যেন অমৃতসিন্ধু প্রাপ্ত হইলাম। এখন আমার প্রাণে বাঁচিবার ভরসা হইল। আমার হৃদয়-অঙ্গনে হর্ষ-লতার উদ্গম হইল। আমি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইলাম। শ্রীভগবানুবাচ—

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

পার্থ এই কথা বলিতেই শ্রীভগবান কহিলেন, তুমি এ কি বলিতেছ? এই বিশ্বরূপের প্রতি তোমার প্রেমভাব পোষণ করা উচিত। আর এই সাকার সগুণ মূর্তিকে নিঃসঙ্গভাবে সেবা করিবে। হে সুভদ্রাপতি, আমার উপদেশ কি বিস্মৃত হইয়াছ? হে অর্জুন, মেরু পর্বত হস্তগত হইলেও তাহাকে ক্ষুদ্র মনে করিতেছ, এমনই মনের দুঃস্বপ্নভাব (ভ্রম), তোমার সম্মুখে আমি যে বিশ্বাত্মক রূপ প্রকাশ করিলাম, তাহা তপস্যা করিয়াও শঙ্করের ভাগ্যে জোটে না।

হে কিরীটী, যোগিগণ অষ্টাঙ্গাদি সাধনের ক্লেশ সহ্য করিয়াও যে রূপের দর্শন লাভ করিতে পান না, সেই বিশ্বরূপের সামান্য পরিমাণও কি করিয়া দেখা যায়, এই চিন্তা করিতে করিতেই দেবগণের কাল অতিবাহিত হয়। চাতক যেমন (অত্যন্ত আশা করিয়া) আকাশের দিকে (মেঘের প্রতীক্ষায়) তাকাইয়া থাকে, তেমনি উৎকণ্ঠিত হইয়া সুরশ্রেষ্ঠগণ যাহার দর্শন পাইবার জন্য অষ্ট প্রহর লালায়িত, পরন্তু সেই বিশ্বরূপের সমান বস্তু কেহ স্বপ্নেও দেখিতে পায় না, সেই রূপ তুমি সহজে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিয়াছ। (৬৭০)

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

হে বীর অর্জুন, ইহা প্রাপ্ত হইবার জন্য কোন উপায় (সাধন-পন্থা) নাই, সাহায্য করিতে গিয়া বেদও এখানে পশ্চাৎপদ হইয়াছে। হে ধনুর্ধর, যত তপস্যাই করা হউক না কেন,

তাহা দ্বারা আমার বিশ্বরূপের নাগাল পাওয়া যায় না। আর দান দ্বারাও ইহা প্রাপ্ত হওয়া কঠিন, তুমি যাহা সহজে দেখিয়াছ, সেই রূপ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারাও তেমন ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; তুমি যেমনভাবে আমাকে দেখিয়াছ, তেমনিভাবে আমাকে প্রাপ্তির একমাত্র উপায় আছে—শুন, যদি ভক্তি আসিয়া চিত্তকে বরণ করে, তবেই আমাকে লাভ করা যায়।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

সে ভক্তি কিরূপ ? যেমন বর্ষার মেঘ ধারাবর্ষণ ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না, কিংবা গঙ্গা যেমন সকল জলসম্পত্তি লইয়া সমুদ্রকে অন্বেষণ করে এবং অনন্যগতি হইয়া উহাতেই মিলিত হয়, তেমনি আমার ভক্ত সর্ব ভাবসম্পদ্ লইয়া একনিষ্ঠ প্রেমে পূর্ণ হইয়া মদ্রূপ হইয়া আমারই মধ্যে মিলিত হয় ; আর ক্ষীরসমুদ্র যেমন তীরে ও মধ্যস্থলে সমানভাবে ক্ষীরময়, ঐ ভক্তের পক্ষে আমিও সেইরূপ ; আমা হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত—কিংবহুনা, এই চরাচরে ভজনের জন্য কোন দ্বিতীয় বস্তু যাহার থাকে না (যে অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তু ভ্রমেও ভজনা করে না), যে মুহূর্তে ভক্তের এইরূপ দৃষ্টি হয়, তখনই আমার এই স্বরূপের জ্ঞান হয় এবং জ্ঞানলাভ হইলে সহজে দর্শনও হয়। (৬৮০)

অগ্নিসংযোগে ইন্ধন যেমন তাহার ইন্ধনত্ব হারায়, এবং মূর্তিমান্ অগ্নিই হইয়া যায় ; কিংবা তেজস্কর সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত যেমন গগন অন্ধকার হইয়া থাকে, আর সূর্যোদয় হইলে একেবারে প্রকাশময় হয় ; তেমনি আমার সাক্ষাৎকার হইলে অহঙ্কারের নাশ হয় এবং অহঙ্কার লুপ্ত হইলে দ্বৈত ভাব চলিয়া যায়, জানিবে। আমি, সে (ভক্ত) ও সমগ্র বিশ্ব স্বভাবতঃ এক 'আমি' হইয়া থাকে, কিংবহুনা, সেই ভক্ত আমার সহিত সমরস হইয়া যায়।

মৎকর্মকৃন্ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

যে শুধু আমারই জন্য সমস্ত কর্মানুষ্ঠান করে, আমা ভিন্ন জগতে যাহার অন্য কোন উত্তম বস্তু নাই, যাহার দৃষ্টাদৃষ্ট (ইহলোক ও পরলোক) সমস্তই কেবল আমিই, যে আমাকেই জীবনের ফলস্বরূপ মানিয়া লয়, প্রাণিমাত্রের নামরূপ (ভেদজ্ঞান) ভুলিয়া যাহার দৃষ্টি শুধু আমাতেই নিবদ্ধ, এইজন্য যে নির্বৈর হইয়া সর্বত্র (সর্বভূতে আমাকে দেখিয়া) ভজনা করে, যে আমার এমন ভক্ত, হে পাণ্ডব, তাহার এই ত্রিধাতু-নির্মিত শরীর মদ্রূপ হইয়া থাকে।

সঞ্জয় বলিলেন, যাঁহার উদরে সমস্ত জগৎ সমাবিষ্ট, করুণারসসাগর শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবে বলিলেন। (৬৯০) ইহার পর পাণ্ডুকুমার অর্জুন আনন্দসম্পদে সমৃদ্ধ হইলেন এবং তিনিই জগতে একমাত্র কৃষ্ণচরণচতুর (কৃষ্ণচরণে ভক্তি করিতে সুচতুর) ; তিনি চিত্তসংযোগ করিয়া ভগবানের উভয় মূর্তিই উত্তমরূপে দেখিয়া, বিশ্বরূপ হইতে কৃষ্ণমূর্তিই অধিক লাভজনক মনে করিয়াছিলেন ; পরন্তু ভগবান তাঁহার এই জ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারিলেন না। কারণ ব্যাপক স্বরূপ অপেক্ষা একদেশী মূর্তি বড় নহে। আর ইহা সমর্থন করিতে দু-একটি উত্তম যুক্তিও শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শন করিলেন। তাহা শুনিয়া অর্জুন মনে মনে বলিলেন, এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি বড় তাহা পরে প্রশ্ন করিব। এইভাবে মনে আলোচনা করিয়া উত্তম রীতিতে (অর্জুন) যে প্রশ্ন করিবেন, সে কথা পরের অধ্যায়ে শুনিবেন।

জ্ঞানদেব বলিতেছেন, সেই সমস্ত কথা আমি নিবৃত্তিপাদ-প্রসাদে, প্রেম সহকারে, প্রাঞ্জল 'ওবী' ছন্দে বলিব। আমি সদ্ভাবের (প্রেমের) অঞ্জলি ভরিয়া প্রস্ফুটিত 'ওবী' ফুলের অর্ঘ্য বিশ্বরূপের চরণযুগলে অর্পণ করিতেছি। [১১শ অধ্যায় সমাপ্ত]

স্বামীজীর শতবার্ষিকী*

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিক উৎসব-আয়োজনের এই প্রস্তুতি-সভায় দীর্ঘ অভিভাষণ দিয়ে এবং স্বামীজীর জীবনকথা ও বাণীর পুনরাবৃত্তি ক'রে শ্রোতৃমণ্ডলীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। স্বামীজীর তিরোধানের পর দীর্ঘ ষাট বৎসব উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ঐ সময়ের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী নানা ভাষায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের অসংখ্য পুস্তকাবলীর মাধ্যমে, স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু শাখাকেন্দ্রের বহুমুখী সেবাকার্য দ্বারা স্বামীজী-প্রবর্তিত শ্রীরামকৃষ্ণের নবযুগ-ধর্মের প্রভাব আজ ছড়িয়ে পড়েছে—দেশে বিদেশে অগণিত ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে; আজ আর দেশের, জাতির ও বিশ্বের কল্যাণে স্বামীজীর অবদান কি—এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন, এবং এই সভার মৌলিক উদ্দেশ্যও তা নয়। আমার সামান্য ধারণায় এই সভার এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী সমিতির মূল উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা হবে—অনাগত ভবিষ্যতে শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে আমরা কি কি নব নব কার্যক্রম গ্রহণ ক'রে তা রূপায়িত করতে পারি, যা দ্বারা স্বাধীন ভারতের তথা সারা বিশ্বের কল্যাণ হবে স্বামীজীরই ঈপ্সিত এবং অসম্পূর্ণ কার্যাবলীকে অবলম্বন ক'রে এবং স্বামীজী-প্রচারিত বেদান্ত ধর্ম বিশ্ববাসীর নিকট আরও ব্যাপক-ভাবে প্রচার ক'রে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে তাঁর আবির্ভাবের শতবর্ষ পরে—বিশ্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত করতে হ'লে শুধু স্বামীজীকে একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষ ব'লে গ্রহণ করলে চলবে না। তিনি রামকৃষ্ণ-শ্রীমা-বিবেকানন্দ এই ত্রিমূর্তির জ্যোতির্ময় প্রকাশ। যেমন শ্রীরামচন্দ্রের পরিপূরক লক্ষ্মণ, শ্রীকৃষ্ণের অর্জুন, তেমনি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পরিপূরক প্রকাশক ও প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ ও পরিচয়ে শ্রীশ্রীমাকেও বাদ দেওয়া যায় না। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিক উৎসব সমারোহ ও নিষ্ঠার সহিত পালন করেছি। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীমার শতবার্ষিকী উৎসব শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত পালন করেছি। স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব হবে অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য এই ত্রিধারা সংযোজনে নবযুগধর্মের ব্যাপক প্রচার। যা কিছু কর্মপ্রণালীই গ্রহণ করি না কেন, যা কিছু পুস্তক প্রকাশ করি না কেন, যা কিছু অনুষ্ঠান পালন করি না কেন, যা কিছু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করি না কেন, তার প্রাণকেন্দ্র হবে—স্বামীজীর প্রচারিত ধর্ম। সে ধর্ম সংকীর্ণ স্থিতিশীল একটি গ্রন্থে বা বিধির মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সে ধর্ম আচার- বা অনুষ্ঠান-সর্বস্ব নয়।—সে ধর্ম মানবের বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ রূপায়িত গতিশীল প্রেম ও সেবার ধর্ম। সে ধর্ম পালনের জন্য বিজন অরণ্যে বা নির্জন প্রান্তরে, লোকা-

* গত ৯ই জুলাই রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব কালচারে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উদ্দেশ্যে আহূত কলিকাতা নাগরিকগণের প্রথম প্রস্তুতি-সভার বক্তৃতা অবলম্বনে।

লয়ের বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। সে ধর্ম—মানুষের মধ্যে সংসারের সর্ব অবস্থায় কর্মব্যস্ত জীবনেও পালন করার ধর্ম। সে ধর্ম জাতির বা দেশের বা ভৌগোলিক সীমারেখার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। সে ধর্ম ভেদাভেদ ভুলিয়ে মানুষকে মহান্ ক'রে তোলে, মানুষকে ভগবানের সত্তা ব'লে মনে করায়—সে ধর্ম ভারতের বাহিরে সুদূর পাশ্চাত্যে জড়বাদী মানবসমাজের মধ্যেও বেদান্তের বাণী প্রচার করে, মানুষের অন্তরের মহৎ শক্তিতে—অধ্যাত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হ'তে শেখায়—যদি ভবিষ্যতে সেই ধর্মের বহুল প্রচারে সহায়তা করতে ও উদ্বুদ্ধ করতে পারি, তাহলে শতবার্ষিক উৎসব পালন সার্থক হবে।

সেই ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে মনুষ্যচরিত্র গঠনের জন্য স্বামীজী রেখে গেছেন তাঁর শিক্ষানীতি। গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টিতে পঞ্চাশ বৎসরেরও পূর্বে যা ধরা পড়েছিল, ওজস্বিনী ভাষায় তা তিনি ঘোষণা ক'রে গেছেন : 'নিদ্রিত ভারত জাগিতেছে—বিশ্বের কোন শক্তি নেই—সে জাগরণের পথ রোধ করিতে পারে।' তাই ভারতের অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। বিশ্বসভ্যতায় স্বাধীন ভারতের অবদানের কথাও বহু বক্তৃতায় ব'লে গেছেন। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ও পাশ্চাত্যের কর্মকুশলতার অপূর্ব সমন্বয়ে নূতন মানব-সমাজ ও বিশ্বকল্যাণের রূপ তিনি দিয়ে গেছেন। এই সমন্বয় রূপায়িত করতে শতবার্ষিক উৎসবের অঙ্গস্বরূপ 'বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা আমাদের অন্যতম কর্তব্য। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর ধর্মকে ভিত্তি ক'রে মানুষ তৈরীর শিক্ষা-প্রণালী (Man-making Education) আজ প্রয়োজন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সব ছাত্র উত্তীর্ণ হবে—তারা মুষ্টিমেয় হলেও স্বাধীন ভারতে নূতন জীবন-গঠনে সহায়ক হবে বলেই আশা করা যায়। সকল দেশের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—জনসাধারণকে সব সময় জাতির কল্যাণে ও আদর্শে পরিচালিত করে মুষ্টিমেয় মেধাবী, দৃঢ়চেতা ও তেজস্বী মানব। সেইরূপ মানব-প্রস্তুতির কার্যভার 'বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়'কে গ্রহণ করতে হবে। এখানকার ছাত্রেরা ভারতের অতীত ঐতিহ্যে স্থির বিশ্বাস রেখে ভারতের অধ্যাত্মশক্তিতে বলীয়ান্ হয়ে জড়বাদী পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রে জাতির ও বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে।

স্বাধীন ভারত—'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র, তার মানে ভারতবর্ষ ধর্মহীন রাষ্ট্র নয়, সকল ধর্মকেই স্বাধীন ভারত শ্রদ্ধা করে। সকল ধর্ম পালনের ও প্রচারের অবাধ স্বাধীনতার দ্বারা 'যত মত তত পথ'-সমন্বয়রূপ নীতিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। সেই ধর্মের প্রকাশ প্রচার ও গ্রহণে যদি আমরা স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবে প্রেরণা জাগাতে পারি—শুধু ভারতে নয়—ভারতের বাহিরে সর্বদেশে, যেখানে রামকৃষ্ণ-ভাবের কেন্দ্র আছে, তাহলে শতবার্ষিক উৎসব সার্থক হবে।

আজ ত্রয়োদশ বর্ষ ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত। কিন্তু স্বাধীন জাতির আদর্শ ও লক্ষ্যে পৌঁছতে কি আমরা পেরেছি এখনও? স্বামীজীর স্বপ্ন—সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্য দূর ক'রে সুস্থ সবল ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের পথে তাদের কতটা এগিয়ে যেতে পেরেছি? জানি—সে পথ দীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ; কিন্তু আজ পথের প্রধান কণ্টক জাতীয় চরিত্রের অধোগতি, ভেদবুদ্ধির ও বৈচিত্র্যের

মধ্যে ঐক্যস্থাপনে অকৃতকার্যতা। তাই আজ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন মানুষের শুভ বুদ্ধির অভ্যুদয়। তা একমাত্র সম্ভব ধর্মের ভিত্তিতে এবং সে ধর্ম পুরাতন আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ধর্ম নয়। সে ধর্ম উদার মানবপ্রেম ও জীবসেবার ধর্ম।

ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা, স্বামীজীর শত-বার্ষিক বৎসর যেন জাতিকে সেই ধর্ম-পালনে ও মানুষ গঠনের শিক্ষায় ব্রতী করে। আজ নানা মত, আদর্শ ও ধর্মের সমন্বয়ের ভিত্তিতেই বিশ্বে শান্তি ও চিরস্থায়ী কল্যাণ সম্ভব। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুই প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ জগতে শান্তি আনতে পারেনি। আজও পাশ্চাত্য জগৎ আগ্নেয়গিরির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাতির প্রতি জাতির অবিশ্বাস, ভয় ও ঘৃণা মানব-সমাজকে জর্জরিত ক'রে রেখেছে। রাষ্ট্র-সংঘের সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির দ্বারা বিশ্বশান্তির স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। বিশ্ববাসী আজ এমন একটা কিছু চায়, যেখানে মানুষ যুদ্ধ-বিভীষিকা থেকে মুক্ত হয়ে চিরশান্তিতে তার জীবনযাত্রা পরিচালিত করতে পারে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে যদি ভারতের শিক্ষিত সমাজ এই শতবার্ষিক উৎসবে কিছু প্রেরণা লাভ করতে পারে, তাহলেই স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব সার্থক হবে।

ঝড়

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী

দেখছ কি লোভ হিংসা কামনার ঝড়?
যে ঝড়ে উপাড়ি' ফেলে জীবনের জড়
উন্মত্ত তাণ্ডবে! পরস্পরে হানাহানি
দংষ্ট্রাঘাতে নখর-প্রহারে। ফেলে টানি'
সভ্যতার হৃৎপিণ্ড। যা-কিছু মহান্
যা-কিছু সুন্দর শ্রেষ্ঠ—সভ্যতার দান
খাণ্ডব-দাহনে সব পুড়ে হয় ছাই,
আপন সৃষ্টিরে নাশি' করে সে বড়াই।
জাগে যবে লোভ হিংসা কামনার ঝড়
নাহি মানে ন্যায় নীতি, না মানে ঈশ্বর।
রক্তের বন্যায় ভাসে কবন্ধ-কঙ্কাল,
যেন কোন সর্বধ্বংসী ক্ষ্যাপা মহাকাল
ভাঙনের উন্মত্ত-উল্লাসে,
অট্ট অট্ট হাসে।

এ কী পরিহাস!
সর্বনাশা প্রমত্ত বিনাশ!
এ কী লজ্জা নিদারুণ—
—লোভ হিংসা ক্ষুধার বিকার
তোমার সৃষ্টিরে নিত্য দিতেছে ধিক্কার
হে বিধাতা!—এ দুরন্ত ঝড়
বহিতে রহিবে নিরন্তর!
এই ক্রূর হানাহানি, এই রক্তস্নান—
এর কি হবে না অবসান—
কোন দিন প্রভাতের বিমল আলোকে?
মানুষ পাবে না খুঁজে এই মরলোকে
আপনার অমর মহিমা? হে ঈশ্বর,
এ প্রশ্নের কে দেবে উত্তর?

ধর্ম

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

[পূর্বানুবৃত্তি]

ধর্ম চিরস্থায়ী কি না ?

স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিন পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মানুষই সাধারণভাবে নিজ নিজ ধর্মকে সনাতন বা চিরস্থায়ী বলিয়া মনে করিত। সম্প্রতি নাস্তিকতার বহুল প্রসারের ফলে রাশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্র হইতে আনুষ্ঠানিক ধর্মের আচরণ প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া ধর্মের নিত্যতা সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহ জাগিতেছে।

ভারতবর্ষেও আজ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছেন, এবং ধর্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরাই বহুক্ষেত্রে ক্ষমতা অধিকার করিয়া ধর্মের—বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব বিলোপের চেষ্টা করিতেছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে যাহা 'সনাতন ধর্ম' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে, নাস্তিকতারূপ সর্বগ্রাসিনী রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া সেই মহান্ হিন্দুধর্মের অস্তিত্বও আজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাহার বিনাশ ঘটে, তাহাকে সনাতন বলা যায় না। হিন্দুত্ব-বিদ্বেষীরা ভাবিতেছেন, আর কয়দিন পরে হিন্দুধর্ম ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

হিন্দুদের ন্যায় বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও নিজ নিজ ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলিয়া সর্বদা প্রচার করিয়া আসিতেছেন ; কিন্তু নাস্তিকতার প্রচণ্ড আঘাত আজ তাঁহাদের ধর্মগুলির স্থায়িত্বও সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া চলিয়াছে আজ ধর্ম ও অধর্মের সংগ্রাম, অর্থাৎ দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ। পুরাণে বর্ণিত দেবাসুর যুদ্ধে প্রায়ই দেখা যায়, প্রথমে অসুরদেরই জয় হয়, দেবতারা পরাজিত হন ; কিন্তু তাঁহাদের ধ্বংস হয় না। সুদূর নির্জনে অজ্ঞাতবাস করিয়া তাঁহারা দানবনিধনের জন্য কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সময় আসিলে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া দানবকুল ধ্বংস করত নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধার করিয়া থাকেন। আজকালকার এই ধর্ম ও নাস্তিকতার যুদ্ধ দেখিয়াও মনে হইতেছে, নাস্তিকতারূপ দানবই যেন আপাততঃ জয়যুক্ত হইবে। কিন্তু এই দানব ধর্মকে ধ্বংস করিতে পারিবে না ; এবং যখন নাস্তিকতা তাহার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া সমগ্র জগৎকে নৃশংসভাবে গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে, তখনই জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে নূতন চেতনা, আর তাহারই ফলে ঘটিবে ধর্মের পুনরভ্যুদয়। এই অনুমান সত্য হইলে ধর্মের হ্রাসবৃদ্ধি স্বীকার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সাময়িক হ্রাসকে ধর্মের লোপ বলা চলে না।

পূর্বে আমরা মহাভারতের যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে একটিতে ধর্মবিশেষকে (হিন্দুধর্মকে) সনাতন বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে অনুরূপ বহু উক্তি দেখা যায়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের গ্রন্থেও তাঁহাদের ধর্মকে সনাতন ধর্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তবে হিন্দুধর্মই গ্রন্থ এবং অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে ধর্মের স্বরূপটি ধরিতে পারিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রই বলেন :

এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥

—ধর্মই একমাত্র যথার্থ সুহৃৎ; কারণ সে মৃত্যুর পরেও সঙ্গে যায়। অন্যান্য সব কিছুই শরীরের সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

কেবল শাস্ত্রগ্রন্থেই নহে, বহু মনীষীর উক্তিতেও ধর্মের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন:

সনাতন সত্যসমূহ মানব-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ বাঁচিবে, ততদিন উহাদের পরিবর্তন হইবে না; অনন্ত-কাল ধরিয়া সর্বদেশে সর্বাবস্থাতেই ঐগুলি ধর্ম।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের একটি উক্তি দেখিয়া মনে হয়, ধর্মের অনাদিত্ব সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান। The East and West in Religion নামক গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১৯) তিনি লিখিয়াছেন: কোন ধর্মই পূর্ণাঙ্গ বা চূড়ান্ত-রূপে স্বীকার্য নহে—'Comparative religion tells us that, all religions have had a history and that none is final or perfect.'

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব হইতে মহামতি ভীষ্মের যে উক্তিটি আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে অহিংসা, সত্য, অক্রোধ এবং দান—এই চারিটিকে 'সনাতন ধর্ম' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 'সনা' শব্দের অর্থ 'নিত্য', তাহার উত্তর 'তনট্' প্রত্যয় করিয়া সনাতন-শব্দটি সাধিত হইয়াছে। অতএব ইহার অর্থ নিত্য-বিদ্যমান এবং অপরিবর্তনীয়।

মহামতি ভীষ্ম হিন্দুধর্মের মূলভিত্তিস্বরূপ অহিংসা প্রভৃতি যে চারিটিকে সনাতন বলিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় ইহারা সনাতনই বটে। সর্বদেশে, সর্বকালে ইহারা এক ভাবেই থাকে। কোন যুগের কোন ধর্ম-প্রচারকই এইগুলির পরিবর্তন-সাধনে যত্নবান্ হন না, এবং ইহাদের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করিতে পারেন না। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ধর্ম বলিতে সম্ভবতঃ উপাসনাপদ্ধতি ও আচার প্রভৃতিকে বুঝিয়াছেন। বস্তুতঃ এইগুলি ধর্মের খোলসমাত্র। এই খোলসের পরিবর্তনের দ্বারা প্রকৃত ধর্মের পরিবর্তন হয় না। পুরাতন জামাকাপড় পরিত্যাগ করিয়া যখন কোন ব্যক্তি নূতন জামাকাপড় পরিধান করে, তখন যেমন তাহার নাম পরিবর্তিত হইয়া যায় না, ঠিক তেমনি উপাসনাপদ্ধতি বা আচারের পরিবর্তনের দ্বারা প্রকৃত ধর্মের পরিবর্তন হয় না।

ধর্মগ্রন্থসমূহের একটি শব্দও পরিবর্তন করিবার অধিকার কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। ধর্ম পরিবর্তনশীল হইলে ঐ সকল গ্রন্থেরও পরিবর্তন ঘটিত। স্মরণাতীত কাল হইতে যে সনাতন হিন্দুধর্ম চলিয়া আসিতেছে, সহস্র আঘাতেও তাহা বিনষ্ট হয় নাই। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন নিজেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। উল্লিখিত গ্রন্থে (২৫ পৃঃ) হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন:

Several militant creeds tried to suppress it, yet it is still there. Many critics ancient and modern killed it, certified its death and carried out the funeral obsequies, and yet it is there.

—বহু সামরিক শক্তিসম্পন্ন মতবাদ ইহাকে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছে; কিন্তু পারে নাই। প্রাচীন এবং আধুনিক অসংখ্য সমালোচক ইহার বিরুদ্ধে বহু বাক্যব্যয় করিয়াছেন, ইহার বিনাশ ঘোষণা করিয়া তাঁহারা ইহার শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত সম্পন্ন করিয়াছেন; কিন্তু আজও ইহা বিদ্যমান।

নূতন ধর্মমতের প্রবর্তন সনাতন ধর্মরূপ মহান্ মহীরুহের নূতন শাখা সদৃশ। কোন বিশাল বৃক্ষে একটি নূতন শাখা গজাইলে যেমন মূল বৃক্ষটির বিনাশ বা পরিবর্তন ঘটে না, নূতন কোন ধর্মমতও তেমনি সনাতন সত্য ধর্মের বিলোপ সাধন করিতে পারে না।

ধর্মসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

'ধর্ম' শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানিয়া এবং ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া আজকাল এক শ্রেণীর লোক ধর্মসম্বন্ধে নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সরলমতি জনসাধারণের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচার করিয়া তাহাদিগকেও অধার্মিক করিয়া তুলিতেছেন। একদল লোক বলিয়া বেড়ান, ধর্ম অজ্ঞতাসম্ভূত। তাঁহাদের মতে—জ্ঞানী ব্যক্তিরা ধর্ম হইতে দূরে থাকেন।

অন্য একদলের মতে, ধর্ম বঞ্চনাকারীদের ষড়যন্ত্রবিশেষ। ইঁহারা মনে করেন, যাঁহারা আগামীকল্যের জন্য কিছুমাত্র সঞ্চয় করা প্রয়োজন বোধ করিতেন না, সেই বিষয়বিরাগী ঋষিগণ মানুষকে বঞ্চনা করিবার জন্য ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। সর্বত্যাগী বুদ্ধ, জীবহিতার্থে জীবনদাতা যীশু, মহাত্মা মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম-প্রচারকগণ ইঁহাদের দৃষ্টিতে প্রবঞ্চক। অবশ্য ইঁহারা পুরোহিত-প্রচারিত আনুষ্ঠানিক ধর্মকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া মনে করেন।

আর একদল মনে করেন—পূজা, পার্বণ, যাগযজ্ঞ, উপাসনা প্রভৃতিই ধর্ম। এই সকল কার্য প্রায়ই আয়াসসাধ্য ও ব্যয়বহুল হইয়া থাকে; সুতরাং আয়াস ও ব্যয়ের ভয়ে স্বার্থ-সর্বস্ব লোকেরা উল্লিখিত কার্যগুলির সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম-শব্দটির প্রতিই বিরূপ হইয়া উঠেন। বস্তুতঃ পূজা, পার্বণ প্রভৃতি যে ধর্মের খোলসমাত্র, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

অন্য এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন, যে ব্যক্তি তাঁহাদের ধর্মগুরুর নির্দেশিত পথে চলে না, সেই অধার্মিক। অধিকাংশ মুসলমানেরই ধারণা—যে মুসলমান নয়, সেই অবিশ্বাসী। খ্রীষ্টানেরাও অখ্রীষ্টানকে অধার্মিক মনে করেন। বস্তুতঃ ইঁহারা প্রত্যেকেই পরস্পরকে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী করিতেছেন। যে কোন মানুষ যে কোন পথে ভগবানের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করিতে পারে, এবং তাহার তাদৃশ চেষ্টা ধর্মেরই অঙ্গরূপে বিবেচনীয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ অন্যের বাধা উৎপাদন না করিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার সেই চেষ্টাকে ধর্ম বলিতে হইবে। সে মন্দিরে, মসজিদে বা গীর্জায় যেখানেই যাক না কেন, তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলিয়াছেন:

ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী আছে। বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর প্রয়োজন। তবে ভেদ আছে বলিয়াই বিরোধের প্রয়োজন নাই।

বর্তমান নাস্তিকতার যুগে সাধারণভাবে সকল ধর্মের বিরুদ্ধেই অপপ্রচার চলিয়াছে বটে, কিন্তু সনাতন সর্বসহিষ্ণু হিন্দুধর্মের বিলোপ-সাধনের উদ্দেশ্যেই সর্বাধিক বিষ উদ্গীরিত হইতেছে। হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও আজকাল এক শ্রেণীর উন্মার্গগামী লোক প্রকাশ্য সভায় বলিয়া বেড়াইতেছেন—দেবতাদের কাছে মাথা নত করা কুসংস্কার, যজ্ঞে আহুতি দান অপব্যয়। এই ধরনের আরও নানাবিধ অপপ্রচার এই শ্রেণীর লোকের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। বস্তুতঃ ধর্মজ্ঞানবর্জিত এই সকল অদূরদর্শী মানুষের উল্লিখিত উক্তি-গুলিকে প্রলাপ বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, উল্লিখিত নাস্তিকেরা দেবতাদের নিকট মস্তক নত করে না বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসুর-প্রকৃতি মানুষের নিকট বা চরিত্রভ্রষ্টা নারীর নিকট সর্বদাই নতি স্বীকার করিয়া থাকে। ইহারা পরোপকাররূপ যজ্ঞে অর্থের অপব্যয় করে না সত্য, কিন্তু বিলাস-ব্যসনে এবং সুরাপানে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়াইয়া দেয়। এবং এতদুদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের জন্য কোনপ্রকার কুকার্যসাধনে ইহারা পরাঙ্মুখ নহে। ইহারা যজ্ঞে পশুবধ করে না, কিন্তু কসাইএর দোকানের জবাই-করা যে কোন মাংস পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া থাকে। ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত লোকেরা এইরূপ কুকর্ম-পরায়ণ হওয়ায় সমগ্র দেশ পাপের পথে উৎসাহ পাইতেছে। গীতায় উক্ত হইয়াছে :

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

—প্রধান ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করে, সাধারণ লোকেরা তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায়, এই শ্রেণীর নাস্তিকেরা প্রায় সকল যুগেই অল্প-বিস্তর বিদ্যমান এবং ইহারা 'চার্বাক' নামে অভিহিত হইত। আর্য ঋষিদের ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের সম্মুখে চার্বাকেরা চিরদিনই হতপ্রভ হইয়াছে; কিন্তু সুযোগ পাইলেই একটা না একটা অনর্থ-সাধনের চেষ্টা সকল যুগেই তাহারা করিয়া আসিয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে দেখি, একজন চার্বাক শ্রীরামচন্দ্রকে সত্যভ্রষ্ট করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। মহাভারতে দেখি, যুধিষ্ঠিরকে বিপথগামী করিবার জন্য তাঁহারই রাজসভায় দাঁড়াইয়া আর একজন চার্বাকের অপপ্রচারের প্রয়াস। মহাভারতের উল্লিখিত স্থলে চার্বাককে 'রাক্ষস' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। পরবর্তী কালের বহু গ্রন্থেও চার্বাকদের অবস্থিতি ও মতবাদের অজস্র উল্লেখ দেখা যায়।

চার্বাক-শ্রেণীর উল্লিখিত নাস্তিকেরা আপাতরম্য কুযুক্তিসমূহ দ্বারা সরলমতি মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। শিশুরা যেমন কোন নূতন কথা শুনিলেই তাহা সত্য মনে করে, সরলমতি জনসাধারণও তেমনি চার্বাকদের কুযুক্তিগুলিকেও ঠিক যুক্তি মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে ধর্ম ও সমাজবিরোধী আচরণে প্রবৃত্ত হয়।

ধর্মসাধনের উপযোগিতা

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক সকলেই স্বীকার করেন যে, আদিম যুগে মানুষ ও পশু একই ভাবে অরণ্যে বাস করিত। পশুদের মধ্যে যেমন ধর্মের জ্ঞান নাই, ঐ যুগের মানুষের মধ্যেও তেমনি ধর্মজ্ঞান একেবারেই ছিল না। ফলে পশু হইতে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বও পরিলক্ষিত হইত না, ক্রমশঃ মানবের মনে বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ ঘটিতে থাকিলে তাহাদের মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তিরা ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য ধর্মাচরণের প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন; এবং সেই সময় হইতেই মানব-ধর্মের বীজ উপ্ত হইল। অতঃপর মানবের মনন-শীলতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মবীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া ক্রমশঃ বৈদিক ধর্মরূপ মহান্ মহীরুহের উদ্ভব হইল। ইহার পরও বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন পথে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেকে সাফল্য-মণ্ডিতও হইয়াছেন।

মনুষ্য-মাত্রেরই জীবনে ধর্মাচরণ একান্ত আবশ্যক। যে মানব ধর্মাচরণ করে না, তাহাতে আর পশুতে কোন পার্থক্য নাই।

ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মিথুনভাব এই চারিটি মানুষ ও পশু—উভয়ের মধ্যেই আছে। ধর্মনামক অতিরিক্ত একটি গুণ মানুষের মধ্যে আছে বলিয়া মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। যে সকল মানুষ ধর্মাচরণ করে না, তাহারা পশুর তুল্য।

ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেয় ত্যাগ, শিক্ষা দেয় পরোপকার এবং সরলতা। বর্তমান যুগের মানুষ যে ভোগী, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থ-সর্বস্ব ও কুটিলমতি হইয়া পাপের পঙ্কিল আবর্তে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা হইতে একমাত্র ধর্মই তাহাদিগকে পুনরুদ্ধার করিতে পারে। রাষ্ট্র এবং সমাজের সকল স্তরের লোকেরই ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া বিশ্বের কল্যাণের জন্য একান্ত আবশ্যক।

রাষ্ট্রনায়কেরা ধর্মে বিশ্বাসী হইলে জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন; ফলে পররাজ্য-গ্রাস করিবার জন্য কুটিল চক্রান্তে লিপ্ত হইবেন না। সরকারী কর্ম-চারীদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস জন্মিলে তাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্য হইতে বিরত থাকিবেন। ব্যবসায়ীরা ধর্মে বিশ্বাসী হইলে খাদ্যে ভেজাল মিশানো-রূপ মহাপাপ দেশ হইতে দূরীভূত হইবে এবং খাঁটি খাদ্য খাওয়ার ফলে জনগণের স্বাস্থ্য ও আয়ু উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে; অধিকন্তু অনর্থক চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন হইতেও তাঁহারা অব্যাহতি পাইবেন। রাজনৈতিক নেতারা ধর্মে বিশ্বাসী হইলে অপপ্রচারের সাহায্যে মানুষের অন্তরের রিপুরূপ দানবগুলিকে জাগ্রত করিয়া এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আর এক শ্রেণীকে খেপাইয়া দিয়া ভোট-যুদ্ধের নামে দেশব্যাপী দেবাসুর-সংগ্রাম পরিচালনা করিবেন না, এবং ফলে মানুষ পরস্পরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারিবে। শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অন্তরে ধর্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইলে, অযথা নূতন করের মাধ্যমে তাঁহারা দরিদ্র জনগণের রক্ত শোষণ করিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার নামে তাহার বিপুল অপব্যয় করিবেন না; ফলে জনসাধারণ তাহাদের শ্রমলব্ধ অর্থ নিজেদের জন্য ব্যয় করিয়া অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য লাভে সমর্থ হইবে।

The end of religions is the realising God in the soul. There is that beyond all books, beyond all creeds, beyond the vanities of this world, and that is the realisation of God within yourself.

Swami Vivekananda

বুদ্ধদেব ও বৈদিক চিন্তাধারা

ডক্টর অণিমা সেনগুপ্তা

ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ভারতের জাতীয় ইতিহাসে সত্যই এক বিস্ময়কর ঘটনা। শুধু ভারতবর্ষ কেন, বহির্ভারতের ধর্মভাব, অনুভূতি ও দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও ভগবান বুদ্ধের দান—তার অনুপম বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণ সারগর্ভতা নিয়ে আজও উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে।

ভারতবর্ষে সত্যসিন্ধুর অমৃত-মন্থনের যে অভিনব তপস্যা বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় যুগে আরম্ভ হয়েছিল, তারই এক গভীর ও মহৎ পরিণতি আমরা দেখতে পাই উপনিষদের বিশ্বাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যানুভূতির মধ্যে। বৈদিক ঋষির অন্তরের জিজ্ঞাসা 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?' ঋষি উদ্দালক যেন তারই উত্তর দিলেন, 'স এষঃ অণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং, স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।' জীব-শরীরে নিয়ামক-রূপে বর্তমান আত্মাই যে বিশ্বের মূলতত্ত্ব—এই সত্য উদ্ঘাটন করেই উপনিষদের ঋষিগণ এ দেশের ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক জগতের আলোর বর্তিকা অধিকতর উজ্জ্বল শিখায় জ্বালিয়ে তুলেছিলেন। হিরণ্ময় পাত্রের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল জগতের সর্বোত্তম গূঢ় সত্য।

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

—জগতে যা কিছু আছে, সবই আত্মরূপী পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করবে। আসক্তি ত্যাগ ক'রে ভোগ কর, ধনের আকাঙ্ক্ষা ক'রো না। এই মহান্ সত্যের আবরণ উন্মোচন ক'রে তার প্রতিষ্ঠা দ্বারা উপনিষদের ঋষিগণ বৈদিক ধর্মের আধারশিলার উপরে উন্নত আধ্যাত্মিক ভাব, চিন্তা ও কল্পনার যে বিচিত্র স্বর্ণসৌধ নির্মাণ করেছিলেন, তার ভগ্নাবশেষও আজ আমাদের নিকট কোন দুর্লভ দেবতার রূপায়িত ধ্যান বলেই মনে হয়।

বেদ ও উপনিষদ্

উপনিষদের ঋষিগণ যে সংহিতার ঋষিদিগেরই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী, সে বিষয়ে কিছুকাল পূর্বেও বিদ্বৎসমাজে বিশেষ মতভেদ ছিল। বহু পাশ্চাত্য মনীষী এবং ভারতীয় দার্শনিক উপনিষদের আবির্ভাবকে ভারতের ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন চিন্তাধারার আবির্ভাব ব'লে মনে করেছেন।

পশ্চিমের মনীষী ডয়সনের মতে 'উপনিষদের আত্মবাদের সঙ্গে বৈদিক দেবতার বর্ণনা ও উপাসনা এবং যাগযজ্ঞ-বিধির মূলগত পার্থক্য রয়েছে'। ম্যাকডোনেল তাঁর 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে' বলেছেন: 'যদিও উপনিষদ্ ব্রাহ্মণেরই একটি অংশরূপে গৃহীত হয়, তথাপি উপনিষদের যে নূতন ধর্মভাবনা পরিলক্ষিত হয়, তা বৈদিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত'। ভারতবর্ষের খ্যাতনামা দার্শনিক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অভিমতও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুরূপ। তিনি মনে করেন: উপনিষদ্ বেদ হ'তে ভিন্ন, কারণ উপনিষদ্ জ্ঞানমার্গী, কিন্তু বেদ কর্মকাণ্ড-প্রধান। আবার অনেকেই আজকাল বিশ্বাস করেন: বেদ ও উপনিষদের মধ্যে এরূপ মূলগত ভেদ বা বিরোধ কল্পনা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

মধ্যযুগে শংকর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণও বেদ ও উপনিষদের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ স্বীকার করেননি। উপনিষদ্ বেদের বিরোধী নয়, বরং তার উন্নততর অভিব্যক্তি। বৈদিক কর্মকাণ্ডও মানবের অন্তর্দৃষ্টি ক্রমশঃ ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রবর্তিত হয়েছে। বেদোক্ত বহুদেবতাবাদ এবং উপনিষদের অদ্বৈতবাদ বিরোধী চিন্তাধারা নয়। সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি বৈদিক দেবতা জগতের বহু বিচিত্র শক্তির বিভিন্ন প্রতীক-মাত্র। এই সকল শক্তির আধাররূপে যে এক পরম শক্তি বিরাজিত, তার আভাস আমরা সংহিতায়ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাই। যথা 'একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। 'মহৎ দেবানাম্ অসুরত্বমেকং'। 'যো দেবানাং নামধা এক এব' ইত্যাদি।

পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদের স্থূল দৃষ্টির তৃষ্ণা প্রতি মুহূর্তে তৃপ্ত করছে, তা যে সত্যের পরিপূর্ণ রূপ নয়—এ অনুভূতি ঋগ্বেদের যুগেও ঋষিহৃদয়ে স্পষ্টরূপেই জাগ্রত হয়েছিল। অতএব এ কথা বলা একেবারেই উচিত নয় যে, বেদবর্ণিত অর্ধ-দেবতাদের মৃত্যুর পরেই উপনিষদে পূর্ণাঙ্গ দেবতার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। অধিদৈবত শক্তি ও অধ্যাত্ম-শক্তিরূপে ঋগ্বেদের দেবতাগণ উপনিষদেও আদৃত হয়েছেন। উপনিষদ্ বেদেরই স্ফুটতর ব্যাখ্যা ব'লে উপনিষদের ঋষিগণ আপন আপন মতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বৈদিক ঋষিদের উল্লেখ করেছেন বারংবার; যেমন 'তদুক্তম্ ঋষিণা', 'তদেতদ্ ঋচাভ্যুক্তম্' ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব ও তৎকালীন বৈদিক ধর্ম

বেদ ও উপনিষদ্-প্রচারিত সত্যে যেমন মূলগত কোন প্রভেদ নেই, সেইরূপ বুদ্ধদেব-প্রচারিত ধর্ম বেদবিরোধী ব'লে সাধারণতঃ বর্ণিত হলেও উপনিষদ্-প্রবর্তিত ধর্মের সঙ্গে তার কোন বাস্তবিক বিরোধ নেই। উপনিষদের পরবর্তী যুগ কল্পসূত্রের যুগ। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হ'তে আরম্ভ ক'রে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এই যুগ বর্তমান ছিল। ব্রাহ্মণ-যুগের মতো এ-যুগেও জ্ঞানযজ্ঞের পরিবর্তে দ্রব্যযজ্ঞের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কর্মকাণ্ডের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত সত্য বিস্মৃত হয়ে লোভবশতঃ যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ তার বহিরঙ্গের উপরই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। লোভের সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, দ্বেষ, অজ্ঞান ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব হওয়ায় দেশের সামাজিক ও ধার্মিক জীবনে অত্যন্ত বিষাক্ত বাষ্পের সৃষ্টি হয়। মন্দবুদ্ধি বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় পূজা যজ্ঞ ইত্যাদি ব্যবসায়ের পর্যায়ে অবনমিত হয়। উপনিষদ্-প্রচারিত মানবের শাশ্বত মহিমা বর্ণভেদের লৌহ-নিগড়ে নিষ্পেষিত হ'তে থাকে।

ভারতের ধর্মাকাশে যখন দুর্দিনের এই কৃষ্ণমেঘ তার সর্বনাশা মূর্তিতে আবির্ভূত, সেই সময়েই ভারতের পুণ্যতীর্থে অবতীর্ণ হন ভগবান বুদ্ধ তাঁর যুগান্তকারী প্রতিভা নিয়ে। এই বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে তৎকালীন ধর্মের মলিন আবরণ ধ্বংস হ'য়ে যায় এবং শাশ্বত আদর্শ ও মুক্তির অনির্বাণ আলো ভারতের দিগন্ত আবার উদ্ভাসিত ক'রে জ্বলে ওঠে। রুদ্রদেবের মতোই বুদ্ধদেব এক পদক্ষেপে জীর্ণসংস্কার ধ্বংস ক'রে অন্য পদক্ষেপে চিরন্তন সত্যের পুনরুদ্ধার করেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষ্যই ছিল উপনিষদ্-প্রবর্তিত চিন্তাধারার সংস্কার সাধন ক'রে বিশুদ্ধরূপে তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা।

সুত্তনিপাতের কতিপয় গাথা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে—বুদ্ধদেব সত্যাশ্রয়ী শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে কোন অশ্রদ্ধাই পোষণ করতেন না। তাঁর অভিযোগ ছিল অর্থলোভী সংকীর্ণচিত্ত পুরোহিত-শ্রেণীর বিরুদ্ধে, যাঁরা সেই যুগে সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন থেকে বর্ণভেদের কঠোরতা সমাজে প্রবর্তিত করেছেন।

চুল্ল বগ্‌গে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন: প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের যিনি অধিকারী, তিনি সর্বদা সংযত জীবন যাপন করেন; পঞ্চকামগুণ তিনি প্রত্যাখ্যান ক'রে শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ব্যবহারে অভ্যস্ত হন; তাঁর কোন রকম বিত্ত বা ধন থাকে না; তিনি অজেয়, কারণ তাঁর বিশুদ্ধ ধর্মাচরণ লৌহবর্মের মতোই তাঁকে সর্বদা পাপ থেকে রক্ষা করে। এরূপ শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণের সম্মুখে কোন গৃহের দ্বার কখনও রুদ্ধ থাকতে পারে না।

বৌদ্ধধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞ Rhys-Davids স্পষ্টই বলেছেন: বুদ্ধদেব জন্মকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দুই ছিলেন। গৌতমের সকল শিক্ষা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে এবং তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, যে ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, ন্যায়পরায়ণতা ও সংযম উপনিষদের যুগে ব্রাহ্মণত্বের অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য-রূপেই পরিগণিত হ'ত।

এইভাবে কল্পসূত্রের যুগের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধার্মিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্মের অধ্যয়ন ও আলোচনা করলে উপনিষদের ধর্ম থেকে বৌদ্ধধর্ম যে মূলগতভাবে অভেদ, তা অনায়াসেই আলোচকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে। অবশ্য সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য বৌদ্ধধর্মের অনেক পৃষ্ঠপোষকই এ সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হবেন, কিন্তু সমন্বয়ের উদার দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে উপনিষদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য বোধ হয় কোন আলোচকই অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।

বৌদ্ধধর্মের মূল বিশ্বাস ও উপনিষদীয় ধর্মভাবনার তুলনামূলক অধ্যয়নে যে সাদৃশ্যগুলি চোখে পড়ে সেগুলি এখানে আলোচিত হচ্ছে:

(১) কর্মবাদ

কর্মবাদ বৌদ্ধধর্মের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ। কর্মদ্বারাই বন্ধন বা দুঃখভোগ এবং কর্মক্ষয়ে দুঃখনিবৃত্তি। দ্বাদশ নিদানের একটি নিদান 'ভব' কর্মের অর্থেও বৌদ্ধদর্শনে প্রযুক্ত হয়েছে। ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় যে বৈচিত্র্য জগতে অবিরাম পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেই বিচিত্রতাও প্রধানতঃ কর্মকৃত। বৌদ্ধমতে কর্মান্তে প্রত্যেক মনুষ্যকেই অবশ্য কর্মফল ভোগ করতে হবে।

'কম্মাসূনকা সত্তা কম্মদাযাদা কম্মযোনী
কম্মবন্ধু কম্মপতিসরনা।' (মঝ্‌ঝিমনিকায)

—অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রই স্বকর্মের উত্তরাধিকারী, কর্ম মনুষ্যের একান্ত আপন, কর্ম তার জন্মের কারণ এবং কর্মই তার একমাত্র আশ্রয়।

কর্মদ্বারা জীবের বন্ধন ও মুক্তি বৈদিক ধর্মেরও মূল কথা এবং দ্রব্যযজ্ঞ দ্বারা ও পরলোকে সুখপ্রাপ্তি হলেও তা যে মুক্তির উপযোগী নয়, একথা উপনিষদ্‌ এবং উপনিষদা-শ্রিত সাংখ্য-যোগ, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনও স্বীকার করেছে। যেমন ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে:

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

কর্মের ব্যাখ্যা বুদ্ধদেব উপনিষদ্‌ এবং বেদান্ত অনুযায়ীই করেছেন। বেদান্ত যেমন কর্ম-শব্দ কেবল যাজ্ঞিক কর্মার্থে প্রয়োগ করেনি, কিন্তু কায়িক বাচিক ও মানসিক কর্মের

অর্থেও প্রয়োগ করেছে, বুদ্ধদেবও তাঁর দর্শনে 'মানসম্ কম্ম' বা চেতনা ও চিন্তার্থে কর্ম-শব্দের ব্যবহার করেছেন। 'চেতনাহম্ ভিক্খবে কম্মম্ বদামি; চেতয়িত্বা কম্মম্ করোতি কায়েন বাচয়া মনসা।' কর্মশুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সত্যজ্ঞানোপলব্ধি বৌদ্ধদর্শন ও বৈদিক দর্শন উভয়েরই গ্রাহ্য। গীতাতে কর্মযোগ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

কায়েন মনসা বাচা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

অর্থাৎ ফলবিষয়ক আসক্তি ত্যাগ ক'রে যখন কোন সাধক কায়িক বাচিক ও মানসিক কর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়, তখনই তার অন্তঃকরণ নির্মল ও পবিত্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় এবং সত্যের সম্যক্ উপলব্ধিও তার পক্ষে সম্ভবপর হয়। কিন্তু আসক্তিপূর্বক বা কামদ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে যে-কর্ম করা হয়, তা কেবল দুঃখের বিবিধ রূপ ধারণ ক'রে মনুষ্য-জীবনকে ক্রমাগত পীড়িত ও লাঞ্ছিত করতে থাকে।

(২) তৃষ্ণা

বৌদ্ধধর্মে 'তন্হা' (তৃষ্ণা) 'কাম' বা 'মার'—সকল বন্ধনোপযোগী কর্মের মূলগত দোষ ব'লে বর্ণিত হয়েছে। জাগতিক সুখ-ভোগের জন্য যে প্রবল আসক্তি মনুষ্যহৃদয়ে প্রতিমুহূর্তে জাগ্রত হচ্ছে, তাকেই বৌদ্ধদর্শনে তৃষ্ণারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই 'তন্হা-সংযোজন' বা 'তৃষ্ণাসংযোগে'র জন্যই বিচিত্র অনুভূতিপূর্ণ জগতের ঘূর্ণায়মান চক্র থেকে মানুষ সহজে আপনাকে মুক্ত করতে সক্ষম হয় না। ভবচক্র বা প্রতীত্যসমুৎপাদ সংসারের ভিত্তিমূলে অপ্রতিহত গতিতে ক্রমাগত আবর্তিত হ'তে থাকে।

তৃষ্ণা বা কামসম্বন্ধীয় ধারণাও বৌদ্ধধর্মের নূতন বৈশিষ্ট্য নয়। ঋগ্বেদের সময় থেকেই ভারতবর্ষে কামকে সংসার-সৃষ্টির মূল কারণ ব'লে গণ্য করা হচ্ছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বলা হয়েছে :

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে :

সমুদ্র ইব হি কামঃ ; ন হি কামস্যান্তোঽস্তি।

—সমুদ্রের মতোই কামরাশি অতল ও অপরিমিত। কামের অন্ত পরিলক্ষিত হয় না।

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, 'ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি'—উপভোগ দ্বারা কামনারাশি শান্ত বা বিলুপ্ত হয় না।

গীতাতেও কামকে প্রজ্ঞাবিরোধী ও দুঃখোৎপাদকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কামজয়ী পুরুষই কেবল শান্তির অধিকারী হ'তে পারে। কামুকের শান্তি-লাভ কখনই সম্ভবপর নয়। 'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥'

বৌদ্ধমতে জাগতিক সুখভোগের তৃষ্ণা মনুষ্যমাত্রকে চারি আর্য সত্য সম্বন্ধে অচেতন ক'রে রাখে ব'লে দুঃখ উৎপাদনের জন্য তৃষ্ণা ও অবিদ্যার এক স্বাভাবিক সহযোগ ঘটে। চারি আর্য সত্য হ'ল—দুঃখ, দুঃখসমুদায়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধমার্গ। জগৎ দুঃখপূর্ণ, অতএব হেয়,—এই জ্ঞান যখন সাধকের হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখনই সে দুঃখের কারণ অনুসন্ধান ক'রে তার বিনাশের পথ গ্রহণ করতে উদ্যত হয়। যতক্ষণ তৃষ্ণা বর্তমান থাকে, ততক্ষণ জগতের দুঃখপূর্ণ রূপ কারও দৃষ্টির সম্মুখেই প্রকাশিত হয় না। তৃষ্ণাতুর জীবন সেজন্য অবিদ্যাকবলিত বলেই পরিগণিত হয়। অবিদ্যা এবং তৃষ্ণা যখন চতুর্থ আর্যসত্যের পরিপালন-দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, তখনই জ্ঞানী

ব্যক্তি বা বুদ্ধচিত্ত নির্বাণলাভে সক্ষম হয়ে থাকে।

(৩) অবিদ্যা

অবিদ্যার কল্পনাতেও বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে বৈদিক দর্শনের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সংসারভোগের মূলে যে কোন রকম ভ্রমাত্মক জ্ঞান বা অজ্ঞান অনাদি-প্রবাহে বর্তমান—এ সত্য চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শনই স্বীকার ক'রে থাকে। অবিদ্যার বা অজ্ঞানের বিশেষ রূপ-বর্ণনায় বিভিন্নতা দৃষ্ট হলেও সাধারণভাবে সর্বত্র অবিদ্যা অতাত্ত্বিক দৃষ্টিরূপেই গৃহীত হয়েছে।

(৪) আত্মতত্ত্ব

অবশ্য তত্ত্বের ক্ষেত্রে যখন প্রবেশ করা হয়, তখন বৌদ্ধ ও উপনিষদ্-প্রচারিত ধর্মের কিছু বৈষম্য ক্ষণকালের জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিচার করলেই দেখা যায় যে, তত্ত্বের বা সত্যের স্বরূপ-বর্ণনায় বা বৌদ্ধধর্মের ভাবধারার সঙ্গে উপনিষদের সমন্বয় সাধন করা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়।

উপনিষদে এক বিভু আত্মার অমর অস্তিত্বের বাণী প্রচারিত হয়েছে। আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও অপরিণামী ; তার ক্ষয় নেই, ব্যয় নেই, মৃত্যু নেই, পরিবর্তন নেই। এক অরূপ, অসীম, স্থির এবং বিরাট চিৎ-সত্তা সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমাগত অভিব্যক্ত হচ্ছে। কিন্তু এই অভিব্যক্তির ফলে আত্মাতে কোন হ্রাস বা ন্যূনতা কখনই ঘটে না। বিরাট বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতীত চৈতন্য সর্বদাই পূর্ণ ও অখণ্ড।

বৌদ্ধদর্শনে কিন্তু এরূপ নিত্য আত্মার বর্ণনা আমরা দেখতে পাই না। বৌদ্ধদর্শন বিভিন্ন মানসিক প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং আত্মাকে সেই সকল প্রবৃত্তির সংঘাত বা সমূহরূপে বর্ণনা করে। আত্মা প্রত্যক্ষগোচর মানসপ্রবৃত্তির কেবল একটি পুঞ্জ বা সংঘাত। সংঘাতাতিরিক্ত নিত্য আত্মার উল্লেখ বুদ্ধদেব করেননি।

বুদ্ধদেব যে সংঘাতকে আত্মা-রূপে বর্ণনা করেছেন এবং যার অস্থির ও চঞ্চল স্বভাবকে মেনে নিয়ে আত্মাকেও ক্ষণ-পরিবর্তনশীল পদার্থের পর্যায়ভুক্ত করেছেন, সেই অস্থির প্রবৃত্তিপুঞ্জাত্মক পদার্থ উপনিষদে ও বৈদিক দর্শনে অহং-ভাবাপন্ন বুদ্ধি বা চিত্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদ্ এবং অন্যান্য বৈদিক দর্শন এই পরিবর্তনশীল বুদ্ধি বা চিত্তকে জড় এবং 'পরপ্রকাশ'রূপে গ্রহণ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে চিত্তের ধারক বা পোষকরূপে অন্য কোন স্থির চৈতন্যের উল্লেখের অভাবে চিত্তকেই 'স্বপ্রকাশ'রূপে গণ্য করা হয়েছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানও চিত্ত বা বুদ্ধি পর্যন্তই স্বীকার করে। কিন্তু উপনিষদ্ ও অন্যান্য বৈদিক দর্শন চিত্ত বা বুদ্ধির পরিণামশীলতা ও জড়ত্ব উপলব্ধি ক'রে সকল মানস প্রবৃত্তির একীকরণের উদ্দেশ্যে চিত্তের বা বুদ্ধির পশ্চাতে এক সূক্ষ্ম স্থির চৈতন্যকে স্বীকার করেছে,—যে চৈতন্য একটি ঐক্য-সূত্রের মতো বিভিন্ন মানসিক অবস্থাকে অবিরাম এক অখণ্ড আত্মভাবের অঙ্গীভূত করছে। বৌদ্ধদর্শনে স্থির আত্মার উল্লেখ নেই বলেই এই দর্শনকে নৈরাত্মবাদী দর্শন ব'লে বর্ণনা করা হয়ে থাকে এবং এই নৈরাত্মবাদী সিদ্ধান্ত দ্বারা উপনিষদের মূলগত চিন্তা হ'তে বৌদ্ধভাবনার মৌলিক ভেদ পরিস্ফুট করা হয়ে থাকে।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও যদি বৌদ্ধদর্শনকে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আমরা পরিদর্শন করি, তবে বুদ্ধদেবের নৈরাত্মদর্শন প্রচারের

একটি সঙ্গত কারণ আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। বৌদ্ধযুগে বৈদিক যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ নিত্য ও শাশ্বত আত্মার বাণী প্রচার ক'রে এবং তার পারলৌকিক সুখোৎপাদনের জন্য যজমানদের উৎসাহিত ক'রে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন এবং নিত্য আত্মার উল্লেখ ক'রে নানারকম দুষ্কর্মও তখন সমাজে অহরহ অনুষ্ঠিত হ'ত। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি ও সর্বনাশের গ্রাস হ'তে ধর্ম, সমাজ ও দর্শনকে রক্ষা করার জন্যই বুদ্ধদেব নিত্য আত্মার আলোচনা সর্বদাই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন।

আত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হ'লে বুদ্ধদেব সর্বদাই মৌনভাব অবলম্বন করতেন। বুদ্ধদেবের এই মৌনভাব উপনিষদ্-বর্ণিত ভাব ঋষির মৌনভাবের সঙ্গেই তুলনীয়। বাস্কলী যখন ভাবের নিকট উপস্থিত হয়ে পরম তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, তখন প্রত্যুত্তরে ভাব মৌন হয়েই রইলেন। কারণ বাক্য ও মনের অগোচর যে তত্ত্ব, তার বর্ণনার উপযোগী ভাষা জগতে আজও সৃষ্ট হয়নি। উপনিষদের 'নেতিবাদ'ও পরম তত্ত্বের স্বরূপ-বর্ণনায় মৌন থাকারই ইঙ্গিত করে।

বুদ্ধদেবের মৌনতা সম্বন্ধে আমরাও অনুমান করতে পারি যে, তিনিও চিত্তের অতীত সূক্ষ্ম আত্মার বর্ণনা একেবারেই অসম্ভব জেনে উপনিষদের ঋষির মতোই মৌনতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বৈদিক দর্শনের অধ্যয়ন ও প্রচার সুদীর্ঘ কাল ধ'রে ভারতবর্ষে হয়ে এসেছে ব'লে এদেশের দর্শনাচার্যগণ উপনিষদের মৌনতাকেও ভাষায় ব্যাখ্যা করার ক্রমাগত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে নির্বাসিত হয়েছিল ব'লে তার শ্রীবৃদ্ধি প্রধানতঃ বিদেশী দার্শনিক দ্বারাই সাধিত হয়েছে। বিদেশী দর্শনে সাধারণতঃ মন বা চিত্তকেই অধ্যাত্ম-প্রকাশকের স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। বুদ্ধি বা চিত্তের আধার-রূপে বুদ্ধির অতীত আর কোন অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান বিদেশী দর্শনে দৃষ্টিগোচর হয় না। বৌদ্ধদর্শনেও বোধ হয় আমরা এই কারণেই চিত্তকেই স্বপ্রকাশরূপে পেয়ে থাকি। ভারতের ভূমিতে বৈদিক দর্শনের মতো বৌদ্ধদর্শনেরও প্রভূত অনুশীলন হ'লে নৈরাত্মবাদের ব্যাখ্যা কতখানি নৈরাত্মবাদী থাকত তা বিচার-সাপেক্ষ।*

(৫) সর্ববস্তুর ক্ষণিকত্ব

বৌদ্ধধর্মের 'সব্বং ক্ষনিকং' মন্ত্রও সর্ববস্তুর উপনিষদ্-বর্ণিত স্বরূপের বিরোধী নয়। উপনিষদ্‌ও তথাকথিত জড়বস্তু হ'তে আরম্ভ ক'রে জড়প্রকাশবুদ্ধি পর্যন্ত সকল পদার্থকেই পরিবর্তনশীল ব'লে বর্ণনা করেছে। অনুভবে সর্বদাই আমরা নূতন বস্তুকে কিছুকাল পরে জীর্ণ ও পুরাতনরূপে পরিবর্তিত হ'তে দেখি। কিন্তু এই জীবতত্ত্ব ও প্রাচীনত্ব এক মুহূর্তে বস্তুদেহে সঞ্চারিত হয় না। প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন হচ্ছে, তার ফলেই এক সময় সেই বস্তু প্রাচীন ব'লে পরিগণিত হয়। এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বস্তুবাদী ন্যায়দর্শন দ্রব্যাংশের স্থিরতা মেনে নিয়ে কেবল গুণাংশের অবিরাম পরিবর্তন ঘোষণা করেছে এবং সাংখ্য ও বেদান্ত গুণ-গুণীতে ভেদ মানে না ব'লে বস্তুকেই পরিবর্তনশীল বলেছে। সাংখ্যের প্রকৃতি প্রতিক্ষণপরিণামিনী। বৌদ্ধধর্মে গুণ-গুণী,

---

* ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে পাওয়া যায়, প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া বহু বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক দার্শনিক এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন ; নাগার্জুন ও আচার্য শংকরের নাম এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উঃ সঃ

অবস্থা-অবস্থাবান্ ইত্যাদির কোন ভেদই মানা হয়নি। প্রত্যেক বস্তু সলক্ষণ ব'লে প্রতিটি সলক্ষণ বস্তুই ক্ষণিক ব'লে গৃহীত হয়েছে।

(৬) দুঃখবাদ

বৌদ্ধধর্মের অপর মূলমন্ত্র 'সব্বং দুখ্খং'ও সকল বৈদিক দর্শনেই ঘোষিত হয়েছে। সাংখ্যকার তো ত্রিবিধ দুঃখের ব্যাখ্যা শাস্ত্রের প্রারম্ভেই করেছেন। বৈশেষিক মতেও সকল আধ্যাত্মিক ভাবনাই দুঃখ এবং বাহ্যজগৎ অনবরত আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ব'লে বাহ্যজগৎও দুঃখপূর্ণ। জগতের দুঃখ-পূর্ণ রূপ উপনিষদের যুগ থেকে স্বীকৃত হয়ে এসেছে বলেই চার্বাক ব্যতীত প্রত্যেকটি ভারতীয় দর্শন 'মোক্ষশাস্ত্র' নামে অভিহিত হয়েছে।

(৭) অহিংসা

যে অহিংসা বৌদ্ধধর্মের বীজমন্ত্ররূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে এবং যার অনুশীলন প্রত্যেক বুদ্ধ-শিষ্যের অবশ্য কর্তব্য ব'লে নির্ধারিত, তার মূল অনুসন্ধান করলেও আমরা বৈদিক ধর্মের বিস্তৃত ও উদার পরিমণ্ডলের মধ্যেই প্রবেশ করি। 'মা হিংসীঃ সর্বভূতানি'—এই মহাবাক্য আবহমান কাল থেকে ভারতের উন্মুক্ত আকাশে ধ্বনিত হয়ে ভারতবাসীকে মুক্তির পথ ও মনুষ্যত্বলাভের পথের সন্ধান দিয়ে আসছে। অমৃতের সন্তান হয়েও অজ্ঞানপ্রসূত বাসনার বশবর্তী হয়ে মানুষ সত্যপথ হ'তে অনবরতই ভ্রষ্ট হচ্ছে, এবং লোভ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি নানা কলুষ তার অন্তরস্থিত নিত্য আত্মার উপলব্ধিতে নিরন্তর বাধা দিচ্ছে। মানুষ যে দুর্বল নয়, হীন নয়, তার মধ্যে যে এক মহান্ চিরন্তন সত্তার সম্ভাবনা রয়েছে—সে সত্য মানুষ বিস্মৃত হয় বলেই লোভের পথে, উদগ্র কামনার পথে নিজেকে পরিচালিত ক'রে জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। সেজন্য যদিও পূর্বমীমাংসা যাজ্ঞিক হিংসার সমর্থন করেছে, তথাপি অন্যান্য সমস্ত বৈদিক দর্শনই সর্বথা অহিংসাকে মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক ব'লে বর্ণনা করেছে। যাজ্ঞিক হিংসাও যে মোক্ষের বিরোধী তা সাংখ্যদর্শনে স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হয়েছে এবং যোগদর্শন অহিংসাকে 'সর্বথা সর্বদা সর্বভূতানাম্ অনভিদ্রোহঃ' রূপে বর্ণনা করেছে।

বাস্তবিক পক্ষে অহিংসা একটি বিশেষ ধর্ম নয়; মনুষ্যত্বের প্রকাশক সাধারণ ধর্মই হ'ল অহিংসা। অহিংসা দ্বারা কেবল মোক্ষপ্রাপ্তিই হয় না, মানবতার গৌরব-প্রতিষ্ঠার জন্যও অহিংসার আচরণ একান্ত আবশ্যক। কায় মন ও বাক্যে যিনি অহিংসভাব পোষণ করতে সক্ষম হন, তাঁর হৃদয়ই মৈত্রী করুণা ও প্রেমের মধুর রসে সিক্ত বা পূত হয়ে থাকে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও পশুবলি এবং যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক অত্যাচারে ভারতে মানবতা লাঞ্ছিত ও উপদ্রুত হচ্ছিল। মহামানব বুদ্ধদেব সেই বিস্মৃতপ্রায় অহিংসার বাণী পুনরায় কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা ক'রে মানবতার বিস্মৃত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। বৈদিক ধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মেও অহিংসা নির্বাণ-প্রাপ্তির এবং মনুষ্যত্ব-প্রাপ্তির সহায়করূপেই স্বীকৃত হয়েছে।

* * *

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বৌদ্ধধর্মের বিচার করলে বৈদিক ধর্মের সঙ্গে তার মিলন-সূত্র আবিষ্কার করা খুব কষ্টসাধ্য হবে না। ঋগ্বেদীয় যুগ থেকে একই দার্শনিক ও ধার্মিক ভাবধারা আমাদের দেশে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বিভিন্ন যুগে বিবিধ লোকোত্তর

প্রতিভার সংস্পর্শে সেই ভাবরাশির ভাণ্ডারে অবশ্য নব নব ঐশ্বর্য ও সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু ভারতের বৈদিক সাধনার কেন্দ্রীভূত ঐক্য নব সম্পদের ভারে কোন যুগেই বিন্দুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি। বেদ, উপনিষদ্ ও বৌদ্ধধর্মের [বুদ্ধসাধনার] ত্রিবেণী-সঙ্গমে যে নূতন প্রেমধর্ম ভারতে একদা জন্মলাভ ক'রে দুর্গত মানবের সুপ্ত বিবেক জাগ্রত করতে সমর্থ হয়েছিল, সেই ক্লেদশূন্য গ্লানিহীন শুভ্র নির্মল ও উদার কারুণ্যের পুনরভ্যুদয় অপেক্ষা ক'রে রয়েছে বর্তমান ভারত—যেখানে আজ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, সামাজিক উচ্চ নীচের বিচার ও নৈতিক অধঃপতন এক ধূলিময় আবর্তের সৃষ্টি ক'রে দেশবাসীর সত্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে। সেজন্য আজ এই শুভ দিবসে* 'শিক্ষা সমুচ্চয়ে'র প্রার্থনা অনুসরণ ক'রে বলতে চাই—

'হে জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ, আমাকে তুমি সর্বপ্রকারে মানবসেবার অধিকারী কর। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবকে যেন আমি জ্ঞানালোকের সন্ধান প্রদান করতে পারি, আর্তের যেন আমি শরণস্থল হই। মানবতার চরম দুর্দিনে যেন মানবজাতিকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যপথে পরিচালিত করতে পারি।'

'জয় হউক মহামানবের, চিরজীবিতের,
মহামৃত্যুঞ্জয়ের জয় হউক।'

* পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বুদ্ধ-উৎসব উপলক্ষে পঠিত।

শরণাগতি

(ইন্দিরা দেবীর হিন্দী ভজনের অনুবাদ)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শোন্ সখী, আজ বলি তোরে আমি কেমনে লভিনু মোহনে :
যোগী ঋষি যার পিয়াসী তাহারে তুষিল অবলা কেমনে॥

জানিতাম শুধু একটি তন্ত্র, একটি মন্ত্র সাধনার :
গুণী জ্ঞানী যারে বলে ভগবান্—(তারে) আমি জানিতাম আপনার।
এলো সে আমার ঘরে তাই—যারে খোঁজে মুনি গিরি-কাননে॥

বেদ-বেদান্ত পড়িনি, ছিল না তপ-সাধনায় মতি লো!
মঙ্গলময় মানি' তারে—তার চাহিনু শরণাগতি লো!
অন্ত পায় না ধ্যানী যার—এল সে আমার মনোগহনে॥

হরির লীলার কী বা জানি বল্? সে আকাশ, পাখী আমি যে।
পড়িতে চরণে দিল ঠাঁই গণি' আপন আমায়—স্বামী সে।
শিশুস্বরে কেঁদে ডাকিলে—অমনি আসে সে ত্বরিত চরণে॥

রাগভক্তি

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেন

'প্রেম' শব্দটি মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও আলোচনা করা যেতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে প্রেম অবিভাজ্য—তার ভগ্নাংশ হয় না। মানুষের ভালবাসা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভক্ত এবং খণ্ডিত, তাই এই অপূর্ণ প্রেমে আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মেটে না। যে প্রীতি বিষয়ীর মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না, ভক্তের বিরহ মিটাবার ক্ষমতাই বা তার কোথায়? আর নিশ্চয়ই এই আংশিক প্রেমে ভগবানেরও তুষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই!

সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিভক্ত ভালবাসার বিশেষ কোন মূল্য নেই। চিত্তের একাগ্রতাই ভাগবত অনুভূতি-লাভের প্রধান উপায়। বিষয়াসক্তি কিংবা 'মায়ার টান' মনকে করে বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল। ভালবাসা একলক্ষ্য না হ'লে দিব্য চেতনা লাভ করা অসম্ভব।

'চাতক চায় কেবল ফটিক জল! উঁচু হয়ে আকাশের জল পান করতে চায়। গঙ্গা যমুনা সাত সমুদ্র জলে পরিপূর্ণ। সে কিন্তু পৃথিবীর জল খাবে না।' নদীতে জল আছে, সংসারেও রস আছে; কিন্তু নদীর জল পান করলে চাতকের 'চাতকত্ব' থাকে না; সে স্বধর্মভ্রষ্ট হয় —তার নিজের প্রকৃতি ত্যাগ করতে হয়। তেমনি পৃথিবীর রস সম্ভোগ করলে সাধকের সাধকত্ব থাকে না; ভক্তের 'রাগভক্তি' অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

রাগভক্তি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, শুভ্র; সংসারের কোন আবিলতা তাকে স্পর্শ করে না। পবিত্রতার স্পৃহা 'প্রেমাভক্তির' মধ্যেই নিহিত। 'বৈষয়িক প্রেমাভক্তি' স্ববিরোধী উক্তি। চাতক উঁচু হয়ে জল পান করে, নীচু হয়ে নয়। ভক্তের প্রীতি মনের ঊর্দ্ধমুখী বৃত্তি। এ অনুরাগ অন্তরের নিম্নমুখী কামনা নয়। অসীম আকাশের বুকে যে জল আছে, সেই জল চায় চাতক; উদার অনন্তের বুকে যে রস আছে, সেই রসের পিয়াসী ভক্ত। এ ভাগবত-রস-পিপাসা কোন সীমিত প্রীতি নয়।

মায়া একটি সংকীর্ণ মনোবৃত্তি। একটি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সে আবদ্ধ। বৃহত্তের কিংবা ভূমার আনন্দ তার কাছে অপরিচিত। তাই আত্মীয়-স্বজনের প্রেমে সে মুগ্ধ। রাগভক্তি এই ক্ষুদ্রপ্রীতির বন্ধন হ'তে মুক্ত। উদার বিশ্বে সে মেলে তার পাখা। সে মায়াহীন, কিন্তু মমতায় ভরা; তার দয়ার সীমা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, 'দয়া অর্থ সর্বজীবে ভালবাসা।' মা নিজের সন্তানকে ভালবাসেন। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে, প্রতিবেশিনীর সন্তান তাঁর ছেলের তুলনায় ভাল হ'লে তিনি বোধ করেন এক গভীর অস্বস্তি, হয়তো গোপন ঈর্ষা। সত্যকার প্রেম থেকে অপ্রেম জন্মায় না; আলো থেকে অন্ধকারের উদ্ভব হয় না। রাগভক্তি সত্য বলেই তার অন্তরের দয়া সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, সে মায়ার মতো স্বার্থপর নয়, পরার্থপর। মায়ার মতো সে দুর্বলও নয়, কারণ তার হারাবার কোন ভয় নেই।

সাধকমাত্রই জানেন যে, রাগভক্তির ফলে মন স্বভাবতই হয় অন্তর্মুখীন। কিন্তু এই ভক্তি নিছক ভাববিলাস নয়, কিংবা নৈষ্কর্ম্যও নয়।

এ নিষ্কাম কর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে এই অনুরাগের ফলে 'সংসার বিদেশ বোধ হয়, কর্মভূমি-মাত্র। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কিন্তু কলকাতা কর্মভূমি। কলকাতায় বাসা ক'রে থাকতে হয় কর্ম করবার জন্য।' কেরানির কর্মে প্রীতি থাকে না, রসবোধও হয় না। তার কর্মে প্রেরণা যোগায় তার দেশের প্রীতি, পারিবারিক ভালবাসা। নিজের স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের জন্যেই সে এক নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যে কাজ করে। ঠিক তেমনি ভগবৎপ্রীতির জন্য এই সংসার-বিদেশে কাজ করে ভক্ত। সংসারে সে রস পায় না; তার সমস্ত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের মূলে থাকে এক দিব্য আনন্দের প্রেরণা। এই রস-চেতনাই, এই দিব্য প্রীতিই নিষ্কাম কর্মের মর্মকথা। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন কিংবা প্রেরণাশূন্য কর্ম কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। তাই একদিন কুরুক্ষেত্রে ভগবান তাঁর বন্ধু অর্জুনকে বলেছিলেন :

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

পরম পুরুষকে সর্বকর্ম দান করা প্রেমেরই ধর্ম। সেই ধর্ম, সেই নিষ্কাম কর্মই 'প্রেমাভক্তি' হয়ে ফুটে উঠেছে কথামৃতের আলোতে।

প্রেমাভক্তি শ্রেষ্ঠ নীতি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'বাঘ যেমন কপ্ কপ্ ক'রে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, অনুরাগ-বাঘ তেমনি কাম-ক্রোধাদি রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে অনুরাগ হ'লে কাম-ক্রোধাদি রিপু থাকে না।' 'যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়…… ইন্দ্রিয়-সংযম আর কষ্ট ক'রে করতে হয় না। রিপুবশ আপনা-আপনি হয়ে যায়……যদি কারও পুত্রশোক হয়, সেদিন কি সে আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে?… যাদের চৈতন্য হয়েছে তাদের বেচালে পা পড়ে না।'

চেষ্টা কিংবা চর্চা ক'রে একটি পরিপূর্ণ নৈতিক জীবন কিংবা পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করা কঠিন। অধ্যবসায়ের মূল্য আছে; তবু কিন্তু ইটের উপর ইট সাজিয়ে যেমন প্রাসাদ তৈরী হয়, একটি গুণের সাথে আর একটি গুণ যোগ দিয়ে তেমনি ক'রে একটি আদর্শ চরিত্র গঠন করা যায় না। পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিভিন্ন সদ্ভাবের একটি নিছক সমষ্টিমাত্র নয়, তার একটি স্বকীয় সমগ্র রূপ আছে। সে নিজেই একটি পূর্ণ বস্তু। তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে লাভ করা যায় না। সেই সমগ্র সত্তার প্রকাশ হয় রাগানুগা ভক্তিতে। আদর্শ চরিত্র রাগভক্তিরই একটি রূপ। তাইতো ভক্তের চরিত্রে হয় সমস্ত সদ্গুণের এক অপূর্ব সমাবেশ। বাস্তব দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই চিন্তা-সঙ্কট দেখা দেয়। কোন্‌টি নীতি, কোন্‌টি দুর্নীতি, কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি অসত্য—বিচার ক'রে সব সময় তার সন্তোষ-জনক উত্তর পাওয়া যায় না। ভগবৎপ্রেমিকের জীবনে এই চিন্তা-সঙ্কটের কোন স্থান নেই. কারণ তাকে হিসাব ক'রে পাপ ত্যাগ করতে হয় না…যে কর্ম সে করে, সেই কর্মই সৎকর্ম। প্রেম ও কাম, ভক্তি ও রিপু পরস্পর-বিরোধী বস্তু; তাই একটির আবির্ভাবে অপরটির হয় তিরোধান। 'অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্তন, সত্য কথা—এই সব।' এত ঐশ্বর্যের অধিকারী বলেই রাগভক্তি পার্থিব আনন্দে কিংবা ইন্দ্রিয়সুখে বীতস্পৃহ।

অনুরাগ ভক্তের প্রাণের তীব্র আকুতি, তাই সে প্রেমাস্পদের বিরহে কাতর। তার 'পলক অদর্শনে শতযুগ মনে হয়।' দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীর, ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এপারে

সবুজ ঘাসের উপরে লুটিয়ে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদছেন—'মা, আমার একটা দিন চলে গেল, তবু তো দেখা দিলিনে।' প্রেমাভক্তি এই বিরহের রক্তে রাঙা। নীলাচলে মহাপ্রভু গাইছেন :

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে

মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং

দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

ওগো দীনদয়াল প্রভু, হে মথুরার অধীশ্বর, কবে আমি তোমায় দেখব? তোমাকে না দেখে আমার সমস্ত মন যে ব্যথায় ভরে উঠেছে। সে মন নিয়ে আমি কি ক'রব, ব'লে দাও!

এই বিরহ-বেদনা শ্রীরামকৃষ্ণ জলে ডুবিয়ে-ধরা মানুষের অনুভূতির সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর ভাষায় জলে ডুবিয়ে ধরলে প্রাণ যেমন 'আটুবাটু' করে, সেইরূপ ভগবানের জন্য যদি প্রাণ আটুবাটু করে, তবেই তাঁকে লাভ করবে।

বিরহ-কাতর ভক্তের ইষ্ট প্রেমময় ঈশ্বর—সগুণ ব্রহ্ম। রাগভক্তির ফলে যে সমাধি হয়, তাকে 'কথামৃতে' বলা হয়েছে 'চেতন সমাধি'। এতে সেব্য-সেবকের 'আমি' থাকে—রস-রসিকের 'আমি' থাকে—আস্বাদ্য-আস্বাদকের 'আমি'। ঈশ্বর সেব্য, ভক্ত সেবক, ঈশ্বর রসস্বরূপ, ভক্ত রসিক……'চিনি হবো না, চিনি খেতে ভালবাসি।' ভক্তির অনুভূতিতে দ্বৈত ভাব প্রবল। সাধকের সাথে তার উপাস্যের রস-সম্বন্ধই প্রেমাভক্তির স্বরূপ।

সে প্রেমের পাত্র নিছক ভাবময় নিরাকার ঈশ্বরও হ'তে পারেন—যদিও ভাবের একটা রূপ আছে, কিংবা সাকারও হ'তে পারেন। কিন্তু মহাপ্রভু ও শ্রীরামকৃষ্ণের মতে সে সাকার রূপ চিন্ময়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'মহাবীর হনুমানের ইষ্ট চিন্ময় আনন্দের মূর্তি—সেই রামমূর্তি।' ভক্তের দেহও চিদানন্দময়। জড় দেহের সাহায্যে যেমন স্থূল রূপ দর্শন হয়, তেমনি চিন্ময় বিগ্রহ দেখবার জন্য প্রয়োজন হয় একটি চিদানন্দময় দেহ। সেই 'ভাগবতী তনু' ভক্ত লাভ করে রাগভক্তির ফলে। মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী :

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করেন আত্মসম।
সেই দেহ করেন তাঁর চিদানন্দময়
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

সেই 'অপ্রাকৃত দেহ' রাগভক্তিরই ফল। ভক্তের এ দান পরম সম্পদ্। 'ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হ'য়ে ভাসে, তেমনি ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়।' সে সাকার 'নিত্যসাকার'ও হ'তে পারে। 'এমন জায়গা আছে যেখানে বরফ গলে না, স্ফটিকের আকার ধারণ করে।'

এ কথা সত্য যে, ভক্ত প্রায়ই ব্রহ্মজ্ঞান চান না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান, তা হলেও সেই জ্ঞান লাভ করবেন।' যে সগুণ ব্রহ্ম ভক্তি-সাধকের উপাস্য 'তাঁকেই প্রার্থনা কর, আর কাঁদো। চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে। নির্মল জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখবে। ভক্তির আমি-রূপ আরশিতে সেই সগুণ ব্রহ্ম—আদ্যাশক্তি দর্শন করবে। ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, সেই প্রতিবিম্বকে ধরে সত্য সূর্যের দিকে যাও। সেই সগুণ ব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শোনেন, তাঁকেই বলো, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান দেবেন।'

কথামৃতের রাগভক্তি শুধু সগুণ নিরাকার কিংবা সাকার ভগবানকে লাভ করবার উপায় নয়, সে নির্গুণ ব্রহ্মদর্শনেরও পথ। এই ভাগবতী প্রীতি চিত্তের একমুখী বৃত্তি ব'লে তার

মধ্যে অন্য কোন ভাব কিংবা চিন্তার স্থান নেই। গভীর প্রেমে অন্যান্য বৃত্তির হয় অন্তর্ধান। আর প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে ব'য়ে যায় একটিমাত্র রসধারা। এ অবস্থায় সাধক হয় ভাবসমাধিস্থ। প্রেমাস্পদের কাছে প্রার্থনার ফলে ভাবসমাধির একবৃত্তিরও হয় অবসান—চিত্তের হয় নাশ—আর রসধারা মিশে যায় অসীম ব্রহ্মসমুদ্রে।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

—নদী যেমন কুলকুল করতে করতে তার নাম-রূপ হারিয়ে সমুদ্রে শেষ হয়ে যায়, তেমনি ক'রে মিশে যায় জ্ঞানী তার নাম-রূপ হারিয়ে সেই পরম পুরুষের সত্তার অতল তলে। ভাগবত ইচ্ছা কিংবা কৃপাই যে ব্রহ্মলাভের প্রশস্ত পথ, সে-কথা আচার্য শঙ্করও অস্বীকার করতে পারেননি। সেই কৃপা-লাভেরই উপায় রাগভক্তি।

যে পরম অনুরাগের ফলে সাধক তুরীয়ে লীন হন, সে অনুরাগ কিন্তু অমর। ব্রহ্মজ্ঞানে তা আত্মহারা হয় সত্য, কিন্তু সমাধির পর তা আবার ফিরে আসে। এ যেন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের একান্ত বিশ্রামাগার। এই পান্থনিবাস থেকে পথিক যে কোন মুহূর্তে পথের শেষে পৌঁছতে পারেন। আবার এখানে তিনি বিশ্রামও নিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'প্রহ্লাদ কখন দেখতেন 'সোঽহং' আবার কখন দাসভাবে থাকতেন। ভক্তি না নিলে কি নিয়ে থাকে? তাই সেব্য-সেবক ভাব আশ্রয় করতে হয়····· হরিরস আস্বাদন করবার জন্য।' "বিজ্ঞানী কেন ভক্তি নিয়ে থাকে? এর উত্তর যে 'আমি' যায় না ·····সমাধির অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের 'অহং' যায় না······হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না। 'আমি'-রূপ কুম্ভ। কুম্ভের ভিতরে বাহিরে জল, তবু কুম্ভ তো আছে। এইটি ভক্তের 'আমি'র স্বরূপ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে—আমি তুমি আছে—ততক্ষণ তুমি ঠাকুর আমি ভক্ত, এও আছে।" 'সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।' তাই রাগভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ।

রাগভক্তি স্বভাবতঃ তন্ময়, সর্বদা উদ্দীপনা। 'কি অবস্থাই গেছে! একটু সামান্যতেই উদ্দীপন হয়ে যেত। সুন্দরী পূজা করলাম। চোদ্দ বছরের মেয়ে। দেখলুম সাক্ষাৎ মা···। হঠাৎ নজরে প'ড়ল, একটি সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা, অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন······ রাখাল জপ করতে করতে বিড় বিড় ক'রত। আমি দেখে স্থির থাকতে পারতুম না—' প্রেমিক চায় প্রেমাস্পদকে স্মরণ করতে। সামান্য উত্তেজনার ফলেও ভক্তের মনে পড়ে তার ভগবানকে। সন্তানের চিন্তা মায়ের সমস্ত অন্তর অধিকার ক'রে থাকে, তাই অতি সামান্য কারণেই তার স্মৃতি আসে ভেসে। ভাগবত স্মরণের বেদীমূলে রাগভক্তির হয় আত্মাহুতি।

সে স্মরণের অবসান নেই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে রাগভক্তির জয়গান করেছেন তার পতন নেই। ভক্ত এমন কথা বলে না, 'ভাই, এত হবিষ্য করলাম, কি হ'ল?' খানদানী চাষার সাথে তিনি ভক্তের করেছেন তুলনা। বহু বছর ফসল না হলেও সে চাষ করে। নিরাশা কিংবা ব্যর্থতাবোধ রাগভক্তির নেই। যে প্রীতি আঘাতে টলে পড়ে, তার বিশেষ

কোন মূল্য নেই। যে প্রেম প্রেমাস্পদের প্রতীক্ষা করতে জানে না, সে নিরর্থক; রাগ-ভক্তি মরমী সাধকের স্বধর্ম—নিজস্ব প্রকৃতি। নিজের সত্তা কেউ ত্যাগ করতে পারে না। মানুষের পক্ষে তার ছায়া অতিক্রম করা অসম্ভব। সাধকের ভক্তি তার মানসিক শক্তির পরিচায়ক, দুর্বলতার নয়। অথচ ফল লাভ হ'ল না ব'লে ভক্তি ত্যাগ করা কিংবা সাধনা থেকে বিরত হওয়া চিত্ত-গ্রন্থির শিথিলতার লক্ষণ। ভক্তের ধৈর্য অটল। সহিষ্ণুতা, প্রতীক্ষার শক্তি, অদম্য অধ্যবসায়, অবিচলিত প্রীতি—এ সবই রাগভক্তির অন্তর্নিহিত সম্পদ্।

সেই ভক্তিরই জয়গান রাধারাণীর কণ্ঠে—

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে,
দেখা না হইত পরাণ গেলে,
এতেক সহিল অবলা ব'লে,
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে!

'ঈশ্বর আস্বাদ্য, ভক্ত আস্বাদক'—এই সম্বন্ধের ভিত্তির উপরই ভক্তের প্রীতি হয় প্রতিষ্ঠিত। সাংসারিক জীবনে মানুষ তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে যে সব সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তার কোন একটিকে অবলম্বন ক'রে গড়ে ওঠে এই ভাগবত ভালবাসা। অবশ্য ভগবানে আরোপিত হবার পর মানবীয় ভাব ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় এক দিব্য অনুভূতিতে। সে বোধের সাথে প্রাথমিক প্রীতির পার্থক্য অনেকখানি। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে ও কথামৃতে এই রাগভক্তিকে পাঁচটি রসে ভাগ করা হয়েছে—যথা: শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, শান্ত ভাব ঋষিদের ছিল। ভাগবত রস ছাড়া 'অন্য কিছু ভোগ করবার বাসনা তাদের ছিল না।' ইষ্টের মধ্যেই সমস্ত অভীষ্টের প্রাপ্তি এই রসের মূল উপাদান। দাস্যভাব হনুমানের—'রামের কাজ করবার সময় সিংহতুল্য।' এ রসের মধ্যে একদিকে আছে সেবা ও দীনতা এবং অন্যদিকে পরম বীর্য। এ সেবার দীনতা ক্লীবতা নয়, পরম পৌরুষ। সেই পৌরুষেরই জীবন্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ। স্ত্রীর ও মায়ের ভিতরেও সেবার ভাব, দাস্য ভাব আছে। "সখ্য বলতে বোঝায় বন্ধুর ভাব। 'এস, এস, কাছে বস'। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখনও এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, কখনও ঘাড়ে চড়ছে।" প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে সমত্ববোধই এই প্রেমের মূলকথা। এ ভালবাসা হয় সমানে সমানে। সামাজিক কোন নিয়ম, কৃত্রিমতা, ভদ্রতা কিংবা সৌজন্যের স্থান এ প্রীতির মধ্যে নেই—পারস্পরিক সেবা আছে। 'বাৎসল্য—যেমন যশোদার। স্ত্রীরও কতকটা থাকে। স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়। ছেলেটি পেট ভরে খেলে তবেই মা সন্তুষ্ট।' ভগবানকে বালগোপালরূপে সেবা করা—এই রসেরই প্রকাশ। 'মধুর—যেমন শ্রীমতীর, স্ত্রীরও মধুর ভাব। এ রসের ভিতর সকল ভাবই আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।' বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে সেজন্যই এ রসকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে, যদিও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ঈশ্বর-লাভের পথ হিসাবে প্রত্যেকটি রসই সমান কার্যকর এবং প্রয়োজনীয়।

প্রত্যেকটি যুগের একটি নিজস্ব আধ্যাত্মিক প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন মেটাতেই ভগবানের আবির্ভাব। তাই রাগভক্তির পঞ্চরসের সাধনা ও তন্ত্রমতে সমস্ত আরাধনা করেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাবের পূজারী। শাস্ত্র যখন তাঁকে কোন তত্ত্ব শোনায়নি, গুরু যখন তাঁর কানে কোন মন্ত্র দেননি, তখন মহামায়াই মা হয়ে তাঁকে ঢেকে রেখেছিলেন

নিজের স্নেহের আঁচলে। সেই মায়ের ইচ্ছাতেই ভৈরবী ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন, সেই স্নেহময়ীর আদেশেই তাঁর বেদান্ত-সাধন। এবার ভগবানের হাসি ও কান্না, মান ও অভিমান, পূজা ও প্রার্থনা—সবই চিন্ময়ী মাতৃপ্রতিমাকে ঘিরে। 'যোগীরা যোগ ক'রে যা পেয়েছে, জ্ঞানীরা বেদান্ত সাধন ক'রে যা জেনেছে'—সে সবই তো ৺ভবতারিণী সন্তানকে দিয়েছেন নিজের হাতে, তাঁর লৌকিক দীক্ষা নেবার বহু আগে। তাই তো সন্তানের রাগভক্তি এত মাতৃমুখী। 'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি—তাঁকেই মা ব'লে ডাকা হচ্ছে। মা বড় ভালবাসার জিনিস কিনা।' এই ভক্তির ফলেই তত্ত্বময়ী হয়েছেন স্নেহময়ী জননী; আবার স্নেহরূপিণী হয়েছেন পরমা প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি। ভক্তি তত্ত্বে, এবং তত্ত্ব ভক্তিতে হয়েছে রূপান্তরিত। 'মা, মা' বলতে বলতে তাপস হয়েছেন সমাধিস্থ। আবার সমাধি থেকে নেমে এসে বলছেন, 'আমাকে অন্ধকারে কে হাত ধরে নিয়ে যাবে? আমি যে বালক···বালকের মা চাই না?'

বালকের মায়ের প্রতি এই আকর্ষণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। একই রক্তমাংসে গড়া মা ও ছেলে। 'মায়ের সত্তা আমার মধ্যে আছে, তাইতো মায়ের প্রতি অত টান।' যে দিব্য স্নেহ জগন্মাতার স্বরূপ, তারই প্রকাশ ভক্ত সাধক। দুইটি সত্তার এই একত্ববোধ না হ'লে রাগভক্তি শক্তি লাভ করে না—প্রেম নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভক্তি কর্তব্যবোধ নয়। হিতোপদেশ দিয়ে কাউকে প্রেমিক করা যায় না। বিশ্বপ্রাণের সাথে যদি মানবহৃদয় একই সুরে বাঁধা না থাকে, তবে তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি স্থাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ভক্ত ও ভগবানের এই নিবিড় প্রাণের সম্বন্ধ শুধু মাতৃপূজাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায় না। 'কথামৃতে' তা গোপীপ্রেমেও মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই প্রীতি রাগভক্তিকে দিয়েছে এক অপরূপ রূপ। তারই বন্দনা শ্রীমদ্‌ভাগবতে:

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥

'ভক্ত যত সহজে গোপিকানন্দনকে লাভ করেন, তত স্বল্পায়াসে যোগী কিংবা জ্ঞানী তাঁকে পান না।' সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের গুণগান করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন সমাধিস্থ—'সখি সে বন কতদূর, যে বনে আমার শ্যামসুন্দর? আর চলিতে যে নারি···।'

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস*

রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত আমার জীবনের সম্বন্ধ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১৯০৯ খৃঃ মথুরায় চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করি। বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে যখন রামকৃষ্ণ আশ্রম ছিল ও নাদু মহারাজ ওখানকার অধ্যক্ষ, তখন আমার যাতায়াত আরম্ভ; ১৯১২।১৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহিমবাবুর সহিত আশ্রমে দেখা হয়। তিনি বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন হইতে মহিমবাবু মথুরায় আমার বাড়ীতে শ্রীযুক্ত প্রাণেশকুমার ব্রহ্মচারীর সহিত যাতায়াত করিতে থাকেন; কোন কোন সময় দুই তিন মাসও আমার বাড়ীতে কাটাইতেন।

১৯১৪ খৃঃ হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলা হয়, মহিমবাবু সহ আমরা তিনজন সেখানে গেলাম। যাওয়ামাত্রই শ্রদ্ধেয় স্বামী কল্যাণানন্দ (কনখল আশ্রমের অধ্যক্ষ) আমাকে হাসপাতালে কলেরা-রোগীদের চিকিৎসায় নিযুক্ত করিলেন। আমি দিবারাত্র রোগীদের সেবা করিতে থাকি। মহিমবাবু আমাকে এত স্নেহ করিতেন যে, আমি কি খাইতাম না খাইতাম, আমার ঘুম হইল কি না, ইহা লইয়া সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। এইভাবে প্রায় দেড় মাস কাটিয়া গেল।

একদিন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহার বাড়ীতে আত্মীয়দের মধ্যে তিনজনের কলেরা হইয়াছে; তিনি রোগীদের আমার চিকিৎসায় রাখিলেন ও ভগবৎকৃপায় ৪।৫ দিনের মধ্যে তাঁহারা সকলেই আরোগ্যলাভ করিলেন। ইহার পূর্বে ব্রহ্মকুণ্ড স্নানের দিন আমি সাধুদের সহিত স্নান করিতে যাইতেছি, লক্ষ লক্ষ মানুষের স্রোত চলিতেছে, কি জন্য জানি না, আমি পথহারা ও সঙ্গীহারা হইয়া পড়িলাম। জনস্রোতে অনেক মহিলা ও শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত সেই দিন হইয়াছিল; আমিও ভয়ে ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম।

একটি দিব্য ইঙ্গিত দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না; মনে ভাবিলাম যে, ইহা ভ্রান্তি-মাত্র। যাহা হউক রৌদ্রের তাপে স্নান করিয়া কনখলে ফিরিলাম। ইহার এক মাসের মধ্যেই কাশিমবাজারের মহারাজা আমাকে ডাকাইলেন। রোগীরা আরোগ্যলাভ করিলে পর মহারাজা আমাকে তাঁহার সহিত বৃন্দাবন পর্যন্ত যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি স্বামী কল্যাণানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেক পূর্বেই মেলা ভাঙিয়া গিয়াছিল ও হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা খুবই কম, এজন্য তিনি আমাকে যাইতে অনুমতি দিলেন; আমি মথুরায় ফিরিয়া আসিলাম।

বৃন্দাবনে মহারাজা আমাকে বাংলা দেশে গেলে কাশিমবাজার যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ঐ বৎসর কয়েক মাস পরে আশ্বিন মাসে আমি কাশিমবাজার গেলাম ও মহারাজার অতিথি হইয়া তিন দিন রহিলাম। একদিন বেলা ৯টা কি ১০টার সময় মহারাজার বৈঠক-খানায় তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। ঐ সময় দেখিলাম, একজন কালো দাড়ি-ওয়ালা সাধু আমার পূর্বেই আসিয়া বসিয়া আছেন। তখন ডিগ্রি পাওয়ার জন্য

---

* বোম্বাইএর লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরলোকগত Dr. A. C. Das.

আমার আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। অর্থাভাবে যাইতে পারি নাই। মহারাজাকে আমি অর্থ সাহায্যের জন্য প্রস্তাব করিলে, সাধুটি মহারাজাকে বলিলেন, 'ছোকরা এখানেই বিদ্যালাভ করিতে পারে, কি জন্য বহু টাকা ব্যয় করিয়া আমেরিকা যাইবে?' তাঁহার উক্তি আমার অত্যন্ত বিরক্তিজনক মনে হইল। সাধু বলিয়া আমি তাঁহার কথার উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ পরে তিনি চলিয়া গেলেন। মহারাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সাধুর পরিচয় জানিতে পারিলাম, তাঁহার নাম স্বামী অখণ্ডানন্দ, নিকটেই সারগাছিতে তাঁহার আশ্রম আছে। জানিতাম না যে, সারগাছিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম আছে।

আমি ২।৩ দিন পরে কাশিমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিলাম। কয়েকমাস পরে মহারাজা আমাকে এক হাজার টাকা মথুরায় পাঠাইয়া দিলেন। তখন হরিদ্বারে দৃষ্ট ইঙ্গিতের মর্ম কিছু বুঝিতে পারিলাম।

সেই বৎসর বা পর বৎসর শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ) পূঃ যোগীন-মা সহ বৃন্দাবনে আসিলেন। সেখান হইতে মথুরায় আসিয়া তাঁহারা আমার বাড়ীতে কয়েকদিন কাটাইলেন। কিছুকাল পূর্ব হইতে ব্রহ্মচারী কানাই মহারাজ (পরে স্বামী অনন্তানন্দ) আমার এখানে আসা-যাওয়া করিতেন ও আমার বাড়ীতে পনর দিন এক মাস বাস করিতেন, আবার মাধুকরী করিয়া আসিয়া হয়তো দু-এক মাস থাকিতেন। পূঃ শরৎ মহারাজ আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন শুনিয়া তিনিও আসিলেন। সে সময় আমার সহধর্মিণী মথুরায় প্রথম আসিয়াছেন। তৎপূর্বে আমি একা থাকিতাম। কানাই মহারাজ ও আমি স্বামী বিবেকানন্দের যাবতীয় পুস্তক (works) ইত্যাদি পড়িতাম ও রাত্রে ছাদের উপর বসিয়া ধ্যান করিতাম।

পূঃ শরৎ মহারাজ ও যোগীন-মার গভীর ধ্যান দেখিয়া আমার খুবই ইচ্ছা হইত, এই মহাপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা লওয়া উচিত। একদিন সাহস করিয়া শরৎ মহারাজকে বলিলাম, 'আমাকে দীক্ষা দিন।' তিনি উত্তর দিলেন, 'সবে বিবাহ করিয়াছ, যখন সময় আসিবে, দীক্ষা লইবে।' আমি হতাশ হইয়া এ বিষয়ে আর কোন কথা কাহাকেও বলি নাই।

তাহার পর বহু বৎসর কাটিয়া গেল, বহু সাধুর সঙ্গ ও সেবা করিলাম। এমন কি ১৯২৭ খৃঃ মহাপুরুষ মহারাজ যখন বোম্বাই আসিলেন ও জ্বরে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন, তখন আমার চিকিৎসায় রহিলেন। আমি দুইবেলা তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। তিনি জ্বরাবস্থায় আমাকে জড়াইয়া ধরিতেন, আমার মনে হইত, আমার শরীরের মধ্যে যেন বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবেশ করিতেছে। সহস্রাধিক ব্যক্তিকে তিনি এখানে দীক্ষা দিলেন; কিন্তু আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না, আমাকে দীক্ষা দিন। তিনি বোম্বাই হইতে কলিকাতা ফিরিবার দিন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়াই আমার স্কন্ধে ভর করিয়া তাঁহার পূর্বনির্দিষ্ট প্রথম শ্রেণীর 'কুপে' পর্যন্ত প্রায় ১০ মিনিট কাল চলিলেন। আমি বাক্যে বর্ণনা করিতে পারি না, আমার মধ্যে কি অনুভূতি হইতেছিল, আমি যেন আত্মহারা হইতেছিলাম, একটা অপ্রাকৃত শক্তি যেন আমাকে অভিভূত করিতেছিল। সময় সময় মনে হইতেছিল, কখন আমাকে ছাড়িয়া দিবেন। যাহা হউক আমি মনে সাহস আনিয়া দশ মিনিট এই অবস্থায়

কাটাইয়া তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর গাড়ী পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলাম ও রক্ষা পাইলাম। কিন্তু শত শত নরনারী তাঁহার দর্শনের জন্য স্টেশনে ভিড় করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি আমার একটুও লক্ষ্য ছিল না, কে কখন আসিয়াছে বা গিয়াছে তাহার দিকেও হুঁশ ছিল না। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল, স্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া গেল; আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছি প্ল্যাটফর্মে, তখন একজন সাধু বলিলেন, 'আপনি যাইবেন না, দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছেন ? চলুন।' তাঁহার অনুসরণ করিয়া নিজের গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম; সেই নেশা কাটাইতে আমার তিন দিন লাগিয়াছিল।

সুখে দুঃখে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ১৯৩৩ খৃঃ আমেরিকা গেলাম, নিউইয়র্কে স্বামী নিখিলানন্দের নিকট কয়েকমাস থাকিলাম। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, 'আপনার শ্রদ্ধাভক্তি আছে, তবে কেন দীক্ষা নেন না?' আমি বলিলাম, 'সময় হইলে দীক্ষা হইবে।' যাহা হউক ১৯৩৪ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে আমি বোম্বাই ফিরিলাম। নভেম্বর মাসে এক রাত্রে বোম্বাই মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বানন্দ আমাকে টেলিফোনে বলিলেন, 'বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী আসিয়াছেন, আপনি দেখা করিতে আসিবেন।'

পরদিন মঙ্গলবার প্রত্যুষে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে গেলাম। গিয়া দেখিলাম, মহারাজ পশ্চিমের বারান্দায় বসিয়া রৌদ্র পোহাইতেছেন। নিকটে গিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, 'কি হে অবিনাশবাবু যে!' আমি বলিলাম, 'মহারাজ, আপনি কি আমাকে পূর্বে কখনও দেখিয়াছেন, আমার তো মনে পড়ে না যে, আমি আপনাকে দেখিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'মনে করিয়া দেখ ১৯১৫ খৃঃ কাশিমবাজারে মহারাজার বৈঠকখানায় আমাকে দেখিয়াছিলে কি না।' তখন মনে পড়িল—সেই সন্ন্যাসীর কথা। মহারাজ আমাকে বসিতে বলিলেন। এক পাশে একটা বেঞ্চ ছিল, আমি বসিলাম। তিনি একটু অপেক্ষা করিয়াই বলিলেন, 'দেখ অবিনাশ, তোমার সময় হইয়াছে, বয়সও হইয়াছে, এখন দীক্ষা নাও।' আমি বলিলাম, 'আপনি কি করিয়া জানিলেন, আমার দীক্ষা নেওয়ার সময় হইয়াছে?' তাহার কোন উত্তর না দিয়া তিনি স্বামী বিশ্বানন্দকে ডাকিলেন ও পঞ্জিকা আনিতে আদেশ করিলেন।

পঞ্জিকা দেখিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, 'শুক্রবার প্রাতে ৮টার সময় গাড়ী পাঠাইবে, আমি তোমার বাড়ীতে গিয়া দীক্ষা দিব।' আমার স্ত্রী প্রার্থনা করিলেন, 'মহারাজ আমাকেও দীক্ষা দিতে হইবে।' তিনি সম্মত হইলেন। শুক্রবার প্রাতে গাড়ী পাঠাইলাম। ১০টার মধ্যে স্বামী বিশ্বানন্দ, অখিলানন্দ ও আরও ৪।৫ জন সাধুসঙ্গে আমার বাড়ী আসিয়া মহারাজ আমাদিগকে দীক্ষা দিলেন। তাঁহার দীক্ষার অতিশয় কঠিন নিয়ম ছিল। দীক্ষার পর সকলেই আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিলেন। সন্ধ্যার পর সকলকে মঠে পৌঁছাইয়া দিলাম।

মহারাজ যতদিন বোম্বাই আশ্রমে ছিলেন, ২।৩ দিন অন্তরই এক একদিন আমার বাড়ীতে আসিতেন। তিনি শুক্তো ও পাটিসাপটা পিঠা খাইতে ভালবাসিতেন; এমন কি বেলুড়ে ও সারগাছিতে গিয়াও লিখিতেন, শুক্তো যেন এখনও মুখে লাগিয়া আছে। মহারাজ প্রায়ই পত্র লিখিতেন, কিন্তু জীবনে আর তাঁহার সহিত দেখা হইল না।

কাশ্মীর ও ক্ষীরভবানী

স্বামী শান্তিনাথানন্দ

নূতন দেশ দেখার আনন্দ মানুষের সহজাত। নূতন নূতন দেশের সহিত পরিচিতি, নূতন ভাষা, নূতন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, স্থানে স্থানে তীর্থমাহাত্ম্য যে অনুপ্রেরণা যোগায়, তা দৈনন্দিন একটানা জীবনের বিরস কর্মধারাকে সরসতায় সঞ্জীবিত করে। ঐতিহাসিক পায় নানা তথ্য, কবি দেখে চিরসুন্দরের লীলায়িত তুলিকায় অপরূপ রূপাবেশ, সাধক সন্ধান পায় যুগ-যুগান্তের ভাবাবেগ, প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে, মনে মনে ভাবে—কি সুন্দর! তাই বোধ হয় নূতন দেশভ্রমণের—তীর্থভ্রমণের সুযোগ মানুষ লুব্ধচিত্তে গ্রহণ করে।

আমার এক পুরাতন বন্ধু যখন এসে চুপি চুপি সংবাদটি দিলেন, কাশ্মীর যাবার একটি সুযোগ এসেছে, তিনি যেতে মনস্থ করেছেন এবং আমাকেও সঙ্গী হ'তে অনুরোধ করছেন, তখন আনন্দে আমার হৃদয় নেচে উঠল।

ভূস্বর্গ কাশ্মীর। বহু শতাব্দীর অতীত ইতিহাসের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি সাক্ষ্যস্বরূপ এখনও বর্তমান, অশোকের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের প্রচার, কনিষ্কের প্রভাব, শিব-উপাসনার কেন্দ্র, মোগলদিগের প্রমোদক্ষেত্র, স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য শিষ্য ও বন্ধুগণ—সিস্টার নিবেদিতা, মিস্ ম্যাক্‌লাউড, মিসেস্ ওলিবুল প্রভৃতি সহ মাসাধিক কাল এখানে অবস্থান, সৌন্দর্য-পিপাসু বহু বৈদেশিকের এই ভূস্বর্গে আগমন, অবশেষে পাকিস্তানের রাজনৈতিক কাড়াকাড়ি—এইসব চিন্তাধারা যুগপৎ মনকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। অন্তরে যেন কাশ্মীর-চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। আস্তে আস্তে আরও তিনজন সহযাত্রীর আবির্ভাবে আমরা পাঁচজন কাশ্মীর-যাত্রার প্রস্তুতির পর্বে যোগ দিলাম।

যাত্রার দিন ২০শে মে, ১৯৬১। 'ভারত-দর্শন' স্পেশাল ট্রেন। যাঁর পরিচালনায় আমাদের এই যাত্রা, তিনি নিরলস অমায়িক ও আশাবাদী। এই যাত্রা তাঁর একটি আদর্শের রূপায়ণ। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ভারতবাসী ভারতবর্ষকে জানবে দেখবে আস্বাদন করবে, পরস্পর যে যোগসূত্রে ভারতের ঐতিহ্য গ্রথিত, তার সূত্রটি আবিষ্কার করবে—যে সাধারণ মূর্ছনাটি ভারতবর্ষের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত; তাকে জানতে হবে, তবেই হবে 'ভারতদর্শন', তবেই হবে যাত্রার উদ্দেশ্য সফল।

রাত্রি ১১টায় ট্রেন ছাড়বে। হাওড় স্টেশনে পৌঁছলাম রাত্রি ৯টায়। পরিচয়পত্রাদি সংগ্রহ ক'রে বিছানাপত্র নিয়ে আস্তে আস্তে ট্রেনে উঠলাম। বিভিন্ন স্থান থেকে যাত্রীরা সমবেত হয়েছেন, কেউ মুর্শিদাবাদ, কেউ মালদহ, কেউ জলপাইগুড়ি, কেউ হুগলি, কেউ মেদিনীপুর, আর কলকাতা তো আছেই। বহু ব্যষ্টির সমন্বয়ে সমষ্টিগত এক বিরাট পরিবার, অপূর্ব তার সাজসজ্জা, বিচিত্র তার ভাষা, অননুভূত তার পরিবেশ। কিন্তু বৈচিত্র্যের মাঝে একটি সুরের অনুরণন যা প্রতিটি প্রাণের নিবিড়তম স্থানে বাজছে, মহৎ যাত্রা সফল হউক: 'শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।'

বিদায়-কোলাহলের মধ্যে ট্রেন ছাড়ল। শত শত হস্ত আন্দোলিত হ'ল, শত শত রুমাল বিদায়ের সঙ্কেত জানাল। আমরা শ্রীদুর্গা স্মরণ ক'রে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম। সমিতির ব্যবস্থা ভালই। ট্রেনে প্রত্যেকের জন্য একটি ক'রে বার্থ। দুই সীটের মাঝে টুল দেওয়া রয়েছে, তাতেও একজনের শয়নের ব্যবস্থা। পাচক চাকর, রান্নার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস, কাঠ কয়লা ইত্যাদি সঙ্গেই চলেছে। অনেক দূরের পথ। মাঝে মাঝে এমন জায়গায় ট্রেন থামাবার ব্যবস্থা হয়েছে, যাতে স্টেশনে রান্না ক'রে সকলকে খাওয়ানো যায় এবং রাত্রের খাবারও সঙ্গে দেওয়া যায়। গাড়ী প্রথম দিন ধানবাদে, তারপর দিন বারাণসী, তারপর মোরাদাবাদ ও শেষদিন পাঠানকোটে থামবে। সেখানে আগে থেকেই বাস-এর ব্যবস্থা করা আছে, যাতে আমরা ৭।৮ ঘণ্টা বিরতির মধ্যে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে আসতে পারি। ইতিমধ্যে আহার্যও প্রস্তুত হয়ে যাবে।

* * *

ট্রেন চলার একটানা দোলনের মাঝে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, ভোরের আলোর সঙ্গে ঘুম ভাঙতে দেখলাম, বাংলার শ্যামল ক্রোড় হ'তে অনেক দূরে এসেছি। দু-ধারে টেলিগ্রাফের থামগুলি বিপরীত দিকে ছুটে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে; বিস্তীর্ণ মাঠগুলিও যেন ঘুরপাক খেতে খেতে দূরে সরে চলেছে। মাঝে মাঝে খনি থেকে সদ্যোত্থিত কয়লার স্তূপের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হচ্ছে। খানিক পরেই ট্রেন ধানবাদ এসে গেল। এখানে কোন ভ্রমণসূচী নেই; শুধু স্নানাহার ও বিশ্রাম। সন্ধ্যা ৬টায় গাড়ী ছেড়ে দিল।

পরদিন শিবক্ষেত্র বারাণসী। পতিত-পাবনী সুরধুনী শত সহস্র মানবমন শুচিশুদ্ধ ক'রে যুগযুগ ধরে প্রবাহিতা। ঐ মণিকর্ণিকার ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, কেদার-ঘাট, ঐ অসংখ্য স্নানরত পুণ্যার্থীর দল। ঐ শত শত দেব-দেউলে ঘণ্টাধ্বনি—এ যেন চিরনূতন! যত বারই দেখি, পুরাতন হয় না। মনে পড়ে যায়, সেই পুরাতন কথা। শিবক্ষেত্র কাশীধামে অন্তে জীব শিবলোক প্রাপ্ত হয়; আর পুনর্জন্ম হয় না।

মা ভবানী ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা সকলেই যদি মুক্ত হয়ে যায়, তবে সৃষ্টি চলবে কেমন ক'রে?' ভোলানাথ উত্তর দিলেন, 'সকলেই মুক্তি পায় না, যার বিশ্বাস আছে সেই পায়।' সত্য কিনা দেখাবার জন্য ভোলানাথ মণিকর্ণিকার ঘাটে মৃতবৎ শুয়ে রইলেন। আর মা মৃত স্বামীর মাথা কোলে রেখে কাঁদছেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করছে, 'মা, কাঁদছ কেন?' 'যে নিষ্পাপ সেই আমার স্বামীর মৃতদেহের সৎকার করতে পারবে আর কেউ নয়।'

কারও সাহস নেই। মনে প্রাণে নিষ্পাপ কে? সকাল দুপুর অতিক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা এল। এক মাতাল সন্ধ্যার আধা-অন্ধকারে সেই পথে উপস্থিত। প্রাণখোলা তার জিজ্ঞাসা 'কে মা, সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে কাঁদছিস কেন?'

'বাবা, আমার স্বামীর মৃতদেহের সৎকারের লোক পাচ্ছি না।'

'তোর ছেলে থাকতে ভাবনা কি?'

মা বললেন, 'বাবা, কিন্তু যে জীবনে কোন পাপ করেনি, সেই আমার স্বামীর দেহ স্পর্শ করতে পারবে।'

'এই কথা? আচ্ছা একটু দাঁড়া।' এই ব'লে মাতাল দ্রুত গঙ্গাগর্ভে নেমে গেল, 'পতিতপাবনি গঙ্গে' ব'লে ডুব দিলে। তাড়া-তাড়ি ফিরে এসে বললে, 'এইবার দে।' কিন্তু

কে কোথায়! পরীক্ষা হয়ে গেছে। যার এই বিশ্বাস একবার গঙ্গাস্পর্শে কোটিজন্মের পাপক্ষয় হয়—এক জন্মের পাপ তো কোন্ ছার—যার এই 'পাঁচসিকে-পাঁচআনা বিশ্বাস' তারই হয়।

সারনাথ, বিড়লা-মন্দির প্রভৃতি দর্শনের জন্য নির্দিষ্ট বাস সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ক-জন গঙ্গাস্নান ৺বিশ্বনাথ দর্শন ও আমাদের আশ্রমে প্রসাদ পাওয়া স্থির ক'রে বাস ছেড়ে দিলাম। আশ্রম থেকে ফিরলাম বেলা ৪টা। ৫॥ টায় আমাদের ট্রেন ছাড়ল।

বেরিলী, মোরাদাবাদ ও জলন্ধর হয়ে ট্রেন ২৪শে পাঠানকোটে পৌঁছল। পরদিন ভোরে শ্রীনগরের বাস ছাড়বে। পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর ২৬৭ মাইল। সাধারণতঃ বানিহালে রাত্রিটা অপেক্ষা ক'রে সকালে আবার শ্রীনগর অভিমুখে যাওয়া হয়। কিন্তু আমাদের বিশেষ অনুমতি নেওয়ার ফলে সেই রাত্রেই শ্রীনগর পৌঁছনো স্থির হ'ল। দূর রাস্তা, পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে যেতে হয়, অন্যদিকে গভীর খাদ। রাত্রে চালকের হিসাবের অল্প ভুল হ'লে অথবা ক্ষণমাত্র তন্দ্রাভিভূত হ'লে কতগুলি অমূল্য প্রাণ কালের অতলে তলিয়ে যাবে! তাই এই সাবধানতা।

পূর্বনির্ধারিত সূচী-অনুযায়ী বাস ছাড়ল সকাল ৮টায়। গরমের মধ্যেও মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। কখন পাহাড়, কখন সমতলভূমির মধ্য দিয়ে আমরা জম্মু এসে পৌঁছলাম বেলা এগারটায়। জম্মু বেশ গরম। নূতন নূতন দৃশ্য, আবার পুরাতন দৃশ্যের পুনরাবির্ভাব—এই রকম ক'রে বানিহাল এসে পৌঁছলাম বৈকাল সাড়ে পাঁচটায়। বানিহাল পাস একটি দুমাইল-লম্বা টানেল। বাইশ মাইল পথকে সংক্ষিপ্ত ক'রে দু-মাইলে নিয়ে আসা হয়েছে।

দু-পাশের অন্ধকার চিরে দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে সারাদিনের ক্লান্তি যে কখন চোখের পাতায় নিদ্রারূপ নিয়েছে, জানতে পারিনি। মাঝে মাঝে বাসের ঝাঁকানি খেয়ে তন্দ্রা কেটে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই আচ্ছন্ন। তন্দ্রা ভাঙলো শ্রীনগরে এসে, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। নীল আবছা আলোয় এ যেন স্বপ্নের দেশে, তন্দ্রার রাজত্বে কোন্ অলকাপুরীতে এসে পৌঁছলাম! 'নামো, নামো, এসে গেছি' রব। সামনে সরকারী যুব হোস্টেল (Government Youth Hostel) পাঁচ শ' জন থাকবার মতো বাড়ী।

আমাদের কয়েকজনের সেখানে থাকা সুবিধা মনে হ'ল না। পরদিন অনুসন্ধান ক'রে নারায়ণ-মঠে এসে উঠলাম। উদ্দেশ্য দুটি। প্রথম, ৺অমরনাথ দর্শন হয় কিনা, তার ব্যবস্থা করা। কাশীধাম হ'তে আভাস নিয়ে এসেছিলাম, যদিও গুরুপূর্ণিমা ও শ্রাবণীপূর্ণিমা—এই দুই দিনই যাত্রীদের যাত্রার অনুকূল, তবু তার আগে ঘোড়া ও গাইডের সাহায্যে যাত্রা চলে, অনেকে গেছেন। দ্বিতীয়, নারায়ণ-মঠে নির্জনতা এবং সাধুসঙ্গ আছে, দুটিই লোভনীয় এবং বাঞ্ছনীয়। টুরিস্ট-অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম, এই বৎসর দেরিতে বরফ পড়ায় রাস্তাঘাট এখনও বরফে ঢাকা, আর সরকার হ'তে যাত্রার অনুমতি পাওয়া যাবে না।

* * *

পারসী কবিদের 'বেহেস্ত' এই কাশ্মীর মালভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় আশী মাইল ও প্রস্থে প্রায় পঁচিশ মাইল বিস্তৃত। পিরপঞ্জলের উত্তুঙ্গ শাখা (প্রায় ১০,০০০ ফুট উচ্চে বানিহাল পাস দিয়ে অতিক্রম করতে হয়) কাশ্মীরকে ভারত হ'তে

বিচ্ছিন্ন করেছে। উত্তরে ও পূর্বে চির-তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের শৃঙ্গশ্রেণী, এইখানে নাম নাঙ্গা পর্বত (২৬,৬৬০ ফুট)। পর্বতের অপর পার্শ্বে তিব্বত, চীন ও সোভিয়েট তুর্কীস্থান। উপত্যকার মধ্য দিয়ে ঝিলাম অলস গতিতে এঁকেবেঁকে চলেছে পাকিস্তানের দিকে।

রাজধানী শ্রীনগর। অনেকের মতে ডাল হ্রদের পাশে অপূর্ব সুষমাময় এই ভূখণ্ডটি পাশ্চাত্যের ভেনিসের সঙ্গে তুলনীয়। ঝিলাম নদীতে নয়টি সেতু শ্রীনগরের উভয় তীরকে সংযুক্ত করেছে। জলে অসংখ্য সুসজ্জিত নৌগৃহ বা 'হাউসবোট' এবং ছোট ছোট নৌকা বা শিকারা টুরিস্টদের আহ্বান জানাচ্ছে।

এ দেশের হাতের কাজ ও সূচীশিল্প অপূর্ব। লক্ষ লক্ষ টাকার বস্ত্রশিল্প ও কাষ্ঠশিল্প প্রতি বৎসর বিক্রয় হয়। মাছ ও দুধ প্রচুর। কাশ্মীর সরকার কাশ্মীরের নানাবিধ উৎপন্ন দ্রব্য এনে জমায়েৎ করেছেন সরকারী বিক্রয়-কেন্দ্রে (Government Emporium)। উইলোর ক্রিকেট ব্যাট, দর্শনীয় নানাবিধ কাঠের কাজ, কাশ্মীর সিল্ক, পশমের উপর সূচীশিল্প, কার্পেট, জাফরান—হরেক রকমের খাঁটি মধু এখানে পাওয়া যাবে।

কাশ্মীরের প্রধান ফসল হ'ল, মাঠে ধান আর গাছে ফল—আপেল, আখরোট, খোবানি নাসপাতি, সফেদা, মিষ্টিডুমুর, চেরী প্রভৃতি। এ ছাড়া যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে হয় বাইরে থেকে। কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দু, ডোগরা রাজপুত—মহারাজ করণ সিং। অধিবাসীরা বেশীর ভাগ মুসলমান।

করণ সিংহের পিতা হরি সিং বস্তুতঃ কাশ্মীরের শেষ স্বাধীন রাজা। ১৯৪৭ খৃঃ যখন হানাদারেরা হাজারে হাজারে পাকিস্তানের যোগসাজসে কাশ্মীরে ঢুকে প'ড়ল, হাতে শুধু কুড়ুল কাটারি ছোরা বর্শা নয়, বন্দুক ষ্টেনগান্ হ্যাণ্ডগ্রেনেড প্রভৃতি আধুনিকতম হাতিয়ার নিয়ে, তখন মহারাজ হরিসিংহের সাধ্য ছিল না তাদের বাধা দেবার। কারণ কাশ্মীরের সৈন্যসংখ্যা সামান্য। তাঁরা আপদে বিপদে বৃটিশ সরকারের উপর নির্ভর ক'রে এসেছেন। আবার তাঁর সৈন্যদের অর্ধেক ছিল মুসলমান। বাধা দেওয়া দূরে থাক, কেউ কেউ হানাদারদের দলেই ভিড়ে গেল। কাশ্মীরের রাজ-সেনাপতি রাজেন্দ্র সিং বীরের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। গ্রাম লুঠ ক'রে শস্যক্ষেত জ্বালিয়ে হানাদারদের দল এগিয়ে আসছে বিনা বাধায়, শ্রীনগর থেকে মাত্র ৬৫ মাইল—উরিতে এসে পৌঁছেছে। মহারাজ হরি সিং নিজ হাতে পত্র রচনা করলেন কাশ্মীরের ভারতভুক্তির জন্য। নূতন ভারত সরকারের কাছে আবেদন 'কাশ্মীরকে রক্ষা করুন'। তারিখটাও মনে পড়ে ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৭।

তারপর ভারত সরকারের সাহায্যে হানাদার দলকে তাড়ানো হ'ল। বহু সৈন্য হতাহত হ'ল। ক্যাপ্টেন রঞ্জিত রায়, ক্যাপ্টেন লাওনেল, প্রতীপ সেন প্রভৃতি বহু বীর প্রাণ দিলেন। তাঁদের রক্তে কাশ্মীরের 'আজাদী' টিকে রইল। আজ পাড়াগাঁয়ের চাষীও তাঁদের স্মৃতি-ফলকের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'ওহি লোক হামকো বঁচায়া।' যাক, সে সব কথা এখনও ইতিহাসের পর্যায়ে পড়েনি। ঘটনা শেষ হলেও ক্ষত এখনও দগ্‌দগে রয়েছে। কাশ্মীরের পথে ঘাটে তা চোখে পড়বে।

শ্রীনগরের ডালহ্রদ এককথায় অপূর্ব। প্রকৃতিদেবী তাঁর সমস্ত সুষমা যেন এখানে ঢেলে দিয়েছেন। পাহাড়ের কোলে ডালের জলে যখন হাজার হাজার পদ্ম ফুটে থাকে,

তখন তার শোভা সত্যই অতুলনীয়। শত শত হাউসবোট অপেক্ষমাণ, শত শত শিকারা সুন্দর মখমলের গদী ও আস্তরণ নিয়ে যাত্রীদের জন্য প্রস্তুত। নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের পসরা নিয়ে ছোট ছোট নৌকা এক বোট থেকে অন্য বোটে যাচ্ছে। এখানেই নেহরু বাগ, করণ বাগ। পার্ক আর বাগানবাড়ী, রাত্রে রোশনাই-এর বাহার। জলের উপর শেওলা জমে জমে মাটি হয়ে গিয়ে ভাসমান বাগানে পরিণত হয়েছে। শ্রীনগরের ডালহ্রদ টুরিস্টদের একটি বিশেষ আকর্ষণের স্থান।

ডালহ্রদের পাশ দিয়ে চমৎকার রাস্তা চলে গেছে। যেতে যেতেই মোগল-উদ্যানগুলি চোখে পড়বে। শালিমার, নিশাতবাগ, চশমা-শাহি প্রভৃতি পাঁচটি বাগান নিয়ে মোগল উদ্যান—ফুলে ফলে সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। পাহাড়ে ঝরনাগুলিকে কাজে লাগিয়ে কৃত্রিম জলাশয় ও ফোয়ারা করা হয়েছে। তার পাশে পাশে দেশী ও বিলাতী ফুলের সমারোহ। আর নানা রকম ফলের গাছ তো আছেই।

কাছাকাছি দুটি পাহাড় রয়েছে। শঙ্কর টিকলী—শিবের মন্দির, প্রায় দেড় হাজার ফুট উঁচু। আর 'হরিপর্বত'। গতবৎসর শঙ্কর টিকলীতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দেখলাম।

শ্রীনগর ছাড়া পহেলগাঁও ও গুলমার্গ দুটি পার্বত্য শহর দর্শনীয়। ভেরীনাগ—ঝিলামের উৎপত্তি, অনন্তনাগ, কোকরনাগ, আচ্ছাবল প্রভৃতি দর্শকের আকর্ষণ-কেন্দ্র।

শ্রীনগরে তৃতীয় দিনে, আমরা সকলে পহেলগাঁও-এ উপস্থিত হলাম। বাস এখানে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করবে। আমরা ৫।৬ জন একটি অনুচ্চ পাহাড়ে উঠে তৃণাসন অধিকার ক'রে বসলাম। চিন্তার স্রোত বয়ে চ'লল:

এই স্থান হতেই অমরনাথ-যাত্রার পথ, মাত্র ২৭ মাইল। কিছুদূরে চন্দনবাড়ী। এইখানেই স্বামীজীর ৺অমরনাথ যাত্রাকালে সিস্টার নিবেদিতার তাঁবু সকলের মধ্যে গড়ায় সন্ন্যাসিবৃন্দ বিষম আপত্তি জানালেন। নিজ শাবকের রক্ষণাবেক্ষণে মাতা যেরূপ অমিত শক্তিতে অগ্রসর হয়, স্বামীজী জ্বালাময়ী ভাষায় সকলের যুক্তি খণ্ডন করতে লাগলেন। একজন নাগা সন্ন্যাসী স্বামীজীর ঐশীশক্তি উপলব্ধি ক'রে বললেন, 'স্বামীজী, আপনার শক্তি আছে জানি, কিন্তু অযথা তা ব্যবহার করা উচিত নয়।' স্বামীজী তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হলেন। বলা বাহুল্য স্বামীজীর যুক্তি সাধু-মণ্ডলী মেনে নিল এবং স্বামীজীও পরদিন হতেই নিবেদিতার তাঁবু পৃথকভাবে ফেলতে নির্দেশ দিলেন।

অদূরে প্রায় আঠার হাজার ফুট গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম ক'রে পাঁচটি গিরিনির্ঝরের সঙ্গমস্থল পঞ্চতরণী। স্বামীজী এখানে তীর্থযাত্রীর আচার পালনপূর্বক আর্দ্রবস্ত্রে একের পর এক পাঁচটি গিরিতটিনীতে স্নান করেন। তারপরই চিরবাঞ্ছিত অমল ধবল, শ্বেত শুভ্র তুষারলিঙ্গ শ্রীশ্রীঅমরনাথ। দূর হতেই যেন সেই পবিত্র গুহা দৃষ্টিপথে পড়ে। আমরা মানসচক্ষে সেই দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। কৌপীন-মাত্রধারী ভস্মাচ্ছাদিত দেহে স্বামী বিবেকানন্দ গুহায় প্রবেশ করেছিলেন এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত অচল অটল দেবাদিদেবের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। পরে নিবেদিতাকে বলেছিলেন, '৺অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বরদান করেছেন।' চিন্তাস্রোতে বাধা পেলাম নীচে হ'তে মাইকের আহ্বানে 'সময় হয়ে গেছে, চলে আসুন।' আমরাও আস্তে আস্তে বাজার ঘুরে বাসে এসে উঠলাম।

ভ্রমণসূচীতে তিন-চারদিন বাদে উলার লেক ও ক্ষীরভবানী যাওয়ার কথা। আগের দিন থেকে মনটা আনচান করছে। সেই ক্ষীর-ভবানী? একান্ন পীঠের একটি পীঠস্থান? যাক অমরনাথ হ'ল না, তবু ক্ষীরভবানী তো দর্শন হবে। পরদিন সকলের আগেই বাসে গিয়ে সীট দখল ক'রে বসলাম।

শ্রীনগর থেকে প্রায় তিরিশ মাইল পশ্চিমে 'উলার' এশিয়ার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ হ্রদ। এর মধ্য দিয়েই ঝিলাম নদী পাকিস্তানের দিকে গতি পরিবর্তন করেছে। আমরা উলার লেক প্রদক্ষিণ ক'রে 'মানসবলে' খানিক বিশ্রাম নিলাম। দূরে পাহাড়ের সীমারেখার কোলে বিস্তৃত হ্রদের উপকূলে নাতি-উচ্চ ছায়াসমাচ্ছন্ন ঘাসের টিলা ও তার পাশে ডাকবাংলোটি সত্যই ক্লান্তিহারক, মনে 'বল'ই দেয়, সার্থক নাম 'মানসবল'। ক্ষীরভবানীতে পৌঁছলাম বেলা তিনটায়, বিশালবপু 'চেনার' গাছের ছায়া-সমাচ্ছন্ন বিরাট প্রাঙ্গণটি মনোরম। সবটাই পাথরে বাঁধানো। মধ্যস্থলে একটি প্রস্রবণ কুণ্ড-রূপে বাঁধানো। আতপ চাল, বাতাসা ও ফুলে জল বিকৃত বর্ণ ধারণ করেছে। তারই মাঝে দেবীর ক্ষুদ্র মন্দির। দূর থেকেই দেবীকে পূজা ও ভোগাদি নিবেদন করতে হয়। চারি পাশে ইতস্ততঃ কিছু দোকান। দু-একজন সন্ন্যাসী বিস্তৃত প্রাঙ্গণের বৃক্ষচ্ছায়ায় জপরত। এই কি সেই ক্ষীরভবানী, যা স্বামীজীর স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত? এখানেই কি স্বামীজী দিব্যানুভূতি লাভ করেছিলেন? বারবার মুসলমানের আক্রমণে মন্দির দৈন্যদশাগ্রস্ত। স্বামীজী চিন্তা করছেন, 'আমি যদি তখন থাকতাম, তাহলে নিশ্চয়ই বাধা দিতাম। কিছুতেই পবিত্র মন্দির ধ্বংস হ'তে দিতাম না।' সহসা দৈববাণী 'যদিই বা মুসলমানগণ পবিত্র মন্দির ধ্বংস ক'রে থাকে, তাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?' স্বামীজী বুঝে উঠতে পারছিলেন না। পরদিন আবার চিন্তা করছেন, 'যাই হোক, এখন আমি ভিক্ষা ক'রে অর্থসংগ্রহ ক'রব, আর জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার ক'রব।' আবার সেই দৈববাণী—'আমি কি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে সপ্ততল সোনার মন্দির তৈরী করতে পারি না? আমার ইচ্ছাতেই মন্দির ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে।' কর্ম-যোগীর ক্ষীণ আমিত্বের অহঙ্কারটুকুও চূর্ণ হ'ল। অজ্ঞানের পাতলা আবরণ যা মা-ই রেখে দিয়েছিলেন তাঁর কাজ করিয়ে নেবার জন্য, তা অপসৃত হ'ল। রইল মায়ের হাতের ক্রীড়নক শিশু বিবেকানন্দ; 'তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র' মনে এই অপূর্ব ভাব শান্তি ও নিস্তব্ধতা নিয়ে ফিরলেন এক নতুন মানুষ।

মায়ের মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে, বৃক্ষতলে বসে কোন দৈব ইঙ্গিত খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু হায়! এ কি বাতুলতা! কোথায় সে চক্ষুকর্ণ? কোথায় সে অনুভূতি?

সুসময়ের স্রোত দ্রুত বয়ে যায়। কাশ্মীরে দশটি দিন কেটে গেল—হর্ষ আনন্দ সুবিধা ও অসুবিধার মধ্যে। ৫ই জুন প্রত্যাবর্তনের পথে নিতান্ত অনিচ্ছায় বাসে উঠে বসলাম। পথে অমৃতসর দিল্লী আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন এলাহাবাদ পাটনা হয়ে কলকাতায় ফিরলাম ১৫ই জুন। ঘটনা শেষ হয়ে যায়, কিন্তু স্মৃতি পড়ে থাকে। কত নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয়, কত নূতন স্থান দর্শন! অপরিচিতের কত ভয়, কিন্তু তখন মনে হয়—

'নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে কথা যে ভুলে যাই।'

সমালোচনা

বেদান্তদর্শনে পরমার্থতত্ত্ব (স্বপ্রকাশত্ব ও মিথ্যাত্ববিচার) : প্রণেতা—ডক্টর সীতানাথ গোস্বামী, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাপ্তিস্থান : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা—১৮৭+২০ ; মূল্য আট টাকা।

শাঙ্কর দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় অদ্বৈত ব্রহ্ম। ভগবান শঙ্করাচার্য উপনিষদ্‌, গীতা ও বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে 'সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্রহ্মাত্মার একত্বে তাৎপর্য' ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত লোকের প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি সিদ্ধ আত্মার ভেদ ও জগতের সত্যত্বের সহিত ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব বিরুদ্ধ হওয়ায় লোকের শ্রুতির অর্থে আপাতপ্রতীয়মান 'জরদ্গব' প্রভৃতি উপাখ্যানের মতো সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া ভগবৎপাদ শঙ্কর বেদান্তদর্শনে প্রথমেই অধ্যাস বর্ণনা করিয়া দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সাধন করিয়াছেন। দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে অদ্বৈতবেদান্ত-দর্শনের প্রতিপাদ্য সিদ্ধ হইয়া যায়। এই জন্য অদ্বৈতবেদান্ত-দর্শনের প্রায় সকল আচার্যই স্বকৃত গ্রন্থে—হয় প্রথমে জগতের মিথ্যাত্ব সাধন করিয়া পরে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, অথবা প্রথমে ব্রহ্মের স্বরূপ বা জীবব্রহ্মের একত্ব বর্ণনা করিয়া পরে তাহার উপপাদকরূপে দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সাধন করিয়াছেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থটিও যে গ্রন্থ প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, সেই 'চিৎসুখী' গ্রন্থে প্রথমে স্বপ্রকাশ জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ, অতএব তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ—ইহা প্রতিপাদন করিয়া সেই দৃক্‌স্বরূপ আত্মার সহিত দৃশ্যের ও দৃশ্যসম্বন্ধের আধ্যাসিকত্ব সাধনপূর্বক বিস্তৃতভাবে পরমতখণ্ডন সহিত অদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইযাছে। চিৎসুখী-গ্রন্থে চারিটি অধ্যায় আছে। তাহার প্রথম অধ্যায়ের প্রথমে জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব ও পরে দ্বৈতের মিথ্যাত্ব আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার প্রথমে জ্ঞানরূপ আত্মার স্বপ্রকাশত্ব স্থাপনে চিৎসুখীর প্রায় সকল কথাই এত সুন্দরভাবে বাংলা ভাষায় বুঝাইয়াছেন যে, সাধারণ পাঠকও একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে বেদান্তের রহস্য কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শুধু তাহাই নহে, পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তের পদার্থগুলি বুঝাইবার জন্য প্রায় প্রত্যেক পত্রের নিম্নে পাদটীকায় ন্যায়, বৈশেষিক, ভাট্ট, প্রাভাকর ও বেদান্তের বিষয়সকল পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। নব্য বেদান্তে যে 'মহাবিদ্যা' অনুমানরীতি প্রচলিত আছে, তাহার আবিষ্কারক ও তাহার অর্থ বর্ণনা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে উহা যে নির্দোষ অনুমান নহে, তাহাও স্মরণ করাইয়া দিয়া ঐ অনুমান-খণ্ডন-কারী 'ভট্টবাদীন্দ্রে'র ও তাঁহার 'মহাবিদ্যা-বিড়ম্বন' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে 'চিৎসুখী'র যে কয়েকটি বিষয় বুঝানো হইয়াছে, সেই সব বিষয়ে অদ্বৈত-সিদ্ধি, ব্রহ্মসিদ্ধি, অদ্বৈতদীপিকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তের প্রকরণ-গ্রন্থের সমান প্রকরণের আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য আত্মার স্বপ্রকাশত্ব ও দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সুস্পষ্ট প্রমাণিত করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে ৭টি অধ্যায়ের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে যথাক্রমে স্বপ্রকাশত্বের আবশ্যকতা, স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ ও প্রমাণ দেখাইয়া চতুর্থ অধ্যায়ে আত্মাই যে স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, তাহা উপপাদিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে মিথ্যাত্বের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে চিৎসুখীর দশটি পূর্ব-পক্ষাত্মক মিথ্যাত্বের লক্ষণ বুঝাইয়া দিয়া ন্যায়ামৃতেরও চারটি লক্ষণ দেখাইয়াছেন। পরে অদ্বৈতসিদ্ধিতে বিবৃত পাঁচটি সিদ্ধান্ত মিথ্যাত্বলক্ষণ উল্লেখ করিয়া, তাহার চতুর্থটিকে চিৎসুখীর একাদশ সিদ্ধান্ত লক্ষণরূপে বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা ও নানাগ্রন্থের সমর্থনের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। অনন্তর অদ্বৈতসিদ্ধির প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মধ্বের উৎপ্রেক্ষিত ছয়টি ব্যাঘাতাত্মক তর্কের আকার যাহা বিষ্ঠলেশে দুইটি সুস্পষ্ট ও অবশিষ্ট চারিটি সূচিত, তাহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া অদ্বৈত-সিদ্ধির রীতি অনুসারে খণ্ডন করিয়াছেন। পরে ক্রমে ক্রমে অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম লক্ষণের আলোচনা করিয়া পঞ্চম লক্ষণটিকে ও আনন্দবোধাচার্যের আবিষ্কৃত নির্দোষ লক্ষণ উল্লেখ করিয়া মিথ্যাত্বের লক্ষণ-বর্ণনা শেষ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে মিথ্যাত্বের অনুমান-প্রমাণ নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমে চিৎসুখী-প্রদর্শিত মিথ্যাত্বের অনুমানে পূর্বপক্ষের কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাকালে অদ্বৈতসিদ্ধির অনেক কথা উল্লেখ করিয়া মিথ্যাত্বানুমানের দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব রূপ তিনটি হেতু অদ্বৈতসিদ্ধির রীতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে মিথ্যাত্বের শ্রুতি-প্রমাণ সম্বন্ধে প্রথমে পূর্বপক্ষের বক্তব্য প্রদর্শন করিয়া শেষে পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক সিদ্ধান্তীর মত প্রতিপাদন করিয়া দ্বৈতমিথ্যাত্ব উপসংহার করিয়াছেন। ফলতঃ এই গ্রন্থে চিৎসুখীর যতটুকু অংশ আলোচিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা চিৎসুখী গ্রন্থের বা অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্যের বিষয়ীভূত পদার্থ সিদ্ধ হইয়াছে;

এই গ্রন্থের আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তাহার কারণ দুরূহ বিষয়গুলিকে যথাসাধ্য সহজ ও নির্দোষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রায় কোন বিষয়ই অমূল বা অনপেক্ষিত বর্ণনা করেন নাই। কয়েকটি স্থলে গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না, ভূমিকাতে একটি কথা অস্পষ্ট হইয়াছে।

২০ পৃষ্ঠায়—দণ্ডকে সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের প্রতি কারণ এবং ঐ পৃষ্ঠায়—ঘটাবয়ব-প্রত্যক্ষের প্রতি সংযুক্ত সমবায়কে সন্নিকর্ষ বলা হইয়াছে। ৬৭ পৃঃ—'কারণ অনুভূতি যদি অনুভাব্য হয়, তাহা হইলে সেই অনুভাব্য অনুভূতিও আবার অনুভাব্য হইবে।' নিম্নরেখ অনুভাব্য স্থলে 'অনুভাবক' হওয়াই উচিত।

৭৫ পৃঃ ৫।৮।১৪ পঙ্‌ক্তিতে তিনটি স্থলে 'অনুভূতিরূপ হেতুটি' না হইয়া 'অনুভূতিত্ব-রূপ হেতুটি' হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভূমিকায় প্রথমে বলা হইয়াছে 'বেদান্তদর্শন তিনটি প্রমাণের দ্বারা বস্তুতত্ত্ব নির্ধারিত করিয়া থাকে—শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব।' কিন্তু শ্রুতি শব্দপ্রমাণ, যুক্তি অনুমানপ্রমাণ—ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ। অনুভবকে কি প্রমাণ বলা যায় অথবা প্রমা বলা যায়? যদি বলা যায় ভাষ্যকার 'শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ' ইত্যাদি বাক্যে অনুভবকে প্রমাণ বলিয়াছেন। তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—ভাষ্যকার 'যথাসম্ভবমিহ প্রমাণম্' এই কথা বলিয়া অনুভবকে ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু 'অনুভব বস্তুতত্ত্ব নির্ধারিত করে' ইহা বলেন নাই। বস্তুতত্ত্বের নির্ধারণই অনুভব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থখানি উপাদেয় বলিয়াই মনে হইল এবং ইহার দ্বারা গ্রন্থকারের গভীর জ্ঞান অনুমিত হইল। এই জাতীয় বেদান্তগ্রন্থ বাংলা ভাষায় যতই প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল। ইতি শম্।

—মেধাচৈতন্য

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা : প্রবোধচন্দ্র সেন। প্রকাশক : জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স। পৃঃ ১৮৮ ; মূল্য পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে মনীষী রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে এই আলোচনাসংগ্রহটি সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণীয়। লেখক স্বয়ং বাংলাদেশের অন্যতম চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্—সেইজন্যই এ গ্রন্থ আমাদের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ভূরিপরিমাণ আয়োজন সত্ত্বেও স্বল্পপরিমাণ শিক্ষার সার্থকতা লক্ষ্য ক'রে দেশবাসীকে মাতৃভাষায় সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, সে আবেদনে আজ পর্যন্ত সাড়া পাওয়া যায়নি। তার কারণ, শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা আজও চিন্তায় ও কর্মে সামঞ্জস্য সাধন করতে পারিনি। ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হ'লে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা দ্রুত অগ্রসর হবো—এমন একটা ধারণা রামমোহন রায় থেকে আধুনিক কাল অবধি চলে আসছে। তার ফলে এই দেড়শ' বছরের মধ্যে এদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ক-জনায় দাঁড়িয়েছে—সে তো সকলের জানা। অপরপক্ষে জাপানে সর্ববিধ বিদ্যা মাতৃভাষায় বিতরিত হওয়ার ফলে একটি জাতি কত দ্রুত উন্নতির পথে চলেছে—তাও আমরা জানি। আসল কথা, চিন্তার রাজ্যে আমাদের উভয়সঙ্কট। ইংরেজী না শিখলে ভালো চাকরি হয় না, মাতৃভাষায় না শিখলে ভালো শিক্ষা হয় না। এই উভয় সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার যোগ্য সাহস যতদিন না জাতীয় চিত্তে দেখা দিচ্ছে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়' গড়ে উঠতে পারবে না। কিন্তু মাতৃভাষায় সর্বস্তরের জ্ঞানসাধনা প্রকাশিত না হওয়া অবধি শিক্ষার মুক্তি নেই, একথা নিশ্চিত। শ্রদ্ধেয় লেখক বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী-প্রসঙ্গ, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাসমস্যা, শিক্ষার মুক্তি, ভাষার মুক্তি, সাহিত্যের মুক্তি—এই কয়টি প্রবন্ধে শিক্ষা-ব্যবস্থার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের উপযোগিতা নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। আন্তঃপ্রাদেশিকতা বা বহির্বিশ্বগত কারণে বিদেশী ভাষাকে চিরকাল শিক্ষার বাহন ক'রে রাখা যায় না। যে জাতির নিজস্ব ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে ওঠেনি, কেবলমাত্র সাহিত্যিক কারণে সেই জাতির ভাষাকে বিশ্ববাসী বেশীদিন শ্রদ্ধা করতে পারে না। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির মতো আত্মনির্ভরশীল ভাষাই যথার্থ সম্মানের অধিকারী। শোভন প্রচ্ছদ ও সুন্দর মুদ্রণে এই প্রবন্ধসঙ্কলনটি প্রত্যেক গ্রন্থাগারে রক্ষণযোগ্য।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি : শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। প্রকাশক : বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬। পৃঃ ৫৫২ ; মূল্য টাকা ১২'৫০।

পদাবলী-সাহিত্যের অগ্রণী কবিগুরু জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস— সংস্কৃত, মৈথিলী ও বাংলা—এই তিনটি সাহিত্যে চিরন্তন সম্পদ্ দান ক'রে গেছেন। চৈতন্য-সাধনার অগ্রচারণ এই তিন মহাকবির রচনা ও ভাবনার পরিমণ্ডলে সমগ্র বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্য বিধৃত। সংস্কৃত ও মৈথিল ভাষায় জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্য-সৃষ্টিকে বাংলাদেশের জনমানস একান্ত আপন বলেই গ্রহণ করেছে। চণ্ডীদাস নানা নামের ধাঁধায় আচ্ছন্ন হলেও প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর কাব্যমাধুর্য সম্বন্ধে কারও দ্বিমত নেই। বিদ্যাপতির অনুসরণে ব্রজবুলি কবি-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। বাংলা পদাবলীর রচয়িতাদের আদর্শ চণ্ডীদাস। এইভাবে বৈষ্ণব-

সাহিত্যের সূচনা ও ক্রমপরিণতির ইতিহাস আজ সাহিত্যপাঠকদের কাছে সুবিদিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ার পর থেকে বৈষ্ণবদর্শন ও বৈষ্ণব কবিদের আলোচনা অনেকেই করেছেন,—কিন্তু এ সব আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষাপ্রশ্নের সম্ভাবিত উত্তর, নয়তো স্তুতিমূলক আলোচনায় সুন্দর উদ্ধৃতির সমাবেশ। কাব্য-বিশ্লেষণের জন্য যে কবি-মনের সর্বাগ্রে প্রয়োজন, এ সব আলোচনায় তার একান্ত অভাব। শ্রীশঙ্করী-প্রসাদ বসুর 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' সেই অভাব পূরণ ক'রে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-বিভাগটি সমৃদ্ধ করেছে। সন তারিখ নিয়ে বিবাদ ক'রে তিনি কাব্যাস্বাদে অন্যমনস্ক নন, অথবা কাব্যের ক্ষেত্রে দার্শনিক সিদ্ধান্তের সরল-রেখা টানবার অসাধ্য সাধন তাঁর ব্রত নয়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদামৃত-সমুদ্রে নিজে অবগাহন ক'রে পাঠকের জন্যও তিনি সেই সিন্ধুর সংবাদ নিয়ে এসেছেন। অনুভূতি-সমুজ্জ্বল তাঁর ভাষা মনীষীদের মতো নিজেই আলোক হয়ে পাঠকচিত্ত আলোকিত করে।

চণ্ডীদাসকে অধ্যাত্ম অনুভূতির কবি এবং বিদ্যাপতিকে পার্থিব প্রেমের কবি ব'লে যে ভাগ তিনি করেছেন—সে বিভাগকে পুরোপুরি মেনে নেওয়া কঠিন। বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের (বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস যে নিশ্চিত পৃথক্—এমন প্রমাণ নেই) রচনা-হিসাবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে মনে রেখে এ কথা বলছি। বিদ্যাপতির পদেও ক্ষণে ক্ষণে প্রেম পূজা হয়ে উঠেছে, এমন উদাহরণ আছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্যবিশ্লেষণে যে নিপুণ বিচারবুদ্ধি ও রসজ্ঞ দৃষ্টির পরিচয় লেখক দিয়েছেন, সেজন্য আন্তরিক সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য।

বাংলাসাহিত্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির—বিশেষভাবে বিদ্যাপতির—পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়াসরূপে এ গ্রন্থ সাম্প্রতিক কালের উল্লেখ-যোগ্য প্রকাশন। —**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

(১) অবতার-রহস্য (২) পুরাণ-রহস্য—শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীশিবধন মুখোপাধ্যায়, 'রামতীর্থ', মণিরামপুর, বারাকপুর, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৩০ ও ১৪; মূল্য ছয় আনা ও চার আনা।

সম্প্রতি কোন কোন লেখক 'পুরাণ অবতার প্রভৃতি অমান্য' এই মর্মে পুস্তক রচনা করিতেছেন, এবং পুরাতন কুসংস্কার দূর করিতে বলিয়া স্বরচিত নূতন কুসংস্কারে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে বলেন। আলোচ্য পুস্তিকা-দুইটি তাহারই উত্তর-স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাণের কাহিনীগুলির মধ্য দিয়া জন-সাধারণের নিকট বেদ ও উপনিষদের সনাতন সত্যের বাণীই সহজ সরলভাবে পরিবেশিত। শত শত সাধক সিদ্ধ ঋষিমুনি ও মহাপুরুষের সাধনা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পুরাণগুলি।

শাস্ত্রের মর্মার্থ উপলব্ধি করিতে হইলে কিরূপ প্রস্তুতির প্রয়োজন, সুধী গ্রন্থকার তাহা 'অবতার-রহস্য' ও 'পুরাণ-রহস্য' পুস্তিকা-দুইটিতে যুক্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করিয়া অর্বাচীন মত যথাযথভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। লোককল্যাণ ও ধর্মস্থাপনের জন্য শ্রীভগবানের আবির্ভাব সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। নানা শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে অবতার-লীলারহস্য প্রকাশ করিবার এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। পুস্তক-দুইটি ক্ষুদ্র হইলেও তথ্যপূর্ণ এবং বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ে সমৃদ্ধ।

পাথেয়—ডাঃ বিজয়বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, ২৩নং ফরডাইস্ লেন, কলিকাতা ১৪। ৭৫টি উপদেশ সংকলিত হয়েছে এই পকেট সাইজ বইটিতে।

A Yankee and the Swamis : John Yale [**জনৈক মার্কিন ও স্বামীজীবৃন্দ—জন ইয়েল**] **প্রকাশক : জর্জ** এলেন এণ্ড আন-উইন, মিউজিয়ম স্ট্রীট, লণ্ডন। মূল্য—পঁচিশ শিলিঙ্‌।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বাণী ও রচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পারস্পরিক বিনিময়ের কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। প্রাচ্য দেশ ধর্মসাধনায় পাশ্চাত্যের গুরুস্থানীয় হবে এবং পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্য তথা ভারত-ভূমি শিখবে কর্মকৌশল। এইভাবে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবসভ্যতা গড়ে উঠবে—এই ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন। পাশ্চাত্য দেশে ভারতের ধর্মসাধনার ক্রমপ্রসারের কাহিনী নানাসূত্রে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে,—সে সবই ভারতীয় দৃষ্টিতে দেখা। এই প্রথম একজন ইয়াঙ্কি বা আমেরিকানের চোখে সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় অধ্যাত্ম-চেতনার সঙ্গে আমেরিকার প্রাণসংযোগটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। এর আগে প্রকাশিত Vedanta for the Western World এবং Vedanta for Modern Man বই-দুটিতে বেদান্ত-দর্শনের সঙ্গে আধুনিক চিন্তা-ধারার সংযোগের পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু এই আমেরিকা-আগত তীর্থঙ্করের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান তীর্থগুলির যে ছবি ধরা দিয়েছে, তার একটি নিজস্ব মূল্য রয়েছে। নিছক তত্ত্ব নয়, অধ্যাত্ম-পিপাসু মানবসমাজের যে গোষ্ঠীগত নিজস্ব জগৎ রয়েছে, সেই জগতের প্রাণোজ্জ্বল বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলাতেই শ্রীইয়েলের কৃতিত্ব। ব্যক্তি-গত জীবনে শ্রীইয়েল আমেরিকার হলিউড কেন্দ্রের অন্যতম ত্যাগী কর্মী (প্রথম পরিচ্ছেদে তাঁর সঙ্ঘগত নাম দেওয়া রয়েছে—ব্রহ্মচারী প্রেমচৈতন্য), কিন্তু তিনি শুধুমাত্র সঙ্ঘের সভ্যরূপেই এ গ্রন্থ রচনা করেননি। পাশ্চাত্য দর্শকের চোখে যে বিস্ময় থাকে, তাও এ গ্রন্থে রয়েছে। কিন্তু কোথাও অনাবশ্যক হিতোপদেশ নেই। ভারতবর্ষকে তিনি যে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের মধ্যে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই পরিচয় নিয়েই এ গ্রন্থ ভারতবাসীর সাগ্রহ সমাদরের যোগ্য হয়ে উঠেছে। পুরীতে জগন্নাথ-দর্শনের সময় ও শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মস্থান কামারপুকুর-দর্শনে লেখকের তীর্থযাত্রার সার্থক সাহিত্যরূপ পাঠককে মুগ্ধ করবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (আলোচনা): ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ কর্তৃক আলোচিত। শ্রীঅন্নদা সেবাশ্রম, পলাশী, পোঃ মাঝিপাড়া, ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত। ২য় ও ৩য় ভাগ একত্রে পৃষ্ঠা ৬৪; মূল্য ১৲। ৪র্থ ও ৫ম ভাগ—মূল্য ১৲।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র ভাষা এমন সরল যে, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়, তাহলেও শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময়ী বাণী যত আলোচিত হয়, ততই ভাল। আলোচ্য বই-দুটিতে 'কথামৃত' থেকে বিশেষ বাণী উদ্ধৃত ক'রে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা স্থানে স্থানে সুন্দর, কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক অবান্তর বিষয়ের উল্লেখ কেন করা হয়েছে, তা বোঝা গেল না। ৫ম ভাগের শেষের দিকে স্বপ্নবিষয়ক এমন অনেক কথাই সন্নিবিষ্ট, যা নিষ্প্রয়োজন ব'লে মনে হয়।

Viveka (The Vivekananda College Magazine, March, 1961): Edited and Published by Sri K. Vasudevan, Professor, Vivekananda College, Mylapore, Madras. Pp. 73 + 19 + 22.

মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজ ম্যাগাজিন 'বিবেক'-এর এই সংখ্যাটিতে পাঁচটি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে রচিত ইংরেজীতে ৩৬, হিন্দীতে ৫, সংস্কৃতে ৭, তামিলে ১১ এবং তেলুগু ভাষায় ১০টি সুনির্বাচিত রচনা মুদ্রিত। কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ 'The Legacy of Rabindranath Tagore', 'Dr. Albert Einstein', 'Taoism', 'Science versus Religion', 'বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনম্' 'অদ্বৈতদর্শনম্'।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী যজ্ঞেশ্বরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৫শে জুলাই স্বামী যজ্ঞেশ্বরানন্দ (শশী মহারাজ) লখনৌএ ৬৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি নানা জটিল রোগে ভুগিতেছিলেন।

১৯২৫ খৃঃ হবিগঞ্জে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩০ খৃঃ সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী মনীষানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১লা অগস্ট অপরাহ্ণ প্রায় চার টার সময় স্বামী মনীষানন্দ (মতি মহারাজ) বেলুড় মঠে ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পূর্বাহ্ণে স্নান সারিয়া তিনি জপে বসিয়াছিলেন, এমন সময় মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনের ফলে সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হন এবং অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

স্বামী মনীষানন্দ ১৯১৬ খৃঃ ২৩ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন-অনুষ্ঠিত বন্যা-ও দুর্ভিক্ষ-রিলিফে তাঁহার সেবা-কার্য উল্লেখযোগ্য। কিছুকাল তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের সেবক ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বন্যার্ত-সেবা

সুরাট ঃ গত ১৯৫৯ খৃঃ সেপ্টেম্বরে তাপ্তী নদীর প্রলয়ঙ্কর বন্যায় সুরাট ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বন্যায় জনসাধারণের দুঃখের পরিসীমা ছিল না; বহু বাড়ীঘর নিশ্চিহ্ন হয়, অনেক মানুষ ও গবাদি পশুর প্রাণহানি ঘটে, বহু গ্রাম সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের বোম্বাই কেন্দ্র হইতে '৫৯ সেপ্টেম্বর হইতে '৬১ ফেব্রুআরি পর্যন্ত বন্যার্তদিগের সেবা (relief) করা হয়। বিভিন্ন তালুকের গ্রামে গ্রামে আর্থিক সাহায্যের সহিত খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি ও কম্বল বিতরণ করা হয়। কেবলমাত্র একটি তালুকেরই (Taluka Chaurasi) ৩৮টি গ্রামে ৬,১০৮ পরিবারে (৩১,৮০৭ লোককে) ৪,২২২ ধুতি, ৪,৪৯৬ শাড়ি, ৮,১১৮ জামা, ৫,৪৬৪ কম্বল ও ১,২২,২৮৯'৭৩ টাকা দেওয়া হয় এবং খাদ্যাদি বাবদ ১৩,৯৬০'৪২ টাকা ব্যয় করা হয়। এই সেবাকার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছয় লক্ষাধিক টাকা। অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল-গুলিতে ১২টি কলোনি নির্মাণ করিয়া দেওয়া হয়। কলোনিগুলিতে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণের সমবেত প্রার্থনা-গৃহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঞ্জোর ঃ মাদ্রাজের অন্তর্গত তাঞ্জোর জেলা বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সেখানে মিশন হইতে সেবাকার্য শুরু হইয়াছে; আগামী মাসে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা : Manager, Ramakrishna Math, Madras 4.

কার্যবিবরণী

পাটনা ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ১৯২২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (জানুআরি '৬০—মার্চ '৬১) পাইয়া আমরা আনন্দিত। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা সম্বন্ধে ২৮১টি আলোচনা হইয়াছিল। পূজা ও উৎসবাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়।

অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৪৬ ছাত্র অধ্যয়ন করে, ইহাদের অধিকাংশই অনুন্নত শ্রেণীর। ছাত্রাবাসে ২৮ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১৬ জনের সম্পূর্ণ খরচ আশ্রম হইতে বহন করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসের একজন ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস-সি. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগারের ৫,৮৭৩ পুস্তকের মধ্যে নূতন সংযোজন ৩৪১। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক ও ৭৩টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত আসিয়াছে। পাঠক-সংখ্যা ও গৃহীত পুস্তক-সংখ্যা যথাক্রমে ২৭,০০০ ও ১১,৪৪৫। গ্রন্থাগারটি জনসাধারণের বিশেষ করিয়া স্থানীয় ছাত্রগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থাগার-ভবনের দ্বিতলে প্রশস্ত হলে—বিশিষ্ট বক্তাদের দ্বারা সাধারণের উপযোগী ধর্ম- ও কৃষ্টিবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক বিভাগে যথাক্রমে ৮১,৪৩৪ (নূতন ৯,৩০২) ও ৬৬,৬৩০ (নূতন ৯,৫৬৫) রোগী চিকিৎসিত হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি): নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং প্রতি বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয় :

মার্চ : প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য; কে জানে, তুমিও ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট হইতে পার; হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদের সিদ্ধান্ত ও তাহার প্রয়োগ; মনের রাজপথ ও নিভৃত পথ; বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্ম; জীবন, মৃত্যু ও জ্ঞানালোক; শব্দ-প্রতীকের মাধ্যমে ধ্যান; 'জগৎমিথ্যাত্ব' সাধন; শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ।

এপ্রিল : পুনরুজ্জীবন ও পুনরবতরণ; ধ্যান এবং শরীর মন ও আত্মার উপর ইহার প্রভাব; মানুষই অলৌকিক; অহংকার ও আত্মা; মনকে কিরূপে শান্ত করা যায়, আচার্য শঙ্কর ও তাঁহার অদ্বৈত বেদান্ত; অবচেতন মন দ্বারা কি করা যাইবে? পবিত্র জীবনের জন্য সাধনা; বুদ্ধ ও খৃষ্ট।

মে : ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি; আধ্যাত্মিক জীবনের দুঃখ ও আনন্দ; পূজা ও প্রার্থনা; কর্মবাদ ও পুনর্জন্ম; বিশ্বশান্তির উপায়; কিরূপে পবিত্র হওয়া যায়; সাধু, ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট মানব ও অবতার পুরুষ; ঈশ্বর কি নির্লিপ্ত? স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং বেদীর সম্মুখের হলে

কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

পুরাতন মন্দিরে: প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আলোচনা করেন। রবিবার ব্যতীত অন্যদিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগত-ভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেলা ১১টা হইতে ১২টা শিশুদের সময়।

স্বামী মাধবানন্দ

স্বামীজীর স্মৃতিজড়িত সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park on the St. Lawrence river) স্বামী মাধবানন্দজী ক্রমশ সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। এখন যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রত্যহ এক মাইল বেড়াইতে পারেন। আগামী সেপ্টেম্বরে তিনি নিউইয়র্ক শহরে ফিরিবেন—এইরূপ আশা করা যায়।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীসারদা-সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন

ত্রিচুর: গত মে মাসে ত্রিচুরে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজসেবার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত শ্রীসারদা-সঙ্ঘের চারদিবসব্যাপী চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি, সভ্যা এবং মহিলা সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষিকা, চাকরিজীবী ও গৃহী ভক্তেরা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্যনামে এই সম্মেলনে সমবেত হন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী মেনন সকলকে স্বাগত জানান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাণী পাঠ করেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী হাকসার সঙ্ঘের বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিলে পর শ্রীমতী মহাদেবী উদ্বোধন-ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর চরিত্রের বিভিন্ন গুণা-বলীর উল্লেখ করেন। সভানেত্রীর ভাষণে ডাঃ ইরাবতী বলেন যে, ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সারদাদেবীর আবির্ভাব এবং তাঁর পুণ্য জীবনকে জানিবার আগ্রহ মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হইতেছে। ত্রিবান্দ্রাম রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী তপস্যানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র জীবন আলোচনা করেন।

ডাঃ ইরাবতী ১৯৬১-৬২ খৃঃ জন্য সঙ্ঘের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। স্বামী ভূমানন্দ তীর্থ শঙ্করাচার্য ও গীতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ডাঃ ইরাবতী ছাত্রী স্বেচ্ছাসেবিকাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সমাগত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে দিল্লীর শ্রীমতী বালম্ বলেন যে, সমাজ-সেবাকে আত্মবিকাশ ও আত্মমুক্তির উপায়-হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। ত্রিবান্দ্রামের শ্রীমতী লীলা আম্মা ভারতের সাধিকা-দের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রতিদিনই অধিবেশনের শেষে ভজন, অভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

উৎসব-সংবাদ

কুমিল্লা: গত ৫ই হইতে ৭ই এপ্রিল স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। সভায় শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী ও শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ (সভাপতি) শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বনে সুন্দর বক্তৃতা দেন।

সচিত্র টেলিফোন

আমেরিকার বেল টেলিফোন লেবরেটরিজ্ 'ছবিসহ টেলিফোন' উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই টেলিফোন ব্যবহারকারীরা কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার সহিত কথা কহিবেন, তাঁহার ছবিও দেখিতে পাইবেন। এই প্রণালীর টেলিফোনে ডাকটিকিটের সাইজের মতো ছোট ছবি দেখা যাইবে। টেলিফোনের সঙ্গে একটি ছোট ক্যামেরা এবং ছবির একটি ছোট নল লাগানো থাকিবে। যে ব্যক্তির সহিত কথা বলা হইবে, তিনি যদি অদৃশ্য থাকিতে চান, তবে তিনি তাঁহার মাথা এমনভাবে সঞ্চালন করিবেন, যাহাতে তাঁহার ছবি পড়িবে না। যদি উভয় ব্যক্তিই পরস্পর অদৃশ্য থাকিতে ইচ্ছুক হন, তবে ছবির যন্ত্রটি ব্যবহার না করিলেই হইল। টেলিফোনে ছবি-প্রেরণের যে কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে কিন্তু 'বেল' ইঞ্জিনিয়ররা সন্তুষ্ট নন, এবিষয়ে আরও উন্নতির জন্য তাঁহারা গবেষণা চালাইতেছেন। (সঙ্কলিত)

আণবিক পরীক্ষার কুফল

ইউনাইটেড নেশনের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৯৪৬ খৃঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যে সব স্থানে একটির পর একটি পারমাণবিক পরীক্ষা চালাইয়াছিল, তাহাদের সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ এখনও তাহাদের রুগ্ণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ, ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও বলিভিয়ার প্রতিনিধিবর্গ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-শাসিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া বিবরণী দিয়াছেন। রঞ্জল্যাপ দ্বীপের বহু অধিবাসীর অভিযোগ যে, তাহারা এবং তাহাদের সন্তানসন্ততি নানাপ্রকার কঠিন রোগে ভুগিতেছে। তন্মধ্যে শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি, অবসন্নতা, গাত্রবেদনা, পাকস্থলীর রোগ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত রঞ্জল্যাপ দ্বীপে অস্বাভাবিক আকৃতিবিশিষ্ট ও বিকলাঙ্গ অবস্থায় বহু শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মৃত অবস্থায়ও অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। (সঙ্কলিত)

ভ্রম-সংশোধন

(১) গত আষাঢ় সংখ্যার উদ্বোধনে ৩১০ পৃষ্ঠায় ২৫ লাইন পরে পড়িবেন :

অন্ত্য পদগুলির সমস্তই সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত। 'কৃপাকণা' শব্দে দ্বিতীয়ার বহুবচন, সন্ধির নিয়মে বিসর্গের লোপ হইয়াছে। 'তে' অর্থাৎ তব, 'সংসারে' সপ্তমীর একবচন।

(২) শ্রাবণের উদ্বোধনে ৩৮৬ পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতির নাম পড়িবেন : মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।
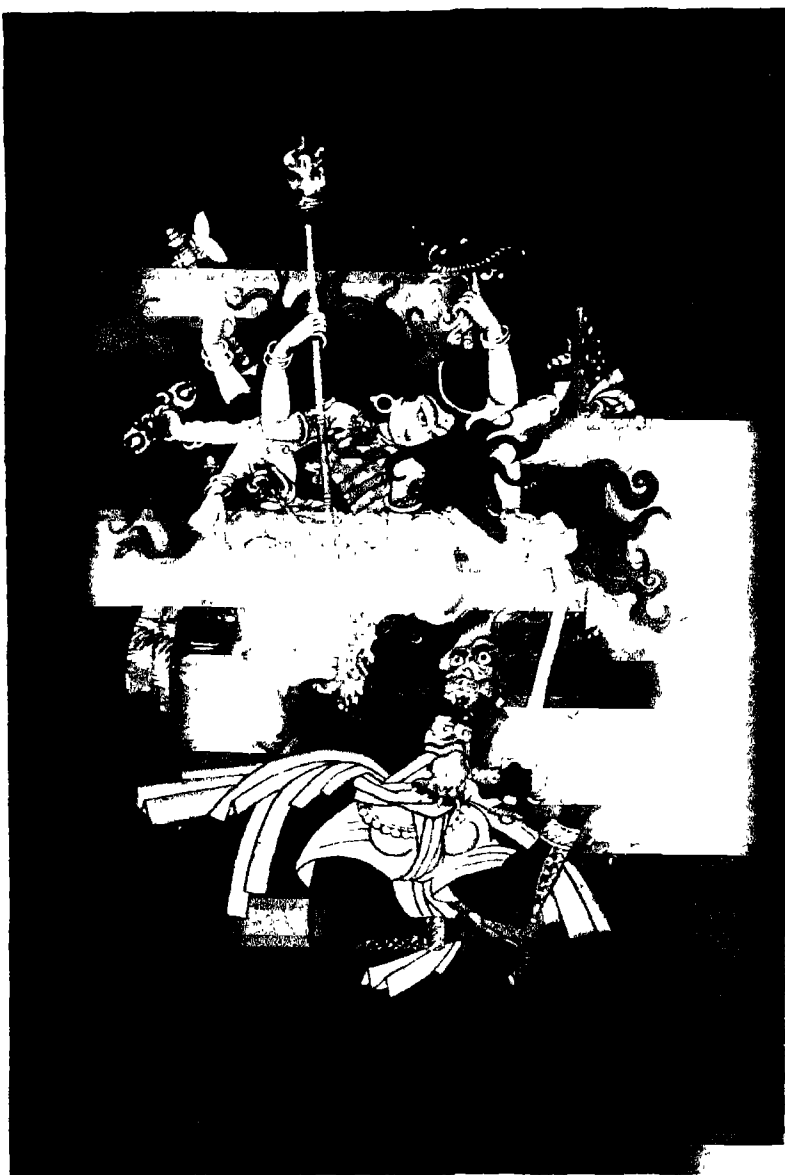
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদাভব॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৩৫

ব্লক ও মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

শিল্পী : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবীসূক্ত

[বাগাম্ভৃণী ঋষি, পরমাত্মা (আদ্যাশক্তি) দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দঃ]

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২ ॥
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩ ॥
ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ ॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫ ॥
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬ ॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭ ॥
অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সংবভূব ॥ ৮ ॥

[ঋগ্‌বেদ—১০।১০।১২৫]

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ আত্মোপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন:

আমি ঈশ্বরী।
রুদ্র বসু আদিত্য
ও বিশ্বদেব যত,
সবারে চারণ করি।

আমি ঈশ্বরী।
মিত্র-বরুণেরে—
ইন্দ্র অগ্নি আর অশ্বিনীকুমারে,
আমিই ধারণ করি ॥ ১ ॥

আমি ঈশ্বরী।
শত্রুঘ্ন সোমেরে—
ত্বষ্টা পূষা
আর ভগদেবতারে,
আমিই ধারণ করি।
আমি যজ্ঞেশ্বরী।
হবিষ্মান্
যে যজমান,
আমি করি তার
যজ্ঞফল দান ॥ ২ ॥
আমি ঈশ্বরী,
আমি রাজ্ঞী।
আমি সবাকার ধনদাত্রী,
যাগকারীদের আমিই প্রথম ব্রহ্মজ্ঞাত্রী।
বহুভাবে আমি
সর্বভূতে প্রবিষ্টা,
দেশে দেশে আমি
দেব-নর-বন্দিতা ॥ ৩ ॥
যা কিছু মানব করে ভক্ষণ,
দর্শন, শ্রবণ কিংবা প্রাণের স্পন্দন—
আমি সবারই বিধাত্রী।
ঈদৃশী আমারে জানে
যারা ব্রহ্মপথযাত্রী।
এইরূপ জ্ঞানে যারা নহে জ্ঞানবান্,
সংসারে তারাই হীন—
চিরভ্রাম্যমাণ।
হে মোর বিশ্রুত সখা,
শ্রদ্ধালভ্য এই আত্মজ্ঞান
শোন আমি করি তার
উপদেশ দান ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণ,
মনস্বী মানবগণ,
শ্রদ্ধায় যে ব্রহ্মতত্ত্ব
করেন পালন,
শোন সখা বলি সেই
অধ্যাত্ম কথন;
আমি ইচ্ছা করি যারে
শ্রেষ্ঠ আমি করি তারে—
কেহ ব্রহ্মা, কেহ ঋষি,
কেহ বা মনীষী ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মদ্বেষী অসুরেরে
করিতে নিধন,
রুদ্রের ধনুতে আমি
করি জ্যা-রোপণ।
জনকল্যাণে
আমি সংগ্রামকারিণী,
ভুবনে ভুবনে
প্রতি বস্তু সনে
আমি অন্তর্যামিনী ॥ ৬ ॥
ঊর্ধ্ব আকাশের
আমি প্রসবিত্রী,
যোনি মোর
সমুদ্র-সলিল-মধ্যবর্তী।
ঈদৃশী যে আমি—
ভুবনে ভুবনে অনুপ্রবিষ্টা,
সকল বস্তুতে
কারণরূপে আমি সংস্থিতা।
ঊর্ধ্বস্থ ঐ স্বর্গলোক যত
আমারই মায়ায় তারা বিস্তারিত ॥ ৭ ॥
বায়ুসম আমি
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত
ভূতজাত কার্য যত
করি উৎপাদিত।
সৃজি দ্যৌ পৃথিবীরে
এ দুয়ের পরপারে
মহিমা-প্রদীপ্ত আমি
ঈদৃশী সংস্থিত ॥ ৮ ॥*

*অনুবাদ: শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

কথাপ্রসঙ্গে

'রূপং দেহি, জয়ং দেহি'

'চণ্ডী'র অপর নাম 'দেবীমাহাত্ম্য'। 'শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী'—তাহাতে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ অবশ্য কর্তব্য। পূজার বিবিধ উপকরণ বিচিত্র আয়োজন তখনই সার্থক হইবে—যখন সেগুলির সহিত দেবীর স্মরণ মনন কীর্তন সমন্বিত এই 'দেবীমাহাত্ম্য' পঠিত হইবে, ভক্তিভরে শ্রুত হইবে। দেবী নিজেই বলিতেছেন: (চণ্ডীর অন্তর্গত) এই স্তবগুলির দ্বারা যে আমার স্তুতি করে, আমি তাহার সকল বাধা দূর করিয়া দিই! (চণ্ডীতে বর্ণিত) আমার তিনটি চরিত্র যাহারা কীর্তন করে, যাহারা শ্রবণ করে, তাহাদের পাপতাপ দূরীভূত হয়, সর্ববিধ ভয় তিরোহিত হয়।

চণ্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবতী-মুখে এই আশ্বাসবাণীই একদিন আশ্বস্ত করিয়াছিল স্বাধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেবতাগণকে; যুগ যুগ ধরিয়া এই আশ্বাসবাণীই আশ্বস্ত করিতেছে স্বাধিকারে বঞ্চিত দুর্বল জনগণকে, তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিতেছে—সকল শুভশক্তি সম্মিলিত করিয়া অশুভ শক্তিকে পরাজিত করার সংগ্রামে।

চণ্ডী ইতিহাস না পুরাণ, রাজনীতি না সমাজনীতি—সে আলোচনা না করিয়াও এইটুকু বলা যায়, ইহার মধ্যে রহিয়াছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে শক্তিলাভ করিবার রহস্য, শান্তি লাভ করিবার উপায়। চণ্ডীতত্ত্ব প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক, কারণ দেহমনের সমস্যা লইয়াই আমাদের যত কিছু সংগ্রাম। দেহমনের মধ্যেই রহিয়াছে নানা শুভাশুভ শক্তি, তাহাদের সংগ্রামই পুরাণে বর্ণিত দেবাসুর যুদ্ধ! কর্মময় রজোগুণ দ্বারা ভ্রম ও আলস্যপূর্ণ তমোভাব জয় করিতে হইবে, সকাম কর্মের চঞ্চল স্তর অতিক্রম করিয়া তবে নিষ্কাম শান্ত সত্ত্বে প্রতিষ্ঠা, সেখানেই শুরু হয় গুণাতীত হইবার ঊর্ধ্বতর সাধনা!

প্রথমে দেবী তমোময়ী প্রসুপ্তা মহাকালী—'হরিনেত্রকৃতালয়া', বোধনমন্ত্রে উদ্বোধিত হইয়া তিনি মঙ্গলময় পালনীশক্তির আধার বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর মাধ্যমে সুখদুঃখ দ্বন্দ্ববোধরূপ দুই দুষ্টশক্তি পরাভূত করিয়া সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন।

পরবর্তী স্তরে রজোগুণের লীলা—দম্ভ দর্প ও ক্ষমতাপ্রিয়তার প্রতিমূর্তি মহিষাসুর—অর্ধপশু! তাহার নিধন জন্য দেবগণের সম্মিলিত শক্তি মহালক্ষ্মী দশপ্রহরণধারিণীরূপে প্রকটিতা! অপূর্ব সংগ্রামে সেই পশুভাব নির্জিত করিয়া বিজয়িনী সাক্ষাৎভাবে দেবগণের স্তব শ্রবণ করিয়া, পূজা গ্রহণ করিয়া বলিয়া গেলেন, 'যখনই তোমরা বিপদে পড়িবে আমাকে ডাকিও।' যখনই তাঁহাকে ভুলি, তখনই আমরা বিপদে পড়ি, তখনই অসুরশক্তি মাথা চাড়া দেয়।

তৃতীয় চরিত্রে শুরু হয় রজোগুণের শেষ লীলা মানবিক স্তরে—কাম ক্রোধ লোভ মোহ বাসনার শতকোটি অশুভশক্তিকে ধ্বংস করিতে দেবী এবার নিজস্বরূপশক্তিতে আবির্ভূতা। অদ্ভুত অভূতপূর্ব যুদ্ধের শেষে কল্যাণশক্তি কল্যাণী অকল্যাণের যাবতীয় শক্তিকে নিঃশেষিত করিয়া আবার দাঁড়াইলেন দেবতাদের পূজাগ্রহণের জন্য—এবার নারায়ণীমূর্তিতে গুণাতীতা অথচ ত্রিগুণময়ী অপরূপ মূর্তিতে!

যিনি অরূপ তাঁহারই অশেষ রূপ, আমরা তাঁহারই কাছে প্রার্থনা করি 'রূপং দেহি'—দেখা দাও তোমার অপরূপ অশেষরূপে! যিনি সর্বশক্তির ঘনীভূতা মূর্তি সর্বশক্তিস্বরূপিণী আমরা তাঁহারই কাছে প্রার্থনা করি 'জয়ং দেহি'। আমরা জানি এই জীবন সংগ্রাম, আরও জানিয়াছি, অন্তরের শক্তি দ্বারাই আমরা জয়লাভ করিব এই জীবন-সংগ্রামে। তাই সেই অন্তর্যামিনী মহাশক্তির কাছে আমরা প্রার্থনা করি: 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি'।

অজানা দেবতা*

স্বামী বিবেকানন্দ

১

অন্ধকার নিরালার বিসর্পিল পথে
ক্লান্তপদে
এ নির্মম নিরানন্দ জীবনের ভার-নত
চলেছে পথিক।
হৃদয়ের মননের কোন প্রান্ত হ'তে
কোথাও মেলে না প্রাণে
নিমেষের প্রেরণা-স্পন্দন।
অবশেষে একদা যখন
লুপ্তপ্রায় সীমারেখা
ভালোমন্দ সুখদুঃখ জন্মমরণের—
অকস্মাৎ উদ্ভাসিল পুণ্যরজনীতে
অপরূপ জ্যোতিরেখা হৃদয়েতে তার।
কোন্ উৎস হ'তে এলো অচেনা এ আলো—
কিছুই তো জানে না সে।
তবুও জানালো সেই আলোক-ঈশ্বরে
তার প্রাণের প্রণাম।
অজানা আশার বাণী
ব্যাপ্ত হ'ল সমগ্র সত্তায়,
স্বপ্নাতীত মহিমায়
পূর্ণ ক'রে দিল তার সমস্ত ভুবন,
সে ভুবন পার হয়ে আভাসিল আর এক জগৎ।
বলিলেন মৃদু হেসে পণ্ডিতের দল—
'অন্ধ এ বিশ্বাস।'
সে আলোর দীপ্ত কান্তি অনুভব করি'
বলিল সে মন্ত্র প্রত্যুত্তরে,
'ধন্য মানি এ অন্ধবিশ্বাস।'

২

স্বাস্থ্য শক্তি সম্পদের সুরামত্ত
আর এক পথিক,
জীবনের ঘূর্ণস্রোতে ছুটে চলে
উন্মাদের মতো,
অবশেষে একদা যখন
এ পৃথিবী মনে হয় বিলাস-কান
খেলার পুতুল যত
কীটসম মানুষের দল,
নিয়তচঞ্চল যত বিলাসের বিচ্ছুরিত আলো
দৃষ্টিরে আচ্ছন্ন করে,—ইন্দ্রিয় অবশ,
সুখদুঃখ একাকার, অনুভূতিহীন;
প্রমোদমদিরামত্ত মহামূল্য এ দেহচেতনা
শবসম লগ্ন হয়ে থাকে দুই বাহুপাশে,
যত সে ছাড়াতে চায়,
তত তার বক্ষ জুড়ে আসে
উন্মাদ-কল্পনা-ভরে বহুরূপে
মৃত্যুরে সে চায়,
ফিরে আসে আর বার মুগ্ধ আকর্ষণে।
তারপর একদিন
দুর্ভাগ্যের দাহ এল নেমে—
হৃতশক্তি, সম্পদবিহীন,
বেদনায়, অশ্রুধারে, মর্মযন্ত্রণায়—
আত্মীয়তা ফিরে পেল নিখিলজনার।
হাসে বন্ধুজনা।
শুধু তারি কণ্ঠে জাগে সকৃতজ্ঞ বাণী:
'ধন্য এ বেদনা'।

---

* স্বামী বিবেকানন্দের Angels Unawares-কবিতার অনুবাদ। অনুবাদক: শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ।

৩

সুন্দর সুঠাম দেহ,
শুধু মন তার শক্তিহীন—
দুর্বার গভীর কোন আবেগ-সংযমে,
অমোঘ-প্রবৃত্তি-স্রোত
রুদ্ধ করা অসাধ্য তাহার।
সংসারে সবাই তারে—
সদাশয়, ভালো ব'লে জানে।
পরম নিশ্চিন্ত ছিল আপনারে নিয়ে।
দূর হ'তে দেখেছে সে চেয়ে—
সংসার-তরঙ্গসাথে বৃথাযুদ্ধে রত
　　　　নরনারী যত।
দেখিতে দেখিতে মন, মক্ষিকার মত
কেবলি ক্লেদাক্ত দেখে সকল সংসার
　　　　সব গ্লানিময়।
তারপর একদা কখন,
সহসা সৌভাগ্যসূর্য দেখা দিল হেসে,
তারি সঙ্গে ঘটে গেল নির্মম পতন।
　সেই তার দৃষ্টি-উন্মোচন।

বুঝিল সে : নিয়ম ভাঙে না কভু
　　　　তরু ও প্রস্তর,
তবু তারা প্রস্তর ও তরু হ'য়ে থাকে।
নিয়মবন্ধন হ'তে ঊর্ধ্বে এসে
সংগ্রামসাধনা দিয়ে
　　　　ভাগ্যেরে সে ক'রে নেবে জয়—
এ পরম অধিকার মানুষেরই তরে।
চিত্তের জড়তা ঘুচি' নবীন জীবন
　　　　হ'ল মুক্ত, প্রসারিত—
সংগ্রামসমুদ্রপারে যে অনন্ত শান্তি বিরাজিত
তাহারি আলোক-রশ্মি
উদ্ভাসিল জীবনের দিগন্ত-রেখায়।

পশ্চাতে রয়েছে পড়ি'
অতীতের অকৃতার্থ নিষ্ফল জীবন,
তরু ও প্রস্তর সম চেতনাবিহীন,
আর একদিকে তার স্খলনপতন,
যার লাগি' বর্জন করেছে তারে সমস্ত সংসার।
সানন্দ-অন্তরে তবু
ধন্য মানি এ অধঃপতন
ঘোষিল সে : 'ধন্য এই পাপ।'

চলার পথে

'যাত্রী'

গঙ্গার তীরে বসে আছি। পিছনেই মন্দির—বেশ নামকরা মন্দির। মন্দিরের একপাশে মঠ—বহু সাধুর সমাবেশ। বৈকালে এবং সন্ধ্যার কিছুটা পর্যন্ত এ-ধারে লোকসমাগমও মন্দ ছিল না; এখন কিন্তু চৌদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে সুমুখের ঐ চিরপ্রবাহিণী জাহ্নবীর দিকে তাকাচ্ছি—মনে পড়ছে, কয়েকদিন আগে পড়া বই-এর কয়েকটি ছত্র—'আমগাছে বোল আসে রাশি রাশি—ফল হয় কটা? ঝরে-পড়া মুকুলের মতো নিষ্ফলতাই কি আমাদের জীবন?'

প্রশ্নটা বারে বারে মনকে খোঁচা দেয়। দীর্ঘায়ত নদীর দিকে তাকিয়ে তার উত্তর খুঁজি—কিন্তু সন্ধ্যার অলস মুহূর্তগুলি কিছুতেই চিন্তাকে প্রসারিত হ'তে দেয় না। কেবল সুমুখের ঐ মায়াময় স্রোতপ্রবাহ এক মর্মরিত অন্ধকারের সঙ্গে মিশে আমার দেহ-মনকে কি এক অতল সুধারসে ভরিয়ে তোলে। উদাস বাতাস মাঝে মাঝে তার দমকা ধাক্কায় প্রাণকে নাড়া দিয়ে সজাগ ক'রে তুললেও সঠিক চেতনা ফিরিয়ে দিতে পারে না। অভিনব স্বপ্নরাজ্যের ঘোর আর তাই কাটে না। সময় শুধু বয়ে যায়।

আবার তাকাই জলপ্রবাহের দিকে। মনের আকাশের সঙ্কুচিত ভাবনার রঙ বদলায়। নদীর চিরন্তন প্রবহমানতায় সহজাত এমন কিছু আছে, যার ছোঁয়ায় আমার সুমুখের এই নিঃসঙ্গ পৃথিবীর স্তিমিত পটভূমি হঠাৎ এক ভাবের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তার সান্নিধ্যে তখন আবার চেতনা ফিরে পাই—চিন্তার ফানুসও ওড়াই।

নদীর অশ্রান্ত গতি—চিরউৎসাহে নবীন হয়ে কতকাল ধরে চলেছে তো চলেইছে। তার সেই পুরাতন ছন্দেতে কিন্তু আজও ছেদ প'ড়ল না। সুমুখে, নদীর ওপারে, উজ্জ্বল আলোগুলির দীপ্তি নদীর ঢেউয়ের ছন্দে মিশে কেমন এক রহস্যময়তায় গাঢ় হয়ে উঠেছে। এর ডাইনে আবছা, বোঝা যাচ্ছে—সেই বিখ্যাত শ্মশান-ভূমি, সেই অন্তিম আহ্বানের ধোঁয়া ও আগুন—বিশাল পৃথিবীর জনতার মধ্যে একজনের শেষ নিশ্চিহ্নতার স্বাক্ষর যেখানে ফুটে ওঠে। চিন্তাও তাই তখন কোন্ ফাঁকে এ-সবকে ঘিরে এক স্বপ্নে-জড়ানো রহস্য-পথে কতদূর এগিয়ে গেছে।

আবার ভাবছি—এই উদ্দেশ্যহীন জীবনে পথিকৃৎ কে হবে?—ঐ শ্মশানের শেষ পরিণতি, না, ঐ নদীর অবিশ্রাম গতি? উত্তর পাই না। স্মৃতির রোমন্থনও তখন থেমে গেছে। সুমুখের প্রসারিত দৃষ্টির রেখা ধরে মনটাকে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম—সফল হ'ল না। কেবল মনে হ'তে লাগল—চারিদিকের এই স্বপ্নসম্ভারের সাথে আশ্চর্যভাবে সুর মিলিয়েছে ঐ চলমান নদী। মাঝে মাঝে তাই চোখ মেলি, আর মনের মধ্যে এক বিচিত্র নির্বিরোধ অনুভূতি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকি।

একটু পরেই আবার সম্বিৎ ফিরে আসে। নদী যেন আমার সঙ্গে তখন শরীরী হয়ে কথা বলতে লেগেছে। সুপ্তিভঙ্গের সাড়া তখন আমার চেতনায় উদ্বেলিত। আধ্যাত্মিক জাগৃতির লক্ষণ এতে নেই। তবুও কে যেন বারে বারে আশ্বাস দিয়ে শোনাচ্ছে—'Learn

to recognize the mother in Evil, Terror, Sorrow, Denial, as well as in sweetness and joy'—আনন্দ ও মধুরতার জননীই যে আবার বীভৎসতা, ভয়, দুঃখ ও নিঃস্বতার জননী এ-কথা বুঝতে শেখো।

কে এই জননী? কে সে?—কে তা জানি না, চিনিও না। তবুও তাঁর অদৃশ্য আবির্ভাবে চৈতন্যের স্ফুরণ হয়। একটা চিরন্তনতা মূর্ত হয়ে ওঠে—চিন্তার সূত্রে আবার কিছুটা ভাবের মালা গাঁথা হয়ে যায়। ভাবি, নদী কি ক'রে পেল এই অবিরাম চলার শ্রান্তিহীন আনন্দ? সেই কবে বেরিয়েছে সে হিমালয়ের এক তুষার-প্রস্রবণ থেকে—আজও তার গতি থামল না। কত বাধা, কত বিপত্তি তাকে থামাতে চেয়েছে, সে কিন্তু সবকিছু কাটিয়ে, তার চলার তরঙ্গে শিহরণ তুলে সেই সত্য-শরণের জন্য আকুল হয়ে ছুটে চলেছে। আমাদেরও তো ঐভাবে চিত্তের চির-প্রোজ্জ্বল দীপটি জ্বেলে অনবরত খুঁজতে হবে সেই চিরশরণকে। ঐ নদীর স্রোতের মতোই হবে তার অফুরান জাগরণ। এই নিত্য চলার নিষ্ঠাটিকে আমাদেরও তো আপন ক'রে নিতে হবে।

তাই বলি, পূজার লগ্ন বয়ে যায়, ক'রছ কি পথিক? চল আর দেরি নয়, পূজায় বসি। চল, সেই নিত্যশরণের আগল-ভাঙা আহ্বানে সাড়া দিতে যাই চল। সর্বসুপ্তির অন্ধকার ঘুচিয়ে সেই আলোক-দিশারীর দিকে চল। যেখানে পৌঁছলে তোমার চিত্তের সুদূর-বিস্তৃত যবনিকা সরে গিয়ে এক অত্যদ্ভুত আনন্দের আস্বাদন পাবে। চল, চল আর দেরি নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

বরাভয়া মা এসেছে!

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

বোধন-বাঁশী উঠলো বেজে, দিগন্ত চঞ্চল,
রূপের রাগে মধুর হাসে সারা জল-স্থল!
পূর্ণ ক'রে বনস্থলী,
উঠলো ফুটে কুসুম-কলি,
উঠলো ফুটে সরোবরে কুমুদ-কমল-দল!
আগমনীর বাঁশীর সুরে দিগন্ত চঞ্চল!

আঙিনাতে শিউলি আজি আঁকছে আলিম্পন,
অপ্‌রাজিতা কণ্ঠ-মালা করছে বিরচন!
বনের পথে শুভ্র কাশে,
দোলন লাগে কি উল্লাসে,
শিশির-জলে সিক্ত-তৃণে জাগছে শিহরণ!
শিউলি আজি মায়ের তরে আঁকছে আলিম্পন!

মুক্ত আকাশ নীল হ'ল আজ, মধুর প্রাণময়,
এ যেন মা'র সহজ সরল উদার অভ্যুদয় !
এ যেন মা'র দৃষ্টি-সুধা,
মিটাতে চায় সকল ক্ষুধা,
এ যেন মা'র স্নেহ-শীতল বুকের বরাভয় !
মায়ের মধুর দৃষ্টি ভরা—আকাশ প্রাণময় !

মা এসেছে, মা এসেছে, পূজা যে আজ তাঁর,
নিঃস্ব ও দীন আয় নিয়ে আয় প্রাণের উপচার !
মায়ের রাতুল অভয়-চরণ,
নিতে হবে আজকে শরণ,
থাকবে নাক' দুঃখ-বেদন, করুণ হাহাকার !
অভয়া মা এসেছে অই—পূজা যে আজ তাঁর !

মা আমাদের রাজেশ্বরী, রিক্ত মোরা নই,
কেন রে হায়, কাঙাল সেজে দুখের বোঝা বই !
মা যে স্নেহের অসীম খনি,
সেই ধনেতে আমরা ধনী,
মায়ের স্নেহের অঙ্ক 'পরে আমরা সদা রই !
মা আমাদের রাজেশ্বরী, রিক্ত মোরা নই !

দূরে দূরে আছিস্ কে রে, আয় তোরা সন্তান !
আজ বোধনের শঙ্খ-রোলে মা করে আহ্বান !
অর্ঘ্য ল'য়ে হস্ত-পুটে,
মায়ের পায়ে পড়্ রে লুটে,
মায়ের স্নেহের অঝোর-ধারায় কর্ রে অভিস্নান !
বরাভয়া মা এসেছে, আয় তোরা সন্তান !

মহামায়ার স্বরূপ ও উপাসনার স্থান

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

বেদান্তাদি শাস্ত্রে মায়ার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে মহামায়াও কি মিথ্যা? শাস্ত্রে অনেক স্থলে ভগবতী দুর্গাকে মায়া, প্রকৃতি, মহামায়া ইত্যাদি শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে।[১] এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়: না, মায়া মিথ্যা হইলেও দেবী মহামায়া মিথ্যা নয়, কারণ মহামায়া কেবল মায়া-স্বরূপ নয়। দেবী-উপনিষৎ, ত্রিপুরা-উপনিষৎ, ত্রিপুরাতাপিনী প্রভৃতি উপনিষদে দুর্গাদেবীকে জগতের মূলীভূত চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মরূপিণী বলা হইয়াছে। পুরাণ এবং উপপুরাণেও মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী, জগদম্বিকা, দুর্গা, শক্তি প্রভৃতিরূপে কীর্তিত হইয়াছেন। চণ্ডীতে স্পষ্টই আছে—'ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা' অর্থাৎ তুমি জ্ঞান (চৈতন্য)-রূপা বুদ্ধি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে দুর্গা বা মহামায়ার স্বরূপ কি? তিনি কি অদ্বৈতবেদান্ত মতানুসারে শুদ্ধ ব্রহ্ম, অথবা মায়াবিশিষ্ট-ব্রহ্ম-রূপ ঈশ্বর, অথবা চিজ্জড়াত্মক পৃথক্ পদার্থ? কারণ, দেবী যেমন চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন, সেইরূপ বহুস্থলে তিনি প্রকৃতি, শক্তি, মায়া, মহামায়া, জগৎকারণ, বিশ্বকর্ত্রী ইত্যাদি রূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের শুদ্ধব্রহ্মে জগৎকারণত্ব বা কর্তৃত্ব প্রভৃতি কোন বিশেষ ধর্ম নাই। সুতরাং মহামায়া শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ নহেন। আবার তাঁহাকে চিজ্জড়াত্মক পৃথক্ পদার্থ বলিলে ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব-হানি হয়। আর যদি তাঁহাকে মায়াবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপ ঈশ্বরাত্মক স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মায়ার মিথ্যাত্বহেতু তাঁহারও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব মহামায়ার স্বরূপ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, মহামায়া বা দুর্গাদেবী প্রকৃত পক্ষে শুদ্ধব্রহ্মই। তবে যে শাস্ত্রে তাঁহাকে জগৎকর্ত্রী, পালয়িত্রী, সংহর্ত্রী, শক্তি, অচেতন-চেতনাত্মক সর্বজগৎস্বরূপিণী বলা হইয়াছে, তাহা মানুষের মঙ্গলের নিমিত্ত। অদ্বৈতব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝিতে ও সাক্ষাৎকার করিতে জগতে অতি অল্প ব্যক্তিই সমর্থ। অত্যন্তবৈরাগ্যবান্, অত্যন্তনির্মলচিত্ত, অতি-তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিই অদ্বৈততত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই অদ্বৈত-ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারে না। অথচ অদ্বৈত-ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ব্যতীত সংসার হইতে মুক্তি অসম্ভব।

মন্দবুদ্ধি মনুষ্যগণ যাহাতে ব্রহ্মকে ধরিতে বুঝিতে পারে এবং তাঁহার উপাসনাদি করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, সেই জন্য শাস্ত্র ব্রহ্মকে মায়াবচ্ছিন্ন জগৎকারণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।[২]

---

১ 'মায়া বা এষা নারসিংহী সর্বমিদং সৃজতি সর্বমিদং রক্ষতি' ইত্যাদি [তাপনীয় উপনিষৎ] অর্থ:—এই নারসিংহী মায়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি ও রক্ষা করেন।

'ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া' [চণ্ডী ১১ অ:] চণ্ডীতে প্রকৃতি, শক্তি, মহামায়া শব্দের উল্লেখ বহু স্থলে আছে।

২ 'নির্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥'

অর্থাৎ যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ নির্গুণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে অসমর্থ, তাহাদের প্রতি অনুকম্পা করিয়াই শাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছে।

এই জন্য শাস্ত্রে মহামায়াকে কোথাও শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ বলা হইয়াছে, আবার কোথাও গুণময়ী বলা হইয়াছে; আর ইহাতে অদ্বৈতত্বের হানি হয় না। কারণ—একই বস্তুকে অধিকারভেদে সগুণ ও নির্গুণ বলা হইয়াছে। দেবীভাগবতেও মহামায়াকে সগুণা এবং নির্গুণা উভয় রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৩] সুতরাং দেবীর স্বরূপ লক্ষণ=সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। ত্রিপুরাতাপিনী উপনিষদে আছে—সেই দেবী পরম পুরুষ, চিদ্রূপ, পরমাত্মা, সকলের অন্তঃপুরুষ আত্মা; তিনিই জ্ঞাতব্য। মহামায়ার তটস্থ লক্ষণ=তিনি সকল জগতের আদিকারণ; এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও প্রসূতি। দেবী-উপনিষদে আছে—তাঁহা হইতেই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; তিনিই সর্বাত্মক।

প্রশ্ন হইতে পারে: এই মহামায়া কিরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কারণ হন? শাস্ত্রে কোথাও বিষ্ণুকেই সর্বজগৎকারণ, কোথাও বা মহেশ্বরকে সর্বজগৎকারণ, কোথাও বা ব্রহ্মাকে সকলের কারণ বলা হইয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, সেই শাস্ত্রেই আবার মহামায়াকে সর্ব-কারণ বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন এপক্ষে যুক্তিও আছে, যথা—রজোগুণপ্রধান মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যই ব্রহ্মা; শাস্ত্রে ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা বলা হইয়াছে; সৃষ্টি রজোগুণের কার্য। সত্ত্বগুণ-প্রধান মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যই বিষ্ণু; বিষ্ণু পালন-কর্তা; পালন সত্ত্বগুণের ধর্ম; এই জন্য বিষ্ণু সত্ত্বপ্রধান। তমঃপ্রধান মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই শিব; শিব সংহারকর্তা; সংহার তমোগুণের ধর্ম। কিন্তু সাম্যাবস্থাপন্ন সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যই মহামায়া দুর্গা।

সাংখ্যমতে যেমন তিনগুণের সাম্যাবস্থাত্মক প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ; সেই প্রকৃতি হইতে গুণের বৈষম্যযুক্ত 'মহৎ তত্ত্ব' প্রভৃতি কার্য উৎপন্ন হয়; সেইরূপ তিনগুণের সাম্যাবস্থাপন্ন মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ মহামায়া হইতে এক একটি গুণপ্রধান বিশিষ্ট চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হয়। মহামায়ার উৎপত্তি নাই, কারণ সাম্যাবস্থাপন্ন মায়া অনাদি। এইজন্য দেবীভাগবত, দেবীমাহাত্ম্য, দেবী-উপনিষৎ প্রভৃতিতে এবং সকল তন্ত্র ও অন্যান্য অনেক পুরাণ ও উপপুরাণে মহামায়া সর্বজগৎকারণ, আদ্যাশক্তি, পরমাপ্রকৃতি ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

যদিও চৈতন্যের উৎপত্তি নাই, তথাপি যেমন অন্তঃকরণ প্রভৃতির উৎপত্তি-বশতঃ সেই অন্তঃকরণ প্রভৃতির দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ জীবের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, সেইরূপ সত্ত্ব রজঃ প্রভৃতি এক একটি গুণপ্রধান মায়ার উৎপত্তি-বশতঃ তাদৃশ মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মা প্রভৃতিরও উৎপত্তি যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। এই যুক্তিতে সাম্যাবস্থাপন্ন মায়ার উৎপত্তি না থাকায় তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যাত্মক মহামায়ার উৎপত্তি নাই। তবে যে অনেক শাস্ত্রে ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা শিবকে অনাদি বলা হইয়াছে, তাহা এই যুক্তিতে বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ সেখানে সাম্যাবস্থাপন্ন মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা মহেশ্বর বুঝিতে হইবে। এইভাবে ধরিলে আর কোন বিরোধ হয় না।

যাহা হউক আমরা সংক্ষেপে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা মহামায়ার জগৎকারণত্ব, সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও ব্রহ্মস্বরূপত্ব দেখিতে পাইলাম। এখন এই

---

৩ নির্গুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণা রাগিভিঃ প্রোক্তা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ॥
অর্থাৎ জ্ঞানিগণ মহামায়াকে সগুণা ও নির্গুণা এই দুইভাবে বলিয়াছেন। সংসারে আসক্ত ব্যক্তিগণ সগুণভাবে ভজন করিবেন; বিরাগিগণ নির্গুণভাবেচিন্তা করিবেন।

মহামায়ার উপাসনার স্থান কোথায় এবং ইহার কি ফল—তাহাই সংক্ষেপে দেখাইয়া বক্তব্য শেষ করিব। শাস্ত্রে কোথাও জড়ের উপাসনা নাই। এইজন্য যাহারা হিন্দুগণকে পৌত্তলিক বলিয়া থাকে, তাহারা কৃপার পাত্র। শুদ্ধ-চৈতন্য বা ব্রহ্মের উপাসনা অসম্ভব। অথচ শাস্ত্র মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের জন্য জল, প্রতিমা, ঘট, পট, যন্ত্র, বীজ, ওঁকার, হৃৎপদ্ম প্রভৃতি উপাধির উপদেশ দিয়া সেই সেই উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। যেমন খড়্গ, জল ও দর্পণ প্রভৃতিতে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যাইলেও দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কারণ দর্পণ-রূপ উপাধি স্বচ্ছ; সেইরূপ একই চৈতন্য সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, বায়ু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, তারা প্রভৃতি রূপে প্রতিভাত হইলেও উপাধির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে সেই সেই দেবতারও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সিদ্ধ হয়। মহামায়া বা দুর্গা বা কালী নামক আদ্যাশক্তির উপাধি হইতেছে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত মায়া—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ মায়ার শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ মহামায়ার শ্রেষ্ঠত্ব এবং এই কারণেই তাঁহার উপাসনারও শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হয়।

এই মহামায়াকে উপাসনা করিলে ব্রহ্ম শীঘ্র প্রসন্ন হন এবং সাধককে বাঞ্ছিত ফল দেন। কারণ ব্রহ্মের সহিত মায়ার সম্বন্ধ নিকটতম। মায়া ব্রহ্মে সাক্ষাৎ আশ্রিত। মায়ার কার্য, সত্ত্ব রজঃ বা তমঃ প্রভৃতি এক একটি গুণ বা তাহার কার্য বুদ্ধি প্রভৃতি মায়ার দ্বারা ব্রহ্মে আশ্রিত। অতএব সেই সাক্ষাৎ আশ্রিত মায়াবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপ মহামায়ার উপাসনা করিলে যে শীঘ্রই ব্রহ্ম কৃপা করিবেন, তাহা যুক্তির দ্বারাও পাওয়া যায়।

সমস্ত তন্ত্র, দেবীমাহাত্ম্য, দেবীপুরাণ, দেবী-ভাগবত প্রভৃতিতে মহামায়ার উপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা এবং ইহাতে শীঘ্র ফললাভ হয়—ইহা উক্ত আছে। তা ছাড়া সব দেবতার উপাসনায় দ্বারা সব ফল পাওয়া যায় না, কিন্তু এই একমাত্র দেবীর উপাসনায় সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি ইঁহার উপাসনায় ইহলোকে সকল প্রকার বাঞ্ছিত ভোগ এবং মৃত্যুর পর দেবী-লোকে গমন বা তাঁহার কৃপায় মুক্তিও সাধিত হয়।

'এবং যঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্।
ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবী-সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥'

সকল তন্ত্রের এই মত।

সকল ব্রাহ্মণই এই শক্তির উপাসনা করেন, কারণ তাঁহারা গায়ত্রীর উপাসনা করেন। যথা:

'ব্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্॥'

এই মহামায়া দুর্গার উপাসনা যেমন নৈমিত্তিক কর্ম, সেইরূপ ইহা সন্ধ্যাবন্দনার মতো নিত্যকর্মও। এই কথা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তাঁহার দুর্গোৎসব-প্রকরণে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা এবং দেবীভাগবতের উপোদ্ঘাতে টীকাকার নীলকণ্ঠও বলিয়াছেন। সুতরাং শক্তির উপাসনা শ্রেষ্ঠ ও সকলের কর্তব্য।

সগুণব্রহ্মের উপাসনার মধ্যে মহামায়ার উপাসনা যে শ্রেষ্ঠ উপাসনা, তাহার একটি যুক্তি পূর্বে বলা হইয়াছে। তাছাড়া এই সংসারে মানুষের পক্ষে জননী যেরূপ একমাত্র ভরসার স্থল, আশ্রয়, এক-কথায় মানুষের সর্বপ্রকারে শরণ, সেইরূপ আর কেহই নয়। ইহা অতিমূর্খ, শিশু, মহাবিদ্বান্—সকলেই জানেন। আর সংসারে যত প্রকার ভাব আছে,

তাহাদের মধ্যে মাতৃভাব যে অতিপবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবও বলিয়াছেন। শাস্ত্রও অন্যান্য ভাবের—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কথা বলিলেও মাতৃভাবের কথা অধিকভাবেই বলিয়াছেন; সুতরাং মাতৃভাবে মহামায়ার উপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। তন্ত্রাদি শাস্ত্র-পাঠে মাতৃভাবের উপাসনাই—অন্ততঃ কলিযুগে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং সংসারে যেমন মানুষের সর্বাবস্থায় মা-ই একমাত্র ভরসার স্থল, সেইরূপ উপাসনায় মাতৃভাবই সর্বত্র সর্বদা আশ্রয়ণীয়। তন্ত্র বলেন, শক্তি ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না। শিবাবতার শঙ্করাচার্যও তাঁহার শৃঙ্গেরী মঠে ত্রিপুরাযন্ত্র স্থাপন করিয়া স্তবস্তুতিতে শক্তির মাহাত্ম্য ভক্তির সহিত কীর্তন করিয়াছেন। বাংলাদেশে বিশেষভাবে যে শক্তির আরাধনার প্রাচুর্য, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই।

শরত-ভুবনে

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সুন্দর, তুমি শরত-ভুবনে
কী রূপে যে ধরা দিলে!
আকাশগঙ্গা সীমাহীন হ'ল
মরালশুভ্র নীলে।
পাখিডাকা বনে অরুণকিরণ
ছায়া-আলোকের ছড়ালো হিরণ,
ধানখেতে দিল দোলা সমীরণ,
আলো জাগে খালে-বিলে।

পাহাড়শৃঙ্গে ঝলিল তুষার—
শেফালী-সুবাস জাগে।
ঘাসে-ঘাসে হাসে শিশিরবিন্দু
কার যেন ছোঁয়া মাগে।
পদ্মের বনে এনে দিলে ভোর,
কাশের কুঞ্জে খুলে দিলে দোর,
আগমনী-গানে বিশ্বমায়ের
হাসিখানি গেল মিলে।

আগমনী ও বিজয়া

শ্রীমতী উমা সেন

আগমনীর সুরে ভরপুর বাংলার আকাশ বাতাস। শরতের শিউলি-ঝরা সুন্দর প্রাতের শিশির-ভেজা অরুণিমা—নীল আকাশে হালকা মেঘের শুভ্র বলাকা—তার উপর খেলে যায় সোনাঝরা রোদের ঢেউ। চারিদিকেই কি এক আনন্দের আভাস—সব কিছুই যেন ঘোষণা করছে কার শুভ আগমন!

প্রকৃতি সেজেছে নবরূপে—তার সাজানো বাগান অপূর্ব ফলফুলের সম্ভার নিয়ে কার আগমনের আশায় উন্মুখ। গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদ আর বর্ষায় রিম্‌ঝিম্‌ বর্ষণের পর শরতের আগমন ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে আনে এক শান্তসমাহিত ভাব—তাতে উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু উচ্ছলতা নেই। বাতাসে শীতের মৃদু আমেজ তপ্ত প্রাণে বুলিয়ে দেয় শান্তির স্নিগ্ধ পরশ—মুছে দেয় মনের সব গ্লানি। প্রকৃতির এ নবরূপ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দেয় আনন্দের মায়ামন্ত্র—উদাসী মন ডানা মেলে কোন্‌ স্বপ্নরঙীন অজানা আশায়!

এমনি সোনালী সুন্দর ভোরেই হবে মহাপূজার বোধন, বোধনমন্ত্রে ঝঙ্কৃত হবে সকলের মনপ্রাণ। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে আনন্দসাগরে ভাসিয়ে দেবে নিজেদের—শঙ্খশুভ্র ময়ূরপঙ্খীর মতো সাবলীল উল্লাসে। আগমন হবে মা আনন্দময়ীর; গিরিরাজ হিমালয় আর দেবী মেনকা ফিরে পাবেন তাঁদের হারানিধি উমাকে মাত্র তিনটি দিনের জন্য। সেই মহামিলনের আনন্দে আজ সবাই বিভোর! মা মেনকার সুরে সুর মিলিয়ে তাই বাংলার ঘরে ঘরে গীত হয় আগমনী-গীতি:

'এবার আমার উমা এলে
আর উমা পাঠাব না,
মায়ে ঝিয়ে ক'রব ঝগড়া
জামাই ব'লে মানব না।'

দশভুজা মা দুর্গাকে বাঙালী মাতৃজ্ঞানে, কন্যাজ্ঞানে আবাহন জানায়, ভক্তির অর্ঘ্য সাজিয়ে নিবেদন করে মায়ের চরণে।

'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

মায়ের বন্দনামন্ত্রে ধ্বনিত হয় আকাশ বাতাস।

রামচন্দ্রের সেই অকাল-বোধন স্মরণ করেই শারদীয়া মহাপূজার প্রচলন। শরতের আগমনে তাই বাঙালী মেতে ওঠে মহোৎসবের আনন্দে। সেও মাকে অকালেই ডাকতে ভালবাসে।

* * *

আজকাল এ উৎসবে আনন্দ আছে, প্রাণের সাড়া নেই; আড়ম্বর আছে, সমারোহ নেই; সজ্জা আছে, কিন্তু শ্রীর অভাব। বাইরে জৌলসের মুখোস, কিন্তু ভিতরে দৈন্যের হাহাকার। ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতি আজ মাতৃচরণে কি প্রার্থনা জানাবে?—'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি'। কিন্তু খাদ্যসমস্যা-সমাকীর্ণ দেশে রূপ আসবে কোথা থেকে? হতবীর্য জাতি জয় কামনা করবে কোন লজ্জায়? অপযশেই যারা নীলকণ্ঠ, তারা যশ প্রার্থনা করবে কিসের ভরসায়? তবু কালের চাকায় নিষ্পেষিত নরনারী প্রার্থনা জানায় সকল দৈবশক্তির উর্ধ্বে মহাশক্তির কাছে, আর্ত মানুষ কামনা করে সৌভাগ্য, আরোগ্য আর পরমশ্রী। পূজার উৎসব-মণ্ডপে, গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে,

শহরের রাজপথে মানবাত্মা আর্তস্বরে প্রার্থনা জানায় অশিবনাশিনী দুর্গতিহারিণী মা দুর্গার কাছে। উৎসবের ঘটা শেষ হয়ে আসে বিসর্জনের পালা। মা দুর্গাকে বিদায় দেয় ভক্ত বাঙালী অশ্রুজলে ভেসে—চারিদিকে শোনা যায় করুণ গাথা :

'মায়ের কোল আঁধার করি
শিবে নিয়ে যায় গৌরী
মায়ের পরানের ধন
শিবে কৈলাসে লয়ে যায়রে।'

বিসর্জনের পালা শেষ ক'রে সর্বহারা বাঙালী গায়,

'মাকে ভাসিয়ে জলে কি ধন নিয়ে যাব ঘরে
ঘরে গিয়ে মা ব'লে ডাকিব কারে ?'

তার পর শুরু হয় শুভ বিজয়ার সম্প্রীতি-উৎসব। হিংসা-দ্বেষ ভুলে, অতীতের সব গ্লানি মুছে ফেলে, শুচিস্নাত মন নিয়ে একে অপরকে করে কোলাকুলি—সুদৃঢ় হয় প্রাণের প্রীতির বন্ধন।

দুর্গাপূজার এ উৎসবের সঙ্গে হিন্দু বাঙালীর জীবনের গভীর যোগাযোগ রয়ে গেছে। হিন্দু-ধর্ম একই ক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়েছে ভোগ ও ত্যাগের মহান্ আদর্শ—মোহ ও মুক্তির পরম আস্বাদ। জীবনে কত আদরের ধন—স্নেহের পুত্তলিকে যেমন জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে ভস্ম ক'রে আসতে হয় চিতার আগুনে, তেমনি কত সাধ ক'রে গড়া প্রতিমা—শিল্পীর সাধনার ধন—যার জন্য এত আয়োজন, এত সমারোহ, তাকেই উৎসব শেষে কঠিন প্রাণে বিসর্জন দিতে হয়। আগমনী যেখানে আছে, বিজয়া সেখানে আসবেই,—যেমন জন্ম হ'লে মৃত্যু হবেই। তাই কবি গেয়েছেন,

'আগমনী কাছে নিয়ে আসে
বিজয়ার শোক অশ্রুজল,
জীবন সে পূর্ণতার শেষে
পরিণত মরণে কেবল।'

আবাহন আর বিসর্জনের মধ্য দিয়েই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভাঙাগড়ার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করা যায়। আগমনী ও বিজয়ার মধ্যে আমাদের সমগ্র জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

বছর বছর সম্পন্ন হয় শারদীয় মহোৎসব। শ্রীরামচন্দ্র দেবীর অকালবোধন করেছিলেন রাবণ-বধের জন্য, যুগে যুগে অসুরনাশিনী মায়ের আবির্ভাবে দূর হয় হিংসা-উন্মত্ত পৃথ্বীর দানবরূপী কুটিলতা আর নারকীয় মনোভাব। আজ অজ্ঞানের অন্ধকার টুটে গিয়ে প্রকাশিত হোক চিরজ্যোতিষ্মান্ সত্য শিব সুন্দরের দিব্য জ্যোতি। অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হোক :

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥

আগমনী

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

শারদা মায়ের আসার আভাস এনেছে শরতরানী
রচিতে মায়ের পূজার অর্ঘ্য সাজায়ে ধরণীখানি।
মেঘ ঢালি জল করিছে মেদুর,
ধরণী শ্যামলে কোমলে মধুর,
আকাশে বাতাসে করে কানাকানি
হয়ে গেছে জানাজানি,
মায়ের আসার শুভ সমাচার এনেছে শরতরানী।

এসেছে শরত বারতা মায়ের, আসিছে শুভঙ্করী,
সবুজ সোনালী সোনার ফসলে ক্ষেত-মাঠ গেছে ভরি।
শ্যাম তৃণদল সবুজ সুতায়
মা'র তরে শাড়ী বোনে নিরালায়,
রুপালী ফুলের মরি কি বাহার—
শিশির পড়িছে ঝরি!
বনে বনে ফেরে মধু গুঞ্জরি মধুকর-মধুকরী।

কমল-কোরক ফোটেনি এখনো যার তরে দিন গোনে,
বাজে কি মায়ের চরণ-নূপুর, কান পেতে তাই শোনে।
রাখিতে মায়ের কমল চরণ
শেফালী ঝরিয়া বিছায় আঁচল,
সুরভি বিভল উতলা পরানে,
কল্পনা জাল বোনে,
জাগে কি মায়ের আসার আভাস পুবালী আকাশ-কোণে!

দূর নীল নভে উজল-উছল, চাঁদিমা-তপন তারা—
ঢালিছে আবেগে আবেশে বিভোর, জোছনা কিরণধারা।
গাহিছে তটিনী কলকল ভাষে
শোভে দুই তীর বনফুল-কাশে
ধরণীর মাঝে আশা-আশ্বাসে
জাগিছে পুলক সাড়া,
এসেছে শরত ধূসর ধরায় মধুর জীবন-ধারা।

রামধনু-আঁকা শরত-আকাশে সোনার তরিটি বেয়ে
আসিছে জননী নিখিল প্রাণের সাগরের জলে নেয়ে।
বাজিছে মায়ের বোধনের বাঁশী—
শরতরানীর মুখে মধুহাসি,
মিলিছে সকলে ধরাবেদীমূলে
জননীর জয় গেয়ে,
আকাশে বাতাসে নিখিল ভুবনে সুরে-সুরে যায় ছেয়ে।

ভুবন-আসরে শরতরানীর পড়ে গেছে কত ত্বরা—
নব রূপায়ণে রূপায়িত করি, রূপময়ী হ'ল ধরা।
রূপের মাঝারে আসিবে অরূপ
ধরণী যে তাই হ'ল অপরূপ
রূপের মরতে মধুর-মূরতি
আসে চিরমনোহরা,—
মধুক্ষরা এই মধুর-ধরায়,—মধুময়ী দেবে ধরা।

বহ্নি-ললাটিকা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মাগো, অনেক ভক্ত দাঁড়াবে আজ পূজার বেদীতলে,
সাজিয়ে দেবে চরণে তোর—কেউ বা চোখের জলে—
পূজার অর্ঘ্য, প্রাণের জ্বালা, মনের অন্ধকার ;
শুনবে তুমি অনেক মন্ত্র মাতৃ-বন্দনার
গুঞ্জরিত চতুর্দিকে ; আগমনীর দিনে
আনন্দগান উঠবে বাজি বিশ্বকবির বীণে।
সেই সে কবির হাতের ছোঁয়ায় চন্দ্র সূর্য তারা
আনে আকাশ-ছাওয়া আলো, আনে জীবন-ধারা।
আনন্দ-রূপ, অমৃত-রূপ তোমার মহিমা যে
অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রাণ শাশ্বত বিরাজে।
শিব-জটার গঙ্গাজলে তোমার অভিষেক
বিশ্বভুবন চেয়ে আছে নয়ন নির্নিমেখ।
অগ্নিমন্ত্র দাও মা তুমি, অভয় দাও মা মনে
বাজাও তোমার বিজয়-শঙ্খ আজকে শুভক্ষণে।
সবার্থ সাধন লাগি দাও মা শুভব্রত
চরণে তোর অনর্থেরা মাথা করুক নত।
আমি মা তোর চিরকালের কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে
কোলে তুলি নিয়েছিলি মা আবর্জনা ঠেলে,
অবোধ আমি, অবাধ্য যে, আমি যে অজ্ঞান
পালিয়ে বেড়াই, লুকিয়ে থাকি, জানি না সন্ধান
শান্তি কোথা, তৃপ্তি কোথা, কোথায় স্নেহ পাই ?
কোথায় আছে ঠাঁই ?
কোথায় জুড়াই এ যন্ত্রণা নিষ্ঠুর সংসারে ?
সব থেকেও যে নাইক' কিছু, তাইতো বারে বারে
পথ ভুলে যাই ; তবু জানি আমার যাত্রাশেষে
কে দাঁড়াবে হেসে
হাতে নিয়ে মঙ্গলদীপ, আশীর্বাদী ফুল—
সেই তো আমার সান্ত্বনা মা, সংশয়সঙ্কুল
অন্ধকারে সেই তো আমার জ্যোতির্ময়ী শিখা
আমার ধ্যানের বহ্নি-ললাটিকা।

জগন্মাতার বালিকামূর্তি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

জগন্মাতাকে বালিকা কল্পনা করিয়া উপাসনা হিন্দুধর্মের একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। মানবহৃদয়ের একটি প্রগাঢ় নির্মল আবেগকে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত করিয়া ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং প্রেমকে অনুভব—ইহা যাঁহারা প্রবর্তনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন একাধারে শিল্পী, কবি, মনস্তাত্ত্বিক এবং তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষি। তাঁহাদের উদ্দেশে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। শিশু-মাত্রেরই প্রতি পরিণত-বয়স্কের স্নেহ স্বাভাবিক হইলেও পুরুষ-শিশু ও স্ত্রী-শিশু—এই দুইয়ের উপর ঐ স্নেহের যে কিছু পার্থক্য আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। খোকা দুষ্টুমি করিলে মা তাহার গায়ে কখনও একটি চড় বসাইয়া দেন, কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় খুকুমণির দেহে করাঘাত করিবার আগে তাঁহাকে তিনবার ভাবিতে হয়। খোকা ও খুকুর স্নেহের দাবি যদিও সমান, তবুও ঐ স্নেহের অভিব্যক্তি একরূপ নয়। ভক্তির আচার্যগণকে ঈশ্বরের প্রতি বাৎসল্যভাবকেও সেই জন্য দুইটি পৃথক্ রীতিতে প্রকাশ করিতে হইয়াছে। বালক কৃষ্ণ বা বালক রামের কাহিনী গান ও স্তোত্রাদিতে ভগবানের ঐশ্বর্যভাব কিছু কিছু প্রকাশ না করিয়া পারা যায় নাই। গোপাল গোকুলে কখনও কখনও নিরীহ শিশু, কিন্তু অন্য সময়ে তাঁহার চাপল্যের কি অবধি আছে? এবং ঐ চাপল্যের সুযোগে পুরাণকারেরা ভগবানের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কত না শক্তি গোপাল-চরিতে জুড়িয়া দিয়াছেন—পূতনাবধ, কালীয়-দমন, এমন কি গোবর্ধন-ধারণ পর্যন্ত। বাৎসল্যরতির সাধক-সাধিকারা যখন গোপালের ধ্যান চিন্তা করেন, তখন শুধু স্তন্যপায়ী বা ক্রীড়ারত শিশুটিকে মনে রাখেন কি, না শিশুর ঐ সকল অলৌকিক বিভূতিকেও?

কিন্তু যিনি তরুণ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে অপূর্বা তরুণী-রূপে দেখা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীমতী রাধিকার বালিকাকালের খবর কি? না, তাঁহার বালিকাকাল বলিয়া কিছু ছিল না? একটি পৌরাণিক কাহিনী কতকটা এইরূপই আভাস দেয়। ঐ কাহিনী অনুসারে গোলক-ধামে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হইতে তাঁহার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধারূপে আবির্ভূতা হন একেবারে নবযৌবনসম্পন্না ষোড়শীরূপে। তা গোলকে যাহাই হউক, মর্ত্যের রাধা মর্ত্যের কৃষ্ণের ন্যায় পিতা বৃষভানু এবং মাতা কলাবতীর গৃহে বাল্যকাল যে কাটাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাণে পাই, বারো বৎসর বয়সে আয়ান ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বারো বৎসর বয়সের সীমানায় বালক শ্রীকৃষ্ণের জীবনে তো বহুতর অলৌকিক ঘটনা জমিয়া গিয়াছে। ঐ সব ঘটনার প্রত্যেকটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভক্তের চিত্তে কত স্নিগ্ধতা, কত মাধুর্য, কত প্রেরণা সঞ্চার করিয়া আসিতেছে। তুলনায় বালিকা রাধা কি সঞ্চয় করিয়াছিলেন? বালক শ্রীকৃষ্ণকে বেড়িয়া যে আনন্দ এবং ভগবদৈশ্বর্যের পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল, বৃষভানু-কলাবতীর গৃহে এবং পল্লীতে বালিকা রাধাকে কেন্দ্র করিয়া অনুরূপ কোন কিছু

জমায়তের খবর তো বড় পাই না। পুরাণকারদের ভুল? -উপেক্ষা?—প্রয়োজনহীনতা? না। শ্রীকৃষ্ণ যদি জগন্নাথ হন, তাহা হইলে তাঁহার চিচ্ছক্তি শ্রীরাধাও জগন্মাতা। জগন্নাথের শৈশবলীলা যদি বাৎসল্যভক্তির উপজীব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে জগন্মাতার বালিকাবৃত্তও নিশ্চিতই ঐ উপজীব্যতার দাবি করিতে পারে। ব্যাপারটি এই যে, বালিকাকালে রাধারানী যে আনন্দপরিবেশ রচনা করিয়াছিলেন, লিখিত বা কথিত কথিকায় তাহা প্রকাশ্য নয়। উহার প্রকৃতিই যে পৃথক্। হৃদয়ের গভীরে ঐশ্বর্যহীন এক অনন্যসুন্দর শুভ্র সরলতার পটভূমিকায় বালিকা রাধারানীকে দেখিতে হয়, দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, মুগ্ধ হইয়া হাসিতে হয়, কাঁদিতে হয়, চেতনা হারাইতে হয়। না, গোচারণ নাই, বাঁশী-বাজানো নাই, কালীয়দমন, গোবর্ধন-ধারণ—এ সকল কিছুই নাই। জগন্মাতা যে বালিকারূপে জন্মগ্রহণ করিযাছেন, ডুরে শাড়িখানি পরিয়া বালিকাবেশে মায়ের পাশে পাশে ঘুর ঘুর করিতেছেন, এই চিত্রই রাধা-বাৎসল্যসাধকদের পক্ষে পর্যাপ্ত। ইহা ঠিক যে, বাৎসল্যরতির সাধক-সাধিকাদের অধিকাংশই বালগোপালকেই স্মরণ করেন, পূজা করেন; কিন্তু বালিকা রাধারানীরও ভক্তের অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের আরাধনা গোপনে, হৃদয়ের ভাবলোকে। বালিকা রাধার মূর্তি গড়া যায় না, আঁকা যায় না; কাহিনী কবিতা দিয়া বর্ণনা করা যায় না। সে মূর্তিতে অলঙ্কার নাই, আভরণ নাই; সে গল্পে বীররস নাই, উত্তেজনা নাই।

বালক রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার চত্বরে দৌড়ঝাঁপ করিয়া রাজা দশরথ, তিন মহিষী এবং মন্ত্রী অমাত্য সভাসদ্ দাসদাসী তথা সমগ্র অযোধ্যার নরনারীর হৃদয়ে আনন্দের তুফান ছুটাইতেছেন, তখন মিথিলাপুরীতে রাজর্ষি জনকের অট্টালিকায় একটি বালিকা কি করিতেছিল? তাহাকে ঘিরিয়া কি কোন নাটক জমিয়া উঠে নাই? নিশ্চিতই উঠিয়াছিল। তবে কবিদের লেখনী সে নাটককে লিপিবদ্ধ করে নাই, করা যায় না বলিয়া। গোঁসাই তুলসীদাসজী 'ঠমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পৈজনিঁয়া' গান লিখিয়াছেন—শিশু রঘুনাথের নৃত্যরঙ্গের গান। কিন্তু বালিকা জানকীর সম্বন্ধে তেমন তো কিছু লিখেন নাই। নিশ্চিতই বিস্মৃতি নয়। লিখেন নাই এই জন্য যে, জগন্মাতার প্রতি বাৎসল্যভক্তির প্রকৃতি আলাদা। জগন্মাতা যখন বয়সে বাড়িয়া উঠেন, যখন মদনমোহনের পাশে বাঁকিয়া দাঁড়ান, যখন রঘুকুলতিলকের পিছনে পিছনে বনগমন করেন, যখন অশোকবনে বসিয়া কাঁদেন, যখন শুম্ভনিশুম্ভ বধ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন চিত্রকরের তুলি, কবির লেখনী, ভাবুকের মন পাগল হইয়া উঠে। কেন না, তখন মায়ের মহিমার অন্ত নাই, তাঁহার কীর্তির পরিমাপ নাই, তাঁহার মূর্তির সীমা ও সংখ্যা নাই। কিন্তু জগন্মাতা যখন বালিকা, তখন তাঁহাকে আমরা একান্তই হৃদয়ের গভীরে লুকাইয়া রাখি। তাঁহার লীলা তখন আরম্ভ হয় নাই বলিয়া নয়, তাঁহার লীলার মাধুর্য তখন এত গভীর যে উহা ভাবনানীত, ভাষাতীত। গভীরতার লক্ষণ কি? সরলতা। জগন্মাতা যখন বালিকা, তখন তিনি সরলতমা।

জগন্মাতা দুর্গার সমস্ত অলৌকিক ঐশ্বর্য সিন্দুকে বন্ধ রাখিয়া আমরা যখন বালিকা উমার কল্পনায় তাঁহার আরাধনায় ব্রতী হই, তখন আমরা কি এক অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভক্তি

আস্বাদন করি না? বাঙালী শত শত বৎসর ধরিয়া কত আগমনী গান বাঁধিয়াছে, গাহিয়াছে—কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সেইসব গানের মর্মকথা আর কয়টি?—

'মা, পতিগৃহে গিয়া এমনি করিয়া আমাদের ভুলিয়া থাকিতে হয়? আহা, পাগল ভোলানাথের সংসারে কত না কৃচ্ছ্রতা তোমাকে সহ্য করিতে হয়! সোনার বর্ণ তোমার মলিন হইয়া গেছে!

...আহা, উমা মা দূর কৈলাস হইতে কাল রাত্রে পৌঁছিয়াছে। বড় ক্লান্ত হইয়া একটু ঘুমাইতেছে। উহাকে এখন জাগাইও না।

...হায়রে, দেখিতে দেখিতে তিনটি দিন কাটিয়া গেল। এখন উমা আবার পতিগৃহে রওনা হইবে। হায়রে নবমীর রাত্রি, তুমি কেন প্রভাত হইলে? কেমন করিয়া স্বর্ণপ্রতিমাকে সেই দায়িত্বহীন জামাতার গৃহে পাঠাইব?

...যদি একান্তই যাইবে মা যাও, সাবধানে থাকিও। একেবারে আমাদের ভুলিয়া যাইও না। আবার সামনের বৎসরে আসিও।'

এই কয়টিই তো কথা। ইহাতে অলঙ্কার নাই, ছন্দ নাই, তত্ত্ববিচার নাই, দার্শনিকতা নাই। অথচ এই ভাব-কয়টির মধ্য দিয়া বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বাংলার নরনারী কী অনবদ্য আধ্যাত্মিক স্নিগ্ধতা সঞ্চয় করিয়া চলে! চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধীশ্বরী, তিনি অতি সহজ কন্যাত্ব স্বীকার করিয়া আমাদের ঘরে উপস্থিত। তাঁহাকে ভয় করিবার কিছু নাই, সমীহ করিবার কিছু নাই, তাঁহার নিকট লৌকিকতা কিছু নাই। তিনি আমাদের ঘরের মেয়ে। তিনি যে আসিয়াছেন, ইহাতেই আমাদের প্রাণ ভরপুর।

চণ্ডীতে মেধস-মুনি সুরথ-রাজা এবং সমাধি বৈশ্যের কাছে মহামায়ার নানা অলৌকিক কীর্তি-কলাপের বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন। দেবীর ত্রিলোক-বিস্ময়কর জন্মকর্মের কথা শুনিয়া রাজা ও বৈশ্য উভয়েই রোমাঞ্চিত। কী অপরিমিত মায়ের শক্তি, কী বিশাল আকাশ-চুম্বী তাঁহার মূর্তি, কী অদ্ভুত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী তাঁহার মায়া! আদ্যচরিত এবং মধ্যম চরিত বর্ণনার পর মুনির মাথা ঘুরিতেছে। জগজ্জননীর উত্তুঙ্গ মহিমা প্রাণে জাঁকিয়া বসিয়া প্রাণের কণ্ঠরোধ করিতেছে। ক্ষুদ্র সরোবরে বিপুলকায় মহামাতঙ্গ নামিলে সরোবরের যে অবস্থা হয়, মুনির সেইরূপ দশা! উপায়? গুরুকৃপায় মুনি উপায় খুঁজিয়া পাইলেন। চণ্ডীর উত্তরচরিতে দেড়টি শ্লোকে এই উপায়ের পরিচিতি আছে। দেড়টি শ্লোক পড়িতে বড় জোর পনের সেকেণ্ড লাগে। কিন্তু সেই পনের সেকেণ্ডে দেড়টি শ্লোকের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হইতে থাকে অনন্তকালের মাধুর্য—জগন্মাতার সরল বালিকামূর্তির চকিত দীপ্তি এবং বালিকার মুখের চারটি শব্দকে বেড়িয়া অতিস্নিগ্ধ রসধারা।

ইন্দ্রাদি দেবতারা শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে লাঞ্ছিত হইয়া পরিত্রাণের জন্য বিষ্ণুমায়ার স্তব করিতেছেন। ভাবিয়াছেন—বিষ্ণুমায়া যখন, তখন সামান্য দু-চার কথায় তো তিনি তুষ্ট হইবেন না। তাই দেবতারা নগরাজ হিমালয়ে গিয়া বেদ-বেদান্ত কাব্য-ব্যাকরণ সর্বশাস্ত্র মন্থন কারয়া শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করিতেছেন এবং উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত তিন-গ্রামে গলা মিলাইয়া আকাশ ফাটাইয়া স্তোত্র গাহিতেছেন। যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই স্তব, তিনি কিন্তু অলক্ষ্যে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। মনে মনে বলিতেছেন, হায়রে মহাজ্ঞানীর দল, আমাকে ডাকিতে কি এত কথা লাগে? মনের কোণে ফুট উঠিবার আগে আমি যে মনের

সকল অভিলাষের সন্ধান পাই, শব্দের জাল বুনিয়া তোদের অন্তরের কি পরিচয় দিবি আমার কাছে? অন্তর্যামিণী তখন একটি ভারী মজার খেলা ফাঁদিলেন।

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন॥
সাহব্রবীত্তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেহত্র কা।

* * *

পর্বতনন্দিনীরূপে কাঁধে একটি গামছা ফেলিয়া নাচিতে নাচিতে যেখানে হিমালয়ের কঠিন পাষাণ ভেদ করিয়া জাহ্নবীর ধারা প্রবলবেগে ছুটিতেছে, সেখানে তিনি স্নান করিবার জন্য উপস্থিত। স্নান করিবার সময় তো কেহ সাজ-গোজ করিয়া জলে নামে না, তাই নিরাভরণা বালিকা। বিচিত্র বেশভূষায় বিচিত্র চেহারার দেবতাদের সমাবেশ দেখিয়া স্নানার্থিনীর না আছে সঙ্কোচ, না আছে ভয়, বরং বড় কৌতুক জাগিয়াছে। সুন্দর ভ্রূ-দুটি দুলাইয়া, চোখ দুটি নাচাইয়া, ঠোঁটে দুষ্টামির হাসি মাখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'হ্যাঁ গা, তোমরা কার স্তব ক'রছ?' এইটুকু চিত্র, এইটুকু সংলাপ। পরবর্তী ঘটনা চণ্ডীপাঠকের জানা আছে—দেবীর নানা পরাক্রমের কাহিনী, আশ্চর্য ঘটনাপরম্পরায় তাঁহার বিশ্বপালিনী, অসুর-সংহারিণী ভাগবতী লীলার পরিবিস্তার। সে সব কাহিনীর মধ্যে তত্ত্বের অনুশীলন আছে, ভয়-ভক্তি-শরণাগতির নিশ্চিত-ফলত্বের নির্ণয় আছে, সে সকল কাহিনীর মূল্যবত্তায় কেহ সংশয় করে না। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অবান্তর এই দেড় শ্লোকের চিত্র ও সংলাপের মূল্য কোন্ পর্যায়ের? জগন্মাতার এই অনাড়ম্বর বালিকামূর্তি কি ভাবুক ভক্তের হৃদয়ে একটি শাশ্বতকালের অতীন্দ্রিয় স্নেহাবেশ সঞ্চার করে না? পর্বতকুমারীর উচ্চারিত চারটি সরল কথা হইতে ভাবলোকের এক চিরনূতন চির-মধুর অনবদ্য সঙ্গীত কি ঝরিয়া পড়িতেছে না?

ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে কুমারিকা অন্তরীপে জগন্মাতার বালিকামূর্তি কন্যা-কুমারীর মন্দির। বোধ করি আমাদের বিশাল দেশে আর কোথাও এইরূপ কন্যামূর্তির স্থায়ী আরাধনার জন্য দেবালয় নাই। না থাকাই স্বাভাবিক। জগদীশ্বরীকে বালিকা কন্যা ভাবিয়া বাৎসল্যভক্তি সহজ নয়। উহার জন্য হৃদয়ের ঐশ্বর্যচিহ্নমুক্ত যে নিরাকাঙ্ক্ষ সাত্ত্বিকতার প্রয়োজন, তাহা ভক্ত দিনের পর দিন বজায় রাখিতে পারেন না। সেই জন্য নৈমিত্তিক পূজার্চনা হিসাবে কিছু সময়ের জন্য আমরা জগন্মাতার বালিকামূর্তির আরাধনা করি—দুর্গাপূজার সময় বা কামাখ্যাপীঠে গিয়া। কন্যাকুমারীতে যাঁহারা দেবীকে দর্শন করিয়াছেন, পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এই যে, এখানকার আধ্যাত্মিক তৃপ্তির একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ভারতের অন্য কোনও দেবালয়ে অনুভূত হয় না। ঠিকই কথা। যে ভাস্কর পাথরে দশ-বৎসরবয়স্কা এই দেবীমূর্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার ভাবদৃষ্টি এবং কলা-কুশলতা অতুলনীয়। তাহার পর শত শত বৎসর সহস্র সহস্র নরনারী তাহাদের হৃদয়ের ভক্তি দিয়া পাথরকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। কী আশ্চর্য হাসি কন্যাকুমারীর মূর্তিতে! এক মুহূর্তে উহা অন্তরের সকল অন্ধকার দূর করিয়া সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে সারা প্রাণ প্লাবিত করিয়া দেয়।

এক শতাব্দী পূর্বে বাংলার বুকে সেইরূপ এক জ্যোৎস্নালোকের বন্যা নামিয়াছিল—জগন্মাতার বালিকা-রূপের বন্যা। না, কোনও দেবতার দল উহা প্রত্যক্ষ করে নাই, কোনও

যোগী-মুনি-তত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে উহা পড়ে নাই। যোগী-মুনিরা তখন নির্জন গুহায় বসিয়া ধ্যান-মগ্ন ছিলেন, তত্ত্বান্বেষীরা তখন শাস্ত্রবিচারে কালাতিপাত করিতেছিলেন। সুযোগ পাইয়া সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া জগন্ময়ী লালচেলীপরা একটি ক্ষুদ্র বালিকার মূর্তিতে মল ঝমঝম করিয়া নাচিতে নাচিতে পল্লীর এক ব্রাহ্মণ-যুবতীর গলা জড়াইয়া বলিলেন, আমি তোমার ঘরে এলাম, মা।

জগন্মাতার এই বালিকামূর্তি যুগ যুগ ধরিয়া ভাবুকের হৃদয়ে আনিবে এক ইন্দ্রিয়াতীত স্নেহাবেশ ও শান্তি, তাঁহার উচ্চারিত কথা ভক্ত-প্রাণের সকল তন্ত্রী অনুরণিত করিয়া তুলিবে এক সুমিষ্ট সঙ্গীত।

পরে বালিকা বেশ বদলাইয়াছিল। লাল চেলী ছাড়িয়া গ্রামের তাঁতীর বোনা আট-পৌরে একটি ডুরে শাড়ি পরিয়া জলে নামিয়া দিনের পর দিন গরুর জন্য দলঘাস কাটিত, দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্তদের পরিবেষিত গরম গরম খিচুড়ি শীঘ্র জুড়াইবে বলিয়া দুই হাতে বাতাস করিত, বাড়ি হইতে দূরে ধান্যক্ষেত্রে নিযুক্ত কৃষি-মজুরদের জন্য মুড়ি বহিয়া লইয়া যাইত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সংসারে এই সকল দৈনন্দিন ছোট ছোট কর্মরত বালিকারূপে জগজ্জননীকে ভাবিতে কেমন লাগে? কল্পনার উপর একটুও টানা-হেঁচড়া করিতে হয় না। কে না বাংলার পল্লীর পুকুর দেখিয়াছে, লম্বা লম্বা ঘাস, খিচুড়ি, হাতপাখা, ধানের ক্ষেত, ক্ষেতে নিযুক্ত মুনিষ এবং মুড়ির দোনা দেখিয়াছে? কে না বাংলার পাড়াগাঁয়ে একটি ছোট শ্যামাঙ্গী বালিকাকে দেখিয়াছে? নিত্যপরিচিত দৃশ্য। এই সকল চেনা ছবির টুকরা জোড়া দিয়া ভাবুক যখন বালিকা সারদার মূর্তি হৃদয়ে গড়িয়া তুলেন, তখন তাহা এক অপরূপ মাধুরীতে ঝলমল করে। এই বালিকা মহামায়ার উদ্দেশ্যে কোনও স্তব রচনা করা যায় না, তাঁহার কাছে কোনও প্রার্থনা করা চলে না, বাহিরে রং-তুলি দিয়া বা মাটি-পাথর খুদিয়া তাঁহার ছবি বা প্রতিমা আঁকা বা গড়া সম্ভবপর নয়। তবুও চন্দ্র সূর্য যেমন সত্য, জগন্মাতার এই বালিকা-মূর্তিও তেমন সত্য। এই মূর্তিতে জগন্মাতার পরিপূর্ণ সত্তা বিদ্যমান, যেমন তাঁহার বিভিন্ন ঐশ্বর্যপ্রকাশক অন্যান্য নানা দেবীমূর্তিতে বর্তমান।

ইহকাল-পরকালের সকল চাওয়া-পাওয়া উপেক্ষা করিয়া নির্মল নিষ্কাম প্রীতিতে যিনি জগজ্জননীর এই বালিকা মূর্তিতে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে পারেন, তিনি নিশ্চিতই ধন্য।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী

[গত ৯ই জুলাই, ১৯৬১ রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব কালচারে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ]

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী যাহাতে উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী সমগ্র ভারতে এবং জগতের বহু সভ্য দেশেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুইজন মহাপুরুষ বাংলা দেশে দুই বৎসরের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বাঙালী-মাত্রেরই গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গদেশ তাঁহাদের জন্মভূমি হইলেও তাঁহারা কেবল বঙ্গদেশের নহেন, এমন কি ভারতবর্ষেরও নহেন, তাঁহারা বিশ্বের বরেণ্য এবং সমগ্র জগৎ তাঁহাদিগকে আপন করিয়া লইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ৪০ বৎসরও মর্ত্য দেহে ছিলেন না, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে তিনি স্বদেশের ও বিদেশের সমগ্র মানবজাতির যে মুক্তির পথের সন্ধান দিয়াছেন, আজিকার এই যুগসঙ্কটে তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাহাতে তাঁহার বাণী ও উপদেশের প্রকৃত মর্ম জনসমাজে প্রচারিত হয় এবং তিনি যে আদর্শ জীবনের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকের কাছে জীবন্ত হইয়া ওঠে, ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্বামীজীর ন্যায় মহাপুরুষ স্তুতি ও সম্মানের বহু ঊর্ধ্বে। আমাদের এই অনুষ্ঠান তাঁহার মহিমা বাড়াইবে, এরূপ স্পর্ধা কাহারও নাই। কিন্তু আমরা নিজেরা যাহাতে তাঁহার মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে পারি, তাহার জন্যই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।

আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলেও যে বহু সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি, তাহা সকলেই মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। আজিকার দিনেই আমাদের স্বামীজীর কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। স্বামীজী পরাধীন দেশেই জন্মিয়াছিলেন, পরাধীন দেশেই দেহরক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দেশকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। রাজনীতিক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তিনি তাহা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার চেয়ে অনেক বড়। আধ্যাত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠ আধার ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাঁহাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার বা বুঝাইবার স্পর্ধা আমার নাই। মহাযোগী বা মহাসাধক হইলেও তিনি ঠাকুরের আদেশে অথবা নির্দেশে সংসারকেই তাঁহার কর্মক্ষেত্র করিয়াছিলেন। তাই সংসারের মধ্য দিয়া তিনি যেটুকু প্রকট হইয়াছিলেন, আমরা সংসারী লোকেরা কেবল তাহাই উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে পারি। সেদিক দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, স্বামীজী কিরূপে এই অধঃপতিত দুর্বল মোহগ্রস্ত ভারতবাসীর মধ্যে এক নূতন শক্তি ও জাতীয়তার প্রেরণা দিয়াছিলেন—পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে যখন আমাদের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত,

যখন আমরা আমাদের হীনতা ও দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ, তখনই স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে আমাদিগকে এই অভয়বাণী শুনাইলেন: তোমরা অমৃতের পুত্র, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, মাভৈঃ।

যেদিন আমেরিকার শিকাগো শহরে স্বামীজী হিন্দুধর্মকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসিবার অধিকার অর্জন করিয়া দিলেন, সেই দিন মৃতপ্রায় ভারতে নূতন জীবনের সঞ্চার হইল। নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া ভারতবাসী মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। আমাদের জাতীয় জীবনে সে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। এই জন্যই আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস-লেখক স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতের জাতীয়তাবোধের জনক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। জড়তা ত্যাগ করিয়া ও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মাতৃভূমির সেবার জন্য তিনি দেশের যুবকদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার এ আহ্বান নিষ্ফল হয় নাই। শত সহস্র যুবক তাঁহার অভয় মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দেশের জন্য আত্মবলিদান দিয়া তাহার মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছে।

'দেশ' বলিতে কি বুঝায়, স্বামীজী তাহা আমাদিগকে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। এই দেশের যত দুঃস্থ দরিদ্র হীন অন্ত্যজ পদদলিত লাঞ্ছিত নিঃস্ব সহায়হীন নরনারী—ইহাদের লইয়াই দেশ। দেশের মুক্তির অর্থ ইহাদের মুক্তি। কেবল বিদেশের শাসনভার দূর করিতে পারিলেই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—যতদিন সমগ্র ভারতবর্ষের নরনারীর উন্নতিবিধান না হয়, ততদিন আমাদের স্বাধীনতা অর্থহীন ও মূল্যহীন। স্বামীজীর এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য আজ আমরা ক্রমশঃ বুঝিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আর একটি কথাও আজ প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে। তিনি বলিতেন যে, দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রথমে চাই—মানুষ তৈরী করা। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন: সারাটা দেশ ঘুরে দেখলাম, মানুষ নেই। আগে চাই মানুষ। তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে তিনি যে অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আজ আমরা মর্মে মর্মে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আজ স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে 'মানুষ' তৈরী করিবার দিন আসিয়াছে।

কিন্তু স্বামীজী কেবল ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করেন নাই। জগতের সমস্যাও তাঁহার দিব্য দৃষ্টি এড়ায় নাই। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভারতবাসীরাও যাহাতে এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির বিশেষ অভাব। এ জন্য বৈজ্ঞানিক উন্নতি ক্রমশঃ তাহাদিগকে ধ্বংসের পথেই লইয়া যাইবে। ভারতের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি এই উভয়ের সমন্বয় ভিন্ন মনুষ্যজাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না। বিজ্ঞান-চর্চায় বিমুখ হইয়া কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া ভারতবাসী চরম দুর্দশায় উপনীত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতিও আধ্যাত্মিক চিন্তায় বিমুখ থাকিয়া কেবল বিজ্ঞানের অনুশীলন করার ফলে দ্রুতবেগে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা যে কত বড় নিদারুণ সত্য, আজ সমগ্র বিশ্ববাসী তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছে। আজ তাই স্বামীজীর আদর্শ বিশ্বের নিকট আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, ভারতের প্রধান ব্রত হইবে পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিক আদর্শ

প্রচার করা। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন না হইলে কেহ তাহার উপদেশে কর্ণপাত করিবে না। আজ স্বাধীন ভারত স্বামীজীর মহামন্ত্র প্রচার করিলে জগতে তাহা স্বীকৃতি লাভ করিবে, এরূপ আশা করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যদি এই উদ্দেশ্য কিছুমাত্র সফল হয়, তাহা হইলেই আমাদের উৎসব গৌরবমণ্ডিত হইবে।

শ্রীভগবান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দেখতে তোমায় পাইনি বটে, তবু নিবিড় পরিচয়,
অনুক্ষণই ভাবি তোমায়—দেখাই তো খুব বড় নয়।
দেখতে তোমায় যে পুণ্য চাই,
অধম আমি—আমার তা নাই,
শুধু আকুল বিস্ময়েতে—ডাকি তোমায় সুধাময়।

নামে তোমার অমৃত হে, ধ্যানে তোমার অমৃত
কৃপার নীরে অবগাহি, দুঃখ কিসের নিমিত্ত ?
বুদ্বুদ আমি সুধাব্ধিরই—
তুমিই আছ আমায় ঘিরি,
তোমা ছাড়া নাইক' কিছু, জীবন মরণ দুই অভয়।

সখ ক'রে তো ডাকি নাক', পুজিনাক' তোমারে—
তোমার পূজা তোমায় ডাকা—প্রাণের ক্ষুধা নিবারে।
তুমি অতি দুর্লভ ধন—
নিত্য তবু তার প্রয়োজন,
তোমা বিনা ঘর করা যে বিড়ম্বনা মনে হয়।

তাহাদিকে সাবাস্ যে দিই—দিই তাদিকে ধন্যবাদ—
সত্য স্বাবলম্বী তারা, থাকুক তাদের ভুল প্রমাদ।
তারা তোমায় আমার মতো
করেনাক' বিরক্ত তো,
তারা করে তোমার কাজই, নাইবা দিলে তোমার জয়।

জ্ঞানদাসের সাধনা

ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

জ্ঞানদাস ষোড়শ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ-শাখায় (১।১১) তাঁহার নাম ধরিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর একটি পদ হইতে জানা যায়, জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন (গৌরপদ-তরঙ্গিণী পৃঃ ৪৭০, ১ম সং)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ও ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম-সম্পাদনায় জ্ঞানদাসের ৩৬৩টি সম্পূর্ণ ও ৩১টি অসম্পূর্ণ পদ প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রামাণিক পদ-সঙ্কলনগুলি ও বহুসংখ্যক প্রাচীন পুঁথি অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞানদাসের আরও ৯৬টি পদ পাইয়াছি। তাঁহার রচিত প্রায় পাঁচ শত পদ হইতে তাঁহার সাধনার ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

লৌকিক কাব্য ও উপন্যাসের লেখক তাঁহার সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যান। তাঁহার নিজের সুখ-দুঃখাদি অনুভব কাব্যাদির পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়া প্রকাশ করেন; আবার তাহাদের ভাব ও ভাবনা প্রকাশের সময় স্রষ্টা কখন কখন নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত হন। কিন্তু এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে নায়ক-নায়িকাকে সেবা করিবার ভাব দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে ইঁহাদের পার্থক্য এইখানে।

সেবা সখীভাবে হইতে পারে, আর সখীর অনুগতা মঞ্জরীরূপে হইতে পারে।

কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
(চৈঃ চঃ—২।৮)

কিন্তু 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে ও গোবিন্দদাসের পদে দেখা যায়, কখন কখন শ্রীকৃষ্ণ দূতীরূপা সখীর সঙ্গে বিলাস করেন। সখীগণ নিভৃত লীলাসময়ে নিকটে থাকেন না, মঞ্জরীরা সে সময়েও সেবা করেন। মঞ্জরীভাব শ্রীরূপ ও রঘুনাথদাস গোস্বামী কর্তৃক প্রদর্শিত হইলেও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা উহা বাংলাদেশে প্রচারিত হয়।

ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনায় বলিয়াছেন, তাঁহার এমন সুদিন কবে হইবে, যেদিন শ্রীরূপের আজ্ঞায় সেবার সামগ্রী সব রত্ন-থালিতে করিয়া রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে দিবেন। 'শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি, রাখবে রাতুল দুটি পায়'। 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় তিনি লিখিয়াছেন:

সখীর অনুগা হৈয়া ব্রজে সিদ্ধদেহ পাইয়া
সেই ভাব জুড়াব পরাণী॥

পুনরায় ঐ গ্রন্থেরই অন্য স্থানে বলিয়াছেন:

সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব কবে
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে॥

এই সেবা-ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া গোবিন্দদাস কবিরাজ বলেন, তিনি রাধাকৃষ্ণের বিলাস-কালে—

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত
মন্দিরে দুঁহুজন পাশ।
মন্দির নিকটে পদতলে শুতলি
সহচরী গোবিন্দদাস॥

কোন পদে দেখি গোবিন্দদাস চামর ঢুলাইতেছেন, কখন মূর্ছিতা রাধাকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন, কখন বা সাধারণভাবে বলিতেছেন—

অনুগা হইতে সাধ লাগে চিতে,
কহয়ে গোবিন্দদাস।

ভণিতায় এইরূপ সেবাভিলাষ প্রকাশ করা প্রাক্-চৈতন্যযুগের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদে দেখা যায় না।

জ্ঞানদাসের পদেও সখীর অনুগা হইয়া সেবা করিবার কথা নাই। জ্ঞানদাস ভণিতায় সখী-ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। কেবলমাত্র দুইটি পদে তিনি রাখালদের সঙ্গে সখ্যভাবে গোষ্ঠে যাইবার কথা বলিয়াছেন ও অন্য একটি পদে 'রাখাল-পদে আশ্রিত' হইবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই তিনটি পদ ছাড়া অন্যত্র সকল ভণিতাতেই জ্ঞানদাসের সখীভাব। তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলাকে শুধু অলৌকিক বলিয়া মানেন না, এই লীলার এমনই নিগূঢ় রহস্য যে ইহা 'বিরিঞ্চি-অগোচরী'।

রাধা যখন বলেন, 'শ্যামরূপ হিয়ার মাঝে জাগে', তখন জ্ঞানদাস সখীভাবে তাঁহাকে বলেন—

কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিক-মণি।

রাধা যখন কৃষ্ণের প্রেমে আকুল হইয়া বলেন, 'বিষেতে জিনিল সর্বগা', তখন জ্ঞানদাস তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন, 'জীয়াইতে পারে সে রসিক-শিরোমণি'। সখীর কথা শুনিয়া যখন রাধার হিয়া উতরোল হইয়াছে, তখন জ্ঞানদাস তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কুঞ্জে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন—

জ্ঞানদাস কহে চল ঝট কুঞ্জে যাই।
প্রেমধন দিয়া তুমি কিনহ কানাই॥

বনের মাঝে যখন বাঁশী বাজিয়া উঠে এবং রাধার মন আর ধৈর্য মানে না, তখন জ্ঞানদাস রাধাকে বলেন—

জ্ঞানদাসেতে কয়, আর বিলম্ব না সয়।
ছুটিল করের শর নিবারণ নয়॥

মন আগেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে, এখন তো আর তাহা ফিরাইয়া আনা যায় না; যেমন নিক্ষিপ্ত বাণ আর নিবারণ করা যায় না, সুতরাং রাধার আর দেরি করা উচিত নহে।

কুঞ্জে যখন কৃষ্ণ আকুল হৃদয়ে রাধার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন রাধা সেখানে মিলিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র কানাইয়ের যেন অমৃত-সাগরে স্নান করা হইল। সহচরীরা রাধার সঙ্গে গিয়াছিলেন, জ্ঞানদাসও যেন তাঁহাদের দলে ছিলেন। তাঁহারা উভয়কে একত্র রাখিয়া দূরে গেলেন। তাহা দেখিয়া কিশোর-কিশোরীর আনন্দ হইল—

পূরল মন-অভিলাষ।
জ্ঞান কহই সখিপাশ।

যে সখীর নিকট জ্ঞানদাস এ কথা বলিলেন, তিনি ঐ দলে ছিলেন না, জ্ঞানদাস ছিলেন—এই ভণিতা হইতেই প্রমাণিত হয়।

রাধা 'প্রেমে পড়িয়াছেন', কিন্তু সখীদের সে কথা বলেন নাই। সখীরা রাধার আকার ও আচরণ দেখিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছেন। জ্ঞানদাস সেই সখীদের পর্যায়ে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলিতেছেন—

জ্ঞানদাস অনুভবিয়া গায়।
মনের বেড়ার লুকানো না যায়॥

সখীরা একদিন রাধার 'লহু লহু মুচকি হাসি' ও বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া চাওয়া দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আজ তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি।

দশদিন দুরজন সুজনে একদিন
আজু পেখলু নিজ আঁখি।

এই রকম করিয়া বলায় জ্ঞানদাসের মনে বড় দুঃখ হইল। তিনি সখীকে বলিলেন, সখি! তুমি আর বলিও না, রাই আমাদের বড় লজ্জা পাইল যে!

জ্ঞানদাস কহ সখি তুহুঁ বিরমহ
রাই পায়ল বহু লাজে॥

সখীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মিলাইয়া দিয়া লীলা প্রত্যক্ষ না করিলে কি এমন অন্তরঙ্গতার সুরে কেহ কথা বলিতে পারে?

রাধা সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণের ভাঙা নৌকায় চাপিয়াছেন। নৌকায় জল উঠিতেছে দেখিয়া জ্ঞানদাস ভয় পাইয়া জল ফেলিতে লাগিলেন।

'বাসকসজ্জা'র একটি পদে রাধা বলিতেছেন, 'কি জন্যই বা আমি ক্ষীর-সর আনিলাম, কেনই বা সুবাসিত জল ও তাম্বূল সংগ্রহ করিলাম!' জ্ঞানদাস এই পদের ভণিতায় বলিতেছেন—

কাহে উজাগরি রাতি।
জ্ঞানদাস লেউ শাতি॥

—রাধা কেন আর রাত্রি জাগিতেছেন, জ্ঞানদাসকে যে শাস্তি উচিত বিবেচনা করেন, তাহাই দিন। এই কথার অর্থ, জ্ঞানদাসই রাধাকে খবর আনিয়া দিয়াছিলেন যে, আজ কৃষ্ণ সঙ্কেতস্থানে আসিবেন; তাই রাধা তাঁহার জন্য সাজগোজ করিয়া বসিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যখন আসিলেন না, তখন জ্ঞানদাসের মনে হয়, তাঁহাকে শাস্তি দিয়া রাধা তাঁহার মনের জ্বালা মিটান।

জ্ঞানদাস রাধার সুখে সুখী, তাঁহার দুঃখে দুঃখী। রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া এমনই গভীর-ভাবে ভালবাসিয়াছেন যে, তিনি লাজ ভয় সব হারাইয়াছেন। রাধার এমন ভাব দেখিয়া 'জ্ঞানদাস কম্প অনিবার',—জ্ঞানদাসের বুকের কাঁপুনি আর থামে না। রাধা একা একা নিজের মনে দুঃখের ভার বহিতেছেন দেখিয়া জ্ঞানদাস অনুনয় করিয়া বলেন, তুমি তোমার দুঃখের কারণ, আমাকে বল—'কহিলে ঘুচিবে তাপ'। জ্ঞানদাসের ভণিতার ভঙ্গী হইতেই রাধার ভয় পাওয়ার কথা অনুমান হয়—

জ্ঞানদাস কহে, আমরা থাকিতে
কিবা পরমাদ তোরে॥

ননদিনীর সাধ্য কি—জ্ঞানদাস থাকিতে রাধাকে কোন রকমে হেনস্তা করিতে পারে।

ভোর হইয়াছে। রাধাকে এখন ঘরে ফিরিতে হইবে। জ্ঞানদাস কৃষ্ণকে বলিতেছেন, এখন 'চরণে পরাও তুমি কনয় নূপুর'। সখীরূপে জ্ঞানদাস কৃষ্ণকেও মাঝে মাঝে ধমকাইয়া দেন। 'দানলীলা'য় শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ছুঁইতে আসিতেছেন দেখিয়া—

জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত না হ'লে
কি লাগি বাহু পসার॥

রাধা তো ইঙ্গিতেও অনুমতি দেন নাই, তবে তুমি কোন্ সাহসে হাত বাড়াইতেছ? কৃষ্ণ পথ আগলাইলে, কবি রাধাকে বলেন, 'কিবা ভয়, যাও হাত ঠেলা দিয়া'। রাধা কৃষ্ণকে কালো বলিয়া, ত্রিভঙ্গ বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন। জ্ঞানদাস তাঁহার সঙ্গে সুর মিলাইয়া কৃষ্ণকে বলিয়া দিলেন, ওগো শ্যাম! নিজেকে একেবারে অতুলনীয় সুন্দর ভাবিও না—

জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম।
আপনা না ভাব অনুপাম॥

কৃষ্ণ যদি বেশি বাড়াবাড়ি করেন, তাহা হইলে অগত্যা জ্ঞানদাসকে প্রতীকারের জন্য রাজ-দরবারে নালিশ করিতে হইবে—'জ্ঞানদাস কংসে দিবে কইয়া'।

প্রয়োজন হইলে জ্ঞানদাস রাধাঠাকুরানীকেও দু-চার কথা শুনাইয়া দিতে পিছপা হন না। 'দানলীলা'য় কৃষ্ণের প্রস্তাব শুনিয়া রাধা যখন বলিলেন, এ-রকম কথা 'শ্রুতিসম্ভব নহে' অর্থাৎ শুনিবার যোগ্য নহে, তখন জ্ঞানদাস বলিতেছেন, এমন করিয়া বলিতেছ কেন? তুমি যে নব-অনুরাগে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিতে আসিয়াছ—

জ্ঞানদাস কহে—ঐছে কহসি কাহে
আওলি নব-অনুরাগে।

রাধা কৃষ্ণকে 'কাঁচ' বলায় জ্ঞানদাসের রাগ হইয়াছে। তিনি রাধাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন কৃষ্ণ কাঁচ নহে, 'কষটি পাষাণ'—কষ্টিপাথর। কৃষ্ণের প্রণয়-চেষ্টাকে বিদ্রূপ করিয়া রাধা যখন তাঁহাকে বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়া ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন, তখন জ্ঞানদাস আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না—

জ্ঞানদাস বলে, গোপঝিয়ারি।
বলিতে পারিলে কি এতেক বলি॥

নৌকায় চড়িয়া রাধা দেখিলেন যে, নাবিক নৌকা বাহেন না, তাঁহাকে ছুঁইবার জন্য আগাইয়া আসেন। কৃষ্ণের অনেক আবেদন-নিবেদন ও চাটুবচনেও যখন রাধার মান ভাঙিল না, তখন জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কৃষ্ণের কথা তো শুনিলে না, কিন্তু অন্ততঃ আমার মুখ চাহিয়া তুমি কানাইকে সরস স্পর্শ দিয়া বাঁচাও—

জ্ঞানদাস কহে ধনি মোর মুখ চাও।
সরস পরশ দেই কানুরে জিয়াও॥

সাধনার কোন্ উচ্চস্তরে উঠিলে কবি এরূপ কথা বলিতে পারেন! যেখানে কৃষ্ণের সকল অনুনয় ব্যর্থ হইল, সেখানেও জ্ঞানদাসের মনে ভরসা আছে যে, রাধা তাঁহার মুখ চাহিয়া মান ত্যাগ করিবেন। রাধার প্রতি কতখানি প্রীতি থাকিলে মনে এমন ভরসা জাগে? জ্ঞানদাসের সাধনা প্রেমেরই সাধনা। এই সাধনায় তাঁহার অহংবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি নিজেকে রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলার পরিকররূপে ভাবনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জ্বালায় অস্থির হইয়া রাধা ভাবিতেছেন, তিনি নিজে মথুরায় যাইয়া তাঁহার বঁধুয়াকে বাঁধিয়া আনিবেন। জ্ঞানদাস এই কথা শুনিয়া বলিতেছেন—

জ্ঞানদাস কহে বিনয়-বচনে
শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে যেতে মানা করি
দারুণ কুলের বাধা।

কবি নিজেই মথুরায় চলিলেন—

শুনিয়া রাধার এত বিরহ হুতাশ!
চলিল ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস॥

মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে রাধার দশা নিবেদন করিয়া 'জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ বধভাগী'। অন্য একটি পদে—

জ্ঞানদাস কহ রোয়।
তিরি বধ লাগবে তোয়॥

জ্ঞানদাস রাধার দুঃখ চোখে দেখিতে পারেন না। রাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্যের জন্য অনুরাগ করেন এবং অবশেষে নতি স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহেন, তখন জ্ঞানদাস বলেন, রাধাকে ভালবাসা দিয়া জ্ঞানদাসের প্রাণ রক্ষা কর—

অব দোষ ক্ষেম নাথ অভাগীরে কর সাথ
জ্ঞানদাসের রাখহ পরাণী॥

কৃষ্ণের উপর জ্ঞানদাসের যথেষ্ট দাবি আছে, না হইলে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য রাধাকে সঙ্গ দিবার কথা তাঁহাকে বলিতে পারিতেন না। প্রিয়াজী যখন বলেন, পরিণাম

যাহাই হউক না কেন, আমি শ্যামকে ছাড়িতে পারিব না, সুতরাং সখীদিগকে তিনি বলেন—

চল সভে মেলি, শ্যাম শ্যাম বলি,
রহিতে না পারি ঘরে।

তাঁহার কথায় সায় দিয়া জ্ঞানদাস বলেন, নিশ্চয়, আমিও তোমার সহিত চলিব—

জ্ঞানদাস কয়, মন অন্য নয়,
শ্যামের পিরিতি সার।
লজ্জা কুলশীল, যে জন রহিবে,
আমি না রহিব আর॥

শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করেন, তখন জ্ঞানদাস বলেন—

মোর মনে হেন লয়, শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জ্ঞানদাসের পাঁচটি ভণিতা উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'বলিতে সঙ্কোচ হয়, এই কয়টি পদে কবির বাণী যেন শ্রীমতীর উক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে' (জ্ঞানদাসের পদাবলী, ভূমিকা—॥৵০)। তাঁহার এই উক্তি যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানদাসের যে সখীভাব আমরা প্রমাণ করিতে চাহিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সহজিয়ারা নিজেকে রাধা ভাবিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে, এবং কখন বা নিজেকে কৃষ্ণ ভাবনা করিয়া অভিপ্রেত নায়িকার সঙ্গে বিহার করে। তাহাদের অভীষ্ট হইতেছে 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা'; আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনা হইতেছে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা'। শ্রীরাধা হ্লাদিনীশক্তি, তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটানোই হইতেছে সখীদের কাজ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটিসুখ হয়॥
(চৈঃ চঃ ২।৮)

লতার মূলে জল দিলে লতার ফুলপাতা আপনিই বাড়িয়া উঠে; আর মূলে জল না দিয়া ফুলপাতায় জল ছিটাইলে অল্পদিনের মধ্যেই ফুলপাতা ঝরিয়া পড়ে। সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচার করা প্রয়োজন, জ্ঞানদাস ঐ পাঁচটি ভণিতায় নিজে রাধার স্থান গ্রহণ করিয়াছেন কিনা। হরেকৃষ্ণবাবু কোন পদের আকর উল্লেখ করেন নাই এবং সাধারণতঃ প্রায় কোন পদেরই পাঠান্তর ধরেন নাই; তাহাতেই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রথম দৃষ্টান্তটি এই—

জ্ঞানদাস বলে মুঞি কারে কি বলিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব॥

এই ধরনের ভণিতা কোন প্রামাণিক পদসঙ্কলনে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি'তে পাঠ ধরিয়াছেন—

জ্ঞানদাস বলে সখি সেই সে করিব।
কানুর পিরিতি লাগি সাগরে মরিব॥ (৪।৫)

'পদামৃতসমুদ্রে' (৪২৬ পৃঃ) ও 'পদকল্পতরু'তে (২৫২৯) পাঠ আছে।

জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব।
বন্ধুর লাগিয়া আমি সাগরে পশিব॥

ঐ পদটি 'পদকল্পতরুতে' দুইস্থানে ধৃত হইয়াছে। প্রথম বারে ধৃত পদের ভণিতা—

জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব॥ (৯২৩)

'পদরসসারে' (২১৪ এবং ১৪০৪) শেষ চরণ—

কানুর লাগিয়া আমি অনলে পশিব।

এই সকল ভণিতাতেই স্পষ্টতঃ বা ব্যঞ্জনায় 'সখি' সম্বোধন আছে। জ্ঞানদাস সখীভাবে রাধাকে বলিতেছেন, তোমার কানুর জন্য আমি সাগরে অথবা যমুনায় প্রবেশ করিব, সেখানেও যদি তাঁহাকে পাই, আনিয়া তোমার সঙ্গে মিলন

ঘটাইব। 'সাগরে মরিব' কথার ব্যঞ্জনা এই, যে কামনা করিয়া সাগরসঙ্গমে প্রাণত্যাগ করে, পরজন্মে তাহার সে কামনা পূর্ণ হয়।

হরেকৃষ্ণবাবুর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হইতেছে—

গঞ্জে গুরুজন, বলু কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।
জ্ঞানদাস কহে, এ অঙ্গ বেচেছি,
তিল-তুলসী দিয়া॥

পদটির আরম্ভ 'কি মোর ঘরদুয়ারের কাজ'। 'পদকল্পতরু'তে (৮৪৭) ইহার ভণিতা নাই। 'পদামৃতসমুদ্রে' (পৃঃ ২৪৯) ইহার ভণিতা এই—

সো মুখ না দেখি পরাণ বিদরে
রহিতে নারিয়ে বাসে।
এমত পিরিতি জগতে নাহিক
কহই এ জ্ঞানদাসে॥

১৩১২ সালে দুর্গাদাস লাহিড়ী 'বৈষ্ণবপদ-লহরী'তে (২৩৮ পৃঃ) এই পাঠই ধরিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্রে'র পাঠ উপেক্ষা করিয়া কোন অজ্ঞাতনামা পুঁথির পাঠকে প্রামাণিক ধরিলে অর্থবিভ্রাট ঘটা আশ্চর্য নহে। 'পদামৃতসমুদ্রে' এই পদের তৃতীয় কলিতে আছে—

গুরু গরবিত, বোলে অবিরত,
সে মোর চন্দন চুয়া।
সে রাঙ্গা চরণে আপনা বেচিনু
তিল-তুলসী দিয়া॥

এটি শ্রীরাধার উক্তি। এই কথাই পদের শেষে ভণিতায় পুনরায় কবি নিশ্চয়ই বলেন নাই।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত হইতেছে—

পরবশ প্রেম, পূরয়ে নাহি আরতি,
অনুখন অন্তরদাহ।
জ্ঞানদাস কহে, তিলে কত সুখ হয়ে,
হেরইতে শ্যামর নাহ॥

রাধা বলিতেছেন, প্রেম পরের বশে—পরের উপর নির্ভর করে, আমার আর্তি বা বাসনা মিটিল না, তাই সব সময়ে বুকে জ্বালা। জ্ঞানদাস তাহার উত্তরে বলিতেছেন, তুমি শুধু জ্বালাটার কথাই বলিলে, তোমার নাথ শ্যামকে দেখিলে প্রতিক্ষণে তোমার যে কত সুখ হয়, তাহা বলিলে না। প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ যদি একই ব্যক্তির উক্তি হয়, তাহা হইলে উহা পরস্পর-বিরোধী হয়।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত হইতেছে—

খাইতে খাইয়ে, শুইতে শুইয়ে,
আছিতে আছিয়ে পুরে।
জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে
আনল ভেজাই ঘরে॥

এখানেও প্রথম চরণ রাধার উক্তি; দ্বিতীয় চরণ 'অনুগতা সখীরূপা' জ্ঞানদাসের কথা। রাধে, তুমি বলিতেছ তোমার এত কষ্ট!

প্রাণ সই কি আর কুলবিচারে।
প্রাণবন্ধুয়া বিনু, তিলেক না জিউ,
কি মোর সোদর পরে॥

জ্ঞানদাস তাঁহাকে বলিতেছেন, কি দরকার তোমার কুল রাখিয়া, তুমি ইঙ্গিত করিলে আমি তোমার ঘরদুয়ারে আগুন লাগাইয়া দিব। পদটি কিন্তু পদামৃতসমুদ্রে (পৃঃ ২৪৯) জ্ঞানদাস-ভণিতায় এবং পদকল্পতরুতে (৮৯৩) চণ্ডীদাস-ভণিতায় পাওয়া যায়।

শেষ উদাহরণটি এই:

হিয়ার পিরিতি, কহিল না হয়,
চিতে অবিরত জাগে।
জ্ঞানদাস কহ, নব অনুরাগ
অমিয় অধিক লাগে॥

এখানেও প্রথম চরণ রাধার উক্তি। পদের প্রথম দিকে রাধা বলিয়াছেন, 'সই গো মরম কহিনু তোরে'। তাহারই উত্তরে 'সখীরূপা'

জ্ঞানদাস বলিতেছেন—তোমার নূতন অনুরাগ, তাহা অমৃতের চেয়েও সুমিষ্ট, সুতরাং সেই প্রেমের কথা চিত্তে অবিরত জাগিবেই তো।

জ্ঞানদাস কোথাও স্বয়ং রাধার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ভণিতা দেন নাই। তিনি সখীভাবেই সাধনা করিতেন। সখীরা রাধার কায়ব্যূহস্বরূপ। শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী। জ্ঞানদাসের দীক্ষাগুরু জাহ্নবাদেবী স্বয়ং সখীভাবে উপাসনা করিতেন। এই কথা শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দ তাঁহার 'জাহ্নবীতত্ত্বমর্মার্থ' নামক অপ্রকাশিত পুঁথিতে (বরাহনগরে গ্রন্থমন্দির বিবিধ ৬২ ক) বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জাহ্নবা বৃন্দাবন-লীলার অনঙ্গমঞ্জরী। ১৫৭৬ খৃঃ কবিকর্ণপূর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে (৬৬) বলিয়াছেন :

'অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে'।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, জ্ঞানদাস বা অন্য কোন বৈষ্ণব মহাজন রাধা-কৃষ্ণের লীলাকে জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন বলিয়া বর্ণনা করেন নাই, কেন না গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন অনুসারে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি, স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি। তিনি অন্তরঙ্গা শক্তি, আর জীব তটস্থা শক্তি। জীব মায়ার অধীন, আর শ্রীরাধাকে বহিরঙ্গা মায়া কোনরূপে স্পর্শ করিতে পারে না।

ফারসী-চর্চায় হিন্দু সুধী

অধ্যাপক রেজাউল করীম

বিশ্বকবি বলেছেন, 'শকহূনদল পাঠান-মোগল এক দেহে হ'ল লীন।' ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাস পাঠ করলে বোঝা যাবে যে, বিশ্বকবির কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। বস্তুতঃ ভারতীয় সভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—সমন্বয়। এখানে হাজার হাজার বছর ধরে নানা ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে এবং কালক্রমে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

ইওরোপের ইতিহাসে দেখি, সেখানেও সমন্বয় হয়েছে, কিন্তু ভারতের মতো নয়। ইওরোপ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে চূর্ণ ক'রে ভেঙে দিয়ে একরূপতার সমন্বয় গড়ে তুলেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ বিভিন্নতাকে ও বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করেনি, বরং বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় রচনা করেছে।

ভারতে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বিভিন্ন দেশ থেকে নানা জাতি এসেছে, তারা ভারতের নিকট থেকে নিয়েছে বহু বিষয়, আবার দিয়েছেও বহু। যখন দুর্বার বেগে মুসলিমগণ ভারতে এল, তখন মনে হয়েছিল, সব বুঝি ভেঙে চুরে একাকার ক'রে দেবে। তারা চারিদিকে রাজ্যবিস্তার করেছে, অনেক কিছু ধ্বংস করেছে, কিন্তু তাদের সাতশ' বছরের ইতিহাস কেবল একটানা ধ্বংসের ইতিহাস নয়, সেই ইতিহাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ইতিহাস; কেউ কাউকে গ্রাস করেনি, একের মধ্যে অপরের প্রভাব অদ্ভুতভাবে সঞ্চারিত হয়েছে।

আমাদের দেশে একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন সমন্বয় হয়নি, বা ভবিষ্যতেও

হবে না। কিন্তু যদি মধ্যযুগের সংস্কৃতির ইতিহাস পাঠ করি, তবে দেখে স্তম্ভিত হবো যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান হয়েছিল, এবং তার ফলে কিছুটা সমন্বয়ও সাধিত হয়েছিল।

মুসলিম-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই আমরা দেখি মনীষী আলবেরুনীকে। আলবেরুনী হচ্ছেন সে-যুগের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রধান সেতু। তাঁর মতো পরে আরও বহু মুসলিম পণ্ডিত ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা আরব দেশে, এবং সেখান থেকে পাশ্চাত্যে ভারতের কথা প্রচার করেন। আরবের বহু সুধী ভারতীয় দর্শন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আরবীতে অথবা ফারসীতে অনুবাদ করেছিলেন। এইভাবে 'নিকট প্রাচ্যে'র (Near East) নানা অঞ্চলে ভারতের জ্ঞান ও দর্শন প্রচারিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভারতীয় কৃষ্টির ভাব (Spirit of Culture) আরব দেশের গভীরতর প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, ভারতের বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বেদ, উপনিষদ্, ষড়্দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত—এই সবের অনুবাদ হয়েছে আরবী ও ফারসী ভাষায়। সংস্কৃত হিতোপদেশের ফারসী নাম 'আনোয়ার সোহেলা'। এই গ্রন্থ আবার আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, তার আরবী নাম 'কালিলা ও দামনা।'

আরবের বহু খলিফা, বাদশাহ ও শাসকগণ আরবদেশ ও বহির্বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সে-জন্য অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হননি। যুক্তি ও দর্শনের ভিত্তিতে একটা নবতর সভ্যতা গঠনের প্রতি তাঁদের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁরা জানতেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক মিলন ঘটাতে হ'লে তাদের দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা দরকার। মূলগ্রন্থ থেকে জ্ঞান আহরণ না করলে নিরপেক্ষভাবে দর্শন-বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হ'তে পারে না, সেইজন্য সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য একশ্রেণীর মুসলিম সুধী অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখি, মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান পণ্ডিতগণ পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। মুসলিম পণ্ডিতগণ যেমন সযত্নে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, সেইরূপ হিন্দু পণ্ডিতগণও আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করতে কুণ্ঠিত হননি। কিছুসংখ্যক হিন্দু পণ্ডিত মুসলিম 'কালচার' সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শুধু সংস্কৃত ভাষায় নয়, ফারসী ও আরবী ভাষাতেও তাঁরা বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কয়েকজন হিন্দু সুধীর কথা ব'লব, যাঁরা আরবী অথবা ফারসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে-সব গ্রন্থের জন্য তাঁরা এত খ্যাতি অর্জন করেন যে, ভারতের বাইরেও তাঁদের গ্রন্থের সমাদর হয়েছিল। তা থেকে বোঝা যাবে যে, সে-যুগে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারাটা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।

বৃটিশদের ভারতে আগমনের বহু শত বৎসর পূর্ব থেকে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে আসছিল। যে-সব হিন্দু সুধী আরবী ও ফারসীতে পুস্তকাদি রচনা ক'রে খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের সংখ্যা অগণিত। তাঁরা ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে ফারসী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতের

মুসলিম ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

ভারতে বৃটিশ-শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে ফারসী ছিল রাষ্ট্রভাষা। সরকারী কাজের জন্য হিন্দু-মুসলমানের অনেকেই ফারসী ভাষা শিখতেন, কিন্তু সেটা ছিল স্বতন্ত্র বিষয়। রাজকার্য-পরিচালনার জন্য যতটুকু ফারসী শিখতেন, তাতে সাহিত্যিক জ্ঞান হ'ত না। সাহিত্যের ভাষা হিসাবে যাঁরা ফারসী শিখতেন, তাঁদের শিক্ষাই ছিল আসল শিক্ষা।

শত শত হিন্দু সুধী ছিলেন, যাঁরা সাহিত্যকে ভালবাসতেন ব'লে সংস্কৃত ভাষার মতোই ফারসী শিখতেন। ইসলামিক জগতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁরা ফারসী ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য সাধনা করতেন। বহু হিন্দু কবি, দার্শনিক ও শিল্পী ছিলেন, যাঁরা যে-কোন ফারসীভাষী পণ্ডিতের মতো সহজ-স্বচ্ছন্দভাবে ফারসী লিখতে পারতেন। ইসলাম-সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ তাঁরা ফারসী ভাষাতেই লিখে গেছেন। কেউ কেউ আবার আরবীতে লিখেছেন। এইসব লেখক-গোষ্ঠী হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কাজকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছেন।

বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর—এ দেশে একটা অপপ্রচার করা হয়েছে, যার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা ভেদবুদ্ধি জাগ্রত হয়ে উঠেছে। সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে ইতিপূর্বে যে-সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছিল, এই সব অপপ্রচারের ফলে সেটা অনেকটা ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগে যে-সব হিন্দু-মুসলমান সুধী ফারসী ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতেন, তাঁরা ছিলেন সে-যুগের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের মশালবাহী সাধক। তাঁরা যে-স্রোত বহিয়ে দিয়েছিলেন, তা যদি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত থাকত, তবে ভারতের অবস্থা অন্যরূপ হ'ত, এই সব সাধকদের জীবনের ব্রত সার্থক হ'ত এবং বহুপ্রকার জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। এই প্রবন্ধে কেবল কয়েকজন হিন্দু সুধীর কথা বলছি, যাঁরা অতীত যুগে ফারসী ভাষার চর্চা করেছিলেন এবং সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করতে সহায়তা করেছিলেন।

প্রথমেই ফারসী ভাষায় লিখিত একটি পুস্তকের নাম করা যাক—'গুলরানা'। এটা কবিদের জীবনীমূলক একটি গ্রন্থ। লেখকের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ। তাঁর কবি-নাম 'শফীক'। লক্ষ্মীনারায়ণের আদি বাসস্থান আহমদাবাদ। তাঁর 'গুলরানা' গ্রন্থে একটি অধ্যায়ে আছে ভারতীয় কবিদের বিবরণ; অপর অধ্যায়ে মুসলিম কবিদের পরিচয়, আর এক অধ্যায়ে সেই সব হিন্দু কবিদের বিবরণ আছে, যাঁরা ফারসী ভাষায় কাব্য-চর্চা করেছেন।

লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ আসলে একজন ঐতিহাসিক। তিনি ১৭৯৪ খৃঃ ভারতের একটি ইতিহাস লিখেছেন। তাঁর সে-ইতিহাস গ্রন্থের নাম 'হাকিকতে হিন্দুস্তান'। এই পুস্তকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্ব-ব্যবস্থার কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর রচিত আর একটি পুস্তকের নাম 'মাসার-ই-আসাদী'। এতে আছে ১৬৭১ থেকে ১৭৬১ খৃঃ পর্যন্ত হায়দ্রাবাদের ইতিহাস। এ-সব ঐতিহাসিক গ্রন্থের একটা নিজস্ব মূল্য আছে সত্য, কিন্তু 'গুলরানা' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, আকবরের রাজত্বকালে ভারতে বহুসংখ্যক কবির আবির্ভাব হয়েছিল। সেই যুগের একজন বিখ্যাত হিন্দু

কবি ছিলেন, তাঁর নাম 'মনোহর তানসানি'। মনোহর তানসানি ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি কাব্য-রাজ্যের সিংহাসনকে চতুষ্পদী কবিতার শ্লোক দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন।

শাহজাহান ও আলমগীরের রাজত্বকালে 'ব্রাহ্মণলাহরী' ব'লে একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি একটি 'দেওয়ান' লেখেন, তাতে তাঁর রচিত বহুবিধ কবিতা সঙ্কলিত আছে। মোগলসম্রাট্ শাহআলম, ফারোকসিয়ার ও মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে বহু হিন্দু কবি কাব্য রচনা ক'রে অশেষ কীর্তি অর্জন করেন। তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ভারতীয় পটভূমিকার উপর ফারসী কবিতা লিখতেন। 'গুলরানা'র লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ আরও কয়েকজন হিন্দু কবির নাম উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তাঁদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল:

১। অচলদাস: তিনি জাহানাবাদের অধিবাসী, জাতিতে ক্ষত্রিয়। অচলদাস ছিলেন স্বভাবকবি। তাঁর কবিতার একটি নমুনা ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে দেওয়া হ'ল। এই ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ দিলাম না, কারণ তাতে 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হয়ে যাবে।

'I did not see any place void of the splendour of the traceless one ; The six directions are full to the brim with His beauty, while His space is vacant—He being not inclined to any particular place'.

২। কিশনচাঁদ: ইনি 'এখলাস' এই কবিনাম নিয়ে কাব্য-চর্চা করতেন। কিশনচাঁদ উপরি-উক্ত অচলদাসের পুত্র। তিনি মিরজা আব্দুল চাঁদী এবং কাবুল কাশ্মিরীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। কিশনচাঁদ ছিলেন সুন্দরের কবি। জীবনে প্রথম শ্রেণীর বহু কবির সংস্পর্শলাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনিও একটি স্মৃতিকথা লিখেছিলেন। সেই গ্রন্থের নাম 'হামেশা বাহার' অথবা চির-বসন্ত। তাঁর এই গ্রন্থ থেকে দু-একটি শ্লোকের অনুবাদ:

'When the heart is overcome with love, reason vanishes. When the king is defeated, the courage of the army vanishes.'

'Art and skill is a sufficient sign for a clever man. The name of a sage subsists through his thought and idea. Do not be perplexed, O Ekhlas, for attaining eminence, for the ups and downs of the world are like a ladder.'

৩। আনন্দ-কন: তাঁর আসল নাম বৃন্দাবন। তিনি ফারসী ও সংস্কৃত এই দুই ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুললিত ভাষায় সমগ্র গীতার ফারসী অনুবাদ করেন। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ইংরেজী অনুবাদেও পরিস্ফুট:

The pillow is drenched throughout
the night with my tears,
The rose-petals become
sparks of fire on my bed;
The slumber comes
and sees water in my eyes
She fears being drowned, so turns back.

৪। উলফৎ লালা অজাগর চাঁদ: ইনি মথুরার এক বিখ্যাত কায়স্থ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং তরুণ বয়স থেকেই কবিতা-লেখা অভ্যাস করেন। বহু দিন পর্যন্ত তিনি আজিমাবাদে বসবাস করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, অল্প আয়ে দিনপাত করতেন। তাঁ

সহজ ব্যবহার, নম্র স্বভাব সকলকে মুগ্ধ ক'রে তুলত। প্রথম জীবনে তাঁর কবি-নাম ছিল 'গুরবৎ' অর্থাৎ দারিদ্র্য। কিন্তু পরে তিনি ঐ নাম পরিবর্তন ক'রে 'উলফৎ' এই নাম গ্রহণ করেন। তাঁর রচনা মধুর ও প্রীতিপদ। নিম্নের উদ্ধৃতি তাঁর রচনামাধুর্যের পরিচয় দেবে :

'In the evening there came into my
bosom a guest named 'grief',
Unceremoniously I placed a fray
before him from the strain of my heart,
My heart is becoming intoxicated
with 'kaaba' of the black eyes,
For it possesses a hundred pitchers of
wine of pleasure of this night,'

৫। ব্রাহ্মণ রায় চন্দ্রভান : এঁর জন্মভূমি লাহোর। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবি। তিনি কিছুদিন মোগলসম্রাট শাহজাহান ও তৎপুত্র দারা শিকোহের সেক্রেটারির কাজ করেছিলেন। দারা যখন কোন সংস্কৃত গ্রন্থকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করতেন, তখন তিনি কবি চন্দ্রভানের নিকট বহু সাহায্য গ্রহণ করতেন, দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা তাঁর নিকট বুঝে নিতেন। এমন কি দারা তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থে চন্দ্রভানের ফারসী শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ফারসী ভাষায় অনেক গ্রন্থ লেখেন, তন্মধ্যে দুটি গ্রন্থ সুবিখ্যাত :

(১) 'মুনশা-আতে ব্রাহ্মণ'—তিনি শাহজাহান ও তাঁর দরবারের কয়েকজন ওমরাহকে যে-সব চিঠি লিখেছিলেন, এতে আছে সেই সব চিঠির সঙ্কলন।

(২) 'দিওয়ান-ই ব্রাহ্মণ'—এটা একটা কবিতার সঙ্কলন। তিনি যে-সব কবিতা লিখেছিলেন, বর্ণানুসারে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। তাঁর কবিতা সে-যুগে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

৬। কন্‌কা, অন্য নাম কঙ্কা : খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কবি কন্‌কার আবির্ভাব ঘটে। সে-যুগে তিনি একজন পণ্ডিত ব'লে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি আরবী ও ফারসী দুই ভাষাতেই রচনা করতেন। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং সুদূর বাগদাদ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। খলিফা মামুনের দরবারে একজন ভারতীয় পণ্ডিত ব'লে সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হন। জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত বহু ভারতীয় গ্রন্থ তিনি বাগদাদে নিয়ে যান এবং অপরাপর পণ্ডিতের সহযোগিতায় সেগুলিকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর এই বিরাট গ্রন্থের নাম 'সিন্ধ হিন্দ'। কন্‌কা আরবী ভাষায় আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেওয়া গেল : (১) আলমু-মুক্তাফিল-আমর—অর্থাৎ জীবনের আদর্শ। (২) কিতাব-ই-আসরার আল মাওয়ালিদ—অর্থাৎ জন্মরহস্য। (৩) কিতাবুল-কিরানাতুল কাবির—অর্থাৎ গ্রহ ও উপগ্রহ-সংক্রান্ত গ্রন্থ। (৪) কিতাবুত্‌ তিব্বেকান্নাম—এটা চিকিৎসা-সংক্রান্ত পুস্তক। (৫) কিতাবুল তারাহাম—কল্পনা-সংক্রান্ত পুস্তক। (৬) কিতাবুল আহাদিসুল আলাম—এটা পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব-সংক্রান্ত পুস্তক।

৭। কেবলরাম : ইনি ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'তাজ-কেরাতুল ওমারা'। এতে আছে কতিপয় বিখ্যাত আমির-ওমরাহদের জীবনীর সঙ্কলন। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে মুসলিম ওমরাহ-সভাসদদের বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে হিন্দু সভাসদদের কথা।

৮। কিশোরী : তিনি ফারসী ভাষায় বহু কবিতা রচনা করেছেন। পাঠান-যুগের

তিনি একজন বিখ্যাত কবি ও বহু গ্রন্থের লেখক। তাঁর গ্রন্থগুলি আজকাল একেবারে দুষ্প্রাপ্য। তবে তাঁর রচিত কয়েকটি কবিতা 'মাজমায়ে আশার' নামক একটি কবিতা-সঙ্কলনে সংগৃহীত হয়েছে। সেগুলি পাঠ ক'রে জানা যায় যে, তাঁর কবিতা যেমন তেজস্বিতাপূর্ণ তেমনি প্রাঞ্জল।

৯। নরনারায়ণ : মোগলসম্রাট্ ফারোখ-শিয়ারের সময় কবি নরনারায়ণ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সংস্কৃত ও ফারসীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং দুই ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'গুলশনে রাজ'। সে যুগের সুধীমণ্ডলী এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা ও দৃশ্যাবলী থেকে গৃহীত। তিনি সে-সব দৃশ্যকে তাঁর যুগের পটভূমিকার উপর অপরূপ-ভাবে অঙ্কিত ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভারতীয় বিষয়ের উপর ফারসী ভাষায় এমন সুন্দর গ্রন্থ অতি অল্পই লেখা হয়েছে। সুমধুর ফারসী কবিতার এ একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

১০। রায় বৃন্দাবন : ফারসী ভাষায় ইনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তাঁর প্রধান কীর্তি এই যে, তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারিখ-ই-ফিরিস্তা'কে ফারসী ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে লেখেন। সেই সঙ্গে এই গ্রন্থে একটি নূতন অধ্যায় সংযোগ করেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কথা তিনি সবিস্তারে এই অংশে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থের নাম 'লুৎবাতুত তওয়ারিখ'।

১১। শানাক : তিনি ফারসী ভাষায় ঔষধপত্র ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন এবং চিকিৎসার বহু অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর তিনখানি পুস্তক খ্যাতি লাভ করেছে। (১) 'কেতাবুস-সুমাম ফি খামসে মকালাত'—এতে আছে বিষ-সম্বন্ধে আলোচনা। (২) 'কেতাবুল বায়ম-তায়াব'—এতে আছে পশুরোগ-সম্বন্ধে আলোচনা। (৩) 'কেতাব ফি ইলাম নুজুম'—এতে আছে জ্যোতির্বিদ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা।

১২। সানজাহাত : দশম শতাব্দীতে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব'লে খ্যাতি অর্জন করেন। আলবেরুনী এঁর ভেষজ-সংক্রান্ত একখানা পুস্তক পড়েছিলেন। ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সানজাহাত অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জন্মরহস্য সম্বন্ধেও একটি গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম 'কেতাবুল মোওয়া-লিদাল কবির'।

১৩। সুজনরাজ : প্রবন্ধের শেষে আর একজন সুপণ্ডিতের নাম ক'রব—যিনি সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময় জীবিত ছিলেন। তিনি প্রাচীনকাল থেকে আওরঙ্গজেবের যুগ পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের একটি বিরাট ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন ফারসী ভাষায়। তাঁর সে গ্রন্থের নাম 'খোলাসাতুত্ তারিখ'। আওরঙ্গজেবের যুগের বহু ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ তাঁর এই গ্রন্থে আছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নের সময় তিনি বহু ফারসী গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, যথা: 'তারিখে আকবর', 'জাহাঙ্গীর-নামা', 'আকবর-নামা'।

আরও বহু হিন্দু সুধী ফারসী ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। স্থানাভাববশতঃ বর্তমান প্রবন্ধে তাঁদের নাম ও পরিচয় দেওয়া সম্ভব হ'ল না। বৃটিশ যুগের পর ফারসীর স্থলে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হ'ল ইংরেজী। সুতরাং দেশে ইংরেজী শিক্ষার খুব ধুম পড়ে গেল; আর ফারসী ভাষা অবহেলিত হ'তে লাগল। তারপর থেকে ফারসী ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। ভারতে

হিন্দু চিন্তা ও মুসলিম চিন্তার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে আদানপ্রদান হয়ে আসছিল। ফলে উভয় ধরনের চিন্তাধারা একই মহাসাগরে মিলিত হচ্ছিল। এইভাবে ভারতে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের পথ সুগম হয়ে আসছিল; কিন্তু ইংরেজ অধিকারের পর সে সমন্বয় বন্ধ হয়ে গেল। আবার নূতন উদ্যমে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারাকে প্রবাহিত ক'রে দিতে হবে। মুসলমানকে যেমন সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতে হবে, সেইরূপ হিন্দুকেও আরবী-ফারসীর চর্চা করতে হবে। ভাষার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। আরবী-ফারসী চর্চা না করলে ভারতবর্ষ ইরান, ইরাক—তথা সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

সাহারায়

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার 'নীল'-এর স্নিগ্ধ করুণার ধারা
কতদূরে, কতদূরে? আমার সাহারা
রৌদ্রতপ্ত কাঁদে আজও দিগন্তপ্রসারী!
কোথায় তৃষার্ত তার পিপাসার বারি
সুশীতল? যতদূর যতদূর চাই
কোনখানে শ্যামলের চিহ্নমাত্র নাই!
বড়ো শূন্য! বড়ো একা! বলো বলো মোরে
আছ মোর পিতা তুমি হাতখানি ধ'রে
তোমার হাতের মাঝে! দাও এ বিশ্বাস—
সূর্যে সূর্যে যে-তোমার জ্যোতির প্রকাশ,
যে-তুমি সর্বজ্ঞ আর সর্বশক্তিমান্
নগণ্য আমার লাগি সে-তোমার প্রাণ
কাঁদিতেছে অহরহ! এক-পা এগোলে
বলো, বলো আস তুমি শতপদ চ'লে!

'বিশ্বশিক্ষক-সম্মেলন'

শ্রীধনঞ্জয়কুমার নাথ

১৯৫২ খৃঃ একটি সম্মেলনে তিনটি আন্তর্জাতিক শিক্ষক-সংস্থা 'ওয়ার্লড্ কনফেডারেসন অব অরগেনাইজেশন অব টিচিং প্রফেসন' নামে একটি বিশ্বশিক্ষক-সংস্থা গঠন করে। এই সংস্থার গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, এই প্রতিষ্ঠান সকল স্তরের শিক্ষকগণের জন্য একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়তে চায়। প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে (১) আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র ও শুভেচ্ছার সহায়ে শিক্ষা শান্তি, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-মর্যাদার রক্ষক হবে; (২) শিক্ষার পদ্ধতি ও সংগঠন উন্নয়নের এবং বৃত্তিমূলক ও শিক্ষাগত উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষকগণ যুবসমাজের কল্যাণে ব্রতী হবেন; (৩) বিভিন্ন দেশের শিক্ষকগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

এর প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যন্ত সভ্যসংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্যসূচীর ক্ষেত্রও ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়েছে। এই সংস্থার সভ্যসংখ্যা বর্তমানে ৭০ থেকে ১২১ দাঁড়িয়েছে। প্রথমে ৩৭টি দেশের শিক্ষক-সংস্থা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়, কিন্তু বর্তমানে ৭০টি দেশের শিক্ষক-সংস্থা এর সভ্য। এই সংস্থার অনেকগুলি আঞ্চলিক সম্মেলন ও সভা হয়েছে। ১৯৫৮ খৃঃ এফ্রো-এশিয়ার দেশগুলির একটি সম্মেলন সিংহলে হয়েছিল। পরবর্তী কালে এই সংস্থার এশিয়া কমিটি ও অঞ্চল পর্ষদ এশিয়া মহাদেশের শিক্ষানীতি-সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা আলোচনার জন্য সংগঠিত হয়। আফ্রিকাতেও এইভাবে ১৯টি দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থাগুলির সাহায্যে একটি আঞ্চলিক সংস্থা একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। এই ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও শিক্ষকের মান উন্নয়নই এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই বিশ্বসংস্থা UNESCO-এর পরামর্শ-দাতা ভূমিকা গ্রহণ করেছে ও UNECF, FAO প্রতিষ্ঠান-দুটির সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। U.N.O.-কে এই সংস্থা শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এই ভাবে রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যে এই সংস্থা জগতের জাতিগুলির মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের সাধু প্রচেষ্টায় ব্রতী আছে।

প্রতি বছর এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠান সংগঠন-সংক্রান্ত বিষয় ও শিক্ষা-সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি বিশ্ব-সম্মেলন আহ্বান করে। এই অধিবেশন পূর্বে অক্সফোর্ড, অসলো, ইস্তানবুল, ম্যানিলা, ফ্রাংকফুর্ট, রোম, ওয়াশিংটন ও আমস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছরে দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল দিল্লীতে এবং আগামী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে স্টকহল্মে।

দিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সমবেত এই সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ ঘোষণা করেছেন: 'Education for responsibility grows out of the convictions held by the society with regard to fundamental moral, spiritual and national values.' আরও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ছাত্রজগতে বিশৃঙ্খলা ও জটিলতা পরিহার করতে হ'লে শিক্ষকগণের কর্তব্য নৈতিক ও আত্মিক মূল্য-বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্রগণকেও ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। এই মূল আদর্শকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকগণের জন্য 'পঞ্চ-শীলের' সুপারিশ করেছে। (১) আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যে আস্থা; (২) আইনের প্রতি শ্রদ্ধা

ও প্রয়োজন-বোধে সংশোধন ; (৩) বিচারশীল দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ মুক্তবুদ্ধি ; (৪) কৌতূহলী মানসিকতাকে উৎসাহ-দান ও ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ; (৫) মানব-অধিকারের ঘোষণা-অনুযায়ী শিক্ষাকার্য-পরিচালনা।

অপর একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, দায়িত্ব-পালনের উপযুক্ত হ'তে হ'লে শিক্ষকগণের যথার্থ সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন প্রয়োজন এবং জনশিক্ষার বাহনগুলিকে কাম ও অপরাধের বিকৃত পরিবেশন বন্ধ রাখতে হবে।

এই অধিবেশন সরকারী সহযোগিতা ও সাহায্যে পুষ্ট। তাই বিশ্বসংস্থার প্রস্তাব ও উদ্দেশ্যের মূল সুরটি সরকারী কর্মচারী ও নেতৃবৃন্দের বিশেষ ক'রে অনুধাবন করা উচিত। এই অধিবেশন শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতার কারণ ও তার সমাধান নির্দেশ করতে দুটি মূল সিদ্ধান্তে এসেছে। প্রথমটি আত্মিক মূল্য-বোধের অভাব এবং অপরটি শিক্ষকগণের দারিদ্র্য ও আদর্শবোধের অভাব। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার প্রভাবে, মানবতাবাদের মাধ্যমে ভোগবাদের প্রবল বন্যা সমাজের সকল স্তরকে প্লাবিত করেছে। তাই কেবল প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে শিক্ষকগণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মিক ও নৈতিক মূল্যমান বজায় রাখতে পারবেন ব'লে মনে করা নিতান্তই অবাস্তব আশাবাদের কথা। এটা শিক্ষক-সমাজের সাধু সঙ্কল্প, কিন্তু পরিবেশের প্রতিকূলে এ সঙ্কল্প বাস্তবে রূপায়িত করা দুঃসাধ্য ব'লে মনে হয়। তাই শিক্ষা—তথা মানব-জীবনকে সার্থক করবার জন্য প্রয়োজন আপামর জনসাধারণের অন্তরে আত্মিক মূল্য-বোধের পুনর্বাসন। কিন্তু এ সমাজের সকল স্তরে আত্মিক মূল্যবোধের সমস্যা সম্পর্কে কোন কোন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কার্যক্ষেত্রে নিতান্তই উদাসীনতা অবলম্বন ক'রে জাতির সর্বস্তরে নাস্তিকতা ও ভোগবাদের মাধ্যমে জাতিকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছেন। এ কারণেই বৈশ্যমূল্য ও বিশ্বস্বার্থের প্রাবল্যে হতাশায় মুহ্যমান শিক্ষক-সমাজের পক্ষে রাষ্ট্র ও সমাজের সহায়তা ছাড়া এক পাও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

অধিকন্তু যে-দেশে একদিকে দারিদ্র্য ও অনাহারক্লিষ্ট শিক্ষক এবং অপর দিকে আর এক শ্রেণীর মানুষের জন্য সস্তায় মোটরগাড়ি উৎপাদনের ব্যবস্থা, সে-দেশে শিক্ষকের মাধ্যমে এতবড় আদর্শগত কর্তব্য কি ক'রে সম্ভব ?

স্বামীজী বলেছেন, খালি পেটে 'ধর্ম' হয় না। 'শিক্ষা'র ক্ষেত্রেও এ-কথা সত্য। 'Education is the manifestation of perfection already in man'—এই যে মহাসত্য স্বামীজী ঘোষণা করেছেন, তার মৌখিক স্বীকৃতি এই বিশ্বসংস্থার মাধ্যমে অন্য ভাষায় পাই, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যতদিন পর্যন্ত না এই শিক্ষা-আদর্শকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রয়াসী হচ্ছেন, তত দিন শিক্ষা ও শিক্ষকের কোন ভবিষ্যৎ আছে ব'লে মনে হয় না।

বিশ্বসংস্থার এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করবার জন্য চাই 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'-ভাবাদর্শের সম্যক্ অনুশীলন। কারণ এই আদর্শেই ব্যক্তির আত্মিক মূল্য ও সমাজের মূল্য সুন্দরভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই আদর্শের অনুপ্রেরণাই ভোগবাদী বৈষম্যের আদর্শ থেকে মানব-সমাজকে মুক্তি-পথে নিয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া শিক্ষকগণের আত্মিক নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় ; অর্থাৎ এ ছাড়া প্রকৃত শিক্ষাদান-কার্য অসম্ভব। আশা করি, মুক্তবুদ্ধি মানুষ এ বিষয়ে সম্যক্‌রূপে সচেতন হবে। অন্যথা সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।

সংকল্প ও সাধনা

শ্রীমতী বেলা দে

মানুষের একটি স্বাভাবিক আত্মমর্যাদা-জ্ঞান আছে, যার বশে সে তার সংকল্প রক্ষা করে, এবং হাতের কাজ শেষ না ক'রে ছাড়ে না। যে কথা সে বলেছে, যে কর্তব্য সে স্বীকার করেছে, তা পালন না করলে তার মান থাকে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মানুষ 'প্রাণের চেয়ে মান, এবং আপনার চেয়ে আপনার নামটাকে বড় মনে করে।' এই মানের জিদেই মানুষ পৃথিবীতে যত কিছু মহৎ কাজ করেছে, মান রাখতে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছে।

সংকল্প-সাধনের জন্য মানুষ তার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করে। প্রত্যেক উপায়েই শারীরিক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। শিশু যা চায়, তা পাবার জন্য হাত পা ছোঁড়ে, এবং শেষে কাঁদতে শুরু করে। কেউ যদি সে কথায় কর্ণপাত না করে, তা হ'লে সে কাঁদতে কাঁদতে হাঁপিয়ে ওঠে, তখন মা-বাপকে বাধ্য হয়ে শিশুর কাছে আসতে হয়। আর একটু বয়স বাড়লেই সে অভীষ্টলাভের জন্য কলহ করতে আরম্ভ করে। ছোট ছেলেমেয়েদের কলহ শুরু হয় এইভাবেই স্বার্থলাভের সংঘর্ষে। তাতে কষ্ট পায় ছেলেমেয়েরাই। শৈশবের এই একগুঁয়েমি কৈশোরে শিক্ষা-দীক্ষার ফলে কিছুটা সাধুপথে চলে, সংযমের বাঁধা পথ ধরে। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও কিশোরের কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ হয়। খেলতে খেলতে হাত-পা ভাঙে, তবুও জয়লাভের আশায় খেলতে হয়। প্রতিযোগিতামূলক খেলা এবং নানাবিধ অভিযান প্রভৃতির ব্যবস্থার দ্বারা কৈশোরে এই জিদকে মঙ্গলের পথে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। যৌবনের জিদ আরও প্রবল।

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন'—এই হ'ল বিশ্বকল্যাণের বাণী। নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য অনেকেই অনেক কষ্ট সহ্য করেন। ব্যক্তিগত জীবন-সাধনাতেও মানুষ সংকল্প-সিদ্ধির জন্য যে কোন কষ্ট সহ্য করতে পারে এবং যারা পারে তারাই জীবনে কৃতকার্য হয়। সত্য-রক্ষার জন্য, প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য দৃঢ়সংকল্প থাকা চাই। যে তরলমতি, যে জীবনকে সত্য জ্ঞান করে না, যার আত্মসম্মানবোধ নেই, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, সামান্য বিপদেই সে কর্তব্যচ্যুত হয়।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটি বিশিষ্ট কর্তব্য বা ব্রত আছে। সেই কর্তব্যই তার জীবনমন্ত্র। কেউ ডাক্তার, কেহ উকিল, কেউ ইঞ্জিনিয়র, কেউ বা যোদ্ধা নাবিক কিংবা বৈজ্ঞানিক হ'তে চায়। প্রত্যেক মানুষের কর্মধারাই তার পক্ষে তপস্যা। প্রত্যেক কাজেরই একটি বিশেষ উন্মাদনা আছে, প্রকৃত কর্মবীর সেই উন্মাদনা আস্বাদন করেন। কর্মের প্রতি এই অনুরাগ মানুষকে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করে।

মানুষ হ'তে হ'লে জীবনের পুরো দাম দিতে হবে, নতুবা ভাগ্যে মিলবে শুধু অপমান আর মৃত্যু। অলসতায় বা বিফল আমোদ-প্রমোদে যারা বহুমূল্য সময় নষ্ট করে, তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিফলতা বরণ ক'রে পরে অনুতাপ করতে থাকে। যে কোন বিষয়ে আত্মোৎকর্ষ-সাধন দৃঢ়সংকল্প-নিষ্ঠা-সাপেক্ষ। দীনহীন কাঙালের সন্তান নিজ পুরুষকার-বলে ভাগ্যলক্ষ্মীকে বরণ ক'রে নিয়ে অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন, শুধু সংকল্পনিষ্ঠার আনুকূল্যে। সেই সব কোটি কোটি মানুষের তপস্যার কথা আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে।

সাধনপ্রসঙ্গে রামপ্রসাদের গান*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

শ্রীরামপ্রসাদ ভক্ত ও সাধক ছিলেন। জগদম্বা তাঁর কন্যারূপে এসে তাঁর বেড়া বেঁধে দিয়ে গেছেন। তিনি মাকে বেঁধেছিলেন ভক্তি প্রেম ও অনুরাগের ডোরে। কাতর হৃদয়ে ব্যাকুল হয়ে তিনি মাকে ডাকতেন। প্রতি গানের মধ্য দিয়েই তাঁর অন্তরের এই আর্তিভাব ফুটে ওঠে। এই গানের মধ্য দিয়েই তিনি মাকে ডাকতেন, অন্তরের কাতর প্রার্থনা জানাতেন। এই গানই ছিল তাঁর সাধনা। মা-ই ছিল তাঁর একমাত্র কামনার বস্তু, সকরুণ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ব্যাকুলভাবে তিনি গান গেয়ে গেয়ে মাকে ডেকেছেন। তিনি সংসারের সম্পদ্ ঐশ্বর্যকে বলছেন, 'সামান্য ধন'। তাঁর একমাত্র সম্পদ্ 'মা'। যে সম্পদ্ লাভ করলে অন্য সব সম্পদ্ তুচ্ছ বোধ হয়, সেই 'মাতৃ-ধন'ই তিনি চাইছেন। এই তাঁর জীবনের শিক্ষা। তিনি মধ্যবিত্ত, প্রায় দরিদ্র ছিলেন বলা যায়। গ্রাম ছেড়ে জীবিকার জন্যে তাঁকে আসতে হয় কলকাতায়, সেখানে এক ধনীর ঘরে তিনি খাতা লেখার কাজ নেন। এখানেও তিনি গান বাঁধতেন। হিসেবের খাতায় লিখেছিলেন, 'আমায় দে মা তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।' ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি মাকে ডাকছেন, সব সম্পদ্ ছেড়ে তিনি মায়ের খাস-তালুকের তবিলদারী চাইছেন। তাঁর জীবনের শিক্ষা অপূর্ব ত্যাগ, ভোগে বিতৃষ্ণা। মানুষ বিষয়ের নেশায় ডুবে আছে, কিন্তু তিনি মাকে বলছেন, সামান্য ধনসম্পদ্ তাঁর কাছে তুচ্ছ, তা তিনি চান না; চান শুধু শ্যামাধন, কালীধন তিনি চান। তাঁর গানে—আছে আলো, আছে পথ।

তিনি বলছেন, সাধন-ভজন বিনা গুরুদত্ত মহামন্ত্র হারিয়ে ফেলেছি। তার অর্থ ভগবানকে পেতে হ'লে সাধনের যেমন প্রয়োজন, তার ওপর আরও একটি জিনিস চাই। সাধন করলেও যেমন তাঁকে পাওয়া যায় না, তেমনি না করলেও আবার তাঁকে পাওয়া যায় না, এটি হয় তাঁর কৃপায়। তাঁকে লাভ করার একমাত্র উপায়—তাঁর কৃপা। কৃপানাথ তিনি। 'তাঁর ইচ্ছা না হ'লে গাছের পাতাটিও নড়ে না' ঠাকুর বলতেন। তাঁর কৃপারূপ পরশমণির স্পর্শে তিনি লোহাকেও সোনা ক'রে দেন। তাই আগে তাঁর কৃপা চাই। কৃপা আসে ব্যাকুলতা থেকে, আর্তি থেকে। ঠাকুর বলতেন, 'কৃপা-বাতাস তো বইছেই, পাল তুলে দাও'। ঐ পাল তোলার পরিশ্রমটি অর্থাৎ সাধন-ভজন করতে হবে। তবে তাঁর কৃপা আসবে। অনুরাগ-মিশ্রিত সাধন চাই। প্রসাদের সাধন কায়িক পরিশ্রমে নয়, সঙ্গীতের মধ্যে অনুরাগ-মিশ্রিত আকুলতাই তাঁর সাধন। তাই মাকে তিনি হারাননি। তিনি পার্থিব সম্পদ্ চাননি। হৃদিকমলে মাতৃধন চাইছেন তিনি।

'গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনের দয়া হ'ল। একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল'। রামপ্রসাদ বলছেন, একের দয়া, কিনা মনের দয়া হচ্ছে না। তাই তাঁর মনে সংশয়। মহামন্ত্র তিনি বুঝি বা হারিয়ে ফেলছেন। গুরুর আদেশ কার্যে পরিণত হচ্ছে না।

* আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ১৯. ১১. ৫৬ সন্ধ্যায় আরাত্রিক অন্তে ধর্মপ্রসঙ্গ। শ্রীআলোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত।

বিষয়াসক্ত মন সোজা হচ্ছে না। এর জন্যে চাই সাধুসঙ্গ। ঠাকুর বলতেন, 'ভিজে দেশলাই যতই ঘসো, জ্বলবে না। তাকে শুকিয়ে নাও, ফস্ ক'রে জ্বলে উঠবে।' সাধুসঙ্গে শুকিয়ে নাও, তবে জ্বলবে। তাই তিনি প্রার্থনা করতেন, 'মা, তুই কৃপা ক'রে এসে হৃদয়ে বোস্, তবেই জীবন সার্থক হবে। সব চেয়ে মজা এই, যতই তাঁর দিকে এগনো যায়, মনে ততই আক্ষেপ আসে যে, কই কিছুই হচ্ছে না। আরও চাই আনন্দ। এতে মন তৃপ্ত হচ্ছে না। আর যারা অল্প কিছু পায়, তারা মনে করে—কত না জানি পেয়েছে!

রামপ্রসাদ আবার বলছেন, 'মন তুমি কৃষিকাজ জানো না, এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।' আবাদই সাধনা,—এই সাধনের সময় গুরুদত্ত বীজ-রোপণ। সাধনকালে 'নাম' বীজ রোপণ করতে হয়। ভক্তিভাবে সাধন করতে হয়। চাষের কালে জমি থেকে ইট-পাটকেল ফেলে দিয়ে, আগাছা সরিয়ে জমিকে পরিষ্কার করতে হয়; সেই পরিষ্কার জমিতে সার এনে দিতে হয়, তার পর বীজ পুঁততে হয়। আমরা কিন্তু ঐ জমি তৈরীর দিকে লক্ষ্য রাখি না, শুধু গুরু-মন্ত্র গ্রহণ ক'রে যাই। দীক্ষাগ্রহণের আগে মন তৈরী করতে হয়। তৈরী জমিতে বীজ দিলে যেমন ভাল ফসল ফলে, তেমনই শুদ্ধ মনে মন্ত্র পড়লে আনন্দ লাভ হয়। শিষ্য চায় সদ্‌গুরু, আবার গুরুও চান শুদ্ধ পবিত্র শিষ্য।

বাইবেলে এইটি বোঝাবার জন্য একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এক ব্যক্তি কিছু বীজ নিয়ে এসে জমিতে ছড়াতে লাগলো। তার সেই বীজ কিন্তু সবই ভাল জমিতে প'ড়ল না; কিছু প'ড়ল পথে, কিছু প'ড়ল পাহাড়ে, কিছু কাঁটাগাছের মধ্যে—ঝোপে, আর কিছু প'ড়ল উর্বর জমিতে। যে বীজগুলি পথে প'ড়ল, পাখী এসে সেগুলি খেয়ে নিল, যেগুলি পাহাড়ে প'ড়ল, সেগুলি অঙ্কুরিত হ'ল না, রৌদ্রে শুকিয়ে গেল। যেগুলি কাঁটাঝোপে প'ড়ল, সেগুলি একটু বড় হ'তে না হতেই কাঁটা গাছের চাপে মরে গেল। আর যেগুলি চষা উর্বর জমিতে প'ড়ল, সেগুলি থেকে চারা বেরুল আর সুন্দর ফসলে মাঠ ভরে উঠল।

যেখানে সেখানে বীজ পড়লে ফসল হয় না, চাষ-করা জমি চাই। সাধন করতে হয়, কিন্তু অহংকার করতে নেই। মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ হয়ো না। অহংকার বর্জন কর, কাউকে হেয় ক'রো না। ঐ বীজ থেকে যখন চারাগাছ দেখতে পাবে, তখন তাতে বেড়া দেবে। সাধক রামপ্রসাদ জগদম্বাকে জেনেছিলেন, তাই তাঁর প্রদর্শিত পথেই আমাদের চলা কর্তব্য।

তৈরী-করা জমিতে বীজ বপন করতে হয়, কিন্তু একটি কথা, পুরুষকারের ওপর নির্ভর করলেই হয় না—অর্থাৎ শুধু সাধন করলেই হয় না। দৈব ব'লে একটি জিনিস আছে। কত পরিশ্রম ক'রে চাষী নিজ পুরুষকারের দ্বারা অনুর্বর জমিকেও উর্বর ক'রে তোলে। কিন্তু বৃষ্টি যদি না হয়, তবে তো সবই পণ্ড, ব্যর্থ সব পরিশ্রম! চাই বৃষ্টি—দেবতার কৃপাবারি। এর সঙ্গে কিন্তু আরও একটি বিষয় আছে, সেটি কাল—শুভ সময়, শুভ মুহূর্ত।

কোন কিছুতে সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে চাই তিনটি একসঙ্গে—পুরুষকার, দৈব আর শুভ সময়। এইগুলির একত্র যোগাযোগ হ'লে তবে ফললাভ। এদের মধ্যে একটি তোমার হাতে, আর বাকী দুটি দেবতার

হাতে—কৃপা ও সময়। আমরা বলি, এর এখন ভাল সময় চলছে, ওর এখন সময় ভাল নয়। এই সময় ভাল-খারাপ এলোমেলো ভাবে আসে না, আসে কর্মফল থেকে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও দেবতা প্রতিকূল থাকায় ফললাভ হয় না। কিন্তু তাই ব'লে চেষ্টা ছাড়বে না, কোন্ সময় যে দৈব অনুকূলে আসবে তা তুমি জানো না। তাই পুরুষকারও চাই, চেষ্টা তুমি ক'রে যাবে, সাধন ক'রে যেতে হবে, আর প্রতীক্ষায় থাকতে হবে শুভলগ্নের ও দৈবী কৃপার। ঠাকুর 'খানদানী চাষা'র উদাহরণ দিতেন। জন্মগত পেশা তার চাষ করা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি—সব সময়ই সে চাষ ক'রে যায়। স্নানাহারের সময় তার থাকে না। একগুঁয়ে হয়ে কাজ ক'রে শেষে সারা-দিন পরে যখন দেখে জমিতে কুলকুল ক'রে জল আসছে, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে তামাক খায়।

কিন্তু এই পুরুষকার ছাড়া দৈবকৃপারও সময় আছে। স্বামীজীর জীবনে দেখি, তাঁর বাবা মারা যাবার পর তিনি কত চেষ্টা করলেন, কত অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন, কিন্তু কোন সুবিধা হয়নি। পুরুষকার বিফল হয়েছে। দৈব ও সময় এখানে প্রতিকূল ছিল। আবার সময় ও দৈব অনুকূল থাকা সত্ত্বেও পুরুষকার না থাকায় ফললাভে বঞ্চিত হ'তে হয়। তাই অপেক্ষা করতে হয়, লেগে থাকতে হয়। সবই তাঁর কৃপায় হয়। হিটলার অত প্রবল পরাক্রান্ত হলেন, পুরুষকার, দৈব ও শুভ সময়ের একত্রমিলনের ফলে। কিন্তু যখন তাঁর সময়ের পরিবর্তন হ'ল, তখন পুরুষকার থাকা সত্ত্বেও তাঁর কি হ'ল! সব সময় এই তিনটির প্রয়োজন। তাই রামপ্রসাদ বলছেন, কৃষিকাজ ছাড়বে না, চাষ করতে হবে। বীজ যেমন জমিতে পড়বে, সেই রকম ফল পাবে। ঐ 'খানদানী চাষা'র মতো নিষ্ঠা চাই।

ঐ মহাজনদের প্রদর্শিত পথই পথ। এই পথ অনুসরণ করেই তাঁরা ভগবানকে লাভ করেছিলেন, সব ত্যাগ ক'রে তবেই তাঁকে পেয়েছিলেন। সংসারী হওয়া সত্ত্বেও রামপ্রসাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল—মা; তাঁর সব আসক্তি ছিল মায়ের ওপর। আর আমাদের লক্ষ্য—টাকাকড়ি। সেটা তাঁর কাছে 'সামান্য ধন'। আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি, পথচ্যুত হয়ে চলছি। এঁদের প্রদর্শিত পথেই আমাদের চলতে হবে। ঠাকুর 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' ব'লে বলছেন, 'মা তোকেই চাই, টাকা চাই না।' মা-ও চাই, টাকাও চাই—তা হয় না।

ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ! এই ভোগসুখ ত্যাগ। বিষয়ানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ—দুটিই আনন্দ, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। শেষেরটি পেতে হ'লে ভেতরের আগাছা দূর করতে হয়। যাদের পূর্বজন্মের সংস্কার আছে, তারা জমি পরিষ্কার করেই গুরুর কাছে আসে। গুরুর কাজ শুধু 'নাম' বীজ পুঁতে দেওয়া। এই বীজ থেকে গাছ বেরোনোর পর চাষী কত যত্ন ক'রে আগাছা তুলে ফেলে ঝোপ-ঝাড় থেকে গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখে। এই ঝোপ-ঝাড় ও আগাছা হচ্ছে সঙ্গদোষ-জনিত কুচিন্তারাশি, যা মনকে সব সময় বিক্ষিপ্ত করে।

এই সঙ্গদোষই হচ্ছে মারাত্মক। মানুষের মনের অশুভ সংস্কারগুলি বেড়ে ওঠে এই কুসঙ্গে। বিষয়ীর সঙ্গে মিশলে বিষয়-চিন্তাই বেড়ে উঠবে। আর সাধুসঙ্গ করলে সৎ চিন্তার বিকাশ হয়। তাই 'কালীনামের দাও রে বেড়া, ফসলের তছরূপ হবে না।' এই নামের

বেড়া হচ্ছে সৎসঙ্গ। এত খাটুনি, এত যত্ন, কেন? ফললাভ করাই তো উদ্দেশ্য। ঠাকুর বলতেন, 'সংসারের পথ কলম-বাড়া রাস্তা'। ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমে যায়। কিছু দূর চলে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হ'লে দেখা যায়, 'বাবাঃ কতদূর নেমে এসেছি!' সংসারের পথও এমনি ঢালু; ঢালু হ'তে হ'তে ক্রমশঃ অতলে গিয়ে মিশেছে। এই পথ কেবল টেনে নিয়ে যায় বিষয়ের দিকে। তাই ঐ স্রোত না ফিরালে ভগবানের দিকে যাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গই এই স্রোত ফেরাতে একমাত্র সহায়। বিষয়ীদের বদ্ধচিন্তা, এর থেকে মুক্ত হ'তে হ'লে লক্ষ্যে স্থির থাকা চাই।

প্রসাদের জীবন থেকে আমরা শিক্ষা পাই—ত্যাগ; 'সামান্য ধন' তিনি চান না। তারপর চাষ করা—সাধন-ভজন করা। 'সাধন করনা চাহিরে মনুয়া'। বিষয়-তৃষ্ণা এত বেশি যে, মন কখনও ভরে না। শুধু আরও চাই, আরও দাও—এই মনোভাব। এটি প্রসাদ বুঝেছিলেন, তাই চেয়েছিলেন শ্যামাধন—কালীধন। সংসারের তেতো-মিষ্টি খেয়ে তিনি এর অসারত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, তাই সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আর সেদিকে ফিরেও তাকাননি। আর আমরা তেতো বা কটু যখন খাই, তখন সেই মুহূর্তের জন্য সাময়িক অবসাদ আসে মনে। মুখে বলি আর খাব না; কিন্তু কিছু পরেই তার তিক্ততা ভুলে যাই, আবার ডুবে যাই সংসারের তিক্ত-কটু রসে।

যার মন এই বিষয়ানন্দ থেকে একেবারে উঠে গেছে, সেই পারে বলতে 'কাজ নাই মা, সামান্য ধনে'। কারণ সে যে আরও বেশী আনন্দ চায়, আরও বেশী সম্পদের অধিকারী হ'তে চায়! চতুর্বর্গপ্রদায়িনী শ্যামা-ধনকেই সে চায়।

ঠাকুর এই ধনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর শ্যামা-মা তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। তিনি মাকে দেখতেন, এবং স্পর্শ করতে পারতেন তাঁর মায়ের সেই ভাবঘন দিব্য তনু। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যদের তিনি বলছেন, 'সত্যি বলছি, মাইরী বলছি, মাকে আমি দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি।'

কোন সাধকের জীবনে এরূপ দেখা যায়নি। সাক্ষাৎ জগদম্বা কন্যারূপে এসে রামপ্রসাদের কাজ ক'রে দিচ্ছেন। একটি গানে তিনি বলছেন, 'মন তুমি কৃষি-কাজ জানো না'। আমরা আমাদের এই মনুষ্যজন্মে, শুধু বিষয়-চিন্তাতেই মগ্ন থেকে গেলাম, যে মনে ইচ্ছা করলে সোনা ফলাতে পারতাম, ভগবানকে লাভ করতে পারতাম, সেই মন সংসারের বিষয়-সম্পদে দিয়ে নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিলাম! তাই সাধক কবি বলছেন—তুমি ভাল চাষী নও, আবাদ করবার জ্ঞান তোমার নেই, ভালমন্দ বিচার তোমার নেই।

এর ফলে সংসারে যাতায়াতের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। মন এখানে শত্রুর কাজ করছে। সংসারে যাতায়াতের যন্ত্রণা মনই দিচ্ছে। তাই ব্যাকুল হয়ে তিনি মাকে বলছেন, 'মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মতো।' সব স্বাধীনতা হারিয়েছি, চোখে ঠুলি দিয়ে অন্ধের মতো ঘোরাচ্ছ। মোহান্ধ ক'রে মায়ায় বদ্ধ ক'রে রেখেছ মা। এই সংসার-চক্রে, ভবের গাছে অবিরত পাক খাওয়াচ্ছ, ঠিক বলদের অবস্থায় রেখেছ। তাই ব্যাকুল হয়ে মাকে তিনি বলছেন, মা, আমায় আসল ফেলে, নকল দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছ। 'বিবেক' তিনি প্রার্থনা করছেন। এই ভবের হাটে চলতে গেলে বিবেককে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়, ভাল-মন্দর বিচার সেই ক'রে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, মানব-প্রকৃতি দুই রকম, কুলোর মতো আর চালুনির মতো। কুলো ভুষি ফেলে দিয়ে শস্যের দানাগুলি ধরে রাখে, আর চালুনি শস্যের সার ফেলে দিয়ে অসার ভুষিকেই ধরে রাখে। সাধারণ মানুষের স্বভাব চালুনির মতো, সার ফেলে দিয়ে, অসার, অপ্রয়োজনীয় অংশকেই ধরে রাখে। কিন্তু বিবেকবান্ যারা, তাদের কুলোর প্রকৃতি। তাই প্রাণভরে মন মুখ এক ক'রে ঐ কুলোর স্বভাব প্রার্থনা কর, ভাবের ঘরে চুরি নয়, প্রকৃত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা। এগুলি সহজ নয়। এতে চাই আবেগ, আকুলতা, ক্রন্দন। তবে আসবে এই অবস্থা।

রামপ্রসাদ বলতেন, 'আয় মন বেড়াতে যাবি, কালী কল্পতরুমূলে (রে মন) চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।' রাজসিক মন বাহ্যবস্তু নিয়েই ব্যস্ত, সে খোঁজে শুধু কি ক'রে ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটানো যায়, কিন্তু সাত্ত্বিক মন বিচারবান্, ফুলের মতো। ইন্দ্রাদির সম্পদ্‌ও তার কাছে তুচ্ছ। হরিদ্বারে এক সাধু দেখেছিলাম আশী বছর বয়স, তিনি বলতেন, 'পর্বতপ্রমাণ সোনা সামনে দেখলেও তাতে মন আকৃষ্ট হয় না।' তাহলেই বোঝো, এমন কিছু একটা তিনি পেয়েছেন, যার তুলনায় এই বিরাট অর্থও তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। তাঁর সেই বস্তু নিশ্চয়ই এটির থেকে বেশী আনন্দপ্রদ। সেটি হ'ল ভূমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যা পেলে সব ভোগ্য বস্তুই নগণ্য মনে হয়।

রামপ্রসাদ মুক্ত হয়ে মাকে ডেকেছিলেন, কত দুঃখ পেয়েছেন এই সময়, কিন্তু বিচলিত হননি, তাঁর কাছ থেকে আঘাত পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেননি, আবার মা ব'লে তাঁকেই জড়িয়ে ধরেছেন, তিনি জানতেন, মা-ই তাঁর একমাত্র শরণ, মা ছাড়া তাঁর গতি নেই। ধর্মের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এটি শাস্ত্রমতে 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। অনেক কষ্ট ভোগের পরই আসেন আনন্দময়ী। প্রসাদও তাই বলছেন, 'ভূতলে আনিয়া মাগো, করলি আমায় লোহাপেটা—আমি তবু কালী ব'লে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা।' ছেলে বিপদে পড়লেও মাকে কখন ছাড়ে না, পাতানো মাকে ছাড়া যায়, কিন্তু নিজের মাকে কি ছাড়া যায়? সম্পদে বিপদে কখন মাকে ছাড়া যায় না। 'আর কারে ডাকবো শ্যামা, ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।' গলা ধরে ফেলে দিলেও তবু 'মা, মা' ব'লে ডাকে। সকল অবস্থায় মা-ই আমাদের আশ্রয়। মাকে ছাড়া আর কাকে ডাকব?

প্রেম-প্রীতি অনুরাগ এলে মন স্বার্থলেশহীন হয়ে যাবে। তাই তিনি পথ দেখাচ্ছেন—'আয় মন বেড়াতে যাবি'—কালী-কল্পতরুমূলে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—চতুর্বর্গ-ফল পাওয়া যায়। ঠাকুর একটি সুন্দর গল্প বলতেন: একটি লোক অরণ্যের পথ ধরে যেতে যেতে শ্রান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে এসে বসেছে। এখন সেই গাছটি ছিল কল্পবৃক্ষ। তার কাছে যা চাওয়া যেত, তাই পাওয়া যেত। সেই লোকটি সেখানে বসে বসে চিন্তা ক'রল, 'আহা, একটি পালঙ্ক যদি তার থাকত, তবে সে বেশ আরামে একটু ঘুমিয়ে নিত,' ব্যস্, যেই না চিন্তা করা, সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে এক পালঙ্ক এসে হাজির! সে বেশ আরাম ক'রে পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে ভাবছে, কিছু পোলাও-কালিয়া যদি এখন পাওয়া যেত, খিদেটা মিটত। সঙ্গে সঙ্গে রাজভোগ খাদ্য এসে উপস্থিত! সে পেট ভরে চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্য খেয়ে শুয়েছে, আর ভাবছে, এখন কেউ যদি এসে একটু সেবা ক'রত, তবে সময়টা মন্দ কাটত না। সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে তার

পদসেবা করতে শুরু ক'রল। এই আনন্দের মধ্যে লোকটি মনে ক'রল, এই জঙ্গলে এখন যদি বাঘ এসে তাকে খায়! ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট বাঘ এসে তাকে ধরে হালুম ক'রে খেয়ে নিল। ভোগের এই অবস্থা!

গীতায় চার প্রকার ভক্তের কথা বলা হয়েছে, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। প্রসাদ বলছেন, মায়ের কাছে যাওয়ার পথে নিষ্কামভাবে যেতে হয়। তিনি বলছেন, মনের দুই পত্নী—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। 'প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি।' বিষয়ের মধ্যে থেকেও প্রসাদ বিষয় ভোগ করেননি। ত্যাগকেই তিনি সঙ্গে রেখেছিলেন। আমরা মায়ের কাছে লাউ-কুমড়ার মতো তুচ্ছ জিনিস চাই। কিন্তু তিনি চাইছেন 'অমৃতফল'। ঠাকুর একটি গান গাইতেন; রাবণের মৃত্যুবাণ আনবার জন্য মহাবীরকে লঙ্কায় রাজপুরীতে যেতে হয়েছিল, তিনি সেখানে স্ফটিক-স্তম্ভ ভেঙে মৃত্যুবাণ পেয়েছিলেন। ছাতে এসে বসে তিনি যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখন মন্দোদরী কিছু ফল এনে তাঁকে তুচ্ছ বানর মনে ক'রে ভুলিয়ে মৃত্যুবাণ নিয়ে যাবেন, ভাবলেন। কিন্তু মহাবীর গানের মধ্য দিয়ে তাঁকে বলেন, 'আমার কি ফলের অভাব, আমি পেয়েছি যে ফল, জনম সফল।'

তিনি মোক্ষফল পেয়েছিলেন; রাম-রূপ মোক্ষফল তিনি হৃদয়ে ধারণ করতেন। তিনি শ্রীরাম-কল্পতরুমূলে বসে রয়েছেন, যখন যে ফল বাসনা করেন, তখনই সে ফল পান। 'আমি ও ফল চাই না, যাব তোদের প্রতিফল দিয়ে।'

প্রসাদ বলছেন, মনের প্রবৃত্তি-জায়া হচ্ছে সংসার। আর নিবৃত্তি হচ্ছে বৈরাগ্য। প্রবৃত্তির সন্তান কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। প্রসাদ এদের পরিত্যাগ ক'রে দ্বিতীয়া পত্নী নিবৃত্তির গর্ভজাত পুত্র বিবেককে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলছেন। তিনি মাতৃকল্পতরুমূলে যেতে বলছেন, বিবেককে সঙ্গে নিয়ে। সেখানে চারি ফলের মধ্যে মোক্ষফলই তাঁর কাম্য। ত্যাগের পথে তিনি অন্তরে প্রবেশ করছেন। এ পথে যেতে হ'লে ভগবানে আসক্ত হ'তে হবে। এ পথে বিবেকই সম্বল, এটি সাত্ত্বিক বুদ্ধি। সৎ-অসৎ বিচার ক'রে পথ দেখিয়ে দেবে, নিত্য-অনিত্য বুঝিয়ে দেবে, তাই এটি চাই সঙ্গে। বুদ্ধের বিবেক লাভ হয়েছিল; প্রথম জীবনে রাজ-ভোগে তিনি সংসার করলেন, হঠাৎ জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ও সন্ন্যাসীকে দেখে জীবনে তাঁর বিতৃষ্ণা এল। তিনি বিবেক লাভ করলেন; তারই প্রেরণায় তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণ ক'রে অমর হয়ে গেলেন। লালাবাবুরও তাই ধোপানীর 'বেলা যায়' কথাটি শুনে চৈতন্যের উদয় হ'ল, বিবেক উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বিবেকই জীবকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখায়। আলোর পথের দিশারী বিবেক।

রামপ্রসাদের গান তোমাদের নূতন জীবনের পথ দেখাক। শুধু সংসার করা নয়, গতানুগতিকতা নয়। বিবেককে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পথে চলো! তাঁর হও! তবেই এ মানবজন্মের সার্থকতা।

রামমোহন-স্মরণে

অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা তথা ভারতের নতুন যুগের গোড়াকার লোক রাজা রামমোহন রায়। ভারতে বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, জাতীয়তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতির যে জোয়ার এসেছিল, তার অনেক কিছুরই সূচনাতে আছেন রামমোহন। রামমোহনকে বাদ দিয়ে বাংলা বা ভারত সমাজ-সংস্কৃতির কথা ভাবাই যায় না। আজ এক-শ' আটাশ বছর হ'ল রামমোহন গত হয়েছেন। ১৭৭২ খৃঃ জন্মগ্রহণ ক'রে ১৮৩৩ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর বিলাতে ব্রিস্টলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পুণ্য কর্মের উত্তরাধিকারী আমরা তাঁর কথা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

রামমোহনের পাণ্ডিত্য ছিল গভীর ও বিস্তৃত। বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, এমন কি তিব্বতী ভাষাও তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। এ ছাড়া বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বাংলা ভাষা ও গদ্য সাহিত্যে রামমোহনের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যকে ভাব-প্রকাশের উপযুক্তরূপে রূপায়িত করেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে রামমোহন একেশ্বরবাদের প্রচার করেছিলেন এবং এইজন্যে প্রথমে 'আত্মীয়সভা' এবং পরে ১৮২৮ খৃঃ 'ব্রাহ্মসভা' সংগঠন করেন। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের যে আন্দোলন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, তার আদিতে ছিলেন রামমোহন। ধর্মের ব্যাপারে চারটি জিনিসের তিনি ঘোর সমালোচক ছিলেন—গোঁড়ামি, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা এবং পুরোহিত-তন্ত্র। সেই সঙ্গে খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধেও তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। রামমোহনের প্রচেষ্টা খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরের দুরভিসন্ধি রোধ করতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। হিন্দুধর্মের আসল রূপ কী, তার ব্যাখ্যানে তিনি নিয়োজিত ছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে ভগবদ্‌বিশ্বাস জাগরিত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

সমাজের অনেক ব্যাপারেই রামমোহন হস্তক্ষেপ করেছিলেন। আমরা জানি তার মধ্যে প্রধানরূপে খ্যাত হয়ে আছে সতীদাহপ্রথা-নিবারণ। সে সময় সতীদাহের সরকারী সংখ্যা ছিল বছরে পাঁচ-শ'র ওপর। এর বিরুদ্ধে রামমোহনের সংগ্রাম অবিস্মরণীয়। সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে রামমোহন এর জন্যে লড়াই করেছিলেন। অবশেষে ১৮২৯ খৃঃ বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের ঘোষণায় এই নিষ্ঠুর প্রথা আইনতঃ রদ করা হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও রামমোহন ছিলেন একজন অগ্রণী পুরুষ। বিখ্যাত হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে যে কথাবার্তা চলে, রামমোহন তাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার যে একটা ভাল দিক আছে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিনিই সর্বপ্রথম তাকে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হন। এ সম্বন্ধে তিনি যে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন, তার

অধিকাংশ তাঁর মৃত্যুর পরে লর্ড মেকলে-প্রচারিত 'শিক্ষা-বিবরণে' স্থান পেয়েছিল। বিখ্যাত মিশনরী শিক্ষাপ্রচারক ডাফ সাহেব যখন এদেশে আসেন, তখন রামমোহন তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

জাতীয় নানা ব্যাপারে রামমোহন সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন। ব্রিটিশ প্রভুত্বের দুষ্ট অবস্থা সম্বন্ধেও তিনি সতর্ক ছিলেন এবং কয়েকটি বিষয়ের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, শুধু জাতীয়তাবোধই নয়, রামমোহনের মধ্যে সেই সময়েও একটা আন্তর্জাতিক বোধ জাগরূক ছিল। তদানীন্তন অনেক আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্বন্ধে তিনি আলোকসম্পাত ক'রে গেছেন।

ধর্ম, দর্শন, সমাজ, শিক্ষা, জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ও কর্মসাধনাকে রূপ দিতে তিনি বহু নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি 'সংবাদকৌমুদী' নামে একটি বাংলা সংবাদপত্র এবং 'মিরাত-উল-আকবর' নামে একটি ফারসী সংবাদপত্র পরিচালনা করেছিলেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রামমোহন একজন অগ্রগণ্য পুরুষ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আদিকার যোদ্ধা।

ভাবতে অবাক্ লাগে যে, একজন মানুষ কত দিন আগেই আমাদের সমাজব্যবস্থার অবনতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন এবং তার সংস্কারের জন্যে সক্রিয় সাধনা করেছিলেন। কতদিন আগেই একজন মানুষ দুই বিশাল ও ভিন্ন সংস্কৃতির—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের—সংমিশ্রণ চেয়েছিলেন। আর কতদিন আগে একজন মানুষের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল স্বদেশের কল্যাণ-চিন্তা, স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতীয়কে ভালবাসা।

নিঃস্বার্থ কর্মের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, 'মহান্ হিন্দু-সংস্কারসাধক রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এই নিঃস্বার্থ কর্মের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। সমস্ত জীবনটাই তিনি দিয়ে গেছেন ভারতবর্ষকে সাহায্য করতে।...যশ বা নিজের ফলাফলের জন্যে তিনি কিছুই গ্রাহ্য করেননি '

এমনই মানুষ ছিলেন রামমোহন।

জয়তু রামমোহন।

That has been the one great cause, that we did not go out, that we did not compare notes with other nations,—that has been the one great cause of our downfall, and every one of you knows that that little stir, the little life that you see in India, begins from the day when Raja Rammohan Roy broke through the walls of exclusiveness. Since that day, history of India has taken another turn, and now it is growing with accelerated motion.

— *Swami Vivekananda in 'Reply to Calcutta Address.'*

শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো-প্রসঙ্গে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

উপক্রমণিকা

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ফটো-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলতেন, 'এখনকার লোক সব সেয়ানা। (ঠাকুরের) ছবিটি তুলে নিয়েছে। কোনও অবতারের কি ছবি (ফটো) আছে?' জনৈক ভক্ত একদা শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেন, 'ছবিতে কি ঠাকুর আছেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'আছেন না? ছায়া কায়া সমান। ছবি তো তাঁরই ছায়া।' অপর এক ভক্তকে তিনি বলেছিলেন, 'ঠাকুরের ধ্যান আর কি? তাঁর ফটো দেখলেই হবে। ছায়ায় কায়ায় ভেদ নেই। ফটোতে তিনি স্বয়ং রয়েছেন।'

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জনৈক সহচর লিখেছেন, 'তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) ফটোগ্রাফ তোলা হয়, তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য না হইলে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারে নাই।'

ক্যামেরায় তোলা শ্রীরামকৃষ্ণের চারিটি ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়।—দুটি দণ্ডায়মান, একটি উপবিষ্ট, আর একটি শেষ-শয্যায় শায়িত অবস্থায়। প্রথমোক্ত চিত্র-তিনটি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন থাকাকালে এবং শেষোক্তটি মহাসমাধিলাভের পর তোলা হয়। এই ফটোগ্রাফগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে গৃহীত। বস্তুতঃ এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য ও তাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিমেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত ফটো-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম তিনটি ফটো দেশে বিদেশে সর্বত্রই সুপ্রচারিত, নানা পুস্তক-পুস্তিকায় এবং পত্র-পত্রিকাদিতে বহুল-প্রকাশিত। কিন্তু শেষোক্ত চিত্রটি একরূপ অপ্রকাশিতই বলা চলে। এই চিত্রটি পুস্তক-পত্রিকাদিতে সচরাচর দেখা যায় না।

প্রথম ফটোর বিবরণ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম ফটোটি গৃহীত হয় ১৮৭৯ খৃঃ ২১শে সেপ্টেম্বর রবিবার, কেশব-ভবনে। তাঁর দেহ তখন রুগ্‌ণ, কঠোর তপশ্চর্যার ফলে বিশীর্ণ; কিন্তু তাঁর মুখকমল এক স্বর্গীয় লাবণ্যে ও মধুর সুষমায় উৎফুল্ল।

ব্রাহ্ম উৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণকে সাদর নিমন্ত্রণ ক'রে ঐ দিবস সার্কুলার রোডস্থিত স্বীয় 'কমলকুটীর' ভবনে নিয়ে আসেন। কেশব-ভবনে ঐ মহোৎসব-বাসরে ব্রাহ্মভক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল সুমধুর কীর্তন গাইছিলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠের ভাবপূর্ণ সংকীর্তন শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্য আনন্দে আত্মহারা হন। তিনি ঈশ্বরপ্রেমে ভাবস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি প্রেম-গদ্‌গদ স্বরে ওঁকার-ধ্বনি করতে করতে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন-পূর্বক সহসা দণ্ডায়মান হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত বাহ্য চৈতন্য বিলুপ্ত হয় এবং তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। তাঁর বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য নিস্পন্দ নিথর দেহখানি পাছে ভূতলে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় তাঁর ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়রাম তৎক্ষণাৎ তাঁকে ঐ অবস্থায় সন্তর্পণে ধারণ করেন। ঐরূপ ভাবাবস্থায় হঠাৎ দণ্ডায়মান হবার সময় তাঁর বাম স্কন্ধস্থিত সুবিন্যস্ত বস্ত্রাঞ্চলটি ভূলুণ্ঠিত হয়। হৃদয় উহা সযত্নে তাঁর কটিদেশে বেঁধে দেন। যা হোক,

শ্রীরামকৃষ্ণকে দিব্য ভাবে গভীর সমাধিনিমগ্ন দেখে কেশবচন্দ্র তখন তাঁর ঐ অপরূপ নয়নাভিরাম মূর্তির ফটোগ্রাফ তুলিয়ে নেন।

ঐ মূল ফটোটিতে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিমগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান। তাঁর দক্ষিণ হস্তটি ঊর্ধ্বে উত্তোলিত এবং ঐ হস্তের অঙ্গুলিসকল মৃগমুদ্রাযুক্ত। বাম হস্তটি তাঁর বক্ষোদেশে সংস্থাপিত, এই হস্তের অঙ্গুলি-গুলিও বিশেষ মুদ্রাযুক্ত। তাঁর মনোহর মুখশ্রী দিব্যহাস্যে সমুৎফুল্ল; নেত্রযুগল নিমীলিত, অপার করুণায় বিগলিত। তাঁর বদনমণ্ডল এক অনুপম স্বর্গীয় জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত, অভয় পাদপদ্মযুগল সুরঞ্জিত কার্পেট-আসনে স্থাপিত। পরিধানে কিঞ্চিৎপ্রশস্ত-পাড়যুক্ত শুভ্র বসন। গায়ে ফুলহাতা কামিজ। কটিদেশে সুবিন্যস্ত বস্ত্রাঞ্চল। তাঁর পশ্চাতে কিঞ্চিৎ বামভাগে হৃদয়রাম দণ্ডায়মান। তিনি মাতুলের বাহ্যশূন্য সমাধিস্থ কোমল অঙ্গখানি অতি সন্তর্পণে ধারণ ক'রে রয়েছেন। ত্রৈলোক্য সান্যাল এবং আরও জন-সাতেক ব্রাহ্মভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে মেজেতে গালিচার উপর উপবিষ্ট। ত্রৈলোক্যের সম্মুখে (শ্রীরামকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে পদতলে) একটি মৃদঙ্গ এবং সকলের পশ্চাদ্‌ভাগে কাষ্ঠনির্মিত ঝিলিমিলিযুক্ত একটি পর্দা স্থাপিত।

হাততোলা এবং দাঁড়ানো অবস্থায় শ্রীরাম-কৃষ্ণের যে-চিত্রটি সর্বত্র দেখা যায়, সেটি কেশব-ভবনে গৃহীত এই মূল ফটোগ্রাফেরই অন্তর্গত চিত্র। কোথাও দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ ভাবে একক দণ্ডায়মান। কোথাও বা দেখা যায়, তাঁর পশ্চাতে হৃদয় তাঁকে ধরে রয়েছেন। এই মূল ফটোগ্রাফের পরিপূর্ণ চিত্রটি কচিৎ দৃষ্ট হয়। পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকায় বা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৮১ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর (১২৮৮ সন ২৬শে অগ্রহায়ণ), শনিবার। রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র, রাজেন্দ্র মিত্র প্রমুখ ভক্তগণ কমলকুটীরে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাঁর ঘরের দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের এই দণ্ডায়মান সমাধি-চিত্রটি টাঙানো ছিল। কেশববাবু এই চিত্রখানির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে প্রসঙ্গতঃ বলেন, 'এরূপ সমাধি দেখা যায় না। যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য—এঁদের হ'ত।'

কেশববাবু গাজিপুরে বিখ্যাত যোগিরাজ পওহারী বাবাকে দর্শন করতে যান। বাবাজীর অত্যাশ্চর্য যোগ-সমাধি দর্শনে তিনি বিমুগ্ধ হন। অতঃপর আলাপন-প্রসঙ্গে তিনি বাবাজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ অষ্টসাত্ত্বিক ভাব, মহাভাব, নির্বিকল্প সমাধি প্রভৃতি অসাধারণ যোগাবস্থার কথা বলেন এবং তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমাধি-চিত্রখানি দেখান। বাবাজী এই চিত্র-দর্শনে বিমোহিত হন এবং যোগদৃষ্টি-সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মহান্ যুগত্রাতা পুরুষ ব'লে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারেন। বাবাজী কেশববাবুর নিকট হ'তে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ প্রতিকৃতিটি পরম আগ্রহভরে চেয়ে নেন এবং সযত্নে সেটি নিজ গুহাস্থিত কক্ষে রক্ষা করেন।

১৮৮২ খৃঃ ২৭শে অক্টোবর, শুক্রবার—কোজাগর লক্ষ্মীপূজা-দিবস। কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ শ্রীরাম-কৃষ্ণ সহ অপরাহ্নে স্টীমারে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেবিন-ঘরে সমাধিস্থ। ঐ ঘরে কেশব, বিজয় এবং আরও বহু ভক্ত উপস্থিত। 'কথামৃত'-কার মাস্টার মহাশয়ও সেখানে রয়েছেন। গাজিপুরের নীলমাধববাবু এবং তাঁর জনৈক ব্রাহ্মবন্ধুও সেখানে আছেন। কেবিনে তিলধারণের স্থান নেই, বাহিরেও বহু ভক্ত। সকলে নির্ণিমেষ

নেত্রে পরম-পুরুষের সমাধিমগ্ন নয়নাভিরাম মূর্তি দর্শন করছেন। তাঁর ঐ অপূর্ব সমাধি দর্শনে সকলেই বিমুগ্ধ। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রমশঃ তাঁর বাহ্যজ্ঞান হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর সমাধি দর্শনে নীলমাধব-বাবু ও তাঁর উক্ত বন্ধু পওহারী বাবার প্রসঙ্গ করছেন। জনৈক ব্রাহ্মভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে সবিনয়ে বলছেন, 'পওহারী বাবাকে (এঁরা) দেখেছেন। তিনি গাজিপুরে থাকেন, আপনার মতো আর একজন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমশঃ অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়েছেন। এখনও কথা বলতে পারছেন না। ব্রাহ্মভক্তটির ঐ কথা শুনে তিনি ঈষৎ হাস্য করলেন। ব্রাহ্মভক্তটি তাঁকে আরও বললেন, 'মহাশয়, পওহারী বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈষৎ হাস্যে নিজ দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বললেন, 'খোলটা'। 'কথামৃত'কার শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন, 'বালিশ ও তার খোলটা। দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না? দেহের ভিতর যিনি দেহী তিনিই অবিনাশী। অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর ক'রে কি হবে? বরং যে ভগবান অন্তর্যামী মানুষের হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই পূজা করা উচিত?'

অবশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার বলেন, 'তবে একটা কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাস স্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্ত-হৃদয়ে বিশেষ রূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তাঁর জমিদারির সকল স্থানেই থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, এই কথা লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।' যুগাবতার ও মহাপুরুষগণের দেহের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ভগবদ্‌ভাবে ভাবিত হয়ে তাঁরা 'ভাগবতী তনু' প্রাপ্ত হন। তাঁদের দেহ চিন্ময়।

১৮৮২ খৃঃ ১৬ই অক্টোবর, সোমবার। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে প্রসঙ্গ করছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র প্রমুখ ভক্তগণ উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদির প্রতি): —এঁড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছিল। আমরা একদিন দেখতে যাবো ভাবলুম। আমি কালীবাড়িতে হলধারীকে বললাম, 'কৃষ্ণকিশোর আর আমি সাধু দেখতে যাবো। তুমি যাবে?' হলধারী বললে, 'একটা মাটির খাঁচা দেখতে গিয়ে কি হবে?' হলধারী গীতা-বেদান্ত পড়ে কি না! তাই সাধুকে বললে, 'মাটির খাঁচা'। কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি ঐ কথা বললাম। সে মহা রেগে গেল আর বললে, 'কি! হলধারী এমন কথা বলেছে? যে ঈশ্বর চিন্তা করে, রাম চিন্তা করে, আর সেইজন্য সর্বত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটির খাঁচা! সে জানে না যে, ভক্তের দেহ চিন্ময়'।

১৮৮৩ খৃঃ ১লা জানুআরি। সাকার-পূজা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জনৈক মারোয়াড়ী ভক্তকে প্রসঙ্গক্রমে বলেন, 'যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমার পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়।'

১৮৯০ খৃঃ ফেব্রুআরি-মার্চ মাস। স্বামীজী গাজিপুরে পওহারী বাবার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। বাবাজীর অদ্ভুত ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিনয়-ভক্তি ও মহোচ্চ যোগাবস্থা দর্শনে তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হন। অতঃপর তিনি যোগ-

শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাবাজীকে যোগ-শিক্ষার আচার্যরূপে বরণ করার সংকল্প করেন।

স্বামীজী যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য ও প্রধান পার্ষদ—একথা বাবাজী তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অবগত হন। একদিন বাবাজী তাঁকে নিজ গুহায় নিয়ে যান। স্বামীজী সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত ফটোটি দর্শন ক'রে চমকিত হন। অতঃপর তাঁর অন্তরে এক অপূর্ব ভাবোদয় হ'ল। ফলে, তাঁর বাক্‌শক্তি রুদ্ধ, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত এবং নেত্র-যুগল অশ্রুপ্লাবিত হয়। ঐরূপ আবিষ্ট অবস্থায় তিনি তথায় বেশ কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকেন। ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হ'লে তাঁর অন্তরে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—'শ্রীরামকৃষ্ণ, না পওহারী বাবা ?'

এই ঘটনার পর স্বামীজীর আরও আশ্চর্য দর্শনাদি ও দিব্য অনুভূতি লাভ হয়। তার ফলে, তিনি বাবাজীর কাছে শিক্ষাগ্রহণের সংকল্প পরিত্যাগ করেন। তিনি লেখেন, 'আর কোনও মিঞার নিকট যাব না।'

এই উপলক্ষেই লেখা তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'গাই গীত শুনাতে তোমায় !' নরেন্দ্রনাথের মনে প্রাণে ধ্বনিত হ'তে লাগলো শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া সেই গান :

আপনাতে আপনি থেকো,
যেওনা মন কারো ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

দ্বিতীয় ফটোর বিবরণ

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় ফটোগ্রাফটি তোলা হয় ১৮৮১ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর (১২৮৮ সন ২৬শে অগ্রহায়ণ), শনিবার। সে দিন ঠনঠনিয়ায় বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে রাজেন্দ্র মিত্রের বাটীতে মহোৎসব। রাজেন্দ্র মিত্র পুরাতন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের মেসোমহাশয়।

ঐদিন বেলা ৩টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সিমলায় মনোমোহন মিত্রের বাটীতে শুভাগমন করেন। তিনি রাজেন্দ্র-ভবনে মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। এই উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে মনোমোহনের বাটীতে আসেন। যা হোক, সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম-গ্রহণের পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিঞ্চিৎ জলযোগও করেন। সুরেন্দ্র (সুরেশ) মিত্র এবং আরও কতিপয় ভক্ত উপস্থিত। সুরেন্দ্র প্রসঙ্গতঃ তাঁকে বললেন, 'আপনি কল (ক্যামেরা) দেখবেন বলেছিলেন—চলুন !'

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রস্তুত হলেন। সুরেন্দ্র তাঁকে ঘোড়াগাড়ি ক'রে অপরাহ্ণে রাধাবাজারে বেঙ্গল ফটোগ্রাফের স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন। সুরেন্দ্রের অনুরোধে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা-যন্ত্রটি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখালেন ও কিভাবে ফটো তোলা হয়, তা বুঝিয়ে দিলেন—'কাঁচের পিছনে কালি (Silver-Nitrate) মাখানো হয়, তারপর ছবি ওঠে।' শ্রীরামকৃষ্ণ পরম আগ্রহভরে খুঁটিনাটি সকল বিষয় বুঝে নেন।

সুরেন্দ্র এই সুযোগে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ফটোগ্রাফ গ্রহণের বাসনা করেন। তিনি চুপি চুপি ফটোগ্রাফারকে নিজ অভিপ্রায় জানান। ফটোগ্রাফার তৎক্ষণাৎ ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ ক্যামেরা দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। এই অবসরে তাঁর ফটো তুলে নেওয়া হয়।

এই ফটোটিতে দেখা যায়—শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ। তাঁর দক্ষিণ হস্তটি একটি থামের উপর স্থাপিত ; ঐ হস্তের অঙ্গুলি সকল বিশেষ মুদ্রাযুক্ত (অনেকটা মৃগমুদ্রার ন্যায়)। বাম হস্তটি বক্ষোদেশের কিঞ্চিৎ

নিম্নভাগে সন্নিবদ্ধ; এই হস্তের অঙ্গুলিগুলিও এক বিশিষ্ট মুদ্রাযুক্ত। তাঁর পরিধানে ধুতি; গায়ে ফুলহাতা কামিজ, কামিজের উপর রঙিন কোট। বামস্কন্ধে পরিধেয় বস্ত্রের সুবিন্যস্ত অঞ্চলখানি সুশোভিত। পায়ে চটি জুতা। তাঁর চক্ষুদুটি অর্ধনিমীলিত। মস্তকের কেশরাশি সুবিন্যস্ত। বিমোহন মুখশ্রী বিমলানন্দে সমুৎফুল্ল, বদনমণ্ডল এক দিব্য বিভায় সমুদ্ভাসিত। এক অপরূপ সুমোহন মূর্তি!

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে সুরেন্দ্র মিত্র সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি মনোরম তৈলচিত্র অঙ্কন করান। ঐ চিত্রে হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি ধর্মমত ও বিবিধ সম্প্রদায়ের অনবদ্য সম্মিলন দেখা যায়। একই প্রাঙ্গণে মন্দির, মসজিদ ও গির্জা অবস্থিত। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের আচার্যগণ তথায় অপূর্ব প্রেমভরে সম্মিলিত। শিবমন্দির ও মসজিদের সম্মুখে যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপার প্রেমে পরস্পর হস্তধারণপূর্বক মধুরভাবে নৃত্যরত। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আচার্যগণ ও ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ ধর্মের প্রতীকচিহ্নহস্তে দণ্ডায়মান। গির্জার সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব সেন বিরাজিত। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে অভিনব সর্বধর্মসমন্বয়ের অপরূপ দৃশ্য দেখাচ্ছেন ও আনন্দ করছেন।

এই কল্পিত তৈলচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে প্রতিকৃতিটি দেখা যায়, সেটি তাঁর এই দ্বিতীয় ফটোরই চিত্র। সুরেন্দ্র বহু যত্নে এই তৈলচিত্রটি প্রস্তুত করান এবং দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখান। শ্রীরামকৃষ্ণ এই চিত্রদর্শনে পরম আনন্দিত হন এবং ভক্তবর সুরেন্দ্রের বহু প্রশংসা করেন।

১৮৮২ খৃঃ ২৭শে অক্টোবর, শুক্রবার; কোজাগর লক্ষ্মীপূজা-দিবস। শ্রীরামকৃষ্ণ এই দিন কেশবাদি ব্রাহ্মভক্তগণসহ ভাগীরথীবক্ষে ষ্টীমার-ভ্রমণে আনন্দ ক'রে কতিপয় ভক্তসহ সিমলা-পল্লীতে সুরেন্দ্র মিত্রের বাটীতে শুভাগমন করেন। সুরেন্দ্র কিন্তু অনুপস্থিত, তাঁদের নতুন বাগানবাড়িতে গিয়েছেন। যাহোক, বাড়ির লোকেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা তাঁকে বাড়ির দ্বিতলের একটি কক্ষে বসান। ঐ কক্ষের প্রাচীর-গাত্রে সুরেন্দ্রের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত সর্বধর্মসমন্বয়ের মনোহর তৈলচিত্রখানি শোভিত। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ চিত্রটির নিকটে গিয়ে এক দৃষ্টে তা দর্শন করেন এবং আনন্দে মৃদু মৃদু হাস্য করেন।

১৮৮২ খৃঃ ১৪ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রমুখ ভক্তগণকে একটি সুন্দর উপমাসহ কাঁচা-ভক্তি ও পাকা-ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই উপমাটি রাধাবাজারের স্টুডিওতে তাঁর 'কল' (ক্যামেরা) দেখারই অভিজ্ঞতার ফল। যাহোক, তিনি বলেন, 'যার কাঁচা-ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা উপদেশ ধারণা করতে পারে না। পাকা-ভক্তি হ'লে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি (Silver-Nitrate) মাখানো থাকে, তাহ'লে যা ছবি পড়ে, তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না—একটু সরে গেলেই, যেমন কাঁচ তেমনি কাঁচ।'*

(ক্রমশঃ)

* এই প্রবন্ধের উপাদান 'কথামৃত', 'মায়ের কথা', শশিভূষণ ঘোষ প্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব', স্বামীজীর 'পত্রাবলী' এবং বিভিন্ন প্রামাণিক সূত্র হইতে গৃহীত।

শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অভিনব প্রচেষ্টা

স্বামী তেজসানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার যে ইতিহাস, তাহাতে ১৯৪১ খৃঃ ৪ঠা জুলাই তারিখটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ এবং স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম মার্কিন শিষ্যা মিস্ ম্যাকলাউডের উদার অর্থানুকূল্য সম্বল করিয়া মঠ ও মিশনের কলেজীয় শিক্ষার প্রাথমিক প্রচেষ্টা 'বিদ্যামন্দিরে'র শুভ উদ্বোধন এই দিনটিতে হইয়াছিল। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ দেশে ভারতীয় প্রাচীন গুরুকুল-প্রথার অনুসরণে এমন একটি বলিষ্ঠ শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহা চরিত্র-গঠন এবং মনুষ্যত্বলাভের আদর্শকে সর্বোচ্চ আসন দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনধর্মের একটি সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করিবে এবং ভারতীয় যুবসমাজের নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবে। কিন্তু ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমস্ত মহৎ পরিকল্পনার রূপায়ণ-সাধনের পথে আসে অজানিত বিপদ্ ও অচিন্তিত বাধা। তাহা ছাড়াও এইরূপ মহৎ আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন হয় অপরিসীম ধৈর্য, অপরিমিত উৎসাহ, প্রভূত স্বার্থত্যাগ এবং সর্বোপরি দায়িত্ব-সম্পাদনে সমর্থ ব্যক্তি-নির্বাচন। যে দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা রামকৃষ্ণ মিশনের জনসেবামূলক প্রচেষ্টাসমূহকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে, অনুরূপ দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা লইয়াই এই বিদ্যাভবন একাদশজন শিক্ষক ও মাত্র চারিজন ছাত্রসহ পূর্বোক্ত দিবসে অপরিসীম আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে তাহার শুভ উদ্বোধন সূচনা করিয়াছিল। উদ্বোধনকালে ছাত্র ও শিক্ষকের এই অত্যল্প সংখ্যা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা আশাবাদী ব্যক্তিকেও যে নিরাশ করিবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু বিদ্যামন্দির কোন কিছুতেই বিচলিত না হইয়া ধীরগতিতে এক সীমাহীন জীবনসমুদ্রে তরী ভাসাইল।

সাফল্যের পথে

২০ বৎসরের জীবনপথে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিকে বহুবিধ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়, লোকাভাব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়াপাত প্রভৃতি বহু বিপদ সময়ে সময়ে এই বাণীমন্দিরের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই মহতী প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে ঐশী প্রেরণা বর্তমান ছিল, তাহাই নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে যথার্থ পথের সন্ধান দিয়াছিল এবং ইহার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। ইচ্ছা ঐকান্তিক হইলেই উপায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সততা ও ঐকান্তিকতার জয় অবশ্যম্ভাবী। ১৯৪৩ খৃঃ প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষায় বিদ্যামন্দির অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করিল। একজন ছাত্র দশম স্থান অধিকার করিল এবং পাসের হার আশাতীত উচ্চ হইল। একটি ক্ষুদ্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শৈশব অবস্থাতে এই চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়া সরকার এবং জনসাধারণ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পরীক্ষার এই সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া শিক্ষকবৃন্দ বৃহত্তর সাফল্যের জন্য তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করিলেন।

বিদ্যামন্দিরে মুখ্যতঃ সাহিত্য-বিভাগ

থাকিলেও অনতিবিলম্বে বাণিজ্য ও বিজ্ঞান-বিভাগ ইহার সহিত সংযোজিত হওয়ায় এই মহাবিদ্যালয়ের কর্মধারারও গতি পরিবর্তিত হইল এবং ইহার আদর্শনিষ্ঠ কর্মপদ্ধতির ও নিয়মনিষ্ঠ জীবনের প্রতি আরও অধিক-সংখ্যক ছাত্র আকৃষ্ট হইল। জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষায়তনটি প্রতি বৎসর নূতনতর সাফল্য অর্জন করিতে লাগিল। স্বল্পকাল মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এখানকার ছাত্রগণের অভূতপূর্ব কৃতিত্ব প্রায় স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হইল। ১৯৫৬ খৃঃ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রথম স্থান অধিকার করিবার গৌরব এই শিক্ষাভবনের জীবন-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গত ১৯৪১ খৃঃ দেশের শিক্ষাজীবনে নূতনতর একটি শুভসূচনা করিয়া-ছিল, আজ ১৯৬০ খৃঃ সে গৌরবের শীর্ষদেশে পৌঁছিয়া তাহার যাত্রাপথের উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায় সমাপ্ত করিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যামন্দিরের ভূমিকা

বিদ্যামন্দিরের এই নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের কারণ অতি সুস্পষ্ট, দুইশত ছাত্রসমন্বিত এই মহাবিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ আবাসিক হওয়ায় এখানকার ছাত্রগণের দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনা, পাঠ, শরীরচর্চা, খেলাধূলা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের এমন একটি সুসমন্বিত সমাবেশ করা সম্ভব হইয়াছে যে, ছাত্রগণ তাহাদের জীবন ও চরিত্রকে অনায়াসে সুগঠিত করিয়া দেশের যথার্থ নাগরিক হইবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। আত্মোন্নতির একটি প্রধান উপায় চিন্তার স্বাধীনতা। বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে যাহাতে তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা করিতে পারে, সেদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ। যদিও সর্ব-প্রকার রাজনীতিক কার্যাবলী হইতে এই শিক্ষায়তন দূরে অবস্থান করে, তথাপি দেশের জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা এবং বিভিন্ন প্রগতিশীল চিন্তাধারার সহিত ছাত্রগণ যাহাতে পরিচিত হইতে পারে, তাহার সুযোগও এখানে বর্তমান। শিক্ষক ও ছাত্রের সৌহার্দ্য-পূর্ণ সম্পর্ক, শ্রমে মর্যাদাবোধ, জীবনে নীতিনিষ্ঠা —এইগুলি এখানকার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই দিকগুলি বিবেচনা করিলে বিদ্যামন্দিরের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। সুতরাং ইহা বিন্দুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদল সময়ের সদ্ব্যবহার, হৃদয়বৃত্তির বিস্তার এবং গঠনমূলক কর্মধারার মাধ্যমে বুদ্ধির বিকাশ সাধন করিয়া শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে, তাহা নহে, সমাজ-জীবনেও উল্লেখযোগ্য কল্যাণকর ভূমিকা গ্রহণ করে।

আজিকার প্রয়োজন

কালক্রমে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই প্রভূত পরিবর্তন আসিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, অতীতে নবীন বিদ্যার্থিগণকে তাহাদের প্রথম জীবনে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট নৈতিক জীবনের শিক্ষাসমূহ দেওয়া হইত। আজ ছাত্রসমাজের জীবনে শিক্ষাকে যদি আমরা যথার্থ ফলপ্রসূ করিতে চাই, তবে শিক্ষাব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। এ-কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, জাতির সাংস্কৃতিক জীবন-সৌধ তাহার ধর্মনায়কগণের আধ্যাত্মিক চিন্তাকে ভিত্তি করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

নৈতিক জীবনের পুনর্গঠনকল্পে আমরা ধর্মকে যদি গ্রহণ না করি, তবে উহা আমাদের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার নামান্তর হইবে। যুবসমাজের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল রাখিয়া কোন বলিষ্ঠ সমাজ-জীবন গঠন করা সম্ভব নহে। জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের এই শুভমুহূর্তে আজ আমাদিগকে জাতীয় সংহতি ও পরিবিস্তৃতির জন্য আমাদের সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের মূলধনকে সম্বল করিতে হইবে এবং ইহার জন্য একটি জাতীয় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই আজ আমাদের চরম ও পরম কর্তব্য।

সার্থক পরিসমাপ্তি

এইরূপে বিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গভূমির সরস মৃত্তিকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে শিশুবৃক্ষটি রোপণ করা হইয়াছিল, তাহা আজ এক ফলপ্রসূ সুবৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়া জ্ঞানান্বেষী বহুজনকে উহার শান্ত শীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করিতেছে। মাধ্যমিক কলেজ হিসাবে যদিও বিদ্যামন্দিরের পরিসমাপ্তি ঘটিল, কিন্তু ইহা প্রাচীন ফিনিক্সের (Phœnix) মতো পুনরায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগ-সমন্বিত একটি ত্রিবার্ষিক ডিগ্রী কলেজরূপে আবির্ভূত হইয়া আগামী দিনের শিক্ষাক্ষেত্রে আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। এই কলেজটিতে ইতিমধ্যেই একটি সুসজ্জিত গবেষণাগার এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহে পূর্ণ একটি আধুনিক গ্রন্থাগার সংযুক্ত করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন। আগামী ১৯৬৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষ-স্মারক হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তনের জন্য আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। অতি আনন্দের বিষয় যে, শিক্ষক-শিক্ষণ, সমাজ-শিক্ষণ, উচ্চতর সংস্কৃত এবং যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিভাগগুলি প্রস্তাবিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আঙ্গিকরূপে পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে বহুমুখী শিক্ষামূলক কর্মধারার সার্থক পরিণতিরূপে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ সূচনা অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীভগবান এই নূতন পরিকল্পনাটিকে নূতনতর সাফল্যের পথে লইয়া চলুন—ইহাই আজ একান্ত প্রার্থনা।

What I now want is a band of fiery missionaries. We must have a College in Madras to teach comparative religion, Sanskrit, the different Schools of Vedanta and some European languages; we must have a press, and papers printed in English and in the vernaculars.

—SWAMI VIVEKANANDA

(In a letter dated the 12th Jan. 1895)

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'নিবেদিতা-বক্তৃতা' : ৭ই—৯ই আগস্ট, ১৯৬১]

ডক্টর রমা চৌধুরী

সত্যই অপূর্ব এই মনুষ্য-জীবন। কত বহুমুখী তার মতি, কত বিচিত্র তার গতি, কত বিভিন্ন গুণ-শক্তি, কার্যকলাপ, আচার-ব্যবহার, আকৃতি-প্রচেষ্টার সমবায়ে তার স্থিতি। কিন্তু এই সব আপাতদৃষ্ট বহু বিচিত্রতা, বহু বিভিন্নতা, বহু বৈপরীত্যের মধ্যেও মানুষটি সেই একই, তার জীবন সেই একই। তার কারণ হ'ল এই যে, এই সকলের মধ্যে রয়েছে একটি শাশ্বত অচ্ছেদ্য মিলন-সূত্র, তাকেই বলা হয়—মানুষের জীবন-দর্শন। এস্থলে 'দর্শনের' অর্থ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-সমূহ নয়। কিন্তু বিস্তৃত সংসার-প্রান্তরে যে অসংখ্য জীবন-নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে নিজ নিজ পথে, তাদের সকলের একটি নিজস্ব লক্ষ্য আছে, এবং আছে সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার একটি উপায়। কত অসংখ্য তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রত্যেকের জীবন, কত সর্পিল তার বিস্তৃতি, কত দেশদেশান্তর অতিক্রমকারী তার ধারা। তা সত্ত্বেও সেই একই লক্ষ্য, সেই একই উপায় এনে দিয়েছে একটি অনুপম সমগ্রতা, অখণ্ডতা, অবিচ্ছিন্নতা; যার ফলে প্রত্যেকেই এক একটি পরিপূর্ণ সত্তা, এক একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সেজন্য যে কোন মানুষকে জানতে গেলে জানতে হবে তার এই জীবন-দর্শন।

যাঁরা মহীয়ান্ মহীয়সী, যাঁদের কমল-পাদস্পর্শে ধরণীর ধূলায় ধূলায় প্রস্ফুটিত হয়েছে শত শত শতদল; যাঁদের দিব্যালোকে দূর হয়ে গেছে জগতের অজ্ঞানান্ধকার; যাঁদের কম্বুকণ্ঠে অম্বুদ-নিনাদে ধ্বনিত হয়েছে নিরন্তর এক চিরন্তনী আশা ও প্রীতি-ভক্তি-মৈত্রীর বাণী, তাঁদের জীবন-দর্শন হয় জীবন-প্রদর্শক—জগতের গতিপথের প্রদীপস্বরূপ। সেজন্য তাঁদের ক্ষেত্রে এই জীবন-দর্শন উপলব্ধি করা প্রয়োজন কেবল তাঁদের পুণ্য জীবন জানবার জন্যই নয়, আমাদের নিজেদের জীবনকেও জানবার জন্য। প্রদীপের আলোকে প্রদীপটিকেই যে কেবল দেখা যায়, তাই নয়; সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, অন্যান্য সকল বস্তুকেও সমভাবে। একই ভাবে এই সকল বিশ্বদীপ-স্বরূপ মহাত্মাদের জীবন-দর্শনের আলোকে, আমরা তাঁদেরও যেমন জেনে নিতে পারি নিঃশঙ্কচিত্তে, ঠিক তেমনি চিনে নিতে পারি নিজেদেরও জীবন-পথ নিঃসন্দিগ্ধভাবে।

এই কারণে মহামহীয়সী ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন অনুধাবন আজ আমাদের নিকট অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

সমগ্র জীবনের মূলে যেরূপ জীবন-দর্শন, সেরূপ সমগ্র জীবন-দর্শনের মূলেও একটি কেন্দ্রীভূত তত্ত্ব চিরস্থিতিরূপে বিরাজমান। যেরূপ সহস্ররশ্মি সূর্যের সহস্র কিরণ বিচ্ছুরিত হয় একটি কেন্দ্রস্থ অগ্নি-গোলক থেকে, যেরূপ সহস্রদল পদ্মের সহস্র দল প্রস্ফুটিত হয় একটি কেন্দ্রস্থ মধু-কোষ থেকে, যেরূপ সহস্র-ধারার নির্ঝরিণীর সহস্র ধারা উৎসারিত হয় একটি কেন্দ্রস্থ উৎস থেকে—সেরূপ জীবনদর্শনের সহস্র রশ্মি, সহস্র দল, সহস্র ধারা নিরন্তর উচ্ছলিত হয়ে উঠছে একটি কেন্দ্রস্থ মূলীভূত তত্ত্ব থেকে। সেই তত্ত্বকেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে জীবনকে—মানুষকে উপলব্ধি করতে হ'লে।

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শনের এই কেন্দ্রীভূত মূলগত তত্ত্ব কি ?

তা অন্বেষণ করতে আমাদের অধিক দূর যেতে হয় না, কারণ তা তাঁর সর্বত্রই প্রকটিত। জীবন-দর্শন অবশ্য জীবনে সর্বত্র ও সর্বদাই প্রকটিত। তা সত্ত্বেও এই প্রকাশের প্রকার-ভেদ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা সুস্পষ্ট প্রকাশিত, বহুল-পরিমাণে প্রকাশিত; কোন কোন ক্ষেত্রে তা নয়। নিবেদিতার জীবনে অস্পষ্ট কিছুই ছিল না; এবং সেজন্য তাঁর জীবন-দর্শনও অতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সংসার-মুকুরে। কি সেই অপরূপ উজ্জ্বল কেন্দ্রীভূত জীবন-দর্শন-তত্ত্ব ? তা হ'ল এক কথায়—তেজ। নিবাত-নিষ্কম্প অগ্নিশিখার মতোই ছিল তাঁর সমগ্র জীবন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বলেছিলেন, 'শিখাময়ী'। এর অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত, সুষ্ঠু, শোভন বর্ণনা আর হ'তে পারে না।

মানব-সভ্যতার প্রথম ঊষাগমে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পুণ্যশ্লোক ঋষিরা মানব-কল্যাণের নিমিত্ত মোক্ষের উপায় নির্দেশ ক'রে অতি সুন্দরভাবে বলেছিলেন :

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥'

—এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন, গ্রন্থপাঠ ও বহু শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় না। তিনি যাঁকে বরণ করেন, তিনিই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। কেবল তাঁরই নিকট তিনি স্বীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন।

অতি সুন্দর রোমাঞ্চকর কথা। কিন্তু সন্দিগ্ধ মানুষের মনে প্রশ্ন থেকেই যায়। তিনি বরণ করবেন কি নিয়মানুসারে ? তিনি তো যদৃচ্ছাভাবে তাঁর এই মহানুগ্রহ বিতরণ করতে পারেন না উচ্ছৃঙ্খল পক্ষপাতদুষ্ট নৃপতির ন্যায়। সেজন্য পরের মন্ত্রেই পুনরায় বলা হচ্ছে সমান সুন্দরভাবে :

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥'
(মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩-২-৪)

—যিনি বলহীন, তিনি এই আত্মাকে লাভ করতে পারেন না। ভোগেচ্ছা ও বৃথা লক্ষ্যহীন তপস্যা দ্বারাও তাঁকে লাভ করা যায় না। কিন্তু যিনি বীর্য নিষ্কামতা ও প্রকৃত তপস্যার পন্থা অবলম্বন করেন, তিনি ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন।

নিবেদিতারও ছিল বীর্য নিষ্কামতা ও তপস্যার পন্থা। তাঁর তেজোদীপ্ত জীবনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই তেজ বিচ্ছুরিত হ'ত অমিত বিক্রমে। তাঁর তেজোমূলক এই জীবন-দর্শনের প্রমাণ আমরা পাই একদিকে তাঁর প্রতি কথায়, প্রতি লেখায়; অন্যদিকে তাঁর প্রতি কার্য-কলাপে, প্রতি আচার-আচরণে; কারণ তাঁর অন্তর ও বাহির ছিল সমান—তিনি মনে যা ভাবতেন, মুখেও তাই বলতেন, কাজেও তাই করতেন। আমরা এই নিবন্ধে তাঁর জীবন-দর্শনের অনুসন্ধান ক'রব তাঁর এই অনুপম অনলবর্ষী অমৃতস্রাবী রচনায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর তেজোদীপ্ত রচনা 'Aggressive Hinduism' ধরা যেতে পারে। তাঁর রচনা-পাঠে যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হ'ল এই যে, তিনি সর্বদাই ভারতীয়দের কথা বলতে গিয়ে 'আমি', 'আমরা', 'আমাদের' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন—বিনা দ্বিধায়, অতি সহজ সরল সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে।

এই 'Aggressive Hinduism' নামক রচনাটি চারটি উদ্দীপ্ত প্রবন্ধের সমাহার :

'The Basis', 'The Task before us', 'The Ideal', 'On the way to the Ideal'.

'The Basis' অথবা 'ভিত্তি' এই নাম থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি আরম্ভ করেছেন একেবারে মূল থেকে। আমাদের জীবনের ভিত্তি কি হবে? সাধারণতঃ আমরা যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করি, যে সমাজে বর্ধিত হই, যে দেশে জীবন অতিবাহিত করি, সেই পরিবার, সেই সমাজ, সেই দেশের আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-দৃষ্টিভঙ্গী নীরবে নিষ্ক্রিয়ভাবে মেনে নিয়ে, শান্ত-শিষ্ট, অমায়িক-মসৃণ, নিরুপদ্রব-নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করি, এবং একদিন একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মতোই বিনাশের অন্তহীন গভীরে নিঃশেষে—নিশ্চিহ্ন ভাবে মিলিয়ে যাই। মিলিয়ে যাই কেন? যেহেতু এ কেবল দৈহিক জীবন—পশুর জীবন। দৈহিক দিক্ থেকে একটি জড় নিঃসাড় বস্তুর ন্যায়ই আমরা বর্ধিত হই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে; পশুর ন্যায় একটি অচল অনড় জীবনই আমরা যাপন করি। কিন্তু নিবেদিতা বলছেন, এরূপ জীবন জীবনই নয়—এরূপ ভিত্তিতে যদি আমরা জীবন আরম্ভ করি, যাপন করি, শেষ করি—তা হ'লে ঐ জড় বস্তুর স্থিতিই কেবল আমাদের হবে, এই পশুর জীবনই কেবল আমাদের হবে, হবে না কেবল মানুষ হওয়া, মানুষের জীবন যাপন করা, মানুষের লক্ষ্য লাভ করা।

তা হ'লে আমাদের জীবনের, মানুষের জীবনের কি ভিত্তি হওয়া উচিত? নিবেদিতা এক কথায় বলছেন, 'Aggression'—কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ নয়, সক্রিয়ভাবে দান; কেবল ধৈর্য-অবলম্বন নয়, বীর্য-প্রদর্শন; কেবল তৃপ্ত হয়ে বসে থাকা নয়, দৃপ্ত হয়ে এগিয়ে চলা; কেবল অবিচলিত সন্তোষ নয়, অনমনীয় সাহস; কেবল সভয়ে আক্রান্ত হয়ে থাকা নয়; নির্ভয়ে আক্রমণ করা। এই ভাবে সক্রিয় 'আক্রমণ', 'আক্রমণের' চিন্তা, 'আক্রমণের' আদর্শ—এই তো হওয়া উচিত আমাদের জীবনের ভিত্তি, জীবনের চিন্তা, জীবনের আদর্শ।

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তেজোদীপ্ত ভঙ্গীতে নিবেদিতা বলেছেন :

'Instead of passivity, activity; for the standard of weakness, the standard of strength; in place of a steady-yielding defence, the ringing cheer of the invading host.'

—নিষ্ক্রিয়তার স্থলে সক্রিয়তা, দুর্বলতার স্থলে সবলতা, ক্রমভঙ্গুর প্রতিরক্ষার স্থলে আক্রমণকারী দলের উদাত্ত বিজয়োল্লাস।

আক্রমণ ক'রব কাকে?—বিশ্ববাসীকে। কি দিয়ে আক্রমণ ক'রব?—আমাদের চিন্তা দিয়ে, আদর্শ দিয়ে, এক কথায় আমাদের চরিত্র দিয়ে, সত্তার সারপদার্থ দিয়ে, আত্মার বল দিয়ে। সেজন্য **চরিত্র-সংগঠনই** হ'ল আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা *'custom'* ও *'character'*-এর মধ্যে একটি সুন্দর পার্থক্য দেখিয়েছেন। এই পার্থক্যের বিষয় অবধারণ করা আমাদের, হিন্দুদের বিশেষভাবে কর্তব্য। যেহেতু আমাদের সমাজে প্রথমটির প্রভাবে দ্বিতীয়টি প্রায়ই আবৃত হয়ে যায়।

'Custom' কি? 'Custom' হ'ল সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন। জন্মের পর থেকেই আমরা অজ্ঞাতসারেই এই সকল সামাজিক রীতি-নীতি গ্রহণ করি, আচার-ব্যবহার অনুসরণ করি, নিয়ম-কানুন মেনে চলি। বিশেষ ক'রে সাধারণতঃ হিন্দু

সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অল্প। শিশুকাল থেকেই হিন্দুসন্তানের আহার-বিহার, আচার-বিচার, কার্যকলাপ যেন একই ছাঁচে ঢালা—নূতন কিছু করতে গেলেই নীরব বিস্ময় ও সরব প্রতিবাদ তার প্রাপ্য। এই ভাবে, হিন্দু-সমাজে '*custom*' এবং 'tradition', সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের প্রভাব অত্যধিক।

কিন্তু নিবেদিতা বলছেন, তাকিয়ে দেখুন একবার পশ্চিমের দিকে। অন্ততঃ এই দিক্ থেকে, তার নিকট থেকে আমাদের শিক্ষণীয় যথেষ্ট আছে। পশ্চিমের শিক্ষার প্রণালী স্বতন্ত্র। পশ্চিমেও নিশ্চয়ই সমাজ আছে, সমাজের শাসনও আছে, সমাজের উপকারিতাও আছে; কিন্তু সেখানে সেই সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবকাশও অল্প নয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় অবশ্য সেই দেশেও শিশুশিক্ষা রয়েছে ন্যস্ত নারীদেরই হাতে। বরং বলা যেতে পারে যে, প্রাচ্যদেশের অপেক্ষা প্রতীচ্যে শিশু-শিক্ষায় নারীদের অধিকার ও দান বহুগুণে অধিক। সে যা হোক, Nursery Education বা শিশুশিক্ষার স্তর অতিক্রম ক'রে বালক-বালিকা, যখন 'সামাজিক ব্যক্তি'রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলে, তখন শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের কি বিষয়ে বিশেষ জোরের সঙ্গে শিক্ষা দেন? এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার মধ্যে একটি প্রভেদ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। সেটি হ'ল এই: তাদের শান্ত হ'তে, বিনীত হ'তে আজ্ঞানুবর্তী হ'তে, সহনশীল হ'তে, বিনা দ্বিধা ও প্রতিবাদে নির্বিচারে নীরবে সমস্ত কিছুই গ্রহণ করতে শিক্ষা না দিয়ে, বরং শিক্ষা দেওয়া হয় তেজস্বী হ'তে, দায়িত্বজ্ঞানশীল হ'তে, নূতন বিষয়ে অগ্রণী হ'তে, প্রয়োজনবোধে বিদ্রোহী হ'তে। সেজন্য শিশুদের 'রাগ ও জিদ্'কে পাশ্চাত্য জগতে অতি ভয়াবহ বস্তু ব'লে মনে করা হয় না, উপরন্তু মনে করা হয় যে, এগুলি শিশুর জীবন-পথে চলবার অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। সেজন্য এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে দমন অথবা ধ্বংস করবার প্রচেষ্টা না ক'রে প্রচেষ্টা করা হয় কেবল শুভদিকে পরিচালিত করবার, মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করবার, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে, তেজ ও অনমনীয়তায় রূপান্তরিত করবার। এই কারণে পাশ্চাত্য জগতে খেলার মাঠে বালকে বালকে মুষ্ট্যামুষ্টি, হাতাহাতি, যুদ্ধাযুদ্ধি প্রভৃতিকে বর্জনীয় না ব'লে বরং প্রশংসনীয় ব'লে গ্রহণ করা হয়, যদি অবশ্য তা অন্যায়-অবিচারমূলক না হয়ে ন্যায়ানুমোদিত হয়। সেজন্য পাশ্চাত্যের পিতামাতাদের মত এই যে, এই ভাবে বালক-বয়সেই সংগ্রাম করতে অভ্যস্ত না হ'লে পরে দুর্গম সংসারারণ্যে সন্তানেরা দিশাহারা হয়ে পড়বে। বলাই বাহুল্য যে, যা এইমাত্র বলা হ'ল, সেই সঙ্গে তাদের শিখে নিতে হবে সেই সংগ্রামের মূল নীতি ও নিয়মাবলীও সমভাবে। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেই যে, কেবল পশুবলই হবে মূলধন, কেবল স্বার্থই হবে মূল লক্ষ্য, কেবল উদ্দামতাই হবে মূল-প্রণালী, তা তো কোন ক্রমেই হ'তে পারে না। সেজন্য এরূপ সংগ্রামের অন্তরালে গঠিত হয়ে ওঠে মানব-জীবনের সেই একমাত্র ভিত্তি—চরিত্র।

বস্তুতঃ **ব্যক্তি** ও **সমাজের** প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া কর্তব্য—তা হ'ল সকল দেশের সমাজ-বিজ্ঞানেরই একটি দুরূহ সমস্যা। একদিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতারও প্রয়োজন আছে; অন্যদিকে—সামাজিক শাসনের মূল্যও অল্প নয়। ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে স্বকীয় সৌন্দর্যে সৌরভে আনন্দে; দিগ্দিগন্তব্যাপী হবে তার গরিমা, বাধাহীন হবে তার বিকাশ, উন্মুক্ত হবে তার স্থিতি। তা সত্ত্বেও

ফুলের মূল রয়েছে আত্যন্ত-কাল মৃত্তিকার ঘনাভ্যন্তরে অনড় অচল অটলভাবে। একদিকে, যেমন ফুল মূলকে অস্বীকার করতে পারে না, অন্যদিকে—তেমনি মূল ফুলকে বন্ধন ক'রে রাখতে পারে না। এই তো হ'ল ফুল ও মূলের—ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত সম্বন্ধ। প্রতীচ্যে ফুলের, প্রাচ্যে মূলের সমাদর সমধিক হ'তে পারে; কিন্তু কেবল একটি রেখে অন্যটিকে বর্জন করা কারও পক্ষেই যে সম্ভবপর নয়, তা সুনিশ্চিত।

সেজন্য দূরদর্শিনী নিবেদিতাও ভারতীয় সমাজের এই মূলগত দোষ দূর করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ মৌলিক চিন্তা-প্রণালী দ্বারা ভারতের 'দশাবতার'-তত্ত্বের মধ্যে এই '*Aggressive Hinduism*'এর আভাস লাভ করেছিলেন। অতি সুন্দরভাবে তিনি বলছেন যে, মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতির স্তর অতিক্রম ক'রে এই অবতারের পুণ্যমূর্তি আমরা দেখি, দুই ক্ষত্র-মহাবীরের রূপে—রাম ও কৃষ্ণ। তাঁদের অতুল বীর্যের সম্মিলিত মহিমার ফলেই যেন পরিশেষে উদিত হলেন করুণাঘন প্রশান্তমূর্তি ভগবান বুদ্ধ। তাতেও কি শেষ হ'ল? না। কলির কল্কি অবতারে নিহিত রয়েছে আরও বীর্যের আরও জয়ের নিশ্চিত নিশানা।

এই ভাবে শান্তির পশ্চাতে থাকবে শক্তি, গ্রহণের পশ্চাতে থাকবে দান, সহনশীলতার পশ্চাতে থাকবে দহনপ্রবণতা। তা হলেই হবে জীবনের প্রকৃত চরিতার্থতা। সেজন্য কেবল বিনয়, কেবল ধৈর্য, কেবল সন্তোষ—দুর্বলতারই নামান্তর মাত্র। আমাদের ভারতীয় সমাজে অবশ্য এগুলির মূল্য সমধিক। কিন্তু বলদীপ্ত পাশ্চাত্যের ভাবধারায় পুষ্ট নিবেদিতা এগুলির সম্যক্ ভিত্তি নির্দেশ করেছেন—সুপ্ত ভারতের জাগরণের জন্য। বস্তুতঃ বিনয় যদি হয় গুণহীনতা, ধৈর্য যদি হয় নিষ্ক্রিয়তা, সন্তোষ যদি হয় উদ্যমহীনতার রূপান্তরমাত্র—তা হ'লে তাদের উপকারিতা অপেক্ষা অপকারিতাই হবে বহুগুণে অধিক, নিঃসন্দেহ।

সেজন্য ভারতীয় সমাজ-জীবনের প্রকৃত ভিত্তি নির্দেশ ক'রে নিবেদিতা বলছেন যে, এই ভিত্তি 'Custom' (রীতি) নয়, 'Character' (চরিত্র)। প্রথমটিকে কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে রক্ষণ করলেই চলে; কিন্তু দ্বিতীয়টিকে করতে হয় সক্রিয়ভাবে সৃষ্টি,—গঠন। সমাজ তার আবহমানকাল-প্রচলিত রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুনকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে অনায়াসে; কিন্তু চাপিয়ে দিতে পারে না চরিত্রকে। কারণ চরিত্র সমাজগত সম্পত্তি নয়, গ্রহণ ও রক্ষণের বস্তু নয়—ব্যক্তিগত সম্পদ্, অর্জন ও সর্জনের বস্তু।

নিবেদিতার সেই মহাজীবনস্বপ্ন আমরাও একবার চক্ষু মুদ্রিত ক'রে দেখি না কেন?

'Let us suppose, then, that we see Hinduism no longer as the *preserver* of Hindu *Custom*, but as the *creator* of Hindu *Character*.'

—মনে করা যাক্ যে, আমরা হিন্দুধর্মকে গ্রহণ করি হিন্দু রীতিনীতির রক্ষকরূপে আর নয়, কিন্তু হিন্দু চরিত্রের স্রষ্টারূপে।

এই 'মনে করার' ভিত্তিতেই নিবেদিতা হিন্দুসমাজের স্থির পন্থা নির্দেশ করেছেন।

সেই পন্থা হ'ল, কেবল নিজেকে রক্ষা করা নয়, কিন্তু অন্যদের নিজমতে আনয়ন করা—

'Our work is not, now, to *protect* ourselves, but to *convert* others.'

—কেবল নিজেদের রক্ষা করা নয়, কিন্তু অন্যদের স্বীয় মতে আনয়ন করা—এই হবে, এখন আমাদের কার্য। (ক্রমশঃ)

আমাদের জাতীয় জীবনে সংস্কৃত-শিক্ষার গুরুত্ব

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

আজ বহু ভারতীয় মনীষী তারস্বরে ঘোষণা করছেন যে, আমাদের বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে ভাষা-সমস্যার একমাত্র সমাধান—সংস্কৃতকে জাতীয় ভাষা ব'লে গ্রহণ করা। সংস্কৃতের সুদৃঢ় বন্ধনে সমগ্র ভারতবর্ষ যতদিন সংগ্রথিত ছিল, ততদিন বহিঃশত্রুর আক্রমণের কাছে ভারতবর্ষ মস্তক অবনত করেনি। আমাদের ঐতরেয় আরণ্যক বলেছেন :

'কলিঃ শয়ানো ভবত্যুজ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্।
চরৈবেতি চরৈবেতি।'

অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত দেশে কলি বিরাজমান, যতদিন দেশবাসী সুপ্ত ; যখন দেশবাসী গা মোড়ামুড়ি দিতে আরম্ভ করে, তখন দ্বাপর ; দেশবাসী উঠে দাঁড়ালেই আসে ত্রেতা এবং দেশের মানুষ চলতে আরম্ভ করলেই সত্য যুগের আবির্ভাব হয়। অতএব—চলতেই থাকো, চলতেই থাকো।

যুগে যুগে বার বার দেখা গেছে, যখনই আমরা চলতে থাকি, তখনই দেশে সত্য যুগ বিরাজমান এবং তখন সংস্কৃতকেই জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ ক'রে আমরা চলতে থাকি। দেশ যখন গাঢ় তমসাচ্ছন্ন—তখন সংস্কৃতেরও অবসাদ ঘনীভূত। সংস্কৃতও মরেনি, ভারতও মরেনি। সংস্কৃতও মরবে না—ভারতেরও মৃত্যু নেই।

সংস্কৃতের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগই ভিত্তিহীন

(১) প্রথম অভিযোগ—সংস্কৃত মৃত।

সংস্কৃত দেবভাষা, মৃত্যুহীন। যে-ভাষা মৃত, তাতে হাজার হাজার লোক দৈনন্দিন কথা বলছে কি ক'রে ? যে-ভাষা মৃত, প্রতি বৎসর সে-ভাষায় এত নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে কি ক'রে ? যে-ভাষা মৃত, তার আশ্রয়-ভিন্ন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি-বিষয়ক বা অন্য যে-কোন পরিভাষা-সমিতি একটিও নূতন শব্দের সৃষ্টি করতে পারেন না কেন ? যে-ভাষা মৃত, সে-ভাষায় কত ত্রৈমাসিক, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা চলছে কি ক'রে ? নিশ্চয় ভারতের অনেকেরই আজ সত্যিকার দৃষ্টিশক্তি বিদেশী কাচের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে বা অন্য যে-কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। না হয়—হাজার হাজার বৎসর যে-ভাষা সমস্ত এশিয়া, ইওরোপ, অস্ট্রেলিয়া, পলিনেসিয়া, মেলানেসিয়া এবং আফ্রিকার বহু অঞ্চলকে জ্ঞানের দিব্যালোকে উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে, যে-ভাষা পৃথিবীর সকল আর্যভাষার জননী এবং যে-ভাষা পৃথিবীর সকল ভাষাকেই অল্পবিস্তর করেছে সম্পদ্ বিতরণ—তার গলায় মৃত ভাষার বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দিয়ে করতালি দেওয়া—নিতান্তই বিবেচনাহীনতার পরিচায়ক, সন্দেহ কি ?

সংস্কৃত ভাষা সকল ভারতবাসীর প্রাণে কত আনন্দের ঝঙ্কার তোলে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই—আমাদের[১] সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের সময়—স্বদেশে এবং বিদেশে। সংস্কৃত স্তোত্র, গান এবং মন্ত্র সকলের হৃদয়ে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিস্রোতোধারা প্রবাহিত ক'রে দেয়।

---

১ প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের উদ্যোগে

(২) দ্বিতীয় অভিযোগ—সংস্কৃত কঠিন ভাষা।

এই উক্তি আরও অসার, একান্ত প্রবঞ্চনাময়। আমরা নিজেরাই দেখেছি,—লণ্ডনে, ইওরোপের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যাঁরা ভারতীয় আর্যভাষার কিছুই জানেন না, তাঁরাও ছয় মাসের মধ্যে সংস্কৃত ভাল করেই শিখে নেন; এক বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতে কথাবার্তা বলতে পারেন ধীরে ধীরে। এমন সুন্দর আইন-কানুনে সুরক্ষিত, সুসংবদ্ধ মধুরিমময় ভাষা—আপন ঝঙ্কারেই পৃথিবীর সকলকে মাতোয়ারা ক'রে দেয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এশিয়ার একটি দেশে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জসমূহে—অহোরাত্র অবিরলধারে সংস্কৃতের চর্চা হয়েছে; সেই সেই দেশে কত উচ্চদরের কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃত ভাষায় কত উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ প্রভৃতি রচনা ক'রে গেছেন। কম্বুজ দেশে পর্যন্ত ইন্দ্রদেবী প্রভৃতি মহীয়সী নারীরাও করেছেন সংস্কৃত ভাষাকে স্বকীয় অনবদ্য দানে সমৃদ্ধ। এ ভাষাকে কঠিন ব'লে পরিহার করার কথা আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয়দের মুখেই শোনা যায়। ভারতবর্ষের বাইরের কোন শিক্ষিত লোক এ কথা বলেন না। অধ্যাপক রাইল্যাণ্ডস্, ডাঃ এফ. ডব্লিউ. টমাস প্রভৃতি সকলেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে কথা উঠলেই অকুণ্ঠিত চিত্তে, অতিদৃঢ়ভাবে সংস্কৃতের নামই উল্লেখ করেন; শুধু তাই নয়, সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা না করার যুক্তিটা কোথায়, খুঁজে পান না ব'লে তাঁরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

কাজেই সংস্কৃত মৃত ও কঠিন ভাষা—এই যে উক্তি, এটি অনেকটাই স্বকপোলকল্পিত অথবা উদ্দেশ্যমূলক—বলা যেতে পারে।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃত

এই বিষয়ে পৃথিবীর কোন ভাষাবিদ্ বা সাহিত্যাচার্যের দ্বিমত নেই। এত স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে আলোচনা বৃথা। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য কেবল শ্রেষ্ঠ নয়, প্রাচীনতমও। এই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার প্রথম গ্রন্থটিই, অর্থাৎ ঋগ্বেদই আমাদের ভারতীয় ভাবধারার ধর্ম-দর্শন-সাহিত্যের মূল আকর।

যুগযুগান্তরের ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতা সংস্কৃতের সহায়তায় পুষ্ট

কেবল বর্তমানের নয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগেরও ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহ ও সাহিত্যরাজির আলোচনায় এটি অতি সুস্পষ্ট যে, সংস্কৃতের উপর নির্ভর করেই আমাদের দেশের প্রত্যেকটি ভাষা ও সাহিত্য সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এখানে এমন স্থান নেই—যাতে আমরা উদাহরণের সাহায্যে এ সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারি—যেমন কর্ণাট দেশের ভাষাই ধরা যাক। সত্যি এটি একান্ত উল্লেখযোগ্য যে কর্ণাটের পুরন্দর দাস, জগন্নাথ দাস, কনক দাস, স্বাদি বাদেরাজ, বা আরও পরবর্তীকালের নারীকবি হেলেবনকট্টি গিরিয়ম্মা—হোক তাঁরা ব্যাসকূট বা দাসকূটের অন্তর্গত—সকলেই সংস্কৃতের ভাবধারায় একান্তভাবে পরিপ্লাবিত; ভাষাও নিতান্ত সংস্কৃতপ্রধান। মারাঠী অভঙ্গ বা হিন্দী দোঁহা বুঝতে কোন বাঙালী, উড়িষ্যাবাসী বা আসামপ্রান্তের অধিবাসীর কষ্ট হয় না—যদি সংস্কৃত কিছু পড়া থাকে, অথবা—স্ব স্ব ভাষার উপরে দখল থাকে, কারণ এই পরবর্তী ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত ভারতীয় মাত্রেই শতকরা ৬০।৭০টি সংস্কৃত শব্দ দিয়ে, বাংলাভাষার মতো ভাষার শতকরা ৯০টি শব্দ দিয়ে কথাবার্তা বলেন—সাহিত্য রচনা করেন তো বটেই।

আজকের দিনের এই যে চিত্র, এটিই ভারতের শাশ্বত চিত্র, এটিই প্রকৃত ইতিহাসের রূপরেখা। ভগবান্ মহাবীর ও ভগবান্ বুদ্ধ যথাক্রমে অর্ধমাগধী ও মাগধী ভাষায় স্বধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন। দুইশত বৎসর যেতে না যেতেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতমণ্ডলী একেবারে ঝাঁপিয়ে গেলেন, এবং সংস্কৃতের গঙ্গাধারায় স্নান ক'রে পুনরায় ধন্য হলেন। পেলাম আমরা কত অগণিত জৈন ও বৌদ্ধ কবি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিকে—সকলেই সংস্কৃতে রচনা ক'রে অমর হয়ে গেছেন। এই রকম একশত, দুইশত মনীষী নন—হাজার হাজার। ভারতে নয়, এশিয়া মহাদেশের সর্বত্র, জগতের অবশিষ্ট স্থানেও। ভারতের বাইরের মনীষীরা সংস্কৃতের প্রসাদে ধন্য হয়ে বললেন—'আমরা ভারতের ধর্মসন্তান; মহা-জননীর জয়গান করি।' মহাকবি অশ্বঘোষ, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক নাগার্জুন, অনঙ্গ, বসুবন্ধু প্রভৃতিরা ছুটে এসে বললেন—'চিরারাধ্যে সংস্কৃতজননি! হারানিধি আমরা, মা! তোর বুকে ছুটে এসে জীবনরক্ষণে হলাম সমর্থ।' একমাত্র সংস্কৃতকেই লক্ষ্য ক'রে বিদ্যাপতির ভাষায় বলা যায়—কত ভাষার ব্রহ্মা এলেন, গেলেন—তোর মহিমার পার কে পায় মা!

'কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত
সাগর-লহরীসমানা॥'

অনন্ত সংস্কৃত-সাগরবক্ষে বুদ্বুদের মতো ভাসছে ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলি দিনে দিনে, মাসে মাসে উঠছে পড়ছে—লীলা চলছে ভাষাসমূহের, কিন্তু বুদ্বুদেরই লীলা তো, স্থায়িত্ব তাদের কোথায়? ভাষাবুদ্বুদের খেলায় যা কিছু স্থায়িত্ব-লাভের আশা করেছে—তাই সংস্কৃতের আশ্রয়ে রূপান্তর লাভ ক'রে যুগের বুকে সিংহাসন জুড়ে বসে আছে।

সংস্কৃতের ব্যাপকতা যেমন অসীম, গভীরতাও তাদৃশ। প্রাচীন ইরান দেশে কি বিস্ময়কর সংস্কৃত চর্চা চলেছে! কত অগণিত চিকিৎসক, জ্যোতিষী সংস্কৃতের মণিরত্ন মস্তকে ধারণ ক'রে সেখানে গেছেন; ফারসী ভাষায় হয়েছে সে সকল অনূদিত। পাশ্চাত্য থেকে পর্যন্ত আমরা নিয়েছি কত, যেমন রোমক-সিদ্ধান্ত। কত ফারসী গ্রন্থ আমরা সংস্কৃতে রূপ দিয়েছি—যেমন শ্রীবরের কথা-কৌতুক। 'ইউসুফ-জুলেখা'র প্রেমকাহিনী যে শ্রীবর সংস্কৃতে রূপায়িত করেছিলেন, তিনি কিন্তু আসলে ঐতিহাসিক। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীকে জোনরাজ, শ্রীবর ও প্রাজ্যভট্ট টেনে এনে জনসাধারণের দরবারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন—আকবরের কাশ্মীর-বিজয় পর্যন্ত।[২] আবার কত মুসলমান সাহিত্যধুরন্ধর ভারতের মধ্যযুগে সংস্কৃতের কেবল পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তা নয়, মৌলিক রচনাতেও সংস্কৃতকে সমৃদ্ধ করেছেন। যেমন, শেখ ভাবন, মহম্মদ শাহ, খানখানান আব্দুল রহমান, দারা শুকোহ, প্রভৃতি।[৩] জগতের নারীশিক্ষার ইতিহাসের প্রারম্ভিক ইতিহাসে শুধু নয়, প্রথম দিকে বহুকাল ভারতীয় মাতৃমণ্ডলীর দান ব্যতীত অন্য কোনও দানই পাওয়া যায় না, যেমন

---

২ এই সুন্দর ইতিহাসের নিমিত্ত বর্তমান লেখক প্রণীত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর গ্রন্থেতিহাস—পৃঃ ২০৫৯ দেখুন। ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস কহ্লণ স্বয়ং রচনা করেছেন; জোনরাজ 'রাজাবলী'তে সে ইতিহাসের ধারা ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টেনে এনেছেন; শ্রীবর ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত; অবশিষ্টাংশ রাজ্যভট্ট-কৃত।

৩ এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের Contributions of Muslims to Sanskrit Learning গ্রন্থমালার ১—৪ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

কেবল ঋগ্বেদেই ২৭ জন নারী ঋষি-কবি আছেন।[৪] তদ্ব্যতীত পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেও নারীদের কত মধুমাখা জ্ঞানদীপ্ত উক্তি রয়েছে—জগতের কোন্ প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্য এ নিয়ে তুলনায় অগ্রসর হ'তে পারে?[৫] ভারতের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, পুরুষ-নারী, ভারতে বাসকারী অভারতীয়গণ, ভারতের বহির্বর্তী অগণিত দেশের পুরুষ-নারী—হাজার হাজার বৎসর ধরে যে সাহিত্য-ভারতীর চরণোপান্তে বসে, কখন বা সুমেরু-কুমেরু শিখরে বা পাদদেশে, কখন বা কাশ্যপহ্রদের (Caspian Sea ?) তীরে বসে, কখন বা বোরবুদুরে, কখন জাপানের ফুজি পর্বতমালায়—লক্ষ লক্ষ সংস্কৃত সাধকেরা হাজার হাজার বৎসর ধরে যে মহাজননীর সেবা ক'রে তার কুলকিনারা পাননি,—ফলতঃ বেড়েই চলেছে যার নিরন্তর বিস্তৃতি, অনুমেয় পরিধি—তাকে কঠিন ও শক্ত ভাষা হওয়ার অজুহাতে দূরে সরিয়ে রাখলে অথবা কোণঠাসা করতে গেলে, কার কি লাভ হবে? কেবল ভ্রাতৃদ্রোহের গ্লানিতে ছারখার হওয়ার দিকে দেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে।

সংস্কৃত ভাষাই প্রকৃতকল্পে চিরকালই ভারতের জাতীয় ভাষা ছিল। ভারতের স্বপ্ন, জাগরণ, অভ্যুদয়—সব কিছুরই মূলস্থান ঐটি। বৈদিকযুগের হাজার হাজার বৎসর কালে আর যে অন্য কোন ভাষা ছিল—তার কোন প্রমাণ নেই। মহাভারতের যুগে যখন হস্তিনার রাজান্তঃপুরে কান্দাহার (গান্ধার), মদ্র, কুন্তি-ভোজের রাজকন্যারা এসে স্থান পেলেন, তখন তাঁরা দৈনন্দিন জীবনযাপনের ব্যপদেশে কোন্ সনাতন ভাষা ব্যবহার করতেন? মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা এসে সমবেত হলেন—কোন্ আন্তর্জাতিক ভাষার মাধ্যমে তাঁরা নিজ নিজ মনোভাব নিবেদন করলেন? সিংহলের অশোক-কাননে মা-সীতা যখন অঝোরে চোখের জল ফেলছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাক্ষস রাবণ বা বানর হনুমান্ কোন্ ভাষায় কথা বলেছিলেন? রামায়ণ বলছেন—হনুমান্ অশোক-কাননে চিন্তা করছেন:

যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা সা সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥[৬]

অর্থাৎ 'যদি আমি এখন হঠাৎ সংস্কৃতে কথা বলতে আরম্ভ করি, মা-লক্ষ্মী সীতা আমাকে রাবণ ভেবে যদি মূর্ছা যান, তা হ'লে কি হবে? কে তার মূর্ছা ভঙ্গ করবে?' কথাটি এই তো দাঁড়াচ্ছে—লঙ্কানিবাসী রাক্ষস রাবণ আর্যাবর্তের এই রাজকন্যা রাজপুত্রবধূর সঙ্গে সংস্কৃতেই কথা বলার চেষ্টা করতেন। রামচন্দ্র ঋষ্যমূক পর্বতে যখন উপস্থিত হলেন, তখন কিষ্কিন্ধ্যাবাসীরা কি অপূর্ব সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেছিলেন, তাতে একটিও অপশব্দের প্রয়োগ ছিল না; শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের সম্পর্কে বলছেন:

নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতাঽনেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥[৭]

এত যে সংস্কৃত হনুমান্ বললেন অপশব্দের প্রয়োগ কোথাও তাঁর হয়নি।

---

৪ See Sanskrit Poetesses by J. B. Chowdhuri, Vols. 1 & 2.

৫ বর্তমান লেখকের Contributions of Women to Sanskrit Learning Series-র ১—৭ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৬ বাল্মীকি-রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড, ত্রিংশ সর্গ, ১৮নং শ্লোক, লক্ষ্মী বেঙ্কটেশ্বর প্রেসের ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ, পৃঃ ১০৩৭।

৭ বাল্মীকি-রামায়ণ, পূর্বোক্ত সংস্করণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, তৃতীয় সর্গ, ৩০নং শ্লোক, পৃঃ ৪৭৩।

'কুমারসম্ভবে'ও (৭।৯০) মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত ও প্রাকৃত বিষয়ে একই মনোভাব ও সত্য প্রকাশ করেছেন। মহাকবি শ্রীহর্ষের দিব্য দৃষ্টিতে চিরকালের সত্য অতি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। দময়ন্তীকে লাভ করার জন্য বিদর্ভ দেশে এসেছেন দেবতা মানব—সকলেই। কিন্তু সকলে এমন সুন্দরভাবে সংস্কৃত বলছেন যে, দেবতাদের থেকে মানুষের, এক দেশের লোক থেকে অন্য দেশের লোকের পার্থক্য বুঝবার কোন উপায় নেই—দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় সকলেই দেবভাষার মাধ্যমে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত।

'অন্যোন্যভাষানববোধভীতেঃ
সংস্কৃতিমাভির্ব্যবহারবৎসু।
দিগ্ভ্যঃ সমেতেষু নরেষু তেষু
সৌবর্গবর্গো ন জনৈরচিহ্নি॥'
(নৈষধচরিতম্, ১০।৩৪)

আজ থেকে একশত বৎসর পরে যদি কোন বাঙালী সন্তান জিজ্ঞাসা করেন—

'অয়ি ভুবনমনোমোহিনি
নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বলধরণী
জনকজননী জননী॥'

—এই রবীন্দ্র-গীতি কোন্ ভাষায় লিখিত, বঙ্গসন্তানকে কি উত্তর দেবেন? এটি কি সংস্কৃত 'ভারত-লক্ষ্মী' সঙ্গীত নয়? এখনও কে বলবে, তখনও বা কে বলতে পারবে? বাংলা ভাষার চেহারা বদলাতে বদলাতে তখন কি রূপ নেবে, কে জানে? সে সময়ে পণ্ডিতেরা, অপণ্ডিতেরা সকলেই বলবেন—ঐ স্বদেশী গান সংস্কৃতেই লেখা। যুগযুগান্তরের বহু রচনা এভাবে সংস্কৃতের ভাণ্ডার পুষ্ট করছে এবং চিরকাল করবে।

তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাধারার মধ্যে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের স্থান আছে, সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের স্থান আছে নিশ্চয়ই—কিন্তু ভারতীয়দের শিক্ষা সংস্কৃতায়িত হওয়া একান্তই দরকার। না হয়, ভারতীয় সন্তানেরা 'জেলি-ফিস্' (Jelly-fish)-ই থাকবেন, মানুষ হবেন না। স্বামীজীর দৃষ্টি কালজয়ী, অভ্রান্ত। যাঁরা সত্যাসত্য-বিনির্ণয়ে অসমর্থ, জগতের এই শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কের, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক ও আন্তর্জাতিক দূত বিশ্ববরেণ্য স্বামীজীর চিন্তাধারাকে তো তাঁরা মেনে নিতে পারেন।

বন্দেমাতরম্।

তৃতীয় পরিকল্পনা

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন

১৯৬১ খৃঃ ১লা এপ্রিলে আমরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তৃতীয় যামে এসে পড়েছি। পূর্ব পরিকল্পনাগুলির মতো এরও উদ্দেশ্য লোকের আয়বৃদ্ধি করা, ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ কমানো, কর্মপ্রার্থীদের জন্য কর্মসৃষ্টি করা—ইত্যাদি। যে পরিকল্পনায় এরূপ ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তার জন্য লোকের উৎসাহের অভাব হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে, দেশের অধিকাংশ লোকের মনে এই পরিকল্পনা কোন প্রকারের আগ্রহ বা উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারেনি। সরকারী রিপোর্টে এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির অনেক বর্ণনা ছাপা হয় এবং এ বিষয়ে পরিসংখ্যানেরও অভাব নেই। গত দশ বৎসরে আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা ৪২ ভাগ; গড়পড়তা জনপ্রতি আয় বেড়েছে শতকরা ১৬ ভাগ—অর্থাৎ প্রতি পরিবারের মাসিক আয় গড়পড়তা প্রায় ১২০৲ টাকা থেকে ১৩৮৲ টাকা হয়েছে। দেশের নানা অঞ্চলে নূতন নূতন শিল্প গড়ে উঠেছে—লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, এলুমিনিয়ামের কারখানা, যন্ত্রনির্মাণের কারখানা, তেলের খনি, রেলওয়ে ইঞ্জিনের কারখানা—এদের চিমনি সগর্বে মাথা উঁচু ক'রে উঠছে। আমরা বড় বড় নদীতে বাঁধ দিয়েছি, বাঁধের জল খাল কেটে চাষীর ক্ষেতে পৌঁছে দিয়েছি, জলে যন্ত্র বসিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী করেছি। বিদেশীরা প্রশংসা ক'রে আমাদের প্রচুর অর্থ ধার দিয়েছে এবং আরও দেবে। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও যে প্রজাদের মনে শান্তি নেই, তা নিঃসন্দেহ।

এর কারণ খুঁজতে হ'লে গত দশ বৎসরের অর্থনৈতিক ইতিহাসের কথা আলোচনা করতে হবে। এই পরিকল্পনার পথে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে ১৯৫০-৫১ খৃঃ থেকে—স্বাধীনতা-লাভের তিন বৎসর পরে। প্রথম পরিকল্পনার পথে দেবতার শুভদৃষ্টি ছিল। জমিতে সোনার ফসল জন্মাল ও খাদ্যশস্যে দেশ ভরে গেল। পাঁচ বৎসর পরে আমরা সহাস্য বদনে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে বরণ ক'রে নিলাম। কিন্তু এই পরিকল্পনায় দেবতা তুষ্ট ছিলেন না। প্রথমেই বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবের ভুলে সঞ্চিত তহবিল প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। তারপর এল বর্ষালক্ষ্মীর চঞ্চল অকরুণ দৃষ্টি। ফলে—জমির ফসল কমে গেল ও খাদ্যশস্যের মূল্য হ'ল ঊর্ধ্বগামী। এই রন্ধ্রপথে 'ইন্‌ফ্লেশন'-শনি দেশ অধিকার ক'রে বসল। ইন্‌ফ্লেশন ধনীর দেবতা—সে ধনীকে আরও ধনী ও দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে। ফলে ধনবৈষম্য বেড়ে গেল। এদিকে আবার পরিকল্পনায় নূতন কর্মসৃষ্টির যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কাজে দেখা গেল যে, তা যথেষ্ট নয়। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারবৃদ্ধি, ইন্‌ফ্লেশনে স্ফীতোদর ধনীর নির্লজ্জ ধনবিলাস, সরকারী কর্মচারীদের অলসতা—সব কিছু মিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আনন্দ অপেক্ষা বিতৃষ্ণার সঞ্চারই হয়েছে বেশী। কাজেই তৃতীয় পরিকল্পনার আগমনে কেহই শঙ্খঘণ্টা বাজায়নি, বরমাল্য দিয়ে অভ্যর্থনা করেনি; বিশেষতঃ জন্মভূমিচ্যুত, প্রতিবেশী-লাঞ্ছিত বাঙালীর চিত্তে এই পরিকল্পনায় আগমনীর সুর মোটেই বাজেনি।

কিন্তু এই অনাদৃত তৃতীয় পরিকল্পনার গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। দেবতার কৃপায় ও বিদেশীর দয়াদাক্ষিণ্যে আমরা যদি পরিকল্পনার লক্ষ্যভেদ করতে পারি, তবে আমাদের গড়পড়তা পারিবারিক আয় দাঁড়াবে মাসিক ১৬০৲ টাকা। বর্তমানের দ্রব্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয় যে খুব বেশী, এ-কথা বলা চলে না। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি যদি নিরস্ত করা সম্ভব হয়, তবে এর দ্বারা অভাব-অনটনের হাত থেকে হয়তো রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। খুব সম্ভব খাদ্যশস্যের অকুলন দূর হবে। বহু নূতন শিল্প গড়ে উঠবে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠার বনিয়াদ এমন পাকা করা যাবে যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমস্তই আমরা নিজেরাই তৈরী করতে পারব।

আসলে তৃতীয় পরিকল্পনা হ'ল শিল্পগঠনের পরিকল্পনা। শিল্পপ্রতিষ্ঠা করতে হ'লে চাই যন্ত্রপাতি, আর যন্ত্রের মূল উপাদান হ'ল লোহা ও ইস্পাত। এই জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তিনটি নূতন লোহা-ইস্পাতের কারখানা বসানো হয়েছে ও তৃতীয় পরিকল্পনায় আর একটি কারখানার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই লোহা দিয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্র তৈরী ক'রে আমরা বহু শিল্প গড়ে তুলব এবং ক্রমে শিল্পক্ষেত্রেও স্বাবলম্বী হ'তে পারব। এই মূল শিল্পগুলির ঠিকমত প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেমন রেলওয়ের প্রসার ও উন্নতি করতে হবে—আরও নূতন ও ভাল রাস্তা তৈরী করতে হবে ও চলাচলের যানবাহনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চাষের উন্নতিরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শিল্পপ্রসার হলেই কৃষিজাত কাঁচা মালের চাহিদা বেড়ে যাবে। পাটের কলের জন্য বেশী পাট চাই—কাপড়ের কলের জন্য তুলা চাই—বনস্পতির কারখানার জন্য তৈলবীজ চাই। এ ছাড়া খাদ্যশস্যের চাহিদাও অনেক বেড়ে যাবে। সুতরাং কৃষির উন্নতির দিকেও তৃতীয় পরিকল্পনায় যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠবে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার দোষত্রুটি তৃতীয়ের মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে কি? তা না হ'লে এই নবজাত শিশুটির জীবনযাত্রাও দুঃখভারাক্রান্ত হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির কাজে কিছুটা শৈথিল্য দেওয়া হয়েছিল। এর কারণ আমাদের হিসাব বা ভবিষ্যদ্দৃষ্টির অভাব। প্রথম পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে এদেশে ভাল বর্ষা হয়েছিল এবং ফসলও জন্মেছিল প্রচুর। সেইজন্য খাদ্যশস্যের মূল্য যথেষ্ট নেমে গিয়েছিল। উৎসাহিত হয়ে পরিকল্পনা-কমিশন তাই ভেবেছিলেন যে, কৃষির জন্য আর তত বেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু 'উল্টা বুঝিলি রাম'। পরের বৎসর থেকেই বর্ষা কমে গেল ও ক্ষেতে কম শস্য উৎপন্ন হওয়ার ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য উর্ধ্বগামী হ'ল। গত দুই বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আবার কিছুটা বেড়েছে এবং আমেরিকা থেকে বেশী খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে। শেষ বৎসরে তাই খাদ্যশস্যের মূল্য একটু নীচের দিকে নেমেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তুলা, পাট, তৈলবীজ প্রভৃতি শস্যের ফলন কম হয়েছে এবং এদের মূল্য অনেক বেড়েছে। কাঁচা মালের দাম বেড়েছে ব'লে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়তির দিকে চলেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কৃষির উন্নতির দিকে আমাদের আরও বেশী নজর রাখতে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য কৃষিকর্মের উন্নতির জন্য বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জমির

উৎপাদনবৃদ্ধি করা যে খুব শক্ত বা ব্যয়সাপেক্ষ, তা নয়। যে কোন সভ্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের জমিতে কম ফসল উৎপন্ন হয়। জমিতে সময়-মত কিছু জল ও একটু সার দেওয়ার ঠিকমত ব্যবস্থা করতে পারলেই ফসলের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যাবে। ছোট ছোট সেচব্যবস্থা—যেমন গ্রামে গ্রামে নলকূপ বসানো, ইঁদারা ও পুকুর কাটা কিংবা যেগুলি আছে তার ঠিকমত সংস্কার করা—এর দ্বারাও জমিতে হয়তো আরও বেশী জল সহজেই পৌঁছে দেওয়া যেত; কিন্তু এটুকু করাও সম্ভব হয়ে উঠছে না। কারণ আমাদের সরকারের দৃষ্টি পড়েছিল বড় বড় কাজের দিকে। তাঁরা ডি. ভি. সি, হীরাকুদ প্রভৃতি অতিকায় স্কীম নিয়েই এতদিন ব্যস্ত ছিলেন। এইগুলি গড়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের জল ঠিক সময়ে ও ঠিক পরিমাণে জমিতে পৌঁছচ্ছে না। এর জন্য শাসনকর্তৃপক্ষ ও সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব কম নয়। সারের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সিন্দ্রির মতো আরও কয়েকটি কারখানা গঠনের ব্যবস্থা তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সব করা সত্ত্বেও মুস্কিল এই যে, জল ও সার ঠিকমত চাষীর জমিতে পৌঁছে দিতে হ'লে যে উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, তা আমাদের নেই।

পরিকল্পনার প্রতি লোকের অনুৎসাহের একটি বড় কারণ নিত্যব্যবহার্য জিনিসের মূল্য-বৃদ্ধি। 'ইন্‌ফ্লেশন'-ব্যাধির বিনাশ করতে না পারলে তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্য নানাভাবে ব্যাহত হবে। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির বহু কারণ আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ঘাটতি—একটি বড় কারণ। আগামী পাঁচ বৎসরে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের উৎপাদন প্রয়োজনমত বাড়ানো যাবে কিনা, এ-কথা বলা শক্ত। এ নির্ভর করছে বর্ষা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির উপরে। তবে ভরসার কথা এই যে, আমেরিকার বদান্যতায় আমরা কিছু খাদ্যশস্য গুদামজাত করতে পেরেছি। দেশে যখন শস্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে, তখন গুদামের শস্য বাজারে বিক্রি করা হবে এবং তা হ'লে মূল্যবৃদ্ধির গতি সংযত করা যাবে। কাঁচামাল সম্বন্ধে এই রকম কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না; কিন্তু কাঁচামালের দাম বেড়ে গেলে উৎপন্ন দ্রব্যেরও দাম বেড়ে যাবে। এই মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা কি ভাবে দূর করা যায়, এ বিষয় নিয়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় কিছু আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ঠিকমত কি ব্যবস্থা করা হ'লে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, তার কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যদি পর পর কয়েক বৎসর ভাল বর্ষণ হয়, তবে হয়তো বিপদ কেটে যাবে। কিন্তু আগামী পাঁচ বৎসরের প্রতি বৎসরই যে ভাল বর্ষা পাওয়া যাবে, তার ভরসা নেই বললেও চলে। কাজেই ভবিষ্যতে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা কম, না বেশী—এ বিষয়টি অনিশ্চিত থেকে যাচ্ছে। তবে কম হওয়ার পক্ষে একটি যুক্তি আছে এই যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় যে-পরিমাণ অর্থব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে, এর অধিকাংশই কর বসিয়ে ও বাজারে দেনা ক'রে চালানো হবে—বলা হচ্ছে। কাজেই ঘাটতির পরিমাণ কম থাকবে ব'লে কাগজী নোট ছেপে ব্যয়-নির্বাহের প্রয়োজন পূর্বাপেক্ষা অনেক কম হবে। তা হ'লে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা হয়তো কিছু কম থাকবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অপ্রিয়তার আর একটি কারণ হচ্ছে—বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি।

দেশের গড়পড়তা আয় কত পরিমাণ বেড়েছে এ আলোচনা বেকারের নিকট সম্পূর্ণ অর্থহীন ব'লে মনে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? পরিকল্পনা-কমিশন যে হিসাব দিয়েছেন, তা থেকে দেখা যায় যে, আগামী পাঁচ বৎসরে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোককে নূতন কাজ দেওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমানে যে-হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার ফলে এই পাঁচ বৎসরে চাকরির বাজারে নবাগতদের সংখ্যা হবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ—অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বেকার-সমস্যা যেরূপ ছিল পাঁচ বৎসর পরে তা বরং খারাপের দিকেই যাবে। এর কারণ যন্ত্রশিল্প লোহা ও ইস্পাত-শিল্প প্রভৃতি যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে যে-পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা হবে, কর্মীর প্রয়োজন হবে সেই অনুপাতে অনেক কম। ফলে নূতন চাকরির সৃষ্টি হবে কম। অবশ্য কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প-প্রতিষ্ঠানের উন্নতিরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলেও লোককে কাজ দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু সব কিছু হিসাব করেও দেখা যাচ্ছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় বেকারের সংখ্যা কমানো যাবে না। পূর্বের দুইটি সমস্যার তুলনায় বেকার-সমস্যাটি অনেক বেশী গুরুতর। আমরা যদি ঠিকমত ব্যবস্থা করতে পারি, জমিতে জল ও সার পৌঁছে দিতে পারি, তবে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যাবে ও দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধিও রোধ করা যেতে পারে। কিন্তু তৃতীয়টির (বেকারের) কোন সমাধান হবে না।

তৃতীয় পরিকল্পনার এইটিই হ'ল সব চেয়ে বড় গলদ। এই পরিকল্পনা পূর্ণনিয়োগের স্বপ্ন দিয়ে গড়া নয়। এমন কি আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যেও যে এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে না, এ-কথা নিশ্চিত। আমরা দ্রুততালে শিল্পায়নের ভিত্তি গড়ে তোলবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি। ভিত্তি গড়ার কাজে বেশী লোককে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এই কাজ শেষ হ'লে যখন চারিদিক থেকে শিল্পের গাঁথনি তোলা হবে—বহু নূতন কারখানায় দেশ ছেয়ে ফেলা হবে—তখন হয়তো বেকার-সমস্যার সমাধান মিলতে পারে। প্রথম থেকেই পরিকল্পনার কাঠামো এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, এর দ্বারা বেকার-সমস্যার আশু সমাধান মিলবে না। আমাদের দেশে শ্রমিক ও কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ তুলনায় অনেক কম। অথচ মূলধন ছাড়া শ্রমিককে কাজে লাগানো যায় না। সেই জন্য প্রথম দিকে মূলধন-বৃদ্ধির দিকেই বেশী নজর দেওয়া হচ্ছে। যখন উপযুক্ত পরিমাণে মূলধন সঞ্চিত হবে, যন্ত্রপাতি তৈরী হবে এবং শিল্পের ব্যাপক প্রসার হবে—তখন কর্মপ্রার্থীদের আর বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হবে না। পূর্ণনিয়োগের (full employment) স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে।

এই হ'ল পরিকল্পনাকারীদের কল্পনা বা চিন্তাধারা। এ যে অযৌক্তিক—এ-কথা বলা চলে না। কিন্তু আজ যে বেকার বসে আছে, তার মনে এই যৌক্তিকতা কোন সান্ত্বনা দেবে না। সে সুদূরের পিয়াসী নয়, বর্তমানের পূজারী। বহু পরিবারে তাই তৃতীয় পরিকল্পনার কোন স্পন্দন জাগিয়ে তুলবে না।

গত দশ বৎসরে এ-দেশে ধনবৈষম্য বেড়ে গেছে, এ-কথা অনেকেই বলেন। তবে এই জন্য পরিকল্পনাগুলি কতটা দায়ী, সে বিষয় বিচারসাপেক্ষ। এ-কথা ঠিক যে, পরিকল্পনা কার্যকরী করতে গিয়েই 'ইন্‌ফ্লেশন' এসেছে এবং

ইনফ্লেশনে ধনবৈষম্য বাড়ে। সেই হিসাবে পরিকল্পনাকে ধনবৈষম্যের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী বলা চলে। আর পরিকল্পনার ফলে বহু শিল্পবৃদ্ধি ঘটেছে, এবং সেইজন্য অর্থোপার্জনের সুযোগও অনেক বেড়েছে। তুলনায় গরীবের ভাগ্যে অর্থলাভের সুবিধা তত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়নি। এই হিসাবেও পরিকল্পনাকে ধনবৈষম্যের জন্য অন্ততঃ আংশিক ভাবে দায়ী করা যেতে পারে। অবশ্য সবচেয়ে বড় কারণ—কর ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তি। মনীষী এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ এক জায়গায় লিখেছিলেন যে, বর্তমান জগতে অতি ধনীলোক থাকা সম্ভব নয়। যদি থাকে তবে বুঝতে হবে যে, সে অতি অসৎ—অর্থাৎ সে অতিমাত্রায় সরকারকে ফাঁকি দিতে পেরেছে। অধিকাংশ দেশেই আয়কর ও উত্তরাধিকার-করের হার এত বেশী যে, ঠিকমত কর দিলে লোকের হাতে খুব বেশী টাকা থাকবার কথা নয়। আমাদের দেশেও এ-কথা খাটে। কারণ এদেশেও ধনীদের উপর উচ্চহারে আয়কর বসানো আছে এবং এ-ছাড়া তাদের ব্যয়কর, সম্পত্তিকর এবং উত্তরাধিকার-কর দিতে হয়। যে লোকের বাৎসরিক আয় একলক্ষ টাকা ও অন্ততঃ তার যদি দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি থাকে, তবে আয়কর বাবদ তাকে দিতে হয় প্রায় ৫২ হাজার টাকা ও সম্পত্তিকর বাবদ ৮ হাজার টাকা; অর্থাৎ তার হাতে থাকবে মাত্র ৪০ হাজার টাকা। সকলে যদি ঠিকমত কর দিত, তবে ধনবৈষম্য যে অনেক কম থাকত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৃহৎশিল্প-প্রসার, আমদানি-নিয়ন্ত্রণ, মূল্যবৃদ্ধি ও ফাট্‌কা-বাজির সুযোগবৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে একশ্রেণীর লোকের লোকের হাতে প্রচুর অর্থ-সমাগম হয়েছে এবং এদের অধিকাংশই খুব সাফল্যের সঙ্গে কর ফাঁকি দিতে পারছে। এর জন্যও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ত্রুটি অনেকটা দায়ী। তৃতীয় পরিকল্পনায় ধনবৈষম্য কমাবার কথা আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এ-সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হয় নি; বরং এই পরিকল্পনাভুক্ত একটি প্রস্তাবের ফলে ধনবৈষম্য কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। ব্যয়নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত যে-রাজস্বের প্রয়োজন, তা পরোক্ষ কর ধার্য ক'রে তোলা হবে—এই কথাই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। তা হ'লে ধনবৈষম্য হয়তো একটু বেড়েই যাবে। কারণ পরোক্ষ কর দেবার পর ধনীদের আয় যতটুকু কমে, গরীব মধ্যবিত্তদের আয় সেই তুলনায় বেশী কমবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা একপঞ্চমাংশ। আগামী পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় আরও অনেকটা বেড়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু এই বর্ধিত আয়ের অধিকাংশই যদি মুষ্টিমেয় ধনীর কুক্ষিগত হয়, তবে জনসাধারণের ভাগ্যে জুটবে খুদকুঁড়ো মাত্র।

সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার যাত্রাপথের বামে সর্প ও দক্ষিণে শৃগাল দেখা যাচ্ছে। যাত্রা-পথের এই বিপদাশঙ্কা যদি বাস্তবে পরিণত হয়, তবে তার জন্য পরিকল্পনার কাঠামোকে খুব দোষ দেওয়া যাবে না। আসল গলদ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে এবং অধিকাংশ কর্মচারীর মধ্যে। শাসনকর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগে যে আত্মত্যাগ, সততা ও সাহসের পরিচয় দিয়ে-ছিলেন, আজ সেই গুণগুলির অনেক অভাব দেখা যাচ্ছে। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা সকলেই স্বাধীনতা চেয়েছিলাম—নিজেদের পদোন্নতি বা ধনভাণ্ডার পূর্ণ করার কথা ভেবে নয়, এ দেশের অগণিত দরিদ্র-নারায়ণের দৈন্য দূর করার জন্য। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে রচিত বিরাট পরিকল্পনা যে সাফল্য-মণ্ডিত হ'তে পারছে না, তার কারণ আমাদের আত্মকেন্দ্রীয়তা ও নৈতিক মানের নিম্নগতি।

আমার মুক্তির তীর্থ এ পৃথিবী

শ্রীশান্তশীল দাস

আমি তো বৈরাগী নই ; 'মায়াময়' ব'লে এ-জগৎ
অরণ্যে পর্বতে ছুটে সন্ধান করিনি মুক্তিপথ।
আমার মুক্তির তীর্থ এ পৃথিবী— এই বসুন্ধরা ;
হাসি-কান্না, আলোছায়া, আনন্দ ও বেদনায় ভরা।

প্রতিদিন দেখি আমি বিচিত্র রূপের সমারোহ ;
'মিথ্যা সব' ব'লে মন কোন দিন করেনি বিদ্রোহ।
ভোগ করি মহানন্দে এই রূপ-রঙের সম্ভার ;
এর সাথে মাঝে মাঝে আসে বটে ঘন অন্ধকার।
সে-আঁধারও হাসিমুখে মেনে নিই ; অভিশাপ ব'লে
কোনদিন উপাধান ভাসাই না নয়নের জলে।

দেখেছি যে চোখ ভরে বিচিত্র রঙের কত খেলা,
পেয়েছি আনন্দ কত ধরণীর উৎসবের বেলা।
ঊসর জীবন-পথে রক্তস্নাত হয়েছে চরণ,
অভিযোগ করিনিক', সে-ব্যথাও করেছি বরণ।

অরণ্যে, গুহার মাঝে, জানি না সে কোন্ ভগবান
ভক্ত লাগি' বর নিয়ে রয়েছেন—তাঁহার সন্ধান
করিনিক' কোন দিন। আমি তাঁর প্রসাদ যে পাই
দিনে রাতে, সুখে দুঃখে ; কোন ক্ষোভ মনমাঝে তাই
জাগেনিক' হাসি-অশ্রু আনন্দ ও বেদনার মাঝে,
সৃষ্টির সর্বত্র তাঁর দাক্ষিণ্যের প্রসন্নতা রাজে।

অকারণে কেন তবে মুক্তি লাগি এই ব্যাকুলতা !
স্রষ্টার আনন্দলোক—যেখানে রয়েছে সার্থকতা
জীবনের—সেই তীর্থে বিকশি' উঠুক চিত্তদল ;
আলো-আঁধারের মাঝে এ-জীবন হোক না সফল !

দণ্ডকারণ্যে দুর্গোৎসব

শ্রীযশোদাকান্ত রায়

আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া ইউরোপের সমাজের মতো একটি সমাজ গড়িতে পারো? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর এরূপ হইবেই হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করিবার প্রধান উপায়—মধ্য ভারতে একটি উপনিবেশ স্থাপন। যাহারা তোমাদের ভাব মানিয়া চলিবে, কেবল তাহাদের সেখানে রাখা হইবে। তারপর এই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সেই ভাব বিস্তার কর। অবশ্য ইহাতে টাকার দরকার, কিন্তু এ টাকা আসিবে। ইতিমধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি করিয়া সমগ্র ভারতে তাহার শাখা স্থাপন করিয়া যাও। এখন কেবল ধর্মভিত্তিতেই এই সমিতি স্থাপন কর; কোনরূপ সামাজিক সংস্কারের কথা এখন প্রচার করিও না। কেবলমাত্র এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, অজ্ঞ লোক-দিগের কুসংস্কার যেন প্রশ্রয় না পায়। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি প্রাচীন নামের মধ্য দিয়া এ-সকল সত্য প্রচারিত হইলে লোকে সহজে গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ সঙ্গে নগরসংকীর্তন প্রভৃতির বন্দোবস্ত কর।

[১৮৯৪, ১৯শে নভেম্বরে লিখিত পত্র হইতে] **বিবেকানন্দ**

মধ্যপ্রদেশের বস্তার জিলা এবং উড়িষ্যার কোরাপুট জিলার ২৩,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত অরণ্যবহুল জনবিরল অঞ্চল এতদিন অনেকের কাছেই অপরিচিত ছিল। রায়পুর হইতে বিজয়নগর অবধি যে জাতীয় সড়কটি এই অঞ্চলকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া গিয়াছে, সেইপথে অরণ্যসম্পদ্ এবং শস্যাদি সংগ্রহ উপলক্ষে কিছু ব্যবসায়ীর যাতায়াত ছাড়া বাহিরের সঙ্গে এই অঞ্চলের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। সম্প্রতি এখানে কর্মের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং দণ্ডকারণ্য-যোজনার উদ্যোগে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত অনেক উদ্বাস্তু বসবাসের জন্য এখানে আসিয়া গৃহনির্মাণ করিয়া এবং অরণ্য হইতে সদ্যোমুক্ত বিস্তীর্ণ জমি চাষ করিয়া এখানে নিজেদের জন্য গ্রাম গড়িয়া তুলিতেছে। পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া ইহারা বহুদিন সরকারী শিবিরে অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। এখন নিজস্ব গৃহ ও জমি পাইয়া ইহাদের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ইহারাই দণ্ডকারণ্যে দুর্গোৎসব করে।

অভ্যস্ত পরিবেশের প্রতি মায়া এবং তাহাকে আঁকড়াইয়া থাকার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই অভ্যস্ত স্থান ছাড়িয়া বাহিরে গেলেও, নূতন স্থানে গিয়া পুরাতন পরিবেশটিই সে সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। কালক্রমে নূতন স্থানটিতেই যখন তাহার জীবনের শিকড় বসিয়া যায় এবং সেখান হইতেই যখন তাহার দেহে মনে শক্তি-সঞ্চার হইতে থাকে, তখন সে এক নবরসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। ভারতের ইতিহাসে ইহার উদাহরণের অভাব নাই।

বাঙালীরা বাংলা দেশে যেমন চাঁদা তুলিয়া বারোয়ারি দুর্গোৎসব করিত, এখানেও তেমনই করিতেছে। এখানেও পূজার মধ্যে তেমনই বহিরঙ্গের সমারোহ। বাংলা দেশে যাহা কিছু তাহাদের প্রিয় ছিল, এই নূতন

স্থানে তাহারা সে সবই আস্বাদন করিতে চায়। তবু দণ্ডকারণ্য বাংলা দেশ নয়। এখানকার পরিবেশ এবং এখানকার প্রতিবেশীরা উভয়ই বাঙালীর কাছে নূতন। বাংলা দেশের সঙ্গে এই স্থানের সাদৃশ্য আছে, প্রভেদও আছে।

দণ্ডকারণ্য-যোজনা যেখানে কর্মরত, সেই স্থানই রামায়ণে বর্ণিত দণ্ডকারণ্য কি না—সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ কিছু নাই। এখন এখানে রাক্ষসেরাও নাই, মুনিঋষিরাও নাই। রামায়ণের যুগে হয়তো নর্মদা, মহানদী এবং গোদাবরীর অববাহিকা ব্যাপিয়া এক বিস্তীর্ণ বনভূমি 'দণ্ডকবন' নামে পরিচিত ছিল। রামায়ণে ইহার ভয়াবহতার বর্ণনা আছে। রামচন্দ্র বহু বৎসর এই অরণ্যে থাকিয়া বিরাধ, মারীচ প্রভৃতি রাক্ষস বধ করিয়া ইহাকে সর্বভয় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এখন দণ্ডকারণ্যে ভয়াবহ কিছুই নাই। দণ্ডকারণ্য-যোজনার কর্মস্থল এই বিশাল বনভূমির একাংশ মাত্র। এখানে কালিদাস-বর্ণিত 'রামগিরি' এবং 'জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদক' প্রস্রবণ এখনও রাম ও সীতার স্মৃতি বহন করিতেছে। এখনও সেখানে বৎসরে একবার মেলা বসে। গোদাবরীর শাখা ইন্দ্রাবতী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। অসংখ্য ঝরনা ও নালা এখানকার বর্ষার জল বহিয়া লইয়া যায়—গোদাবরী ও মহানদীতে। বর্ষাকালে এগুলি জলপূর্ণ হইয়া মাঝে মাঝে কূল ছাপাইয়া যায়, আবার বর্ষান্তে ইহাদের অধিকাংশই একেবারে শুকাইয়া যায়। পাহাড় ও বনশোভিত এই স্থানটি বড়ই সুন্দর। এখানকার জমিও খুব উর্বরা। প্রধান শস্য ধান, তাহা ছাড়া ভুট্টা, জোয়ার, সরিষা, কলাই, তামাক, আম, জাম, কাঁঠাল, লেবুজাতীয় ফল, তরিতরকারি প্রচুর জন্মে। বনসম্পদের মধ্যে শাল, সেগুন, হরীতকী, আমলকী, বিড়িপাতা প্রধান। লোহার আকর এখানে প্রায় সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। স্থানীয় আদিবাসীরা এই সব আকর হইতে নিজেরা আদিম প্রথায় লোহা গলাইয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় লোহার সরঞ্জাম তৈরী করে। এই স্থান সমুদ্রতল হইতে প্রায় ২,০০০ ফুট উঁচু; আবহাওয়া খুব মনোরম। গ্রীষ্মের তেমন প্রখরতা নাই, অন্যান্য ঋতুগুলি বাংলা দেশেরই অনুরূপ।

এই পরিবেশে বাঙালীরা বাস করিতে আসিয়াছে। পূর্ববাংলার প্রশস্ত ও চিরপ্রবাহী নদী এখানে নাই, দিগন্তলীন সমতল শস্যক্ষেত্রও নাই। এখানে চাষ করিতে হইবে পাহাড় ও বনবেষ্টিত অসমতল উপত্যকায়। বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া জলের চাহিদা মিটাইতে হইবে। নদীপথে যাত্রী এবং পণ্য বহনের সুবিধা এখানে নাই, অরণ্যপথে গো-যানে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাত্রী ও পণ্য লইয়া যাইতে হইবে, অবশ্য মোটরগাড়ী চলিবার উপযুক্ত অনেক রাস্তাই আছে। এই পরিবেশ সম্পূর্ণ বাংলার মতো না হইলেও ইহার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা বাঙালীর বসবাসের প্রতিকূল। বাঙালীর প্রতিভা এই পরিবেশকে সহজেই আপনার করিয়া লইতে পারিবে। আন্দামান হইতে রাজস্থান ও নৈনীতাল পর্যন্ত বাঙালী যেখানে গিয়াছে, কোথাও পরিবেশ তাহাকে বাধা দিতে পারে নাই। দণ্ডকারণ্যেও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। এই দেশেও আবাদ করিয়া বাঙালী সোনা ফলাইবে।

এই পরিবেশের মধ্যে বাঙালীরা আর একটি বলিষ্ঠ মানব-গোষ্ঠীকে প্রতিবেশীরূপে পাইয়াছে। তাহারা এতদঞ্চলের আদিবাসী। আচারে ও সংস্কারে তাহারা বাঙালীদের মতো

নয়। বৌদ্ধযুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাহিরের সমস্ত প্রভাব পূর্ববাংলায় অবাধে প্রবেশ করিয়াছে এবং পূর্ববাংলার সংস্কৃতির স্তরে স্তরে আপন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। দণ্ডকারণ্যে তাহা ঘটে নাই। অরণ্য ও পাহাড়ের বাধা অতিক্রম করিয়া বাহিরের প্রভাব সহজে এখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাই অত্যন্ত আদিম অবস্থার মানুষ এই অঞ্চলের কোথাও কোথাও দেখা যায়। দেশ স্বাধীন হইবার পর দণ্ডকারণ্যের প্রবেশ-পথ খুলিয়া গিয়াছে। সমাজ-উন্নয়ন-যোজনার মাধ্যমে অরণ্যের গভীরেও আদিবাসীদের জন্য শিক্ষা ও বৈষয়িক উন্নয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। দণ্ডকারণ্য-যোজনাও আদিবাসীদের জন্য নানারূপ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাপৃত। আদি-বাসীরা অধিকাংশই 'গোন্দ' জাতীয়। ইহারা মারিয়া, মুরিয়া, পরজা প্রভৃতি নানা উপ-জাতিতে বিভক্ত। অরণ্যের নিভৃতে ইহারা বহুকাল এমন একটি সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, যাহার অনেক কিছুই সুন্দর ও প্রশংসনীয়। ইহারা স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া জীবিকার জন্য পরিশ্রম করে। চাষের কাজ, নৃত্য, গীত, আনন্দ-উৎসবাদি উভয়ে মিলিয়া করে। স্ত্রী-পুরুষের এই মিলন সমাজের শাসনে বিস্ময়কর-ভাবে সংযত। ইহাদের সমবেত গীত, বাদ্য এবং নৃত্য ভারতীয় লোকসঙ্গীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নর্তকদের বেশবৈচিত্র্যে, নর্তকীদের সংযত ও ললিত ভঙ্গীতে এবং সুরমাধুর্যে এই লোকসঙ্গীত অনুপম। ইহাদের শিল্পসামগ্রীর মধ্যেও এমন শিল্পবোধের পরিচয় আছে, যাহা সচরাচর দুর্লভ। সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ইহাদের পিতলশিল্প। মাটি, মোম এবং পিতলের সাহায্যে ইহারা যে সব জিনিস তৈরী করে, ভারতের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পের মধ্যে সেগুলি স্থান পাইবার যোগ্য। দণ্ডকারণ্যের নানা স্থানে পাথরে খোদাই-করা দেবদেবীর মূর্তি দেখা যায়। আদিবাসীরা এই সব মূর্তি পূজা করে। শিল্প-হিসাবে মূর্তিগুলি অনবদ্য। আদিবাসীদের পিতল-শিল্পের শিল্পশ্রেণীর সহিত এই প্রস্তর-মূর্তিগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, এই মূর্তিগুলি আদিবাসী ভাস্করদেরই কীর্তি। এখন এই প্রস্তরশিল্প লোপ পাইয়াছে।

এই প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাঙালীকে মিলিয়া মিশিয়া একাত্ম হইয়া বাস করিতে হইবে। বৈষয়িক ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া চাষের কাজে, ইহারা পরস্পরকে নানাভাবে সাহায্য করিতেছে। স্থানীয় আদিবাসীদের চাষের রীতি বাঙালীরা কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও একটি মিলনভূমি প্রস্তুত হইয়া আছে। বাংলার মতো দণ্ডকারণ্যেও শিবশক্তি-পূজার বহুল প্রচলন আছে। বাংলার মতো এখানেও চড়কপূজা হয় এবং 'দেল' লইয়া ভক্তেরা গাজনে বাহির হয়, আবিষ্ট অবস্থায় কাঁটার আসনে বসে এবং নানারূপ অসাধ্য সাধন করে। আদিবাসীদের কোন কোন দেবস্থানের সম্মুখে একটি কাঁটার আসন ঝুলাইয়া রাখা হয়। শিবের পূজা করিয়া পুরোহিতেরা সেই আসনে বসে। আবার বাংলায় যেমন শক্তিপূজার প্রচলন, এখানেও তেমনই দেবীপূজার প্রচলন আছে। আপদে বিপদে দেবীই ইহাদের সহায়। 'কারণ' এবং ছাগ উৎসর্গ করিয়া ইহারা দেবীর পূজা করে। সিংহবাহিনী দশভুজা ঢাকেশ্বরী যেমন ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, তেমনই দণ্ডকারণ্যের বস্তার অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিংহবাহিনী দন্তেশ্বরী। ইহাদের বিশ্বাস—দেবী দন্তেশ্বরীর কৃপাতেই এই অঞ্চলে কখনও দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

বাঙালী যেখানে যায়, সেখানেই যথাসম্ভব ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করে। তাই দণ্ডকারণ্যে দুর্গোৎসবের মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। তবে শক্তিপূজার এমন অনুকূল পরিবেশ অন্যত্র দুর্লভ। দুই বৎসর পূর্বে বাঙালী উপনিবেশীরা দণ্ডকারণ্যে যে দুর্গোৎসব করিয়াছিল, তাহা তাহাদের প্রথম দুর্গোৎসবরূপে স্মরণীয়। উপনিবেশীদের সংখ্যা তখন অল্প ছিল এবং গ্রামও তৈরী হইয়াছিল মাত্র একটি। প্রতিমা, পুরোহিত এবং পূজার অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল বহু দূরবর্তী শহর রায়পুর হইতে। তেলের ড্রামের মুখে চামড়া আঁটিয়া ঢাক তৈরী হইয়াছিল। শত বাধা সত্ত্বেও বাঙালীদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। নূতন স্থানে আসিয়া বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা করা যাইতেছে—একদিকে যেমন এই আনন্দ ছিল, অন্যদিকে—তেমনই জীবনের নূতন অধ্যায়ের আরম্ভে দেবীর কাছে প্রণতি জানাইবার আকাঙ্ক্ষাও ছিল প্রবল। আদিবাসীদের কাছে এই উৎসবটি হইয়াছিল এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ২৫।৩০ মাইল দূরের গ্রামাঞ্চল হইতেও অরণ্যপথে পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া তাহারা উৎসবে যোগ দিয়াছিল। বাঙালীরা যেমন আরাত্রিক, মহোৎসব, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি দ্বারা উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, আদিবাসীরাও তেমনই অহোরাত্র নাচিয়া গাহিয়া উৎসব মুখরিত করিয়াছিল। দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল, ইনিই তো দন্তেশ্বরী মা।

বাঙালী উপনিবেশীদের সংখ্যা তাহার পর অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর দুর্গা-পূজার পূর্বেই চৌদ্দটি গ্রাম নির্মিত হইয়াছিল এবং দুর্গাপূজা আরও ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিমা, পুরোহিত এবং অধিকাংশ উপকরণ দণ্ডকারণ্যেই পাওয়া গিয়াছিল, বাহির হইতে আনিতে হয় নাই। আদি-বাসীরাও অধিকতর সংখ্যায় এই উৎসবে যোগ দিয়াছিল। এক স্থানে তাহারা প্রস্তাব করিয়াছিল প্রতিমা বিসর্জন না দিয়া মণ্ডপেই রাখা হোক, যাহাতে তাহারা প্রত্যহ আসিয়া দেবীর পূজা করিতে পারে।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসী-দের সঙ্গে বাঙালীর যোগাযোগ এবং আদান-প্রদান উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর। ইহাতে বাঙালীর সংস্কৃতি যেমন নূতন পরিবেশ হইতে নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া নবরূপ গ্রহণ করিবে, আদিবাসীরাও তেমনই পাইবে বাঙালীর বহুযুগ-সঞ্চিত সাধনারাশির স্পর্শ। দণ্ডকারণ্যে এই মহত্তর ভবিষ্যতের ভূমিকাই রচিত হইতেছে।

সমস্যা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

কি নামে তোমায় ডাকিব বন্ধু ?
কি নামে কানটি সজাগ থাকে ?
কেউ বলে 'হরি', কেউ বলে 'হর',
'তারা' 'তারা' ব'লে কেউ বা ডাকে।
তোমারে ডাকিতে কেন করে বলো,
অকারণে দু'টি আঁখি ছল-ছলো,
বলো তো কী আছে নামের ফাঁকে ?
'জয় কালি !' ব'লে কেউ ডেকে ওঠে
কী নাম আসল শুধাই কাকে ?

'প্রভু ! প্রভু !' বলা সাজে না তোমায,
তোমাকে 'বন্ধু' ব'লে যে জানি,
আমি শুধু চাই আমার হৃদয়ে
তোমার প্রেমের পরশখানি।
'নাথ' ব'লে কেউ করে প্রণিপাত ;
আমি 'প্রিয়' ব'লে ধরেছি যে হাত,
প্রণম্য ব'লে কেমনে মানি ?
আমি যে পেয়েছি তোমার আদর,
কানে, প্রাণে ভরা তোমার বাণী।

'গুরু ! গুরু !' করা, হাঁকা 'জয় গুরু !'
গুরুতর ঠেকে আমার কাছে !
ডাকবো আমার ঠাকুরকে আমি,
গুরুজীর এতে কাজ কী আছে ?
প্রিয়-মিলনের লগ্নেই সতী
আপনিই চেনে আপনার পতি ;
নীড় চেনে পাখী—কোন্ সে গাছে।
জল কোথা কত গভীর অতল
কেউ কি সে কথা শেখায় মাছে ?

হয়তো অনেক উপরেই কেউ
উঠেছেন নিজ সাধন-বলে ;
আমি কেন যাবো হাত ধ'রে তাঁর,
ভক্তশিষ্য সাজার ছলে ?
অন্যের হাতে গাঁজা খেলে ভাই,
নেশায় তেমন মৌজ কি পাই ?
আমার ক্ষুধার তৃপ্তির বেলা
বকলমে কাজ সারা কি চলে ?

ইওরোপ-ভ্রমণকালে

[রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবের প্রভাব-দর্শন]

শ্রীমতী শান্তি সেন

ঠাকুর স্বামীজীর ভাব ইওরোপের অখ্যাত গ্রামের ভিতরে পর্যন্ত, নরনারীর হৃদয় কী গভীরভাবে যে স্পর্শ করেছে, তা দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। আমরা যখন ওদেশে ছিলাম, তখন ভ্রমণ করবার সময় যে কটি দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়েছে, তাই এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

ইংলণ্ড

একবার গ্রীষ্মকালে আমরা 'ইংলিশ লেক ডিস্ট্রিক্ট'এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানকার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। একদিন বিকেলবেলা—বিকেলই ব'লব, কারণ তখনও দিনের আলো ছিল, যদিও ঘড়িতে তখন ৯টা বেজে গিয়েছে, আমাদের রাত্রির খাওয়াও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদেশে গ্রীষ্মকালে রাত্রির অন্ধকার দশটা সাড়ে দশটার আগে নামে না। লণ্ডনেই দশটা সাড়ে দশটার আগে নামে না, আর লেক ডিস্ট্রিক্টে তো আরও একটু পরেই অন্ধকার হয়। সেইজন্য রোজই আমরা ডিনারের পর অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত বাইরে বেড়াতাম।

সে-দিন বেড়াতে গিয়ে আমরা একটি ফেরী বোটে ক'রে গ্র্যাসমিয়ার (Grassmere) লেকটি পার হয়ে অপর পারে গিয়েছিলাম। ফেরী বোটে আমরা ছাড়াও অনেকে ছিলেন। সেখানে আমরা তিনজন ভারতীয় ছিলাম। আমরা হ্রদটির শোভা দেখছিলাম, আর সে-সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় একজন ইংরেজ ভদ্রলোক আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: আমরা ভারতবর্ষ থেকে এসেছি কিনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমরা কি জানি? তাঁদের সম্বন্ধে বই কোথায় পাওয়া যায়? আমরা তাঁকে লণ্ডনে স্বামী ঘনানন্দের ঠিকানা দিলাম। তখন তিনি বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি কিছু বই পড়েছেন। তাঁকে তাঁর খুব ভাল লেগেছে, তাই তাঁর সম্বন্ধে আরও জানতে চান। শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর ক্রাইষ্টের মতো ব'লে মনে হয়। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। তাঁর উপদেশ মতো ওঁরা সংযতভাবে জীবনযাপন করেন। এইরূপ আরও অনেক কথা বলেছিলেন। লেকের অপর পারটি নির্জন, ওখানে গিয়ে তিনি ধ্যান করেন।

একটু পরে আমরা লেকের অপর পারে পৌঁছে গেলাম। লেকের এই পারটি একটি ঢালু পাহাড়—লেকের জল থেকে ঢালুভাবে উপরে উঠে গেছে এবং জল থেকে আরম্ভ ক'রে চূড়া পর্যন্ত ঘন লম্বা সবুজ ঘাসে ঢাকা। ঘাসগুলি এত ঘন ও নরম যে, বসলে বা শুলে নরম গদির মতো মনে হয়। তাতে আবার এত লম্বা যে, বসলে পাশের লোকও দেখতে পায় না। মাঝে মাঝে এক একটি বড় গাছও আছে। ইংরেজ ভদ্রলোকটি বোট থেকে নেমে জলের ধারে একটি গাছের নীচে ঘাসের উপরে বসে পড়লেন। আমরা উপরে উঠে গেলাম, সেখানে গিয়ে বসলাম। লেকের তীরটি খুব বিস্তৃত; তাই যদিও বহুলোক এখানে আনন্দ করতে আসে, তবুও নির্জন বোধ হয়।

সেদিন ইংলিশ লেক ডিস্ট্রিক্টের সন্ধ্যায় গ্রীষ্মকালের অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোতে ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে ভগবৎ-চিন্তায় বিভোর দেখে সত্যই খুব অবাক্ হয়েছিলাম। যখন চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মহোৎসব, সব লোক আনন্দে মত্ত, তখন ভদ্রলোকটি শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় জানতে ব্যগ্র। তাঁর অন্য কোন দিকে মন নেই, ঠাকুরের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ তাঁর এত বেশী যে, নিজেদের সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করতেও তিনি পশ্চাৎপদ হলেন না। ইংরেজরা অপরিচিতের সঙ্গে বড় একটা কথা বলে না; কেউ পরিচয় করিয়ে দিলে তবে আলাপ করে। এই তাদের সামাজিক রীতি এবং এরা খুব রক্ষণশীল ব'লে সহজে সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করে না। কিন্তু এই ইংরেজটির ঠাকুরের বিষয় জানার আগ্রহ এত বেশী হয়েছিল যে, তিনি তাঁদের গতানুগতিক নিয়ম ভঙ্গ ক'রে এসে ঠাকুরের কথা জানতে চাইলেন, এবং চারদিকের আমোদ-প্রমোদে যোগদান না ক'রে, একান্তে বসে ধ্যানে মগ্ন হলেন। এ দৃশ্য সত্যই বিস্ময়কর! সেদিন আমরা বুঝেছিলাম, ঠাকুরের ভাব কত দূরে দূরে ও গভীরভাবে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করছে!

কোপেনহাগেন

পরবৎসর গ্রীষ্মকালে আমরা স্কাণ্ডিনেভিয়ান (Scandinavian) দেশগুলি দেখতে যাই; সে সময় আমরা ডেনমার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একদিন কোপেনহাগেনে একটি ডেনিস-ভারতীয় সোসাইটিতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি। সেখানে চা খাওয়া ও ডেনিস ও ভারতীয়দের মধ্যে আলাপ-আলোচনা মেলামেশার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের চা খাওয়ার পর গল্পগুজব হচ্ছে, এমন সময় একটি ডেনিস যুবক, বয়স তার ২৮।২৯ হবে, আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা ক'রল, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমি কি জানি? তাঁর সম্বন্ধে কি কি বই আছে, এবং কোথায় সেই বই পাওয়া যায়? আমি তাকেও লণ্ডনের বেদান্ত-কেন্দ্রের ঠিকানা দিয়েছিলাম। তখন সে উচ্ছ্বসিত ভাষায় স্বামীজীর প্রশংসা করতে লাগলো; ব'লল, এমন তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রের কথা সে আর কখনও শোনেনি। ভারতীয় যোগীদের কথা সে শুনেছে, কারও কারও জীবনীও সে পড়েছে, কিন্তু এত ভাল তার আর কাউকে লাগেনি। স্বামীজীর প্রতি তার এত গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখে আমি অবাক্ হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাদের দেশের সন্ন্যাসীর আদর্শ সে এমন ক'রে বুঝতে পারলো কী ক'রে? ছেলেটি তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ব'লল, 'কেন, আমাদের দেশে রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যেও তো সন্ন্যাসী আছে? তবে এ-কথা ঠিক স্বামীজীকে তার যত ভাল লেগেছে, তত ভাল আর কাউকে লাগেনি।' সুদূর পাশ্চাত্যের কোপেনহাগেন শহরে এসে, একজন ডেনিস যুবককে স্বামীজীর এত অনুরাগী ভক্তরূপে দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম।

লণ্ডন

আমরা যখন লণ্ডনে ছিলাম, ঘনানন্দ স্বামীর সঙ্গে তখন আমাদের প্রায়ই দেখা হ'ত। সপ্তাহে একদিন ক'রে তাঁর মিটিং থাকত, আমরা মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম। তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন, সেখানেও আমরা যেতাম। তিনিও আমাদের বাড়িতে আসতেন; একদিন ফিজি রামকৃষ্ণ-কেন্দ্রের স্বামী রুদ্রানন্দকে নিয়েও এসেছিলেন।

লণ্ডনে স্বামী ঘনানন্দের লেকচার-হলে ধীরে ধীরে কিরূপে লোকসংখ্যা বাড়তে লাগলো, তা আমরা দেখেছি। প্রথমে যাঁদের

চোখে কেবলমাত্র কৌতূহল, এমন কি বিদ্রূপ পর্যন্ত দেখেছি, ধীরে ধীরে তাঁরাই আবার আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন—তাও দেখেছি। অনেকে ঠাকুর-স্বামীজীর ভক্ত হয়ে গেছেন। ক্রমে কয়েকটি ইংরেজ ছেলেমেয়ে স্বামী ঘনানন্দের কাছে আসতে লাগলেন। তাঁরা ভারতীয় যোগীর মতো হ'তে চান। দু-একটি ছেলে ব্রহ্মচর্য নিয়ে ঘনানন্দজীর সঙ্গে থাকতে লাগলেন। এইরূপ কয়েকজনকে আমরা দেখেছি। তাঁরা ওখানকার সব কাজ করতেন, এবং ধ্যান জপ ক'রে ভারতীয় সাধুদের মতো জীবনযাপন করতে চেষ্টা করছেন। ধনীরাও ক্রমে আকৃষ্ট হলেন এবং ঠাকুর-স্বামীজীর নামে আশ্রম করার জন্য বাড়ি ও টাকা দান করলেন।

গ্রাৎস্-এ একদিন

গ্রাৎস্ একটি ফরাসী গ্রাম। প্যারি থেকে পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত। একবার ঈস্টারের ছুটিতে আমরা সেখানে গিয়ে একদিন ছিলাম। ওখানে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম আছে। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ তখন ওখানকার অধ্যক্ষ; তিনিই ঐ আশ্রমটি গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ফরাসী বলতে পারতেন একজন ফরাসীর মতো। বহুদিন ধরে তিনি প্যারি ও তার আশেপাশের অঞ্চলে ঠাকুরের নাম প্রচার করেছিলেন। ঠাকুর-স্বামীজীর ভক্ত একজন ফরাসী noble man (জমিদার) তার Chateauটি (সাতো অর্থাৎ প্রাসাদটি) ও তৎসংলগ্ন ভূমিখণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার জন্য দান করেন। এই বাড়িতেই স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

আমরা ঈস্টারে ওখানে যাব ঠিক ক'রে সিদ্ধেশ্বরানন্দজীকে চিঠি দিয়েছিলাম। তারপর লণ্ডন থেকে আমরা জার্মানি যাই, সেখানে কিছুদিন থেকে ঈস্টারের আগের দিন প্যারিতে পৌঁছাই। প্যারিতে নেমেই দেখি, একজন ইংরেজী-জানা ফরাসী মেয়ে আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা গ্রাৎস্-এ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যাব কিনা। আমরা খুশী হয়ে সম্মতি জানালে তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন। সিদ্ধেশ্বরানন্দজী তাঁকে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁর নামটি আজ আর মনে নেই। তিনি প্যারি ইউনিভার্সিটির একজন গ্রাজুয়েট ও ঠাকুর-স্বামীজীর খুব ভক্ত, গ্রাৎস্ আশ্রমে প্রায়ই যান। তিনিই ট্যাক্সি ঠিক ক'রে আমাদের সরবোর্ণ অঞ্চলে অর্থাৎ প্যারির ইউনিভার্সিটি পাড়ায় একটি হোটেলে নিয়ে গেলেন আর বললেন, পরদিন সকালে এসে আমাদের গ্রাৎস্-এ নিয়ে যাবেন। তিনি চলে যাওয়ার পর আমরা একটি রেস্তরাঁয় গিয়ে রাত্রির খাওয়া সেরে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে উঠে স্নান ও প্রাতরাশ সেরে তৈরী হতেই দেখি পূর্বদিনের সেই মেয়েটি এসে উপস্থিত। তারপর আমাদের নিয়ে স্টেশনে গেলেন ও একটি ট্রেনে চড়ে আমরা গ্রাৎস্ চললাম। অল্প সময়েই পঁচিশ মাইল ট্রেন যাত্রা শেষ হ'ল। আমরা গ্রাৎস্-এ এসে, ট্রেন থেকে নেমে গ্রামের পথ ধরে আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গ্রামের সবুজ গাছপালা ও ঘাসে-ঢাকা মাঠ—আমাদের দেশেরই মতো। কেবল বাড়িগুলি একটু স্বতন্ত্র ধরনের এবং রাস্তাঘাটগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আশ্রমের সাদা বাড়িটি সবুজ ঘাসে ঢাকা বিরাট লনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ লনের এখানে সেখানে গোলাপের ঝাড়। অন্য নানা ফুলগাছের ঝোপ। সব গাছে রকমারি রঙের ফুল ফুটেছে। আর সেই

দিনটিও ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল; তাই সবুজ মাঠ, সাদা বাড়ি সবই রৌদ্রকিরণে ঝলমল করছিল। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখি বিরাট বিরাট হল; সবই সুসজ্জিত। সুসজ্জিত প্রাসাদটিই জমিদার আশ্রমের জন্য দান করেছেন।

আশ্রমে পৌঁছে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে প্রণাম করলে তিনি আমাদের দোতলায় ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমেই ঠাকুরঘর। সিংহাসনের উপরে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবি বসানো আছে। আর অজস্র গোলাপ দিয়ে সিংহাসন ও ছবিগুলির অর্ধেক ঢাকা। ফুলদানিতেও প্রচুর ফুল রাখা হয়েছে। দু-পাশে ধূপকাঠি জলছে। মনে হ'ল ঠিক যেন ভারতবর্ষের কোন ঠাকুর-ঘরে এসেছি!

প্রণাম ক'রে আমরা নীচে নেমে এলাম। সিদ্ধেশ্বরানন্দজী বললেন, এখানকার সব কাজ আশ্রমের ছেলেরাই করে। ঠাকুরঘর ধোয়া-মোছা, ঠাকুর সাজানো, ধূপ জেলে দেওয়া ইত্যাদি তো করেই, এই বিরাট বাড়িটি পরিষ্কার রাখা, রান্না করা, কাপড় কাচা, ইত্যাদি সব কাজই এরা নিজেরা করে। আবার ভারতীয় সাধুদের মতো ধ্যান জপ ক'রে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করছে। তিনি আরও বললেন, এরা ঠাকুর স্বামীজী ও মাকে তো মানেই, আমাদের দেশের 'বিষ্যুদ'বারটি পর্যন্ত মানে,—ঠাকুর ও মা মানতেন যে! ঠাকুর-স্বামীজীকে এরা এত ভালবাসে যে, তাঁদের দেশের সবই এদের প্রিয়। সুদূর বিদেশে এসে এরূপ একটি আবহাওয়া পাওয়া আশার অতীত। আমাদের মনে হ'ল যেন দেশেই এসে গেছি!

তারপরে আশ্রমের একটি যুবক আমাদের আশ্রমটির সব দেখালে। তার কাছেই জেনেছিলাম যে, ভক্ত ফরাসী জমিদারটি সুসজ্জিত প্রাসাদটিই আশ্রম করার জন্য দান করেছেন। তারপর আমাদের খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। খাবার-টেবিলে ভারতীয় এবং ফরাসী রান্না করা নানা প্রকারের খাদ্য সাজানো ছিল। দইকারী, বিন-ভাজা, পায়েস, পুডিং ইত্যাদি। তখন আশ্রমে দুইটি দম্পতি অতিথি ছিলেন: জেনিভার অধ্যাপক (Professor of medicine) ও তাঁর স্ত্রী; আর ছিলেন, স্টক্‌হল্‌মের বৈমানিক (Civil aviation Assistant controller) ও তাঁর স্ত্রী। শেষোক্ত ভদ্রলোকের অল্পদিন আগেই একমাত্র সন্তান মারা যাওয়াতে, তাঁর স্ত্রী খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাই শান্তিলাভের আশায় তাঁরা আশ্রমে এসেছেন এবং সপ্তাহ-দুই এখানে থাকবেন ঠিক করেছেন। আর জেনিভার প্রফেসর—তাঁর ক্লান্ত স্নায়ুকে আশ্রমের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় বিশ্রাম দেবার জন্য এসেছেন। তিনিও ৮।১০ দিন আশ্রমে থাকবেন। তা ছাড়াও সেদিন ঈস্টার ছিল ব'লে প্যারি থেকে বহু ভক্ত মেয়ে এবং পুরুষ আশ্রমে এসেছিলেন।

আমরা বারো চোদ্দ জন খাবার টেবিলে বসেছিলাম। সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর একপাশে আমি বসেছিলাম এবং আমার বাঁ পাশে জেনিভার প্রফেসর বসেছিলেন। পরিচয় করানো হয়ে গেলে জেনিভার প্রফেসর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবাসীরা কত বৎসর বয়সে যোগাভ্যাস করতে আরম্ভ করে, আমি তো শুনে অবাক্ হয়ে গেলাম। কি জবাব দেবো, বুঝতে পারছি না। এমন সময় সিদ্ধেশ্বরানন্দজী বললেন, 'বারো বৎসর বয়স থেকে, কারণ ঐ বয়সেই আমাদের উপনয়ন

হয়।' বিদেশে শিক্ষিত লোকেদেরও যে আমাদের দেশ সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত, কিরূপ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা—জেনে খুবই বিস্ময় বোধ হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশে একশ্রেণীর লোক আছে, যারা ভাবে ভারতীয়েরা অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও অসভ্য; আর একশ্রেণীর লোক ভাবে, ভারতবর্ষ যোগীর দেশ, সকলেই বুঝি যোগাভ্যাস করে। যাই হোক এইরূপ নানা আলোচনায় আহার-পর্ব শেষ হ'ল। ওরা রান্না বেশ ভাল করেছিল। আর ফরাসী মেয়েরা বিনুনী ক'রে খোঁপা বেঁধে খুব কাজ ক'রে বেড়াচ্ছিল।

খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে আমরা সকলে একটি বড় হলে সমবেত হলাম। সিদ্ধেশ্বরা-নন্দজী আমাদের সামনে একটি চেয়ারে বসে বাইবেল থেকে ক্রাইষ্টের 'পুনরুত্থান' বিষয়টি পড়ে শোনালেন, তারপর ব্যাখ্যা করলেন। পাঠ ফরাসী ভাষায়, ব্যাখ্যাও ফরাসী ভাষায়; তাঁর বলা খুব স্বচ্ছন্দ, ভাষাও খুব সহজ। আমাদের খুব ভাল লাগলো। পাঠ ও প্রার্থনার পরে আমরা উঠে এলাম। তখন সন্ধ্যা হ'তে আর বেশী দেরি নেই। আশ্রমের ছেলেরা ঠাকুরঘরে আলো দিতে ও আরতি করতে চলে গেল। আশ্রমের অতিথিরা লনে একটু বেড়াতে লাগলেন। আমরা এবং আরও যাঁরা প্যারি থেকে এসেছিলেন, সকলে আবার ট্রেনে প্যারি ফিরে গেলাম। গ্রাৎস্-এ একদিন, আমাদের অদ্ভুত ভাল লেগেছিল। ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবধারা, এত দূর দেশেও এই-রূপ ছড়িয়ে পড়েছে দেখে আরও আনন্দ হ'ল।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

Reminiscences of Swami Vivekananda—By His Eastern and Western Admirers. Published by Swami Gambhirananda, President, Advaita Ashrama, Mayavati, Almora, Himalayas. Calcutta Centre: Advaita Ashrama, 5, Dehi Entally Road, Calcutta 14. Pp 404; Price: Rs. 7·50.

আলোচ্য পুস্তকটিতে দেশবিদেশের ৩১ জন ভক্ত স্বামীজী সম্বন্ধে বিভিন্ন-সময়ে যে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা গ্রথিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে তাঁহার শিষ্য-শিষ্যাগণের পুণ্যস্মৃতিও অন্তর্ভুক্ত। এই সব স্মৃতিকথা ইতিপূর্বে 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটি স্মৃতিকথা মূলতঃ বাংলায় উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির অনুবাদও এ-গ্রন্থে সন্নিবেশিত। যাঁহারা স্বামীজীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, স্বামীজির পূত সঙ্গে যাঁহাদের জীবন রূপান্তরিত হইয়াছিল, যাঁহারা আধ্যাত্মিকতার আলোকে নিজেদের জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি একসঙ্গে এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণ—এই পুস্তক পাঠে একদিকে যেমন স্বামীজীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ করিবেন, অপরদিকে তেমনি দেশের ও জাতির নানা সমস্যার সমাধান পাইবেন। স্বামীজীর শতবার্ষিকীর পূর্বে প্রকাশিত এই পুস্তক স্বামীজীর জীবন ও বাণী বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

আবেদন

স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

অগণিত সাধুমহাপুরুষের জন্মভূমি ভারতবর্ষ ৯৮ বৎসর পূর্বে প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া জগৎকে মানব-জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য 'স্বামী বিবেকানন্দ' উপহার দিয়াছিল। বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৬৩ খৃঃ জানুআরি মাসে তিনি কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ছিল বহুমুখী— একাধারে দেশপ্রেমিক ও সন্ন্যাসী, জাতীয়তাবোধে পূর্ণ আবার আন্তর্জাতিক। দেশবাসীর সমক্ষে তিনি ভারতীয় কৃষ্টির সৌন্দর্য ও প্রাণশক্তি লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং উন্নতি ও বিকাশের নিজস্ব পথে জাতিকে পুনর্গঠনের মহৎ কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই বীর সন্ন্যাসীর উদাত্ত আহ্বানে ভারতের তন্দ্রাচ্ছন্ন আত্মা জাগিয়া উঠিল এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশিত করিল।

অধিকন্তু নূতন এক সভ্যতার ঊষাগম তাঁহার সত্য দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, যেখানে বিভিন্ন ধরনের কৃষ্টি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মিলিত হইবে, অথচ প্রত্যেকেরই সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ থাকিবে। এই সমন্বয়ের আদর্শ তিনি কেবল ভারতেই প্রচার করেন নাই, পাশ্চাত্যেও প্রচার করিয়াছিলেন ; ইহার দ্বারা তিনি বিভ্রান্ত মানবজাতিকে উন্নততর সভ্যতার পথনির্দেশ করিয়াছিলেন, যাহা জগতে শান্তি আনিতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে দূরতম স্থানেও এই মহান্ জগদ্গুরুর সঞ্জীবনী বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থির হইয়াছে যে, তাঁহার জন্মশতবর্ষজয়ন্তী (১৯৬৩ খৃঃ) জগতের সর্বত্র যথোপযুক্ত মর্যাদা-সহকারে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের জন্য একটি ব্যাপক কার্যসূচী কার্যকরী সমিতির সভায় গ্রহণ করা হইয়াছে।

অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীনে একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হইবে, ইহা হইতে লোকহিতকর কার্য এবং বৃত্তিগত ও শিল্প-সংক্রান্ত প্রণালীতে জনশিক্ষা ও বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যে সাহায্য করা হইবে। এই পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করিবার জন্য সাধারণ কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি ও কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হইয়াছে।

আমাদের হাতে সময় খুবই অল্প এবং সামনে কাজ অনেক। তাহা হইলেও আমরা আশা করি, এই মহান্ ভারত-সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তাঁহার অনুরাগী ব্যক্তিগণের সহৃদয় ও সক্রিয় সহযোগিতা দ্বারা জগতের সর্বত্র এই শতবার্ষিকী উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

সাধারণ কমিটির সভ্যপদ জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের নিকট উন্মুক্ত। সভ্য হইবার এককালীন চাঁদা অন্যূন মাত্র কুড়ি টাকা (২০৲), একই পরিবারের দুই ব্যক্তি সভ্য হইলে ত্রিশ টাকা (৩০৲) দিলেই চলিবে। ছাত্র-ছাত্রী এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মাত্র দশ টাকা (১০৲) দিয়া সভ্য হইতে পারিবেন। বৈদেশিকগণের জন্য তিন পাউণ্ড বা দশ ডলার। যাঁহারা শতবার্ষিকী তহবিলে পাঁচশত টাকা বা তদূর্ধ্ব দান করিবেন, তাঁহারা সাধারণ কমিটির পৃষ্ঠপোষক বলিয়া গণ্য হইবেন। পরিকল্পনাটি পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিতে হইলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

ভারতে ও ভারতের বাহিরে সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের নিকট আমরা আবেদন করিতেছি, তাঁহারা যেন সাধারণ কমিটির সভ্য হইবার জন্য নাম তালিকাভুক্ত করেন এবং শতবার্ষিকী তহবিলে মুক্তহস্তে দান করিয়া, উৎসবের সার্থক রূপায়ণে সাহায্য করিয়া স্বামীজীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধানিবেদন করেন।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইলে সাদরে প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে :

১। কোষাধ্যক্ষ, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া।

২। কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি ইণ্টালি রোড, কলিকাতা ১৪।

৩। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯।

৪। কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩।

৫। দি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ, A/c শ্রীবিবেকানন্দ সেন্টিনারি,
৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা ১

৬। দি সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ, A/c শ্রীবিবেকানন্দ সেন্টিনারি,
১০০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ১।

৭। ভারতের ও বাহিরের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে-কোন কেন্দ্র।

৮। সেক্রেটারি, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী, সুরফ্রিজ ভবন,
১৬৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৪।

স্বামী শঙ্করানন্দ (সাধারণ কমিটির সভাপতি)

স্যার বি. পি. সিংহরায়
মাদাম রোমাঁ রোলাঁ
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, মন্ত্রী (পশ্চিম বঙ্গ)
ডক্টর কালিদাস নাগ
শ্রীজি. বসু
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
স্যার এ. রামস্বামী মুদালিয়র

মাননীয় বিচারপতি পি. বি. মুখার্জি
শ্রীএম. এন. ব্যানার্জি, বার-এট-ল'
ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীবি. কে. দত্ত
শ্রীআর. এন. মজুমদার
স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (সম্পাদক)
প্রভৃতি

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

নিবেদিতা বিদ্যালয়, কলিকাতা : রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয় ও সারদা-মন্দিরের ১৯৫৯-৬১ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৯৮ খৃঃ প্রাথমিক কার্য শুরু হয়; ১৯০২ খৃঃ ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ খৃঃ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। ছাত্রী-সংখ্যা (প্রাথমিক বিভাগ সহ) ৭৩০। শিল্পবিভাগে বয়ন, সেলাই, খেলনা তৈরী, চামড়ার কাজ, মৃৎশিল্প প্রভৃতি শেখানো হয়। শিল্পবিভাগের ছাত্রী-সংখ্যা ৭৮। গ্রন্থাগারে ৬,৪৪৩ পুস্তক আছে; পাঠাগারে ৪টি সংবাদপত্র ও ১৬টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়।

সারদা-মন্দিরে শ্রীসারদা-মঠের ত্যাগব্রতে দীক্ষিতা ১৯জন কর্মী আছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, ত্যাগ ও সেবামূলক সেই আদর্শে এই বিদ্যালয়ের বিভাগগুলি পরিচালিত হইতেছে। ছাত্রীনিবাসের ৩৮ জন ছাত্রীর মধ্যে কয়েকজন বিনা খরচে ও আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ পায়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি এবং প্রধান উৎসব-দিনগুলি যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে বেদান্ত-অধ্যাপনা

আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের অন্তর্গত সহস্রদ্বীপোদ্যান (Thousand Island Park) গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের উপযোগী সুন্দর একটি স্থান। একটি ছোট পাহাড়—চারিদিকে ওক-বৃক্ষের শ্রেণী; এখানে আছে স্বামী বিবেকানন্দের ১৮৮৫ খৃঃ সাত সপ্তাহ যাবৎ অবস্থানের পুণ্য স্মৃতিধন্য একটি কুটির। কি এক উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় স্বামীজী এই সময় থাকিতেন, তাহা 'দেববাণী' (Inspired Talks) গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়। এইস্থানে স্বামীজী কয়েকজন অন্তরঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীকে 'দেববাণী' উপদেশ করিয়াছিলেন। এখানেই তিনি বিখ্যাত 'সন্ন্যাসীর গীতি' (Song of the Sannyasin) রচনা করেন এবং ভারতে তাঁহার কাজের জন্য অনেক চিন্তা করেন। অধিকন্তু এখানে তাঁহার নির্বিকল্প সমাধি হয়। পশ্চিম গোলার্ধে সেই জন্য এই স্থানটি সকল বেদান্তানু-রাগীর নিকট পবিত্র তীর্থ।

স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা যায়, এই স্থানে বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ধারা অব্যাহত থাকিবে। গত বৎসর দুই সপ্তাহ যাবৎ স্বামী নিখিলানন্দ এখানে একটি ছাত্রসঙ্ঘ পরিচালনা করেন ও 'বেদান্তসার' অধ্যাপনা করেন। এবারে গ্রীষ্মের সময় গত ২রা হইতে ১৫ই অগস্ট দুই সপ্তাহ যাবৎ তিনি উপনিষৎ হইতে নির্বাচিত অংশসমূহের ব্যাখ্যা করেন ২৬ জনের একটি ছাত্রসঙ্ঘে। এই সব ছাত্র দূর দূর অঞ্চলের অধিবাসী। তাঁহারা আসেন ম্যাসাচুসেটস্, মিশিগান, নিউজারসি, নিউইয়র্ক, ওহিও, পেনসিলভানিয়া, ভার্জিনিয়া ও কানাডা হইতে। কয়েকজন ছাত্র দুইদিন ধরিয়া মোটরে করিয়া এখানে আসেন। সকলেই বার্ষিক অবকাশের অধিকাংশ সময় পাঠাভ্যাসে নিয়োজিত করেন।

এই সময় ছাত্রগণ সকালে প্রায় দেড়ঘণ্টা উপনিষদের ব্যাখ্যা শুনিতেন এবং তাঁহাদের কোন প্রশ্ন থাকিলে তাহার সমাধান করাইয়া লইতেন। সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে (যে ঘরটিতে স্বামীজী থাকিতেন) সকলে সমবেতভাবে আরাত্রিকে যোগ দিতেন এবং পরে ভজন ও ধ্যানাভ্যাস করিতেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামী মাধবানন্দ গ্রীষ্মকাল কাটাইতেছেন, কয়েকজন ছাত্র তাঁহার পূত সঙ্গলাভের সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন।

তাঞ্জোরে বন্যার্ত-সেবা

জনসাধারণ অবগত আছেন, রামকৃষ্ণ মিশন তাঞ্জোর জেলায় বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে তিরুক্কাটুপল্লী ও থিরুভায়ার কেন্দ্র হইতে সেবাকার্য পরিচালনা করিতেছেন। মিশনের কর্মিগণ দুঃস্থ পরিবারগুলির অবস্থা দেখিয়াছেন, কোন কোন স্থানে তাঁহাদিগকে বুক-জলের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। নিম্নলিখিত জিনিসগুলি গত ৩০. ৭. ৬১ পর্যন্ত ১,৩৬৩ পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে:

নূতন শাড়ি	…	১,৭৩২
„ ধুতি	…	১,৫৬৭
„ তোয়ালে	…	১,৫৬১
„ মাদুর	…	৭৭৩
„ পোষাক (শিশুদের)		৮৮৭
পুরাতন জামা-কাপড়		২,০০০

সাহায্য গ্রহণকারীদের মধ্যে বহুসংখ্যক মুসলমান ও খৃষ্টান আছেন, সকল প্রার্থীকেই সমভাবে দেখা হইতেছে এবং সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

সহৃদয় জনসাধারণ ও বন্ধুবর্গকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হইতেছে, তাঁহারা যেন 'ম্যানেজার, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ ৪'—এই ঠিকানায় সাহায্য প্রেরণ করেন। যে কোন প্রকার সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে এবং প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ডাঃ সুবোধ মিত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কলিকাতা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিট্যুটের ডিরেক্টর ডাঃ সুবোধ মিত্র গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভিয়েনায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজিক্যাল সম্মেলনে গিয়াছিলেন। ডাঃ মিত্র ১৯৪৫ খৃঃ হইতে সিণ্ডিকেট ও সেনেটের সদস্য এবং পরে উপাচার্যরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। মৌলিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কলেজ (College of Basic Medical Sciences) প্রতিষ্ঠার কার্যে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার নিকট ঋণী। RWAC প্রতিষ্ঠানেরও তিনি সংগঠক ছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার সময়ে তাঁহার সেবা উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও অস্ত্রোপচারে তাঁহার খ্যাতি ছিল পৃথিবীব্যাপী। তাঁহার মৃতদেহ বিমানযোগে দমদমে আনা হয় এবং শোভাযাত্রা সহকারে কেওড়াতলা শ্মশানে লইয়া গিয়া বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সৎকার করা হয়।

এই বিখ্যাত চিকিৎসকের মৃত্যুতে চিকিৎসা-জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—এই প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

কার্যবিবরণী

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা : স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জনকল্যাণে রূপায়িত করিবার জন্য ১৯০২ খৃঃ স্থাপিত এই সমিতির ১৯৬০ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সোসাইটির কর্মধারা প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত : প্রচার, শিক্ষা ও সেবা।

আলোচ্য বর্ষে সাপ্তাহিক ধর্মসভায় গীতা, নারদীয় ভক্তিসূত্র, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি আলোচিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপন করা হয়। বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে তাঁহাদের জীবনী আলোচিত হইয়াছিল। সমিতি-ভবনে সভ্যগণ কর্তৃক পূর্বপূর্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীশ্রীকালী-পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সোসাইটির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ১১,৪৮৯ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং সাহায্য ভাণ্ডার হইতে ৭ জন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে ১৩৮৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়।

গ্রন্থাগারে নির্বাচিত ৪,৯০০ পুস্তক আছে, আলোচ্য বর্ষে ২,৮১৫ পুস্তক গ্রাহকগণকে পড়িবার জন্য দেওয়া হয়। পাঠাগারে ১৮টি পত্র-পত্রিকা নিয়মিত লওয়া হইয়াছে।

পরবর্তী সংবাদ : প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ স্মৃতি-ভবন নির্মাণ-কল্পে গত ৩রা জুলাই কলিকাতা ১৫১, বিবেকানন্দ রোডে প্রায় ৪৷৷০ কাঠা জমি কেনা হইয়াছে। গৃহ নির্মাণের জন্য সোসাইটি জনসাধারণকে আবেদন জানাইতেছেন।

জনসংখ্যা

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ (U N O) কর্তৃক সংকলিত পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে, আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে বোম্বাই নগর পৃথিবীর দশটি বৃহত্তম নগরের অন্যতম। টোকিও এই সকল নগরের মধ্যে বৃহত্তম ; উহার আয়তন ১,৮৮৫ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ১,১৩,৭০,০০০। নিউইয়র্ক, মস্কো, পিকিং, সাংহাই এবং লণ্ডন এই সকল বৃহৎ নগরের তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিসংখ্যানবিদ্‌গণের মতে পৃথিবীর যে চারটি দেশে শিশুমৃত্যু সর্বাপেক্ষা অধিক, সিকিম তাহাদের অন্যতম। তথায় যে সকল শিশু জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদের প্রতি ১,০০০-এর মধ্যে ২০০টি শিশু তাহাদের প্রথম জন্ম-তিথির পূর্বেই মারা যায় ; ভারতবর্ষ, টাঙ্গানিকা, তিউনিসিয়া ও ব্রাজিলে প্রতি ১,০০০ শিশুর ১৫০-এরও বেশ কিছু বেশী মারা যায়। ভারতবর্ষে প্রত্যাশিত জীবনকাল পুরুষদের পক্ষে ৩২'৪৫ বৎসর এবং স্ত্রীলোকদের পক্ষে ৩১'৬ বৎসর।

বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতবর্ষের মতো খুব কম দেশই আছে, যেখানে স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যাশিত জীবনকাল পুরুষদিগের জীবনকাল অপেক্ষা কম। সিংহল ও কাম্বোডিয়ার অবস্থাও অনুরূপ। অতিরিক্ত হারে প্রসূতি-মৃত্যু স্ত্রীলোকদিগের অধিক সংখ্যায় মৃত্যুর অন্যতম বিশিষ্ট কারণ বলিয়া মনে করা হয়।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৎসরে কমপক্ষে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। সমগ্র পৃথিবীর গড়-পড়তা জন্মহার হাজারপ্রতি ৩৬ জন এবং মৃত্যুহার হাজারপ্রতি ১৯ জন।

ইওরোপ অপেক্ষা এশিয়ায় দ্বিগুণহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন এশিয়ায় বাস করে, অথচ পৃথিবীর ভূভাগের শতকরা মাত্র ২০ ভাগ এশিয়ার অন্তর্গত। (সংকলিত)

চলচ্চিত্রে আমেরিকা পরিক্রমা

গত ২১শে সেপ্টেম্বর রঞ্জি স্টেডিয়ামে নবনির্মিত জিওডেসিক ছাউনির ভেতর U S I S-আয়োজিত 'সার্কারামা'র প্রথম প্রদর্শনী যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি আনন্দদায়ক। এ এক নতুন ধরনের চলচ্চিত্র, ছাউনির মধ্যে চারিদিকেই চলচ্চিত্রের ১১ খানি শুভ্রপট ৩৬০° ঘিরে রয়েছে! দর্শকগণ বুঝতেই পারছেন না কোনটিতে কি দেখানো হবে।

হঠাৎ শুরু হ'ল ক্যামেরার যাদুকর ওয়াল্ট ডিজনীর 'সার্কারামা' (circarama) চারিদিকে ছবির স্রোত! প্রথমে বোঝা যায় না কোনটি দেখব, আর কোনটি বাদ দেবো, ধীরে ধীরে বোঝা যায়—সামনেই এগিয়ে যেতে হবে! মনে হয়, দর্শকেরাই চলেছে চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আগিয়ে, সামনের দৃশ্যই পেছনে মিলিয়ে যাচ্ছে, যেমন চলমান যানের মধ্য থেকে দেখা যায়।

'দর্শক যাত্রীদল' প্রথমে চলেছে যেন স্টীমারে নিউইয়র্ক বন্দর অভিমুখে তারপর সেই আকাশচুম্বী সৌধাবলী-শোভিত মহানগরী দেখে দর্শকদের 'মোটর' যেন চলেছে রাজধানী ওয়াশিংটন, শান্ত পল্লী-অঞ্চল পার হয়ে কর্মব্যস্ত শিল্পনগরী, শিক্ষাকেন্দ্র, পশুচারণের নির্জন প্রান্তর, ফসলে ভরা শস্যক্ষেত্র দেখতে দেখতে দর্শকেরা যেন বিমানবাহিত হয়ে এসে পৌঁছয় গ্র্যাণ্ড কেনিয়নের ওপর, তারপর দেখা যায় পশ্চিম উপকূলের তোরণদ্বার স্যানফ্রান্সিকো, গোল্ডেন গেট ব্রিজও বাদ যায় না।

এক অপূর্ব অনুভূতি নিয়ে ২৫ মিনিটে ২৫,০০০ হাজার মাইল ভ্রমণ শেষ ক'রে দর্শকগণ বেরিয়ে আসেন কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামের প্রাঙ্গণে! নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কলকাতার এ প্রদর্শনী থাকবে, আশা করা যায়—সকলেই দেখবার সুযোগ পাবে।

বিজ্ঞপ্তি

কার্ত্তিক মাসের 'উদ্বোধন' মাসের শেষ সপ্তাহে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নিকট পৌঁছিবে। তখনও না পাইলে পত্রদ্বারা জানাইবেন।

—কার্যাধ্যক্ষ

রাত্রিসূক্ত

[কুশিক ঋষি, রাত্রি দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ

ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ
বিশ্বা অধি শ্রিয়োহধিত ॥ ১ ॥
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২ ॥
নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী।
অপেদুহাসতে তমঃ ॥ ৩ ॥
সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি।
বৃক্ষেণ বসতিং বয়ঃ ॥ ৪ ॥
নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫ ॥
যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয়স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬ ॥
উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয় ॥ ৭ ॥
উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮ ॥

দেশে দেশে
দীপ্তিক্রীড়াময়ী
নেমে আসে রাত্রি ধরাতলে—
নক্ষত্রনয়না দেবী
সর্বশ্রীধারিণী ॥ ১ ॥
অমরা এই রাত্রিদেবী
নেমে আসে দিবলোক হ'তে—

তমসা-পূরিত করি
অন্তরীক্ষ দেশ,
আবরে সে স্বীয় তেজে
বৃক্ষ গুল্ম লতা—
ঊর্ধ্বগতি, নীচগতি সবে।
নক্ষত্র-আলোকে
বাধে পুনঃ সেই তমসারে ॥ ২ ॥

ভগিনী উষারে
রাঙাইয়া প্রকাশে সে
নিশাশেষে অরুণের রাগে।
দূরে যায় নৈশ অন্ধকার ॥ ৩ ॥
আগত এক্ষণে রাত্রির সে যাম—
বিশ্ববাসী নিদ্রাতুর সবে।
হে রাত্রিদেবতা,
প্রসাদে তোমার—
বৃক্ষনীড়ে সুখসুপ্ত বিহঙ্গম সম—
সুখসুপ্তি লভি যেন মোরা ॥ ৪ ॥
কর্মক্লান্ত দিবসের শেষে
ফিরিয়াছে গৃহে গৃহে গ্রামবাসী সবে,
নিয়েছে আশ্রয় তারা সুষুপ্তির ক্রোড়ে।
সুপ্ত—গাভী, অশ্ব, পক্ষী সব।
দ্রুতগতি শ্যেন—
সেও সুপ্ত ॥ ৫ ॥
রাত্রি সুগভীর।
হানা দেয়
আরণ্যক হিংস্র বৃক বৃকী ;
হানা দেয়
পরধন-অপহারী তস্করের দল।
হে রাত্রিদেবতা,
আমা সবাকার থেকে
দূরে রাখ
বৃক বৃকী, তস্করের দলে।
সুতরা মোদের হও তুমি দেবী ॥ ৬ ॥
সকল বস্তুতে
দৃঢ়লগ্ন অন্ধকার।
কৃষ্ণ বর্ণ তার
প্রকটিত স্পষ্টরূপে।
সেই অন্ধকার
আসন্ন আমার কাছে এবে।
হে উষা আলোকময়ী,
দূর কর এই অন্ধকার—
অবাঞ্ছিত ঋণ সম ॥ ৭ ॥
পয়স্বিনী গাভারে যেমন
দোগ্ধা জানায় তার
দোহন-প্রার্থনা—
এ স্তুতি তোমার কাছে
হে রাত্রিদেবতা,
জানায় প্রার্থনা মোর।
আগত হবন-কাল।
শত্রু জয় লাগি,
হে সূর্য-দুহিতা,
হুত মোর এই হবি—
এই স্তুতি সম—
কর এ গ্রহণ ॥ ৮ ॥

[বঙ্গানুবাদ : শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী]

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

জাতীয়সংহতি-সম্মেলন

যে কোন কারণেই হউক, জাতীয় সংহতি (National integration) লইয়া নানাভাবে চিন্তা ও আলোচনা শুরু হইয়াছে। অনেকের ধারণা বুঝি বা ভারতের পূর্বে পশ্চিমে বা দক্ষিণে কোথাও ভাঙনের কোন লক্ষণ দেখা দিয়াছে, তাই এই প্রশ্ন আজ এত বড় করিয়া জাতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমাধান দাবি করিতেছে। যদিও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ-বিভাগ, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ-বিভাগ, রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভারতের দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছে ভারতবাসীর মন কিন্তু এ সকলের ঊর্ধ্বে সর্বদাই একটা একত্বের উপাসক। সেই অন্তর্নিহিত একত্ব আজ বাহিরের জীবনে প্রতিফলিত করিতে না পারিলে, ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠভাব অদ্বৈততত্ত্ব আজ সমাজ-জীবনে রূপায়িত করিতে না পারিলে ভারতবাসীর মহৎ জীবনাদর্শ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে মাঝে মাঝে জাতির সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এই আহ্বান আসিয়া থাকে। অন্তরের ও বাহিরের শক্তির সংঘাতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। জাতির ঐতিহ্য-প্রসূত প্রতিভা ও শক্তিশালী নেতা যদি সমসাময়িক সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হন, তবেই জাতি সে যাত্রা বাঁচিয়া যায়, নতুবা জাতীয় জীবন ভূলুণ্ঠিত হইয়া পরবর্তী উত্থানের অপেক্ষা করে, আর যেখানে জাতীয় জীবনের নূতনতর বিকাশের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না— সেখানে সে জাতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমরা কি আজ সেইরূপ কোন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি?

স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত একটি চিন্তাই প্রবল ছিল। কি করিয়া বিদেশী শাসনের নাগপাশ হইতে দেশ-জননীকে মুক্ত করা যায়। যে ভাবেই হউক, যে অবস্থাতেই হউক বিদেশী শাসন সরিয়া গেল, জাতি যেন সুপ্তোত্থিত রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো জাগিয়া উঠিল— তাহার সকল শুভাশুভ সংস্কার লইয়া। দেশ-বিভাগের ফলে সাম্প্রদায়িক শক্তি কিছুটা স্তিমিত হইলেও ভাষা লইয়া বিরোধই আজ বড় করিয়া দেখা দিয়াছে। সেই সমস্যার সমাধান আজ একান্ত প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক বিরোধের সময় যেমন ভাষাবিরোধের সময়ও তেমনি— রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-লাভই উদ্দেশ্য, কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা-লাভের মধ্যেই আর্থনীতিক ও অন্যান্য উন্নতিলাভের আশা নিহিত। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সংখ্যায় যাহারা বেশী, তাহারাই ক্ষমতা লাভ করিবে, অতএব আজ সর্বত্র সেই চেষ্টাই চলিতেছে। ইহাতে সংখ্যালঘুগণ অধিকার-বঞ্চিত হইতেছে এবং এইখানেই জাতীয় জীবনে ফাটল ধরিয়াছে।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দেই শ্রীদেশমুখের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাণ্ট কমিটির একটি আলোচনা-চক্রে (U. G. C. Seminar) প্রশ্ন উত্থাপিত হয়: শিক্ষার বিভিন্নস্তরে কি মাধ্যম হইবে? জনগণ যেন মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত না হয়। আবার

সারা ভারতে সকলের বোধগম্য এবং ব্যবহার্য একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তাও বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছে। সংবিধানে হিন্দীকে সেই ভাষার সম্মান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু একদিকে হিন্দী ভাষাভাষীদের যথাশীঘ্র সর্বত্র হিন্দী চালু করিবার প্রবল আগ্রহ, অন্যদিকে অনেকের ইংরেজীকে সর্বভারতীয় ভাষারূপ চালু রাখিবার ইচ্ছা আর এক বিরোধের আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে।

আভ্যন্তরীণ এই বিরোধ দূর করিয়া জাতিকে সুসংহত করিবার চেষ্টায় কংগ্রেস জাতীয় সংহতি-কমিটি (National Integration Committee) স্থাপন করিয়া ব্যাপারটি সব দিক দিয়া বিবেচনা করিতে বলেন। তাঁহাদের প্রস্তাবে গত মে, জুন ও অগস্ট মাসে বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিগণ মিলিত হইয়া আলোচনা করেন. সেখানেও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হয়, —বিশেষত ১৯৫৬ খৃঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আশ্বাস কার্যকর করিতে বলা হয়।

সম্প্রতি ভাষাভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি জাতির সংহতি বিষয়ে আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিয়াছে; মনে হয় তাহারই প্রতিকারকল্পে জাতীয় সংহতি সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনের পূর্বেই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম সম্মেলন এবং পরেই আলিগড়ের হাঙ্গামা -অসাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন অধিকাংশ ভারতবাসীকে নিশ্চিন্ত হইতে দিতেছে না।

যাহাই হউক এই সংকট মুহূর্তে সর্বদলের সহযোগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন এক নূতন অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিবে, আশা করা যায়। কয়েকজন নির্দলীয় নেতা এবং মনীষীর উপস্থিতি সম্মেলনকে শক্তিশালী করিয়াছে। আহূত ব্যক্তিদের তালিকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, কয়েকজন বৈজ্ঞানিক, শিল্পনায়ক প্রভৃতি থাকায় সম্মেলনের ভিত্তি বিশাল হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকারী দলের প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ে, হয় তো ইহা অপরিহার্য।

এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের প্রারম্ভেই বিভিন্ন দেশহিতৈষী চিন্তানায়ক যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন দুঃখ করিয়া বলেন: জাতিভেদ-প্রথা আজ সমাজ ছাড়িয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, নির্বাচনী দ্বন্দ্বে বর্ণ-বৈষম্যকে লাগানো হইতেছে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ-গঠন যতই প্রয়োজনীয় হউক, উহা সমস্যাকে কঠিন করিয়াছে। হিন্দী সরকারী-ভাষারূপে গৃহীত হইলেও বর্তমান আন্তর্জাতিক মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে আমাদের ইংরেজী শিখিতেই হইবে। আঞ্চলিক ভাষার নামে ভারতকে আর ছিন্নভিন্ন করা চলিবে না।

'জাতীয় সংহতি' আলোচনার অন্যতম প্রবর্তক শ্রীদেশমুখ বলেন: রাজনৈতিক সংহতির অভাব না থাকিলেও দেশে একতাবোধের অভাব আছে—কর্তব্যবোধের অভাব আছে; উপযুক্ত শিক্ষাসহায়ে তাহা দূর করিতে হইবে।

নির্দলীয় সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ একটি নূতন সুর তুলিয়া বলেন: ভারতবাসীকে একটি আধুনিক জাতিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। আধুনিক জাতি বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতে তাহা কখনও ছিল না। লক্ষ লক্ষ মানুষ জানে না—জাতির প্রতি আনুগত্য বলিতে কি বুঝায়। আসাম ও জব্বলপুরের ঘটনা তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। এই সম্মেলনের ফলে যদি একটি সর্বসম্মত কর্মসূচী গৃহীত হয়, এবং

উহা কার্যে পরিণত হইতেছে কিনা, দেখিবার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই যথেষ্ট হইবে। শিক্ষাবিদ্ জাকির হোসেনের মতে রাজনীতিই সাম্প্রদায়িকতার জন্য দায়ী।

এই সম্মেলনে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিতে ভাষা ও লিপির ভূমিকা আলোচনা-প্রসঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, ইংরেজী ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা (National Language) বলিয়া ঘোষণা করা হউক। কিন্তু ইংরেজীর বিরুদ্ধে এবং হিন্দীর স্বপক্ষে বলেন কাকা কালেলকর ও শ্রীলোহিয়া। তাহাদের মতে ইংরেজী-ভাষাভাষীরা জনগণ হইতে পৃথক একটি শ্রেণীতে পরিণত হইতেছে।

ভাষার প্রশ্নের পর লিপির প্রশ্নের তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়; এ বিষয়ে তিনটি সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত হইয়াছে।

(১) প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে দেবনাগরী অক্ষরই সর্বভারতের সাধারণ লিপি বলিয়া অনুমোদিত হয়, তাহা এই সভায় অনেকেই অনুমোদন করেন।

(২) ইহার বিরুদ্ধে রোমীয় লিপি (ইংরেজী অক্ষর) প্রস্তাবিত হয়, কারণ দেবনাগরীতে সব ভাষার সব অক্ষর আসে না।

(৩) ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, রোমীয় লিপিতেও সব ভাষার সব অক্ষর বা ধ্বনি আসে না, অতএব ক্রমবিকাশের পথে নূতন কোন লিপি প্রবর্তন করিতে হইবে—যাহার দ্বারা সব ভাষার সব ধ্বনি ও অক্ষরকে প্রকাশিত করা যায়।

এ প্রসঙ্গে এ-কথাও চিন্তনীয়: লিপির ঐক্যকে এত বড় করিয়া দেখার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, রোমীয় লিপি ইওরোপকে বা আরবী লিপি মুসলিম জগৎকে কি ঐক্যে আবদ্ধ করিয়াছে?

শিক্ষার মাধ্যম আলোচনাকালে দেখা যায় প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা এবং মাধ্যমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষা (Regional language) যে মাধ্যম হইবে এ বিষয়ে সকলেই একমত; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা সম্বন্ধেই বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাই চলুক, কেহ বলেন আন্তর্জাতিক কারণে ইংরেজী মাধ্যম ছাড়া উচিত হইবে না, আবার কেহ বলেন, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দী প্রচলিত করা উচিত। মোটামুটি এই সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের 'তিন ভাষার ফর্মুলা' (3-language formula)-ই অনুমোদিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ছাত্রকে মাধ্যমিক স্তরে তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে—আঞ্চলিক, হিন্দী ও ইংরেজী। হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা তাঁহাদের একটি দাক্ষিণাত্যের ভাষা শিখিতে হইবে। ইহা দ্বারা ভাষাগত বিদ্বেষ দূরীভূত হইবে এবং ভাষাগত একটা সাম্য ও সংহতি স্থাপিত হইতে পারে।

সারা দেশের শিক্ষাব্যাপারে অধিকতর সামঞ্জস্য আনয়ন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে একটি সর্বভারতীয় শিক্ষা-বিভাগ (All India Education Service) স্থাপন করিবার এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (National Academic Board) তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তক রচনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমাদের মনে হয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন-ব্যাপারে সরকারের পরোক্ষ নির্দেশই গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গল। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে কি ভাবে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়, সন্ধান লইয়া তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

ভারতে বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও ভাষার লোক আছে। কিন্তু সকলের মধ্যে একটি একত্ব রহিয়াছে! আবার রাজনৈতিক একত্ব সত্ত্বেও আঞ্চলিক অধিবাসীদের মনে একটি কেন্দ্রাতিগ

শক্তি (Centrifugal force) খেলা করিতেছে। এই উভয় ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জাতীয় জীবন চালিত করিতে হইবে। ধর্ম ও ভাষার প্রতি আনুগত্য অবশ্যই থাকিবে, কিন্তু উহা যেন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। জাতীয় স্বার্থের বোধ অবশ্যই একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার এবং উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারাই উহা জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত করিতে হইবে। অন্তরে একত্ব বোধ না করিলে বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসী কি করিয়া বোধ করিবে 'আমি ভারতবাসী'?

মেগাটন ও নিউট্রন বোমা বিস্ফোরণের আতঙ্কে মানুষ আজ বিপন্ন; আন্তর্জাতিক আকাশ আজ শুধু দুর্যোগের ঘনমেঘে নয়, বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় বিকীরণে সমাচ্ছন্ন। পৃথিবীর মানুষ এই বিপদের মুখে জীবন রক্ষা করিবার জন্য আজ এমনভাবে একীভূত হইতে চাহিতেছে, যেমনটি আর কখনও চাহে নাই। এ হেন বিশ্বজনীন বিপদের সময় আমরা কি আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া সমস্বার্থবোধ করিয়া জাতীয় সংহতিরক্ষার জন্য একমত হইতে পারিব না?

হইতে পারে এই সম্মেলন সকলের মনের মত হয় নাই, ইহার প্রতিনিধি নির্বাচন আশানুরূপ হয় নাই, একটি দলের প্রাধান্য স্পষ্ট লক্ষিত হয়; হইতে পারে যাহারা আজ সংহতি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদেরই মধ্যে সংহতি নাই, এমনও হইতে পারে তাঁহাদেরই কথা ও কাজ একদিন জাতিকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তথাপি জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

সম্প্রতি-কালের মধ্যে এতগুলি দেশপ্রেমিক, সমাজসেবক ও মনীষী মিলিত হইয়া দেশ ও জাতির কল্যাণকল্পে এত খোলাখুলিভাবে জাতীয় সমস্যার মৌলিক বিষয়গুলি আলোচনা করেন নাই। 'অসংহতির প্রকৃত কারণ'রূপ নগ্ন সত্যের সম্মুখীন না হইলেও এই সম্মেলন নানা কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ন্যূনতম সম্মতির সূত্র ধরিয়া যদি কিছু পরিমাণ চিন্তাও কার্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে দেশের অনেক দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত হইবে, এবং জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

চলার পথে

'যাত্রী'

মৃত্যুই কি জীবনের শেষ পরিণতি?—ভাবছিলাম এই কথাটাই সেদিন শ্মশানে দাঁড়িয়ে। পায়ের নীচে ঐ শ্মশানভূমি, পাশেই খরস্রোতা 'খরকাই' নদী বয়ে চলেছে। ভাদ্রের বর্ষার শেষ আশীর্বাদ নিয়ে খরকাই আজ সত্যি খরকায়া। ও-ধারে, ঐ দূরে মাথা তুলেছে টাটার কারখানা। সেখানেও বিলোল ধূম চিমনির মুখে—এখানেও বিলম্বিত ধোঁয়া চিতার বুকে। আর এই অদ্ভুত পরিবেশের মাঝে কেমন এক প্রচ্ছন্ন প্রেরণায়, মনের মধ্যে সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা জাগছে—মৃত্যুই কি জীবনের শেষ পরিণতি?

মৃত্যুর পরও যে জীবন, সে জীবনেও কি আমার এই প্রাণের অনুভূতি থাকে? থাকে কি তখনও এই ফেলে-যাওয়া জীবনের স্মৃতি-সম্পদ্। এই সুদূরের যাত্রায়, এই অজানায় পাড়ি দেওয়ার সময়েও, সেই দেহ-নিঃসম্পর্কিত মনেও কি চিন্তার চেতন-সত্তায় চৈতন্যের পরশ লাগে?

লাগে কি সেই মনেও—স্মৃতির হাতছানি, অজানার আহ্বান? কৃষ্ণ-বাঁশরীর যে টানে রাধা ছুটতেন সব ফেলে, সব ছেড়ে—সেই বাঁশরীর সঙ্গীত-সুষমার বিচিত্র প্রয়াসে কি ও-পারের বাঁশীর সুরগ্রামগুলি বাঁধা থাকে? কে জানে? নিজের মন এতে উত্তর দেয় না—মানস-ই একমাত্র তখন তাকে বোঝাতে প্রয়াস পায়। সর্বমানবলোকের কত কথাই না শোনায় তখন ঐ মানস—ঐ মনন-সত্তা, ঐ বিবেক—যাকে বিচারশক্তিও বলা যায়।

তাই ভাব-সাধনার মানসপটে ঐ সর্বমানবীয় প্রশ্ন নিয়ে কত আঁকজোক টানি। কত জীবনবাদের স্পন্দন তুলি। কত ঢেউ, কত তরঙ্গ বর্তমান মনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই কূলহারা ভেসে-হাওয়া অবস্থায় মনে হয় তট পাবো—তীরে উঠব। কিন্তু এই তটের আশ্বাস থাকলেও তার আগমন ঘটে কচিৎ। কেবল চিন্তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে, ঘূর্ণির পাকে পাকে জিজ্ঞাসাটা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এক সময় তাই চিন্তার সুতো কেটে দিই, তখন মনের লাটাইয়ের তত্ত্বের ঘুড়িটা আর ফিরে আসে না—অসীম অজানার আকাশে ঐ ঘুড়িটা তখন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা ক'রে লাট্‌ খেতে খেতে কোথায় ভেসে যায়—কে জানে?

বাস্তবপন্থী বলবেন, এত চিন্তা কেন? মৃত্যু তো তোমার দেহে ঘটছে প্রতি মুহূর্তেই। তোমার দেহের জীবকোষগুলির দিকে তাকাও—দেখবে যাদের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সমষ্টি নিয়ে তোমার এই দেহ, এই জীবন, এই প্রাণ-স্পন্দন টিকে রয়েছে। সেই জীবকোষগুলির কত সহস্র প্রতিদিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আবার প্রতিদিন কত শত নূতন কোষের প্রাণ উন্মেষিত হচ্ছে; কিন্তু কৈ, তুমি তো তাদের জন্য ব্যাকুল হও না। তোমার দৈনন্দিন জীবনের গতি যে তাতে একটুও যে ব্যাহত হয়, তাও তো নয়। বরং তুমি তোমার জীবনরূপ বিরাট্‌ সত্তাকে নিয়ে আদর্শের দিকে সমান ভাবেই এগিয়ে চলো। তেমনি এই মহাবিশ্বের তুলনায় ঐ জীবকোষ-সন্নিভ তোমার জীবদেহ-ধ্বংসে ঐ বিরাটের চিন্তার ও চলার কি আর বিপ্লব ঘটবে!

তাই তো জীবকোষের ধ্বংসে যেমন জীবন বেঁচে থাকে, তেমনি প্রাণী-জীবনের ধ্বংসেও ঐ মহাজীবনই—তথা অমরত্ব চিরদিনই টিকে থাকবে। আর ঐ অমরত্ব ঐ চিরন্তন সত্তাকে ধরা তো অমৃতত্ব। এই নির্বিরোধ অমরত্ব ছাড়া ভারত আর কিছুই চায়নি। এই কল্পনার মহোৎসবে ভারত তাই সুস্পষ্ট ক'রে বলেছে—'কিমহং তেন কুর্যাম্‌ যেনাহং নাহমৃতা স্যাম্‌' (যে জিনিস অমৃত দেয় না, তা নিয়ে আর কি ক'রব)। এবং ভারতের এই উক্তির বহু পরে পাশ্চাত্যের ভাব-নদীতে এর ফুট উঠেছে—'The light that never was on sea or land, the concentration and the poet's dream.'

এই অমৃত আস্বাদনের জন্য আমাদের ত্যাগ চাই। শ্মশান সেই ত্যাগের প্রতীক, বৈরাগ্যের অভীমন্ত্রের উৎসমুখ। পৃথিবীতে সব কিছুই ভয় দেখায়, কেবল বৈরাগ্যই মনে নির্ভীকতা এনে দেয় (সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌)। এই বৈরাগ্যের আবাসভূমি শ্মশান তাই ভয়ের জায়গা নয়, ভাবের জায়গা। ভয়ের জায়গা বরং ঐ লোহার কারখানাটা। যেখানে মানুষ যন্ত্রের কলকব্জার মতো কেবল automaton হয়ে কাজের মোহে বাঁধা পড়েছে। যেখানে মানুষের কৃত্রিম জীবনের জৈবসত্তাটাই বড়। চৈতন্যসত্তার চিন্তামাত্রও যেখানে পঙ্গু। যেখানে সর্বময় প্রেমের সেই অমৃতপরশ মেলে না। যেখানে ঐ নিশ্চেতনার

লৌহকারাগারে বাস করতে করতে কি-এক ছদ্ম-বৈরাগ্যে মানুষ সেই মহান্‌কে আস্বাদন করার স্পৃহাটুকুও হারিয়ে ফেলে। অথচ এই আনন্দ-আস্বাদনই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রুতিতে একে ঘিরেই ভারতের মহাবাণী উদ্বোষিত হয়েছে : প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ।

এই সর্বশ্রেষ্ঠকে পাবার জন্য হিমালয়ে ছুটতে হবে না—নিজের কর্মসংস্থাও ছাড়তে হবে না—কারণ এ তো সকলের মধ্যেই অনুস্যূত। শুধু সে যে আছে, সত্যই আছে, এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে নিজের মধ্যে ডুব দিলেই তাকে পাওয়া যাবে। তাইতো শাস্ত্র বলেছে : এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। কেবল কুকুর-শেয়ালের মতো নিজের জৈবদেহটাকে উপভোগের চিতায় তুলে একমুঠো ছাইমাত্রে পরিণত না ক'রে ঐ মহান্‌কে পাওয়া যায় এই বোধ—এই অপরোক্ষ অনুভূতিটুকু জাগিয়ে আনন্দসত্তার আস্বাদন-টুকু নিতে চেষ্টা কর, পথিক। আর এই চেষ্টার জন্যই তো তোমার মনুষ্যদেহ ধারণ। তাই বলি আর দেরি নয়— চল সেই পরাপ্রাপ্তির পথে, আস্বাদনের অপূর্বতায়। চল আর দেরি নয় —**শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ**।

কে জানে মায়ের খেলা !*

স্বামী বিবেকানন্দ

কে জানে—হয়তো তুমি ক্রান্তদর্শী ঋষি !
সাধ্য কার স্পর্শ করে সে অতল গভীর গহন,
যেখানে লুকানো রয় মা'র হাতে অমোঘ অশনি !

হয়তো পড়েছে ধরা উৎসুক করুণনেত্র শিশুর দৃষ্টিতে,
দৃশ্যের আড়ালে কোন ছায়ার সংকেত,
মুহূর্তে যা হ'তে পারে দুর্নিবার ঘটনাপ্রবাহ।
আসে তারা কখন কোথায়, মা ছাড়া কে জানে !

হয়তো বা জ্ঞানদীপ্ত মহান্ তাপস,
বলেছেন যতটুকু,
তারো বেশী পেয়েছেন প্রাণে।
কে জানে কখন,
কার হৃদি-সিংহাসনে
মা আমার পাতেন আসন।

মুক্তিরে বাঁধিবে কোন্ নিয়মশৃঙ্খলে,
ইচ্ছারে ফিরাবে তাঁর কোন্ পুণ্যবলে ?
সংসারের শ্রেষ্ঠ বিধি—খেয়াল তাঁহার,
ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান।

হয়তো শিশুর চোখে দিব্যদৃষ্টি জাগে,
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা পিতার হৃদয়,
হয়তো সহস্র শক্তি কন্যার অন্তরে
রেখেছেন বিশ্বমাতা—সযত্ন সঞ্চয়।

---

* *Who Knows How Mother Plays* কবিতার অনুবাদ : প্রণবরঞ্জন ঘোষ

স্বামীজীর একটি চিঠি

(মিস মেরী হেলকে লিখিত পত্রের অনুবাদ)

রিজলি ম্যানর*

৩০শে অক্টোবর, ১৮৯৯

স্নেহের আশাবাদী ভগিনি,

তোমার চিঠি পেয়েছি। স্রোতে-ভাসা আশাবাদীকে কর্মে প্রবৃত্ত করবার মতো কিছু একটা যে ঘটেছে, তার জন্য আনন্দিত। তোমার প্রশ্নগুলি দুঃখবাদের গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছে, বলতে হবে। বর্তমান বৃটিশ ভারতের মাত্র একটাই ভাল দিক আছে, যদিও অজ্ঞাতে ঘটেছে—তা ভারতকে আর একবার জগৎমঞ্চে তুলে ধরেছে, ভারতের উপর বাইরের পৃথিবীকে চাপিয়ে দিয়েছে জোর ক'রে। সংশ্লিষ্ট জনগণের মঙ্গলের দিকে চোখ রেখে যদি তা করা হ'ত—অনুকূল পরিবেশে জাপানের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে—তা হ'লে ফলাফল ভারতের ক্ষেত্রে আরও কত বিস্ময়কর হ'তে পারত। কিন্তু রক্তশোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্য, সেখানে মঙ্গলকর কিছু হ'তে পারে না। মোটের উপর, পুরানো শাসন জনগণের পক্ষে এর চেয়ে ভাল ছিল; কারণ তা তাদের সর্বস্ব লুঠ ক'রে নেয়নি এবং সেখানে অন্ততঃ কিছু সুবিচার-কিছু স্বাধীনতা ছিল।

কয়েক-শ অর্ধশিক্ষিত, বিজাতীয়, নব্যতন্ত্রী লোক নিয়ে বর্তমান বৃটিশ ভারতের সাজানো তামাশা—আর কিছু নয়। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৬০ কোটি, এখন ২০ কোটিরও নীচে।

ইংরেজ-বিজয়ের কালে কয়েক শতাব্দী ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছিল, বৃটিশ শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপে ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, এবং তার চেয়েও ভয়ানক যে-সকল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, (দেশীয় রাজ্যে কখন দুর্ভিক্ষ হয়নি) তা লক্ষ লক্ষ লোককে গ্রাস করেছে। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে, কিন্তু মুসলমান শাসনের আগে দেশ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এখনও সেই সংখ্যায় পৌঁছয়নি। বর্তমান জনসংখ্যার অন্ততঃ পাঁচগুণ লোককে সহজেই ভরণপোষণ করার মতো জীবিকা ও উৎপাদনের সংস্থান ভারতে আছে—যদি সব কিছু তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া না হয়।

এই তো অবস্থা—শিক্ষাবিস্তার একরকম বন্ধ করা হয়েছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহৃত, (অবশ্য আমাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে অনেক আগেই), যেটুকু স্বায়ত্তশাসন কয়েক বছরের জন্য দেওয়া হয়েছিল, অবিলম্বে তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দেখছি, আরও কী আসে! কয়েক ছত্র সমালোচনার জন্য লোককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, বাকীরা বিনা বিচারে জেলে। কেউ জানে না, কখন কার ঘাড় থেকে মাথা উড়িয়ে দেওয়া হবে।

ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে চলেছে ত্রাসের রাজত্ব। বৃটিশ সৈন্য আমাদের পুরুষদের খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট করেছে, বিনিময়ে আমাদেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরেছে পেনসন ভোগ করতে। ভয়াবহ নৈরাশ্যে আমরা ডুবে আছি। কোথায় সেই ভগবান?

মেরী, তুমি আশাবাদী হ'তে পার, কিন্তু আমি কি পারি? ধর, এই চিঠিখানাই যদি তুমি প্রকাশ ক'রে দাও—ভারতের নূতন কানুনের জোরে ইংরেজ সরকার আমাকে এখান থেকে সোজা ভারতে টেনে নিয়ে যাবে এবং বিনা বিচারে আমাকে হত্যা করবে। আর আমি জানি, তোমাদের সব খ্রীষ্টান শাসক-সম্প্রদায় ব্যাপারটা উপভোগ করবে, কারণ আমরা যে 'হিদেন'। এর পরেও আমি নিদ্রা যাব, আর আশাবাদী থাকব? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশাবাদীর নাম নীরো (Nero)। হায়, সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা তারা সংবাদ হিসাবেও লেখবার উপযুক্ত মনে করে না। নেহাতই যদি দরকার হয়, রয়টারের এজেণ্ট এগিয়ে এসে 'আদেশ-মাফিক তৈরী' ঠিক উলটো খবরটি বাজারে ছাড়বে। হিদেন-হনন খ্রীষ্টানদের পক্ষে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত অবসর-বিনোদন। তোমাদের মিশনরীরা ভারতে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করতে যায়, কিন্তু ইংরেজদের ভয়ে সেখানে একটি সত্য কথা উচ্চারণ করতে পারে না; যদি করে, পরদিন ইংরেজেরা তাদের দূর ক'রে দেবে।

পূর্বতন শাসকেরা শিক্ষার জন্য যে-সব জমি ও সম্পত্তি দান করেছিলেন, সে-সবই গ্রাস ক'রে নেওয়া হয়েছে, এবং বর্তমান সরকার শিক্ষার জন্য রাশিয়ার চেয়েও কম খরচ করে,—আর সে কী শিক্ষা! মৌলিকতার সামান্য চেষ্টাও টুঁটি টিপে মারা হয়।

মেরী, আমাদের কোন আশা নেই, যদি না সত্যি এমন কোন ভগবান থাকেন, যিনি সকলের পিতাস্বরূপ, যিনি বলবানের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে ভীত নন, এবং যিনি কাঞ্চনের দাস নন। তেমন কোন ভগবান আছেন কি? কালেই তা প্রমাণিত হবে।

হ্যাঁ, আশা করছি—কয়েক সপ্তাহ পরে চিকাগো যেতে পারব এবং তখন সব কথা খুলে ব'লব।···

সর্ববিধ ভালবাসা-সহ সতত তোমার ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

পুনঃ—ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে '—' এবং অন্যান্য সম্প্রদায় কতকগুলি অর্থহীন সংমিশ্রণ; ইংরেজ প্রভুর কাছে আমাদের বাঁচতে দেবার প্রার্থনা নিয়ে এরা গজিয়ে উঠেছে। আমরা এক নূতন ভারতের সূচনা করছি—যথার্থ উন্নত ভারত, পরের দৃশ্যটুকু দেখবার অপেক্ষায় আছি। নূতন মতবাদে আমরা তখনই বিশ্বাসী, যখন জাতির তা প্রয়োজন এবং যা আমাদের পক্ষে যথার্থ সত্য হবে। অন্যদের সত্যের পরীক্ষা হ'ল 'আমাদের প্রভুরা যা অনুমোদন করেন'; আর আমাদের হ'ল, যা ভারতীয় জ্ঞানবিচারে বা অভিজ্ঞতায় অনুমোদিত হয়, তাই। লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে, '—' ও আমাদের মধ্যে নয়,···শুরু হয়েছে আরও কঠিন ও ভয়ঙ্কর শক্তির বিরুদ্ধে।

একতার সমস্যা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

১

ভারতবর্ষে একতার প্রশ্ন নিয়ে চারদিকেই রব উঠেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবিধ বিবরণ পড়ে যে-ধারণা একজন সাধারণ ব্যক্তির মনে জন্মায়, তা হচ্ছে এই যে, সকলেই যেন ভদ্রতার খাতিরে কিংবা অপর কোন উহ্য কারণে অনৈক্যের আসল হেতুটি মুখ ফুটে বলতে নারাজ, যেহেতু ওটা অত্যন্ত অপ্রিয় সত্য। একটি প্রবচন আছে, 'সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'। আচার্য-প্রফুল্লচন্দ্র ব'লে গেছেন যে এটাকে পালটে লেখা উচিত 'সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ব্রূয়াচ্চ সত্যমপ্রিয়ম্'। শৌখিন এবং মজলিশি ব্যাপারে অপ্রিয় সত্য না-বলার রীতি হয়তো চলতে পারে, কিন্তু যেখানে জীবনমরণ-সমস্যা, সেখানে শুধু অপ্রিয় বলার ভয়ে সত্যকে চেপে যাবার ন্যায় মূর্খতা আর কিছুই হ'তে পারে না। 'দুঃসময়ে সত্যকে চাপাচুপি দিতে যাওয়া প্রলয়ক্ষেত্রে বসিয়া ছেলেখেলা করা মাত্র।' (রবীন্দ্রনাথ)

বর্তমান যুগ, ধুয়ার (slogan-এর) যুগ। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে যাঁরা মহারথী, তাঁরা একটি ধুয়া কিংবা বুলি ধরিয়ে দেন, আর প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে সেই বুলি লক্ষবার, কোটিবার ধ্বনিত হ'তে থাকে,—যার ফলে মানুষের বিচারবুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যায় এবং কোনরূপ যাচাই না করেই তারা সেই বুলিকে সত্য ব'লে গ্রহণ করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান + সংবাদপত্র + রেডিও + দলগত-রাজনীতির সমবায়ে যে-কয়েকটি মারাত্মক বিপদ মানবজাতির সম্মুখে দেখা দিয়েছে, স্লোগান-আশ্রিত প্রচার হ'ল তাদের অন্যতম। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে; যা কিছু সেই বিচারবুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় অথবা বিনষ্ট করে, তা মানুষের পক্ষে নিতান্ত অকল্যাণকর। কারণকে দূর করা সম্ভবপর নয়, একমাত্র প্রতিকার জনসাধারণের পক্ষে নিজের চেষ্টায় বুদ্ধিকে সজাগ রাখা, এবং যে-কোন ধুয়া উঠুক, তাকে তন্ন তন্ন ক'রে বিচার করা। অনৈক্যের আসল কারণ-নির্ণয়ের পথ সুগম করবার জন্যে আমরা প্রথমে কয়েকটি চলতি ধুয়ার একটুখানি বিচার ক'রব।

২

একটি ধুয়া হচ্ছে 'Casteism'। এই জিনিসটি নাকি আমাদের পরস্পর রেষারেষির প্রধান কারণ। এমন কি আসাম থেকে বাঙালী-বিতাড়ন সম্পর্কে বড় বড় নেতারা আমাদিগকে শুনিয়ে আসছেন, অনর্থের মূলে তোমাদের ঐ 'Casteism'। 'Casteism'-এর কোন বাংলা প্রতিশব্দ কিংবা অনুবাদ খুঁজে পাচ্ছি না। Casteism বলতে কি বুঝায়, তার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা আমাদিগকে শোনানো হয়নি। Casteism বলতে যদি নিজের জাতের প্রতি অতিরিক্ত টান বুঝায়, তা হ'লে বাঙালী ব্রাহ্মণ ও অসমীয়া ব্রাহ্মণের নিশ্চয়ই বিভেদ ঘটত না; তারা অন্ততঃ এক হয়ে দাঁড়াত। Casteism বলতে যদি ছোঁয়াছুঁয়ির আতঙ্ক বুঝায়, অর্থাৎ নিজের শরীর এবং খানাপিনা সম্পর্কে স্পর্শদোষে

বিশ্বাস কিংবা স্পর্শদোষ মেনে চলা বুঝায়, তবে আসামের ব্যাপারে Casteism-এর কারণত্ব বুঝা দুরূহকর। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার নিয়ে এক দল আর এক দলের মাথা গুঁড়ো করতে চেয়েছে—এমন কোন ঘটনার কথা শোনা যায়নি। যদি বলা হয় যে, যারা পানাহারে স্পর্শদোষ মানে, তাদের মন স্বভাবতঃ সংকীর্ণ হয় এবং এই সংকীর্ণতা থেকে ভেদবুদ্ধি অন্যান্য দিকে প্রসারিত হয়, তবে প্রশ্ন জাগে এই যে, যে-সমস্ত 'শিক্ষিত' ব্যক্তি, স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, তারা সকলেই কি খুব গোঁড়া হিন্দু, এবং ছোঁয়াছুঁয়ি অত্যন্ত মেনে চলে? পানাহারে স্পর্শদোষ না মানলেই কি রাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষ খুব উদারচেতা হয়? যদি বলি যে, খানাপিনায় ছোঁয়াছুঁয়ি মানা-না-মানার উপর ধর্মবোধ এবং মনুষ্যত্ব নির্ভর করে না, তবে কি খুব বেঠিক বলা হয়? স্বর্গত মদনমোহন মালব্য মহাশয় ছোঁয়াছুঁয়ি মানতেন; আমরা অনেকেই মানি না। আমাদের স্বদেশানুরাগ, মনুষ্যত্ব এবং মানবপ্রেম কি তাঁর চেয়ে বেশী?

Casteism বলতে যদি বৈবাহিক আদান-প্রদানের নিষেধ বুঝায়, তবে প্রশ্ন আরও কঠিন। ভারতবর্ষের সকল জাতি সম্প্রদায় ও ভাষাভাষীর মধ্যে ব্যাপকভাবে বৈবাহিক আদানপ্রদানের রক্তমিশ্রণ যদি নেশন-গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়, তবে তার সম্ভাবনা কোথায় এবং ভারতীয় সংবিধানে তদুদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা হয়নি কেন? ইতিহাসের আদিম যুগে প্রভূত রক্তমিশ্রণ মানবসমাজে অবশ্যই ঘটেছিল; কিন্তু তৎপরবর্তীকালে, বিশেষতঃ মধ্যযুগের পরে ব্যাপক রক্তমিশ্রণ কোন দেশে ঘটেছে কি? হিন্দুসমাজের ভিতরে রক্তমিশ্রণে যে-সমস্ত আইনগত বাধা ও অসুবিধা ছিল, তা সমস্তই তো ইদানীং দূরীভূত করা হয়েছে। যদি উহাই যথেষ্ট না হয়ে থাকে, তবে তো এই মর্মে আইন করতে হয় যে, নিজ নিজ বর্ণ এবং সম্প্রদায়ের বাইরে ব্যতীত, ভিতরে আর কোন বিবাহ-সম্বন্ধ হতেই পারবে না। এরূপ আইন করা সম্ভবপর অথবা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হবে কি?

আর কোথাও না হোক, সুদূর অতীতে অন্ততঃ পূর্ব-ভারতে (আসাম, বাংলা, বিহার উড়িষ্যায়) জাতিমিশ্রণ যে খুব ব্যাপকভাবে ঘটেছিল, আমাদের বর্তমান চেহারা তার অকাট্য প্রমাণ। আবার এও নিঃসন্দেহে সত্য যে, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থানে এ অঞ্চলে জাতিভেদ দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। কেমন ক'রে জাতিভেদ ফিরে এল, এবং আমরা সত্বেও কেমন করেই বা আমরা সভ্য মানবরূপে এখনও পরিচিত রয়েছি—এগুলো কি ভাববার বিষয় নয়? যে বিশিষ্ট প্রণালীতে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতা বিস্তৃতি এবং স্থায়িত্ব লাভ করেছে, তার সঙ্গে কি এ সমস্ত ব্যাপারের কোন যোগাযোগ নেই? অতীতের মূলোচ্ছেদ ক'রে নেশন-গঠনের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত এবং শুভদায়ক হবে কি?

আর একটি মাত্র কথা ব'লে Casteism-এর প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। অবস্থার চাপে এবং অন্যান্য কারণে ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার খুবই হ্রাস পেয়েছে; স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অনতিকাল মধ্যে হিন্দুসমাজে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। তজ্জন্য বিশেষ কোন চেষ্টার দরকার হবে না। এই মরণোন্মুখ প্রথাকে আর ঠেঙাবার কোনই প্রয়োজন নেই। দেশের ভিতরে নূতন করে যে অনৈক্য

ও ভেদবিবাদ দেখা দিয়েছে, Casteism কিংবা জাতিভেদপ্রথা নিশ্চয়ই তার মূল কারণ নয়, এমনকি মুখ্য কারণও নয়, গৌণ কিংবা আংশিক কারণ কি না, তাতেও সন্দেহ। অনৈক্যের কারণ অন্যত্র।

৩

দ্বিতীয় একটি বুলি প্রচারিত হচ্ছে—Linguism. দেশের ভিতরে অনৈক্যের জন্য 'লিঙ্গুয়িজম'কে দায়ী করা হচ্ছে। কারা এই জিনিসটিকে আমদানি করেছে ও কাজে লাগাচ্ছে, তার স্পষ্ট উল্লেখ আমরা দেখতে বা শুনতে পাই না। দোষী করা হচ্ছে একটা ভাববাচক বিশেষ্যকে—একটা Abstract Noun-কে—কারণ এই পন্থা একদম নিরাপদ। Abstract Noun আমাদের মাথা গুলিয়ে দিতে পারে, কিন্তু ভাঙতে পার না।

Casteism-এর ন্যায় Linguism-ও অভিধান-বহির্ভূত শব্দ। সুতরাং এর মানে ধোঁয়াটে রাখার পক্ষে খুবই সুবিধা। Linguism-এর এক মানে হ'তে পারে ভাষার উপর অতিরিক্ত-মাত্রায় গুরুত্বের আরোপ। সম্প্রতি দেশের একজন সেরা মনীষী বলেছেন: ভাষা একটা তুচ্ছ জিনিস, এ নিয়ে বাদবিসংবাদের কোন অর্থ হয় না। খুব উঁচু স্তরে উঠে গেলে ভাষা-সম্পর্কেও হয়তো এ-কথা খাটে যে, এটা নিজের কিংবা পরের ভাষা, তা 'গণনা লঘুচেতসাম্'। কিন্তু আমাদের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধিতে খটকা লাগে, মাতৃভাষা কি নগণ্য জিনিস? যেমন মাতৃভূমির প্রতি, তেমন মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ, এবং উভয়ের জন্য চরম স্বার্থ-ত্যাগ কি গৌরবের বস্তু নয়? ভাষা যদি নগণ্য জিনিস হয়, তবে ভারতীয় সংবিধানে ভাষা-সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা এবং রক্ষাকবচই বা কেন?

Linguism বলতে যদি ভাষাভিত্তিক রাজ্য-গঠনের দাবির প্রতি কটাক্ষ বুঝায়, তবে তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই দাবি ভারতবর্ষের পনের আনা ভূখণ্ডে স্বীকৃত এবং কার্যকরী করা হয়েছে। যেটুকু অংশে করা হয়নি, সেখানে অসন্তোষের আগুন জ্বলছে।

Linguism মানে যদি Linguistic imperialism হয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে ভাষা-বিশেষের প্রচলন ও প্রতিপত্তি বাড়ানো বুঝায়, এবং ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানেরা যদি এবম্বিধ আচরণকে বস্তুতঃ দূষণীয় মনে করেন, তবে তাঁদের আচরণে এর কোন প্রমাণ পাই না কেন? এ-প্রকার অন্যায় যে দেশের কতক অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণেই চলেছে, সেন্সাস-রিপোর্টসমূহে তার বিস্তর সাক্ষ্যপ্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু তা নিবারণের চেষ্টা দূরের কথা, তার মৌখিক নিন্দাবাদ পর্যন্ত শোনা যায় না কেন? ঘটনাচক্রে, কিংবা চক্রান্তের ফলে যারা দুর্বল এবং সংখ্যালঘু, তাদের জন্যই সদুপদেশ: ভাষার প্রশ্ন তুচ্ছ ব্যাপার, এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। এও বলা হয় যে, তারা এবং তাদের ছেলেপিলেরা ৩।৪ টা ভাষা শিখে নেয় না কেন!

'Linguism অনৈক্যের ইন্ধন জোগাচ্ছে', এ-কথা বলার আগে Linguism কথার অর্থ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। বাক্যের ধূম্রজাল রচনার দ্বারা অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট কখনও হয় না। সাধারণবুদ্ধিতে আমরা এটুকু বুঝি যে, ভাষাকে উপলক্ষ্য ক'রে স্থানে স্থানে যে সংঘাত উপস্থিত হয়েছে, তার মূলে গভীরতর কারণ বিদ্যমান, উহা ব্যাধি নয়, ব্যাধির বাহ্য লক্ষণ। অনৈক্যের কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে।

৪

'Emotional integration' নামক আর একটি বুলি আজকাল খুব আওড়ানো হচ্ছে। এর বাংলা তরজমা করা যেতে পারে 'ভাবালুতার সাহায্যে একীকরণ কিংবা ঐক্যবদ্ধ হওয়া'। এ-প্রকার চেষ্টার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখেছিলাম, খিলাফৎ আন্দোলন উপলক্ষে। বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে ভাবালুতার আবেশে হিন্দুরা তখন মুসলমানের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল। তার ফল ফলতে দেরি হয়নি। প্রথম ঘটে মালাবারে হিন্দুদের উপর মোপলা বর্বরতার অভিযান, তার অল্পকাল মধ্যেই শুরু হয় নূতন উৎসাহে মুস্লিম-লীগের হিন্দু-বিদ্বেষী নীতি। Emotion-এর বন্ধুত্ব আসে আচমকা, তা আবার শত্রুতায় পরিণত হয় আচমকা। এর উপর জাতীয় ঐক্যের সৌধপ্রতিষ্ঠা শুধু বালু দিয়ে বাঁধ-রচনা।

৫

স্লোগানের আলোচনা ছেড়ে এবারে আসল কথায় আসা যাক। দিগ্বিজয়ী সম্রাটের অধীনে রাষ্ট্রিক একতা ভারতবর্ষে কয়েকবারই ঘটেছে; কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতিতে সমগ্র দেশব্যাপী এক শাসনের প্রতিষ্ঠা ইতিপূর্বে হয়নি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশের একত্ব-সংস্থাপন কিংবা একত্ব-সংরক্ষণের যে সমস্যা, তা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন। ইওরোপেরও গণতান্ত্রিক নেশন-রাষ্ট্র খুব বেশী দিনের নয়। ইওরোপের ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক দেশেই সুশাসক (Enlightened Despot) রাজার আমলে নেশন-রাষ্ট্রের কাঠামো প্রথমে গড়ে উঠেছে, দেশের একতা সুদৃঢ় হয়েছে; এবং হয় ধাপে ধাপে, নয় তো বিপ্লবের পন্থায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজ সমগ্র ভারতবর্ষকে এক শাসনরজ্জুতে বন্ধনপূর্বক একরাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। অপর দিকে ইংরেজী শিক্ষা ভারতবাসীর মনবুদ্ধির জন্যে এনেছিল এক নূতন মুক্তি,—তার সম্মুখে খুলে দিয়েছিল এক নূতন জগৎ। ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারের ফলেই ভারতবাসীর মনে জাগে স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এবং লোকে বুঝতে পারে যে, এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই প্রয়োজন। এই মনোভাব এবং অভিলাষকে যদি ইংরেজ সুনজরে দেখত, তবে সুশাসন ও ন্যায়বিচারের দ্বারা ভেদ-বিবাদের কারণগুলোকে ক্রমশঃ দূরীভূত ক'রে একটা দৃঢ়বদ্ধ একতা ইংরেজ এদেশে হয়তো গড়ে তুলতে পারত। একতার ভাব এবং চরিত্রবল যথেষ্ট পরিমাণে গড়ে উঠবার পর দেশে গণতন্ত্র চালু হ'লে তা থেকে অনিষ্ট জন্মাবার আশঙ্কা থাকত কম। কিন্তু ইংরেজ সে পথে গেল না। ইংরেজ যখন বুঝতে পারলে যে, নূতন রাজনৈতিক সাধনায় ভারতবর্ষ যদি সিদ্ধিলাভ করে, তবে ভারতবর্ষকে আর শোষণ করা চলবে না,—তখন দেশের সমস্ত ভেদ-বুদ্ধিকে প্রশ্রয় ও উস্কানি দিয়ে সে চাইলে একতার ভিত্তিমূলকেই বিনষ্ট ক'রে দিতে। সেই মনোবৃত্তি ও চেষ্টার চরম পরিণতি—দেশবিভাগ।

পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের একতা-সাধনে ইসলাম-ধর্মকে পাকিস্তান সর্বতোভাবে কাজে লাগিয়েছে। এর পরিণাম ভাল কি মন্দ, তার বিচার এখানে হচ্ছে না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, আমরা ও-পথে যাইনি। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমরা ধর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছি। সুতরাং ভারতবর্ষে নেশন-রাষ্ট্র গঠনের কাজে হিন্দুধর্মের দোহাই আমরা

পাড়তে পারব না। হিন্দুধর্ম বিভেদকেই প্রাধান্য দেয়, অথবা সর্বভূতে সমদৃষ্টি এবং সর্বত্র ঈশ্বরদর্শনকেই প্রাধান্য দেয়, সে সমস্ত তর্ক আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর এবং বৃথা।

জাতি (Race), ধর্ম এবং ভাষার একতা নেশনগঠনের পক্ষে অপরিহার্য না হলেও এগুলো প্রায় সর্বত্র নেশনগঠনে প্রভূত সাহায্য করেছে। কিন্তু আমাদের পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, ভারতবর্ষে এর কোনটির সাহায্যই আমরা পাব না। জাতির (Race) একতা ভারতবর্ষে অস্তিত্ববিহীন; ধর্মের একতাও তথৈবচ; ভাষার ঐক্যও ভারতবর্ষে অবিদ্যমান। প্রধান ভাষার সংখ্যাই চৌদ্দটি; অপ্রধান তো আরও অনেক বেশী। জাতি, ধর্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। সুতরাং বাধ্য হয়ে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব' (Unity in diversity), —এই নীতিকেই আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনের এবং নেশনগঠনের মূলনীতিরূপে গ্রহণ করেছি। এই নীতির উপরেই ভারতীয় সংবিধান গঠিত। 'বহুর মধ্যে এক বিরাজমান'—একমেবাদ্বিতীয়ম্ —এটিও হিন্দুধর্মের একটি প্রধানতত্ত্ব। সংবিধানে হিন্দুধর্মকে স্থান না দিলেও হিন্দু-ধর্মের এই তত্ত্বকে সীমিতভাবে ভারতের গঠনতন্ত্রের মূলনীতিরূপে আমরা গ্রহণ করেছি।

দেশের ভিতরে নানা বৈচিত্র্য আমরা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু একতার তত্ত্বটি তত পরিস্ফুট নয়। একরাষ্ট্রানুগত্যই আমাদের একমাত্র বন্ধনরজ্জু, এতদ্ভিন্ন আর কোন বন্ধন-রজ্জুই কার্যকরী হ'তে পারে না। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, দেশময় এক ধর্ম প্রচলিত করার চিন্তাকে আমরা স্থানই দিইনি। ব্যাপকভাবে রক্তমিশ্রণের দ্বারা দেশময় এক নূতন সঙ্কর-জাতির (Creation of a mixed race by extensive miscegenation) সৃষ্টি করাও অসম্ভব বলা বলে। অপর সমস্ত ভাষাকে তুলে দিয়ে কিংবা নগণ্য ক'রে দিয়ে শুধু একটিমাত্র ভাষাকে দেশময় চালু করা—তার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। এইজন্যেই বলছি যে, রাষ্ট্রানুগত্যই আমাদের একমাত্র বন্ধনরজ্জু হ'তে পারে; তার বেশী আর কোন একতার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই রাষ্ট্রানুগত্য যদি উপর থেকে আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয়, আমাদের অন্তরের সমর্থন তাতে না থাকে—তবে সেই আনুগত্য দ্বারা একতা কিছুতেই সাধিত হবে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই আনুগত্য প্রত্যেকের হৃদয় থেকে স্বতঃ উৎসারিত হওয়া চাই। রাষ্ট্রানুগত্য আপনা থেকে আসবে, যদি রাষ্ট্রের লক্ষ্য আমাদের প্রাণের জিনিস হয়, এবং যদি প্রত্যক্ষ দেখতে পাই যে, রাষ্ট্রপ্রধানেরা সেই লক্ষ্যাভিমুখে সত্যই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। রাষ্ট্র রাষ্ট্রিকের* প্রাণ পর্যন্ত দাবি করে। দেশরক্ষার জন্য সবাইকে সৈন্যদলে ডাকা যেতে পারে। তার বদলে রাষ্ট্রিকও রাষ্ট্রের মধ্যে নিজের জন্য একটা মহৎ আশ্রয়, আর দেশের জন্য একটা মহৎ লক্ষ্য, মহৎ সম্ভাবনা দেখতে এবং পেতে চায়।

---

*Citizen কথার প্রতিশব্দরূপে 'রাষ্ট্রিক' শব্দের ব্যবহার বাঞ্ছনীয় বলে ম'নে করি। প্রাচীন গ্রীসের City State থেকে Citizen কথার উৎপত্তি। State এখন আর City মাত্র নয়; Citizen কথা প্রচলিত থাকলেও তার অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাতে Citizenএর প্রতিশব্দরূপে 'নাগরিক' শব্দের ব্যবহার মোটেই যুক্তিযুক্ত কিংবা শোভন নয়। Citizen অর্থে 'রাষ্ট্রিক' শব্দের ব্যবহার অধিকতর যুক্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠু। যেমন 'নগর' থেকে 'নাগরিক', তেমনি 'রাষ্ট্র' থেকে 'রাষ্ট্রিক'। রাষ্ট্রের বাসিন্দারূপে বিবিধ অধিকার যে ব্যক্তি পেয়েছে এবং দায়িত্ব যার উপর বর্তেছে, সেই 'রাষ্ট্রিক'।

ভারতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি? সংবিধানের প্রারম্ভেই বড় বড় অক্ষরে তা লেখা রয়েছে। উদ্দেশ্য—প্রত্যেক রাষ্ট্রিক যাতে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি নির্বিবাদে ও নিশ্চিতরূপে পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা:

প্রথমতঃ—সামাজিক, আর্থিক, বার্তিক, ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার।

দ্বিতীয়তঃ—চিন্তায়, ভাবপ্রকাশে, মতবাদে, ধর্মবিশ্বাসে এবং পূজোপাসনায় স্বাধীনতা।

তৃতীয়তঃ—মর্যাদার এবং সুযোগ-সুবিধার সমতা। অধিকন্তু রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে, (উপর্যুক্ত জিনিসগুলির সাহায্যে) সমস্ত রাষ্ট্রিকদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিবর্ধিত করা, যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা এবং নেশনের একতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা-পরিচালনা ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্র হচ্ছে গবর্নমেণ্ট বা সরকার। অতএব সরকারের কর্তব্য–ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সাম্যের যে গ্যারাণ্টি অথবা প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক রাষ্ট্রিককে দেওয়া হয়েছে, সেই প্রতিশ্রুতির অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন। এ যদি না করা হয়, তবে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে দেশের একতা কখনও বজায় থাকতে পারে না। এ-সকল প্রতিশ্রুতি যদি সরকার কার্যে পরিণত করেন, তবে প্রত্যেক সজ্জন ব্যক্তি রাষ্ট্রকে তার প্রাণের জিনিস ব'লে মনে করবে, রাষ্ট্রের গৌরবে নিজে গৌরবান্বিত, রাষ্ট্রের উন্নতিতে নিজেকে উন্নত ব'লে জ্ঞান করবে। নতুবা রাষ্ট্র এবং শাসন-যন্ত্রকে সে মনে করবে একটি পেষণযন্ত্র, এবং ভাবতে বাধ্য হবে যে, তার মর্যাদা ও অধিকার হরণের জন্যেই সেই যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে একতার মূলোচ্ছেদ ঘটবে।

সরকারের কর্মকুশলতা, সততা, ন্যায়-পরায়ণতা ইত্যাদির উপর দেশের একতা বহুলাংশে নির্ভর করে। যেহেতু আমাদের মধ্যে জাতি ধর্ম এবং ভাষার বন্ধন অবিদ্যমান কিংবা শিথিল, অতএব আমাদের একতার জন্য সরকারের কার্যে এবং আচরণে এই সমস্ত সদ্গুণ যথাসম্ভব পূর্ণমাত্রায় থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভাষা, চাকরি ইত্যাদি সংক্রান্ত কতকগুলি ফর্মুলা, কিংবা শুধু বাগাড়ম্বর, সভাসমিতি, কমিটি-কমিশন, ইস্তাহার, প্রচারবুলি ইত্যাদি দ্বারা দেশের ভিতরে একতা রক্ষিত এবং বর্ধিত হবে, এ আশা নিতান্ত দুরাশা। প্রাদেশিকতা-সমস্যার, ভাষাসমস্যার এবং অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান অনায়াসেই হ'তে পারে, যদি রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা সাহস-সঞ্চয়পূর্বক সংবিধানের লক্ষ্য এবং মূলনীতি অনুযায়ী সুশাসন দেশে প্রবর্তিত করেন।

যেমন শিক্ষক, ছাত্র, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি সকলেরই আপন ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য আছে, তেমনি যাদের উপর দেশের শাসন পরিচালনার ভার ন্যস্ত, তাদেরও একটা ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য আছে। সেই ধর্মের নাম রাজ-ধর্ম। আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীদের মতে রাজধর্ম অপর সকল ধর্মের আশ্রয়; রাজধর্ম যথাযথ পালিত না হ'লে সকলেই নিজ নিজ কর্তব্যে অবহেলা করে এবং দেশ উচ্ছন্ন যায়। এ বিষয়ে মহাভারতের দুটি বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে আলোচনা সমাপ্ত করা যাক—

মজ্জেৎ ত্রয়ী দণ্ডনীতৌ হতায়াং
সর্বে ধর্মাঃ প্রক্ষয়েয়ুর্বিবৃদ্ধাঃ।
সর্বে ধর্মাশ্চাশ্রমাণাং হতাঃ স্যুঃ
ক্ষাত্রে ত্যক্তে রাজধর্মে পুরাণে॥
সর্বে ত্যাগা রাজধর্মেষু দৃষ্টাঃ
সর্বা দীক্ষা রাজধর্মেষু যুক্তাঃ।
সর্বে বিদ্যা রাজধর্মেষু চোক্তাঃ
সর্বে লোকা রাজধর্মে প্রবিষ্টাঃ॥

[—শান্তিপর্ব, ৬৩।২৮-২৯]

ভগিনী নিবেদিতার জীবনদর্শন

ডক্টর রমা চৌধুরী

[নিবেদিতা বক্তৃতা : পূর্বানুবৃত্তি]

এই প্রসঙ্গে সত্যই ভারতীয় ধর্মের একটি মূলগত প্রকৃতির কথা আমাদের মনে পড়ে। সেটি হ'ল এই যে, ভারতবর্ষে কোন দিনও যাকে বলা হয় 'Conversion',—অথবা অপরকে স্বধর্মে আনয়ন-প্রচেষ্টা—তার প্রাবল্য ছিল না। প্রায় সকল ধর্মেই 'Conversion' অথবা এরূপ প্রচেষ্টা ধর্মপ্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের একটি প্রধান উপায়রূপে পরিগণিত করা হয়। যথা, ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মে এটি একটি অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম-শিরোমণিগণের স্থির মত এই যে, হিন্দুধর্ম এরূপ একটি মহাপুণ্যশীল ধর্ম যে, বহু জন্মের বহু সুকৃতির ফলেই কেবল হিন্দু-পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রে হিন্দু হওয়া যায়, অন্য কোন উপায়ে নয়; সেজন্য হিন্দুধর্মে 'conversion'র কোন স্থান অথবা প্রশ্নই নেই। উপরন্তু যাতে বিধর্মীদের কলুষ-স্পর্শে হিন্দুধর্মের পবিত্রতা বিন্দুমাত্র ব্যাহত না হয়, সেই বিষয়েই আমাদের সর্বমনপ্রাণে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই ভাবে আদ্যন্ত কাল হিন্দুধর্ম 'সংরক্ষণের' প্রশ্নই কেবল উঠেছে, 'সম্প্রচারের' নয়।

নিবেদিতা এই সনাতন রীতির বিরুদ্ধেই আপত্তি উত্থাপন করছেন। সংরক্ষণের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা প্রধানতঃ প্রারম্ভে কেবল—পরিশেষে প্রয়োজন বরং সম্প্রসারণ। যখন বহু সঞ্চয় হয়ে যায়, তখন তা কেবল পুঞ্জীভূত ক'রে না রেখে বরং অকাতরে দান করাই কি শ্রেয়ঃ নয়? পুষ্পটি যখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তখন তার সৌন্দর্য স্বভাবতই দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করে, সৌরভ বিস্তৃত হয় দিকে দিকে; মধু আকৃষ্ট করে শত শত ভ্রমরকে। এ সব কি লুক্কায়িত ক'রে রাখা যায়?

একই ভাবে আজ হিন্দুধর্ম যুগযুগান্তব্যাপী সাধনা-তপস্যায় বহু সম্পদের অধিকারী। আজ তার কর্তব্য—মুক্তহস্তে দান করা, নিজেকে আচার-বিচারের অন্ধজালে আবৃত ক'রে না রেখে। কারণ দানেই তো সঞ্চয়ের পূর্ণ সার্থকতা।

অবশ্য এ স্থলেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সেটি হ'ল এই যে, যদি দান করবার সামগ্রী আমাদের থাকেই, তা হ'লে আমরা নিজেরাই অগ্রসর হয়ে উপযাচকরূপে অন্যদের উপরে তা চাপাতে যাব কেন? অন্যেরাই যদি আমাদের মহিমা উপলব্ধি ক'রে নিজেরাই আমাদের দাতব্য বস্তু গ্রহণ করেন, তা হ'লে তাই কি শতগুণে শ্রেয়ঃ নয়? সেক্ষেত্রে 'conversion'-এর প্রয়োজন কি?

নিবেদিতা স্থির বিশ্বাসভরে বলছেন যে, প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। যে নিষ্ক্রিয়, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ জীবনযাপনে আমরা—হিন্দুরা সাধারণতঃ অভ্যস্ত, তার যুগ আজ আর নেই। আজ কর্মের যুগ, গতির যুগ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। আজ সকলেই নিজ নিজ, পৃথক্‌ পৃথক্‌, ব্যাপারাদিতে সর্বদাই এরূপ ব্যস্ত যে, অপরের সম্পদ্‌লাভের জন্য সেরূপ আগ্রহ সর্বত্র লক্ষিত নাও হ'তে পারে। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে,

আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃততর হচ্ছে; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃততর হচ্ছে অপরের উপর নিজেদের প্রভাব-বিস্তারের প্রচেষ্টা। কারণ ক্রমশঃ ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি প্রাধান্যও বিস্তার লাভ করছে আধুনিক জগতের বর্তমান রীতি অনুসারে। এই কারণে আজ আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে প্রত্যেককেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে অপর সকলকে সেই ভাবে প্রভাবান্বিত করতে হবে।

এই আধুনিক নিয়মানুসারেই নিবেদিতা বলছেন, যখন এই হচ্ছে প্রচলিত প্রয়োজনীয় ধারা, তখন কেবল ভারতবর্ষই বা ব্যতিক্রম হবে কেন, পশ্চাতে পড়ে থাকবে কেন? সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, পা ফেলে তাকেও তো হ'তে হবে সমান সক্রিয়, সমান প্রচারশীল, সমান উৎসুক স্বীয় সম্পদ্-বিতরণের জন্য। এই জন্যই তিনি অত জোরেব সঙ্গে বলেছেন, 'Aggressive Hinduism'-এর বিষয়।

কিন্তু 'Aggressive' কথাটা আমাদের—ভারতীয়দের বিশেষ ভাল লাগে না। কারণ মনে হয় যেন, বাইরে থেকে জোর ক'রে মূল্যহীন কিছু অপরের উপর চাপানোর প্রচেষ্টা এতে আছে।

এই ধারণা ক্ষালনের জন্য নিবেদিতা বলছেন যে, দান হবে যোগ্যদান, আক্রমণের পশ্চাতে থাকা চাই সম্পূর্ণ যোগ্যতা— না তো এ সব বৃথা। এই জন্যই তিনি অতি সুন্দর-ভাবে বলছেন:

Point by point, we are determined not merely to keep what we had, but to win what we never had before. The question is no longer of other people's attitude to us, but rather of what we think of them. It is not how much we kept, but how much we have annexed. We can not afford now to lose, because we are sworn to carry the battle far beyond our remotest frontiers. We no longer dream of submission, because struggle itself has become only the first step towards a distant victory to be won. (p. 8)

—প্রত্যেক বিষয়ে যা আমাদের আছে, কেবল তাই রক্ষা করতেই যে আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প, তাই নয়; কিন্তু যা আমাদের নেই, তা অর্জন করতেও আমরা সমভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প। অন্যেরা আমাদের প্রতি কি ভাব-সম্পন্ন—তাই তো কেবল প্রশ্ন নয়; সেই সঙ্গে এও প্রশ্ন যে, আমরাও তাদের কি ভাবে দেখি। আমরা কতটা রক্ষা করেছি, তাই কেবল প্রশ্ন নয়; সেই সঙ্গে এও প্রশ্ন—আমরা কতটা লাভ করেছি। এখন পরাজিত হ'লে আমাদের চলবে না; কারণ আমাদের প্রতিজ্ঞা এই যে, আমরা দূরদূরান্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আমরা পরাজয় বরণ করবার কথা স্বপ্নেও ভাবব না, কারণ আমাদের এই যে যুদ্ধ, তা তো প্রথম সোপান মাত্র; আমাদের লক্ষ্য সুদূর ভবিষ্যতে জয় লাভ করা।

কত জোরের সঙ্গেই না নিবেদিতা বারংবার যুদ্ধের কথা বলছেন, জয়ের কথা বলছেন। বলাই বাহুল্য, এই যুদ্ধ দৈহিক যুদ্ধ নয়, আত্মিক যুদ্ধ। লোভের যুদ্ধ নয়, দানের যুদ্ধ। এতদিন আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, তা কেবল রক্ষণশীলতার অনড় অচল দৃষ্টিভঙ্গী যা আমাদের যুগযুগান্ত ধরে আছে, যা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি, তাই কেবল সযতনে রক্ষা করবার প্রচেষ্টা। এর ত্রুটি দুটি দিক্ থেকে। একদিক্ থেকে, আমরা অপরের

নিকট কোন কিছু গ্রহণ করতে পারি না। অন্যদিক্ থেকে আমরা অপরকে কোন কিছু দানও করতে পারি না। এ যেন একটি স্রোতোহীন পুষ্করিণী—কোন জলধারা এসে এতে পড়ছে না; কোন জলধারা এর থেকে বের হচ্ছে না। এরূপ গতিবিহীন জলাশয়ের গতি কি, তা আমরা জানি—পঙ্কিলতা। ভারত-সংস্কৃতি-পুষ্করিণীরও এই দুটি ত্রুটির বিষয় নিবেদিতা উপরের রচনাংশে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ-কথা সত্য যে, পুষ্করিণীর উদাহরণ এ স্থলে সম্পূর্ণ খাটে না, যেহেতু ভারত-সংস্কৃতির পঙ্কিলতার কোন লক্ষণ আজও দেখা যায়নি। এটি সত্য—এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ভারতের উত্থান-পতনশীল সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন দিনও এসেছে, যখন ভারত-সংস্কৃতির কদর্থ-বাষ্পে সমাজ-জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, তাতে অন্তর্নিহিত প্রকৃত শাশ্বত ভারত-সংস্কৃতির স্বাভাবিক পবিত্রতা ও মহিমার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

এই কারণে ভারতের অনুপম, অনবদ্য, ধ্বংসবিহীন সম্পদের বিষয় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেই, নিবেদিতা এ স্থলে অন্যদের নিকট গ্রহণ অপেক্ষা, অন্যদের দান করার বিষয়ই বারংবার অধিক জোরের সঙ্গে বলেছেন। গ্রহণের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে—সে বিষয়ে আর দ্বিমত কি? কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে—বর্তমানে তার অপেক্ষাও শতগুণ অধিক প্রয়োজন দান; অকাতরে দান, নিজে অগ্রসর হয়ে দান, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দান, সাহসভরে দান।

এরই নাম নিবেদিতা দিয়েছেন, 'Dynamism'—সক্রিয়তা, সাহসিকতা, প্রাণ-চাঞ্চল্য, জীবনগতি।

স্থির বিশ্বাসভরে তিনি বলছেন যে, এরূপ 'Dynamism' হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে যেরূপ সম্ভবপর, অন্যান্য ক্ষেত্রে সেরূপ নয়। তার কারণ কি? তার কারণ, আমরা বলতে পারি যে, হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা—সম্পদ্-শক্তি। যার কিছু নেই, সে দান করবে কি? যার শক্তি নেই, সে যুদ্ধ করবে কি ক'রে? যার পূর্ণতা নেই, সে জয় করবে কি ক'রে? এই কারণে বাইরের দৃষ্টিতে যাই হোক না কেন, প্রকৃতকল্পে হিন্দুধর্মের পক্ষে 'Dynamic' হওয়া, 'Aggressive' হওয়া অতি সহজসাধ্য এবং অতি প্রয়োজনীয়।

পরিশেষে সেই এক মূলগত কেন্দ্রীভূত প্রশ্ন: আমরা সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হয়ে জগৎকে কি আজ দান ক'রব?—ক'রব সেই একটিমাত্র বস্তুই, যা ভারতের শাশ্বত সম্পদ্, বিশেষ সম্পদ্—অর্থাৎ 'আধ্যাত্মিকতা'। ভারতের সম্পদ্ আদ্যন্তকাল আত্মার সম্পদ্; ভারতের বাণী শাশ্বতকাল আত্মার বাণী; ভারতের আদর্শ চিরন্তনকাল, আত্মার আদর্শ। এই তো আমরা জগৎকে দান ক'রব; এ ছাড়া ভারত ভারতই নয়; ভারতের ভারতীয়ত্ব কেবল এইখানেই।

যে চরিত্রগঠনের কথা নিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে, সেই চরিত্রই ভারতের প্রাণ-স্পন্দন, সেই চরিত্রই 'আধ্যাত্মিকতা'। নিবেদিতা ভারতের এই শাশ্বত অনাবিল রূপটি উদ্ঘাটিত ক'রে বলছেন: 'Character is spirituality'.

এই Spiritualityই হ'ল ভারতের 'Dynamism', ভারতের 'Aggressiveness'. 'Spirituality'র অর্থ কি? এর উত্তরে নিবেদিতা ভারতীয় দর্শনের মূল তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন অনুপম-ভাবে। কি সেই মূলতত্ত্ব? এই মূল তত্ত্বটি অতি গম্ভীর তত্ত্ব নিঃসন্দেহ,

কিন্তু সুদীর্ঘ তত্ত্ব নয়। তা প্রকাশ করা যায় সংক্ষেপে, একটিমাত্র বাক্যে—স্মরণ করুন উপনিষদের সেই রোমাঞ্চকারী মহামন্ত্র :

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। (ছান্দোগ্যোপনিষদ্) —পৃথিবীতে সব কিছুই ব্রহ্ম। তত্ত্বের তাত্ত্বিক দিক্ হ'ল—সর্বাত্মবাদ; ব্যাবহারিক দিক্ হ'ল- সর্বমৈত্রীবাদ। সব কিছুই ব্রহ্ম হ'লে তোমার স্বার্থ এবং আমার স্বার্থ এক ও অভিন্ন, যেহেতু আমরা উভয়ে একই। সেজন্য এই তত্ত্বানুসারে ব্যক্তিগত সুখের কথা না ভেবে আমরা কেবল ভাবব বিশ্বগত সুখের কথা; কেবল নিজের মুক্তির কথা না ভেবে আমরা কেবল ভাবব মানবজাতির মুক্তির কথা। শুনুন নিবেদিতার স্নেহমধুর বাণী :

To Ramakrishna and Vivekananda, the many and the one were the same Reality perceived differently and at different times by the human consciousness. Do we realise what this means? It means : **Character is Spirituality.** It means to protect another is infinitely greater than to attain salvation. It means Mukti lies in overcoming the thirst for Mukti. It means conquest may be the highest form of **Sannyas.** It means, in short, that Hinduism is become aggressive, that the trumpet of Kalki is sounded already in our midst; and that it calls all that is noble, all that is lovely, all that is strenuous and heroic amongst us, to a battle-field on which the bugles of retreat shall never more be heard. (p. 9).

—জান এর অর্থ কি? এর অর্থ হ'ল : চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা। এর অর্থ হ'ল : দুর্বলতা ও পরাজয় ত্যাগ নয়। এর অর্থ হ'ল - অন্যকে রক্ষা করা মোক্ষলাভের অপেক্ষা অনন্ত-গুণে শ্রেয়ঃ। এর অর্থ হ'ল—মোক্ষলাভের কামনা জয় করাই প্রকৃত মোক্ষ। সংক্ষেপে এর অর্থ হ'ল - হিন্দুধর্ম আজ হয়েছে আক্রমণশীল, কল্কির ভেরী আমাদের মধ্যে নিনাদিত হচ্ছে, এবং আমাদের মধ্যে যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শ্রমসঙ্কুল, যা কিছু বীর্যবান্ আছে, তা সবই আহ্বান করছে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে—যেখানে পরাজয়ের ভেরী আর কোনদিনই শোনা যাবে না।

উপরের উদ্ধৃত অংশে নিবেদিতার জীবন-দর্শনের কি সুন্দর দর্শনই না পাওয়া যায়? তাঁর এক একটি পঙ্‌ক্তি নিয়েই এক একটি বৃহৎ দার্শনিক তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ রচনা করা যায়।

প্রথমেই ধরুন 'Many' and 'One'-র প্রকৃত সম্বন্ধ-বিষয়ক পঙ্‌ক্তিটি। এস্থলে তিনি বলছেন :

"রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিকট 'এক' ও 'বহু' ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন সময়ে দৃষ্ট একই তত্ত্ব।"

বস্তুতঃ এটি দর্শনশাস্ত্রের মূলীভূত সমস্যা। কেহ বলেন, 'কেবল একই সত্য'; কেহ বলেন, 'কেবল বহু সত্য'। নিবেদিতা তাঁর প্রাণপ্রতিম গুরুদ্বয়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছেন যে, এ সমস্যা তো সমস্যাই নয়। কারণ 'এক' ও 'বহু' দুটি তত্ত্বই নয়—একই তত্ত্ব। যথা, সমুদ্র 'এক' কি 'বহু' এ প্রশ্নটিই কি হাস্যকর নয়? সমুদ্ররূপে দেখ—'এক'; তরঙ্গরূপে দেখ—'বহু'। সমস্যা কোথায়, বিরোধ কোথায়, দ্বিমত কোথায়?

এই 'একতত্ত্ব'বাদ স্বীকার ক'রে নিলে, আর সবই তো সহজ হয়ে যাবে। এই মহাতত্ত্বের পাঁচটি অর্থ নির্দেশ ক'রে নিবেদিতা বলছেন :

জান কি—এর অর্থ কি? এর অর্থ হ'ল : **'চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা'।**

এর ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। আমাদের আধ্যাত্মিকতা—আমাদের আত্মা কি? আমাদের আত্মা দেহ নয়, চরিত্র—জ্ঞান-ভক্তি-কর্মে গঠিত চরিত্র। চরিত্র কি? চরিত্রই মানব-জীবন, মনুষ্যত্ব; এবং এরূপ মনুষ্যত্বের মূল কথা হ'ল একদিকে তেজ, অন্যদিকে ত্যাগ। 'তেজ' ও 'ত্যাগ' একই মহাতত্ত্বের দুটি দিক্। কারণ এই 'তেজ' স্বার্থসিদ্ধির জন্য বলপ্রয়োগ নয়—এই তেজ ত্যাগের মহিমায়, বিশ্বপ্রেমের দীপ্তিতে, মানবসেবার গৌরবে ভাস্বর। অপর পক্ষে 'ত্যাগ' দুর্বলের অধিকার-লাভে পরাঙ্মুখতা নয়, নিরুপায়ের নিষ্ক্রিয়তা নয়, আশাহীনের হতাশা নয়।

এই ভাবে মানব-জীবনের, তার শাশ্বত আদর্শের ভিত্তির বিষয় বলতে গিয়ে চির-তেজস্বিনী অনমনীয়া নিবেদিতা এই আত্মিক-বলের বিষয়ই বারংবার বলেছেন অতি জোরের সঙ্গে। বল, বীর্য, তেজ, শক্তি—এই ছিল তাঁর জীবন-মন্ত্র; এবং কতভাবে, কত উপমার সাহায্যে, কত সুন্দর উদ্দীপনাময় ভাষায় তিনি এই মন্ত্র প্রকাশ ও প্রচার ক'রে গেছেন আজীবন, প্রাণ পণ ক'রে, সমগ্র শক্তি দিয়ে।

একবার স্থিরচিত্তে ভেবে দেখুন, এই মহা-মন্ত্রের মহিমা। এক কথায় এর অর্থ হ'ল: কেবল স্থিতি নয়, গতি; কেবল অস্তিত্ব নয়, বিকাশ; কেবল নির্বিকারতা নয়, উৎসাহ। গভীর অতল যে দীঘি, তার স্থিতি আছে, অস্তিত্ব আছে, নির্বিকারতা আছে। অপর পক্ষে, অগভীর চঞ্চল যে ঝরনা, তার গতি আছে, বিকাশ আছে, উৎসাহ আছে। এই দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ? নিবেদিতার মতে—প্রয়োজন দুটিরই পূর্ণ সংমিশ্রণ। সেই দিক্ থেকে আমরা কি আর একটি সুন্দর উপমার উল্লেখ করতে পারি না? সেই প্রাচীন সর্বজনবন্দ্য নদীর উপমা? অগভীর ঝরনা থেকে ক্রমশঃ হয় নদীর উৎপত্তি, নদী এসে মিলিত হয় সমুদ্রে। ঝরনার বিকাশ আছে, গভীরতা নেই; নদীর বিকাশও আছে, গভীরতাও আছে; সমুদ্রের বিকাশ নেই, কিন্তু গভীরতা আছে। মানব-জীবনেও তো একই ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষিত হয়। শিশু-বয়সে সাধারণ রীতিই হ'ল নিজেকে প্রচার করা—প্রকৃত গভীরতা থাকুক বা নাই থাকুক। পরে পরিণত বয়সে, এই প্রকাশের ইচ্ছা অল্প হয়ে যায়, গভীরতা বর্ধিত হয়। পরিশেষে, বৃদ্ধবয়সে গভীর বিস্তার-বিহীন সমুদ্রের মতোই হয় জীবন। সমুদ্রের আর একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে। সে গভীর অথচ বিস্তার-বিহীন, বিস্তারবিহীন অথচ সদাচঞ্চল। সেই ভাবে শেষ বয়সে গভীরতা বর্ধিত হয়, প্রকাশ-প্রচারের প্রয়োজন থাকে না, অথচ প্রাণ-চাঞ্চল্য, জীবনোৎসাহ, চিত্তোদ্যমের অভাবও যেন না ঘটে—এইটিই তো হওয়া উচিত জীবন-লক্ষ্য।

হয়তো উপরের উপমার সাহায্যে আমরা নিবেদিতার জীবনাদর্শ-ভিত্তির বিষয় কিছু উপলব্ধি করতে পারব। আমাদের পরিণত যৌবন যেন হয় পূর্ণ নদীর ন্যায়। নিজের সুমধুর বারিধারাকে কত সাহসভরে আগ্রহ-সহকারে আবেশ-বশে সে দান করে দেশ-দেশান্তরে—এই তো হ'ল তার 'Aggressive-ness'—তার নিষ্কাম আক্রমণশীলতা; কত অনুর্বর কঙ্করময় ভূমি তার এই সস্নেহ আক্রমণে পরাজিত হয়ে উর্বর উদ্যানে পরিণত হয়েছে, তার ইয়ত্তা কি?

এরূপ আক্রমণশীলতাই হোক হিন্দু-ধর্মের

মূলমন্ত্র—নিজেকে চতুর্দিক থেকে পূর্ণ ক'রে নিয়ে নিজেকে চতুর্দিকে পূর্ণভাবে দান করা—ঠিক একটি নদীর ন্যায়—এর অপেক্ষা অধিক মহনীয় আর কি হ'তে পারে? এই হোক তার জীবন-ভিত্তি, এই হোক তার মহালক্ষ্য. এই হোক তার পূর্ণ সার্থকতা।

নিবেদিতার ভগবৎপাদপদ্মে নিবেদিত মহাজীবনেরও এই তো ছিল সুদৃঢ়-ভিত্তি। তাঁর জীবন-দর্শন অনুধাবন করতে গেলে, এইটিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করতে হবে পরিপূর্ণ ভাবে। কি কোমল, কি মধুর ছিল তাঁর জীবন। কিন্তু কোমলতার সঙ্গে তেজ, মধুরতার সঙ্গে সাহসিকতার যে অপূর্ব সমন্বয় তাঁর ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়, তা সত্যই জগতের ইতিহাসে বিরল। সত্যই, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, তাঁর 'শিখাময়ী' নামটি অতি সার্থক। তিনি যেন সত্যই একটি প্রদীপ্ত আলোক-শিখা, শিখার ন্যায়ই একাধারে কোমলা ও বীর্যময়ী, মধুরা ও অনমনীয়া, অন্ধকার দূরীকরণে উৎসর্গীকৃতা। 'Aggressiveness'র এই মহামন্ত্র সকলকেই শিক্ষা দিতে তিনি ছিলেন সমুৎসুকা। বিশেষ ক'রে তাঁর অসহ্য বোধ হ'ত যে, অতুলৈশ্বর্যশালিনী ভারতভূমি এই ভাবে দীনহীনার ন্যায় পশ্চাতে পড়ে আছেন। সেজন্যই তিনি বারংবার এই ভাবে তাঁর পূজ্যপাদ গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ ক'রে বীর্যমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর যে সুন্দর সম্পূর্ণ সত্য উক্তিটি উদ্ধৃত ক'রে নিবেদিতা আরম্ভ করেছেন, তা দিয়েই আমরাও আজ এই অধ্যায়টি শেষ করছি :

The true Hinduism, that made men work, not dream.

—যা প্রকৃত হিন্দুধর্ম, তা মানুষকে কাজ করায়, স্বপ্ন দেখায় না। (ক্রমশঃ)

পূজারী

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

জানি একদিন চলে যেতে হবে
ভেঙে যাবে এই বাসা,
জীবনের পাখী উড়ে যাবে নভে
ফেলে রেখে সব আশা।

তবুও আমার হৃদয়ের মাঝে
কত কল্পনা অবিরত রাজে,
মায়া-মরীচিকা অতৃপ্ত তৃষা কেবলি আনে,
আমি চেয়ে থাকি প্রতি দিবসের নিমেষ-পানে।

ধরার ধূলায় খেলাঘর পেতে
সাজায়ে পুতুল শত,
সংসার করি উৎসাহে মেতে
আগ্রহে অবিরত।

ক্ষণ অবসরে অন্তরে মম
জাগে আনন্দ আলেয়ার সম,
ফুলের পেলব সুরভি লভিতে কত না সাধ !
মঞ্জুমনের কুঞ্জে করেছি দৃষ্টিপাত।

তবুও আমার নাহি মনে সুখ
কি যেন বেদনা জাগে,
বিঘ্নবিপদে ভেঙে যায় বুক
শোচনায় পুরোভাগে।

দিনগুলি মোর শঙ্কিতচিতে
যায় আসে কি যে দিতে আর নিতে,
বহু ঘটনার মূক বিবরণ লুকায়ে রহে,
বহু কামনার কল্লোল মোর মরমে বহে।

দূর হ'তে কার বন্দনা-সুর
কানে আসে বারে বারে,
স্মৃতি-পিঞ্জরে শ্রবণ-মধুর
কে যেন ডাকিছে কারে ?

সংশয় দোলা পেয়ে নিরবধি
দূর করিবারে মোহ-দুর্গতি,
মোর প্রার্থনা মন্ত্র ধ্বনিতে মুখর করি,
চিদাকাশ হ'তে আলোকের ধারা পড়িছে ঝরি।

সে কি নিখিলেরে করেছে প্রসব
সে কি গো সারদা মাতা !
পেলে কৃপা তার পাবো বৈভব
গাহি তার স্তবগাথা।

এসেছিলে নব নর-কলেবরে
সাথে লয়ে ভোলা চিরসুন্দরে
শিবজ্ঞানে সেবা জীবেরে করিতে মহাজীবন,
শিখায়েছে এসে শক্তিরে করি উদ্বোধন।

আজিকে মায়ের অর্চনা-ক্ষণে
প্রাণের প্রণাম রাখি,
ধ্যানের গহনে অতি সযতনে
ভাবে আলিপনা আঁকি।

করুণা তাহার পাথেয় আমার,
পার হয়ে যাবো মরু পারাবার
চিরশান্তির অমৃতলোকে নয়ন মেলে,
সেই তো ধন্য যেজন সারদা মায়ের ছেলে !

কালিফোর্নিয়ার শেষ কয়দিন

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাস

[ডক্টর দাশ ১৯৫৪ খৃঃ স্যানফ্রান্সিস্কো শহরে 'American Academy for Asian Studies' নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ এবং হিন্দু আইনের অধ্যাপক হইয়া কালিফোর্নিয়া গমন করেন। বর্তমান ভ্রমণকাহিনা তাঁহার তৎকালীন অভিজ্ঞতার বিবরণ। উঃ সঃ]

জেমস ব্রাইস লিখছেন একটি ব্যঞ্জনাময় বাক্য—California, more than any other part of the union, is a country by itself, and San Francisco a capital. যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে কালিফোর্নিয়া বিশেষত্বময়, এটি শুধু রাষ্ট্র নয়, এটি একটি দেশ। নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভায় ও মানসতায় এ বর্ণাঢ্য, বহিরাঙ্গিক চমৎকারিত্ব তার ভুলবার মতো নয়, তার নিসর্গ চিত্রের চারুতাই শুধু হৃদয় স্পর্শ করে না, তার বহু বিচিত্র সমৃদ্ধিও মনপ্রাণ অভিভূত করে। আর সেই বিচিত্র রাষ্ট্রের ও বিচিত্র দেশের রাজধানী সানফ্রান্সিস্কো।

রুচিশীল মানুষের সমারোহ শুধু নয়, নানা ভাবের, নানাবর্ণের মানব-সাধারণের মিলনভূমি এই অনবদ্য নগর। প্রশান্ত মহাসাগরের বিরাট বিস্তৃতি দিয়েছে এর চিত্তে ভূমার বোধ, তাই বৃহত্ত্ব এর কাছে ভাবালুতা নয়, এর সহজ হৃদয়-সম্পদ্, যাযাবর মানুষের চঞ্চলতা ও উন্মাদনায় সে অধীর।

বুধবার। গেনসবরোর (Gainsborough) সাথে আলাপ হ'ল, তিনি আমাদের হাত-খরচ দুইশত ডলার দেবেন বললেন, তাতেই খুশী হলাম—এসেছিলাম সেপ্টেম্বরে এবং যাচ্ছি অক্টোবরে, সেই হিসাবে আরও কিছু দিলে হয়তো ভাল হ'ত, কিন্তু এই সব নিয়ে দর কষাকষি ক'রে মন কষাকষি করতে চাইলাম না। রাত্রে এখানে একটি সাধারণ বক্তৃতা দিলাম। এটা একাডেমির একটা বিশেষত্ব। এরা চায় সাধারণ মানুষের মনের প্রসার। এদের বিশ্বাস এশিয়ার জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার খুলে দিতে হবে শিক্ষাব্রতীর জন্য যেমন, তেমন ভাবেই সাধারণের গণ-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই বক্তৃতায় যেসব ডলার পাওয়া যায় সেটা বক্তার প্রাপ্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কুড়ি বাইশ জন মাত্র শ্রোতা এসেছিল, কিন্তু তারা সবাই শ্রদ্ধাশীল সমুৎসুক। তাই সারা অন্তর দিয়ে তারা শুনল ভাষণ। বক্তৃতার পর ছয় ডলারের বই বিক্রয় হ'ল।

মেরি ওয়া এসেছিল—শুক্রবার রাত আটটায় সে তার ওখানে এক বিদায়-সভার আয়োজন করেছে, নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। শোওয়ার আগে শিবরাম আর তার পত্নী সমাদর ক'রে ব'লল,—'চা বা কফি খান না?' মানুষ-দুটি খুব সরল, ওদের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়ে ওদের ঘরে গিয়ে কিছু আঙুর খেয়ে শুতে এলাম।

বৃহস্পতিবার। আজ বিমান-কার্যালয়ে গেলাম; তারা ব'লল আমার টিকিটে আমি যেখানে খুশি নামতে পারি—অর্থাৎ ইচ্ছা করলে Salt-Lake City, ডেলওয়ার (Delaware), চিকাগো (Chicago), ডেট্রয়েট (Detroit), ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia) হ'য়ে নিউ-ইয়র্ক যেতে পারি।

রাত্রে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুরজিৎ সিংহ এলেন। প্রবন্ধ লিখবেন—'হিন্দু সমাজে

পিতৃত্বের প্রভাব'—তিনি তার সম্বন্ধে বলতে চাইলেন। হিন্দু দায়াধিকারে পিতৃতন্ত্র—ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও মাতৃতন্ত্র ছিল, কিন্তু পিতৃত্ব তাকে পরাজিত ক'রে আপন গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বললাম—'পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ'—'পিতুরপ্যধিকা মাতা'—এই শ্লোক-দুইটির বিশ্লেষণ করুন—ওখানে মাতাকে উচ্চতর আসন দিলেও ব্যাপারটি কিন্তু মূলতঃ পিতৃ-দেবতার জয়স্তুতি। মনুর বচন বললাম, 'যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ'।

পিতৃভক্তির এই আদর্শ আমাদের সমাজে এনেছে Continuity (ভাবসন্ততি) এবং Tradition (ঐতিহ্য), কিন্তু ক্ষতি করেছে—There is lack of initiative.—এই সব বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ চ'লল।

বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর হরিদাস চৌধুরী এলেন। দাক্ষিণাত্যের নৃত্যকলাবিদ্ শিবরাম এই অতিথিদের আপ্যায়ন করবার জন্য চা ও বিস্কুট দিল।

শুক্রবার। আজ সকালে Civic Centre দেখতে গেলাম—এদের মেয়র রবিনসন ইওরোপে যাবেন, তাই তিনি ব্যস্ত—তাঁর সাথে দেখা হ'ল না। ওখানকার কর্মচারী সালিভানের (Mr. Sullivan) কাছে গেলাম—সে কালিফোর্নিয়া রাষ্ট্রের রীতি ও নীতি সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিল :

'আমেরিকা ফেডারেল গভর্নমেন্ট—তাই নাগরিকত্ব রাষ্ট্রের দান। কলম্বিয়া জিলা, কোন রাষ্ট্র নয়; তাই তাদের ভোটের অধিকার নেই।'—বক্তৃতান্তে সালিভান বিচারকদের খাস মুহুরী মিঃ কামিংসের (Mr. Cummings) সাথে আলাপ করিয়ে দিলে। তিনি জজ টোয়েন মাইকেলসনের (Judge Twain Michelson) কাছে নিয়ে গেলেন।

নম্র, সত্য ও সদালাপী টোয়েন বেশ চালাক, কিন্তু চাতুর্য তাঁর সহজ সৌজন্যকে নষ্ট করেনি। আমায় পাশে নিয়ে বসলেন, অনেকগুলি মোকদ্দমার কথা শুনলাম, তিনি মাঝে মাঝে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর মেলোনি (Mr. Melony) ব'লে এক ভদ্রলোকের কাছে গেলাম। বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকদ্দমায় নাবালক সন্তানদের কেমন ক'রে রাখা হবে, সেইটি তত্ত্বাবধান করবার ও বিবরণ দেওয়ার ভার তাঁর উপর। এখান থেকে ফিরে বাসায় এসে মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম।

শরীর অসুস্থ ও ক্লান্ত। আমাদের মেসের পরিচালক বিল ব'লল ডাক্তারের কাছে যেতে। সেই উপদেশ গ্রাহ্য না ক'রে ঘরে এসে খানিক ঘুমালাম। শিবরামের কাছে আমার বড় ট্রাঙ্কটি পাঁচ ডলারে বিক্রি করলাম। ডিনার খেয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মেরি ওয়াগ (Mary Wagh) বাসায়। সে তার চারজন বান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করেছিল। ওদের ছোট-খাট একটু বক্তৃতা শোনালাম। ওরা তিনখানি বই কিনল, আর দশ ডলার দিল।

শনিবার। প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন-ভোজন বাসায় বসে করলাম—লাইব্রেরির নানা বই ঘেঁটে সময় কাটলো। তার পর হাঁটতে শুরু করলাম—হেঁটে হেঁটে Mission Doloces নামে প্রাচীনতম গির্জায় গেলাম। এটা পর্তুগীজ কীর্তি, পাদ্রী জুনিবোরো ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। অগ্নি ও ভূমিকম্পের অত্যাচার সহ্য ক'রে এই প্রাচীন কীর্তি আজও বেঁচে আছে। আদিম আমেরিকানরা সবজির রস দিয়ে এর কড়ি বরগা রং করেছিল—সেই কাঁচা রং আজও

বেশ দেখা যায়। কড়ি ও বরগাগুলি চামড়া দিয়ে বাঁধা। স্পেনীয় যুগের স্মৃতি দেখতে পেলাম। তার পাশেই নূতন ও চমৎকার গির্জা হয়েছে। পুরাতনটি দেখতে ২৫ সেণ্ট দক্ষিণা দিতে হয়। পুরাতন ইতিহাসের মোহ ছাড়া দর্শকের মন ভোলাবার বিশেষ কিছু নেই। সেখান থেকে গেলাম ডক্টর চৌধুরীর বাসায়। পথে Twin Peaks এবং মাউণ্ট ডেভিডসন দেখে নিলাম, ডেভিডসন পাহাড় সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া; Twin Peaksকে সানফ্রান্সিস্কোর ভৌগোলিক কেন্দ্র বলা হয়, এখানে বড় টানেল আছে। পাহাড়-দুটির উপর থেকে নগরের এবং পূর্বোপসাগরের চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ে।

চৌধুরী-গৃহিণী আহারের খুব আয়োজন করেছিলেন। মুগডাল, বেগুনভাজা, চিংড়ি মাছ, রুইমাছের কালিয়া, টমাটোর চাটনি, পায়স প্রভৃতি ক'রে এক বিরাট ভোজের আয়োজন—তার সঙ্গে অনেক গল্প হ'ল।

আজ শিবরাম ও জানকীর নাচ দেখলাম। শিবরাম বিষ্ণুর নানা অবতারের ভঙ্গী, শিবের নটরাজ নৃত্য, ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা পর্বতের পক্ষচ্ছেদ, কামদেবের মৃত্যু, ঘুড়ি ওড়ানো, ব্রহ্মপূজা প্রভৃতি নানাবিধ কৌতুকপ্রদ ও ভাবসুন্দর নৃত্যকলায় দর্শককে মুগ্ধ ক'রল। ব্যাসি (Bassie) ও আমি এলথিয়ার (Althea) গাড়ীতে বাসায় ফিরলাম। বিল ব'লল, 'আমেরিকায় পরদেশী অতিথিদের আতিথ্য প্রদর্শনের এক সভা আছে, তার নাম Opendoor Institution; এই সভার সভ্য যারা, তারা অতিথির সেবা যত্ন করে।' আমি বললাম, 'দাও ঠিকানা, তাদের চিঠি লিখি।' ঠিকানা নিয়ে চিঠি দিলাম আট দশ খানি, শুতে রাত হ'ল অনেক। ভোর রাতে ঘুম ভাঙলো, তখন মনে হ'ল Salt-Lake City আর যাব না।

Salt-Lake City দেখার একটা ইচ্ছা ছিল, কারণ এটা Mormon নামক এক অদ্ভুত সম্প্রদায়ের আড্ডা। মর্মন চার্চের যারা ভক্ত, তারা ধূমপান করে না, মদ চা কফি পান করে না। এদের আর এক নাম Latter Day Saints. প্রত্যেক সভ্য তার আয়ের দশমাংশ গির্জাকে দেয়, কাজেই সেটি খুব বিভব- এবং প্রতিপত্তিশালী। কিন্তু অবশেষে এই লোভ সংবরণ ক'রে আমার ভ্রমণ-তালিকা থেকে উটা (Utah) রাষ্ট্রকে বাদ দিলাম। প্রথম রাতের লেখা চিঠি ছিঁড়ে ফেলে নূতন ক'রে চিঠি লিখলাম।

রবিবার। টিকিট কিনে চিঠিগুলি ডাকে ফেললাম, তারপর 'যোগ' সম্বন্ধে কতকগুলি বই নাড়াচাড়া করলাম। দেড়টার সময় মিস্টার ডেলিং এভেরী এলেন—তাঁর সঙ্গে এদের মাউণ্ট ডেভিডসনের বাড়ীতে গেলাম, মিসেস এভেরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার বক্তৃতার দিন। এই মহীয়সী নারীর আন্তরিকতা জীবনে ভুলব না। এদের একটি মাত্র ছেলে, ওদের বন্ধু স্যালি (Sally) ব'লে একটি মহিলা, এক এটর্নি-দম্পতী আর মিস ড্যানিস—সবাই মিলে গল্পগুজবে বেশ কাটলো কয়েক ঘণ্টা। এটর্নি-দম্পতী বললেন, তাঁদের বন্ধুদের কাছে পরিচয়-পত্র দেবেন।

সেখান থেকে গেলাম রাজকুমারী অমৃত কাউরের সংবর্ধনা-সভায়। বলা ও চলার ভঙ্গীটি রাজকন্যার মতোই—তবে দু-ডলার চাঁদা দিতে হ'ল—সেটা খুব মনঃপূত হ'ল না। কিষন আজ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু কি কারণে তারিখ বদলে গিয়েছিল, তার বাসায় তাই আর খাওয়া হয়নি। তাকে তার

গাড়ীতে বাসায় পৌঁছে দিতে বললাম। তার স্বর আগ্রহান্বিত নয় ব'লে বাসেই বাসায় ফিরলাম।

মঙ্গলবার। সত্য আগরওয়ালের পরিচিত বান্ধবী মিস লেভি (Levy) আজ তার গাড়ীতে বসিয়ে নিয়ে গেলেন। তরুণী লজ্জাশীলা, অপরিচিত আমার সঙ্গে বিশেষ আলাপ করলেন না। সুরজিতের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি যেদিন গিয়েছিলেন সেই দিনই কলমটা ভুল ক'রে নিয়ে এসেছিলেন।

সে কথাটি যদি আমাকে ফোনে বা চিঠি লিখে জানিয়ে দিতেন, আমাকে হয়রানি ভোগ করতে হ'ত না। কিন্তু এই প্রত্যুৎপন্ন-বুদ্ধির অভাবই আমাদের জাতির স্বভাব, আমরা বুদ্ধিশীল, কিন্তু সে প্রজ্ঞা আমাদের প্রগতির পন্থা হয়ে উঠছে না—আমাদের চারিত্রিক দৌর্বল্যের জন্য, আমাদের নৈপুণ্যের অভাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উচ্চ স্তম্ভ আছে, কিন্তু আজ মঙ্গলবার সেটা বন্ধ থাকায় দেখা হ'ল না। তারপর এদের নৃতত্ত্ব-মিউজিয়ামে গেলাম। ডক্টর গিলোর্ড কানে কম শোনেন, কিন্তু এমনই খুব সুন্দর মানুষ—সব তন্ন তন্ন ক'রে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলেন।

তারপর ডেভিড মেণ্ডেল বামের (Mendel Balm) সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন করলাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভোজনাগারে। মেণ্ডেল বাম আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে পারলেন না ব'লে দুঃখ জানালেন।

লাঞ্চের পর মিসেস সাদি এলেন, গাড়ী ক'রে ওদের বাড়ী নিয়ে গেলেন। ওদের বাড়ী East Bay Areaতে—এটি জনবিরল, এদের রাস্তাগুলি ছায়াশ্যাম, সাদির বাড়ীটি চমৎকার একটি উচ্চ টিলার উপর, সামনে সমুদ্র গর্জন করছে—ফুলের কেয়ারি ভরা—খুবই ভাল লাগলো। মিসেস সাদি এক বাক্স কেক উপহার দিলেন। এই ভারতীয়া নারীর স্নেহমধুর আত্মীয়তা জীবনের এক পরম সঞ্চয় হয়ে রইল।

ফিরে এসে ডক্টর রায়ের নিকট লেখা হুমায়ুন কবীরের চিঠি পেলাম, কি করতে পারে দেখবে—এই তার সারমর্ম। কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল কিছু করবে না, কিছু করে-নি। প্রতিবাদ করা ব্যর্থ, তবু প্রতিবাদ জানিয়ে রাখি।

দেওয়ান চমনলালের 'Hindu America' হিন্দু আমেরিকা বইটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন দক্ষিণ আমেরিকার ভারত-উপনিবেশের সন্ধান। মায়া (Maya) এবং আজটেক (Ajtec) সভ্যতার এবং পেরু বলিভিয়া প্রভৃতি দেশে স্বাধীন ভারতের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের নিদর্শন দেখা যায়।

বোম্যান (Bowman) রাত সাড়ে আটটায় এলেন। ডক্টর চৌধুরীর সাথে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলাম। আমি চলে যাচ্ছি শুনে বোম্যান দুঃখ প্রকাশ করলেন। বোম্যানকে একখানি ভারতীয় সাবান দিলাম। ডক্টর চৌধুরীকে একখানি তোয়ালে ও দুখানি সাবান দিলাম। যাত্রাপথে ভারবহন করা আমার রুচিমাফিক নয়। তাই যতটা লঘু হয়, তারই চেষ্টা। গল্পগুজব ক'রে ওঁরা বিদায় নিলেন রাত ৯-৪০ মিনিটে।

বুধবার। মিসেস এডওয়ার্ডস্ এবং মিসেস এগান সকালে মোটর নিয়ে এলেন—মা ও মেয়ে—স্বামিপরিত্যক্তা মেয়েকে বুড়ী এডওয়ার্ডস্ সান্ত্বনা দেয়—ওরা আমার Public Lecture (বক্তৃতা) শুনে খুব খুশী হয়েছিল। তাই আমার কাছে নিতে এসেছে অমৃত-প্রলেপ—যদি

শোকাতুরা কন্যার অন্তরে জাগাতে পারি আলো—এই তাদের মনের গোপন কথা।

ওরা বেড়াতে নিয়ে চ'লল, প্রথমে Golden Gate Parkএ গেলাম। এই বিরাট রম্যোদ্যান সানফ্রান্সিস্কোর এক অত্যুজ্জ্বল গৌরব। এর মধ্যে মানুষের শিল্পচেষ্টার যে পরিচয়, তার সম্যক্ বর্ণনা অসম্ভব। আমরা এর পর Summer House দেখতে নামলাম; কাচের ঘরে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানা রঙের ও নানা আকৃতির ফুল, এখানে একটি ভারতীয় মাধবীলতা দেখে খুশী হলাম। সেখান থেকে Seal's Rock দেখতে গেলাম—কূলের নিকট ছোট একটা জলমগ্ন পাহাড়—সেখানে সিন্ধু-ঘোটকেরা মাতামাতি করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের দেখা মিলল না, তারা চলে গেছে দূর-দূরান্তরে। Sea-Cliff Restaurant নামক রেস্তোরাঁর ওখানে রয়েছে দুটি রম্য মূর্তি—জাপানী Kounan (কাউনান দেবী)। অন্ধ-বিশ্বাস—তাদের সামনে পয়সা ফেলে যে-প্রার্থনা করা যায়, তা নাকি সফল হয়। দু-পেনি ফেলে আমেরিকায় আমার পর্যটন-সাফল্য প্রার্থনা করলাম। রাত্রে পেলাম নেব্রাস্কার নিমন্ত্রণ। হয়তো কাকতালীয়—তবু যোগাযোগ আছে ব'লে মনে হ'ল। ওখান থেকে গেলাম Merced Lake দেখতে—সেখান থেকে West Lake District হয়ে Sunny Cliff Lake Area নামক স্থানে—এখান থেকে শহরে জল সরবরাহ হয়—ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একটা চমৎকার রেস্তোরাঁয় গিয়ে Early Lunch খেলাম—ওরাই খাওয়াল—তারপর Twin Peaks ঘুরে ওরা আমায় ব্যাঙ্কে নামিয়ে দিয়ে গেল।

বিকালে ৭-৩০ মিনিটে মা ও মেয়ে আবার এলেন। আমরা Metaphysical হলে বক্তৃতা দিতে চললাম। ওরা খুব বিজ্ঞাপন দিয়েছিল:

ডক্টর দাশ বিশ্ব-পর্যটক—তিনি যোগ-শাস্ত্রের ইতিহাস বলবেন। ৭৫ সেণ্ট দক্ষিণা। আসুন, শুনুন—যোগ আধ্যাত্মিক, মানসিক, দৈহিক ও আর্থিক অভ্যুদয় আনতে পারে। যোগ বিধাতার সাথে মিলনের বস্তু—ডক্টর দাশ একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত—তিনি ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে অনেক বই লিখেছেন—এই অপূর্ব সুযোগ হারাবেন না। কর্মযোগ দেহে শক্তি ও বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন করে। রাজযোগ মানসিক অভ্যুদয়ের পন্থা দেখাবে—অবসাদ দূর হবে—আসুন যোগ দিন।

৮টা ১০ মিনিটে বক্তৃতা শুরু হ'ল, ৯-৪০ মিনিটে শেষ হ'ল। শ্রোতা বেশী নয়—জন কুড়ি পঁচিশ—কিন্তু তারা মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে শুনল।

বুড়ী খুব সহৃদয়া, যখন শুনল আমায় মাত্র সাড়ে দশ ডলার দিয়েছে, তখন ওদের খুব ব'কল। বাসায় এসে ডক্টর প্যাটার্সনের চিঠি পেলাম। তিনি নেব্রাস্কার দর্শনের অধ্যাপক।

বৃহস্পতিবার, আজ সানফ্রান্সিস্কোয় শেষ দিন। কোথাও গেলাম না, সব জিনিস ঠিক ঠাক ক'রে নিতে হবে—সেই ভাবনায় অধীর হলাম। একজন ধর্মযাজকের উপদেশ পড়েছি: ভগবানের হাতে অনন্ত সময়, তাই তার কোনই তাড়া নেই, সব কাজই তার নিয়মের ছন্দে গাঁথা, তেমন ক'রে নিজেকে চালাও—ব্যস্ততা, তাড়াহুড়া, উদ্বিগ্ন, ব্যাকুলতা শুধু ক্ষয় ও অপচয়। কিন্তু সে উপদেশ পালন করতে পারি না।

জুলি ড্যানিশ কুড়ি ডলারের বই নিয়েছিল। সে টাকাটা আর দিল না, তাকে ফোন ক'রে ধরতে পারলাম না, তার ভাবগতিক সে দেবে

না; তাঁকে চিঠি লিখেও টাকাটা আদায় হয়নি। সব দেশেই সব রকমের মানুষ আছে, জুলি ড্যানিস আছে, আবার মেরি ওয়াও আছে। তাই নালিশ করি না, এই বিচিত্রতাকে দেখবার জন্যই জীবন-দেবতা পাঠিয়েছেন।

এলেন ওয়াট্‌স্‌কে বললাম, 'কাল যাচ্ছি'।

ডক্টর সিন—চীনা অধ্যাপকটি বললেন যে তিনি সঙ্গিহীন হবেন—তার দরদ-ভরা কথায় হৃদয় ভরে উঠল।

সানফ্রানিস্কো—সুন্দর ও মনোহর। পাহাড়ের, সেতুর, ফুলের শোভায় শোভাময় স্বপ্ন-জাগা শহর। এর একটি বর্ণনার কথা মনে পড়ছে—A fabulous city of hills, bridges, cable cars, flowers and beautifully dressed women. Its romantic and vigorous history has left its impression in a reflected aura of story-book mystery, a magical quality. though elusive, can be distinctly felt both by the visitor and the resident.

কল্পনার নগর—পর্বত, সেতু, বৈদ্যুতিক তারের যান, পুষ্প এবং সুসজ্জিতা সুন্দরী ললনাগণের নগর। নাগরিক হোক, কিংবা ভ্রমণকারী হোক—এর অতীতের রোমাঞ্চকর ইতিহাস এই নগরের নামের সাথে জড়িয়ে রেখেছে এক কল্পনার যাদু, অবিস্মরণীয় স্পর্শ।

বিলাসিনী নগরীর সেই বিভ্রম-কুহক—সেই আধ-চেনা আধ-অচেনা রাজ্যের চমক আমি ধরতে পারিনি, তবু ব'লে যাব—তোমায় ভাল লেগেছিল, ভাল লেগেছিল তোমার আলোভরা বুক—তোমার সমুদ্রস্নাতা চারুতা আর বিচিত্র নিসর্গ-লীলা।

অকৃতজ্ঞ

শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

অকৃতজ্ঞ তাই
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুমি নাই, তুমি নাই।

রূপ, রস, গন্ধে, নব নব ছন্দে
ভরিয়া রেখেছ সব ঠাঁই।
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুমি নাই, তুমি নাই।

সদা রহ কাছে কাছে
বিপথে না যাই পাছে
তবুও ভুলিয়া কভু ডাকি নাই, ডাকি নাই।
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুমি নাই, তুমি নাই।

অঞ্জলি ভরিয়া দান দিয়েছ সুমহান্
পেয়েও ভুলেছি তবু, বলিয়াছি পাই নাই।
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু তুমি নাই, তুমি নাই।

মরণ-দুয়ার হ'তে তুমি নিলে কোল পেতে
বুঝিয়াও বুঝি নাই—
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুমি নাই তুমি নাই।

জীবন সায়াহ্নে আজ বুঝিয়াছি মহারাজ
তুমি ছাড়া কেহ নাই
অকৃতজ্ঞ তাই
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুমি নাই, তুমি নাই।

যোগীশ্বর গোরক্ষনাথের দার্শনিক সিদ্ধান্ত

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগীশ্বর গোরক্ষনাথ ছিলেন প্রাগ্ মধ্যযুগীয় ভারতে সুপ্রাচীন যোগধর্মের একজন অনন্যসাধারণ প্রভাবশালী প্রচারক। তিনি ভারতের সকল প্রদেশে সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে যোগের ভাবধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত যোগিসম্প্রদায় নাথ-যোগী, সিদ্ধযোগী, অবধূতযোগী, দর্শনীযোগী, কানফাটা যোগী ইত্যাদি নামে ভারতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ। সারা ভারতবর্ষে এমন কোন প্রদেশ নাই, যেখানে গোরক্ষনাথের নামে মঠ মন্দির আখড়া প্রভৃতি অদ্যাপি বিদ্যমান নাই। তিনি যে যোগের আদর্শ লইয়া সমগ্র দেশে একটা বিরাট্ ধর্মান্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মহাযোগীশ্বরেশ্বর শিবকে তিনি শুধু ব্রহ্মস্বরূপে বা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়বিধাতা পরমেশ্বররূপে নয়, তৎসঙ্গে সকল জ্ঞানী যোগী ভক্তদের আদিগুরু এবং চিরন্তন জীবনাদর্শ-রূপে সর্বসাধারণের সমীপে সমুপস্থিত করিয়াছিলেন। শিবকেই 'আদিনাথ'-নামে তৎপ্রচারিত যোগধর্মের আদিপ্রবর্তক-রূপে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ আদিনাথ শিবের নিকট হইতেই মহাজ্ঞান ও মহাযোগের দীক্ষা ও উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গোরক্ষনাথ স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবাবতার বলিয়া সর্বত্র যোগী- ও ভক্ত-সমাজে পূজিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, এবং পার্থিব দেহেই তিনি কালের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া অমর হইয়া এখনও বিদ্যমান আছেন ও লোকচক্ষুর অগোচরে জীবকল্যাণ করিতেছেন, ইহা যোগিগণ বিশ্বাস করেন। তিনি কোন্ শতাব্দীতে কোন্ প্রদেশে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিকগণ এখনও নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই।

আমরা সাধারণতঃ 'দার্শনিক' বা 'দর্শনাচার্য' বলিতে যাহা বুঝি, সেই অর্থে মহাযোগী গোরক্ষনাথ 'দার্শনিক' বা 'দর্শনাচার্য' আখ্যা পাওয়ার যোগ্য কিনা, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। সাধারণ দৃষ্টিতে যাঁহারা বিশেষ কোন একটি তাত্ত্বিক মতবাদ পোষণ ও প্রচার করেন, যুক্তি-তর্ক-বহুল গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা সেই বিশেষ মতবাদ প্রতিপাদন করেন ও তৎসম্পর্কে সম্ভাবিত সর্বপ্রকার আপত্তি-নিরসনের প্রচেষ্টা করেন, এবং যুক্তিতর্কের প্রখর অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী সকল মতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, সেই সব মনীষিবৃন্দই 'দার্শনিক পণ্ডিত' বা 'দর্শনাচার্য' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কপিল, বাদরায়ণ, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণ এইরূপ মহান্ দার্শনিক ছিলেন। কিন্তু এই অর্থে নারদ, শুকদেব, গোরক্ষনাথ, কবীর, নানক, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অসাধারণ প্রভাবসম্পন্ন ধর্মোপদেষ্টা ও সম্প্রদায়প্রবর্তক হইলেও তাঁহাদিগকে 'দার্শনিক' আখ্যা দেওয়া হয়তো অনেকের মতে সমীচীন হইবে না। এই সব মহাপুরুষদের কোন প্রকার দার্শনিক তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রবৃত্তিই দেখা যায় না, অথচ ইঁহারা সকলেই সাধনোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বোপদেশও দিয়াছেন। সাধ্যের নির্ণয় ব্যতীত সাধনার সুনিরূপণ সম্ভব নয়। সাধ্যের নির্ণয় তত্ত্বজ্ঞানের

উপরই নির্ভর করে। এই সব মহাপুরুষ আপনাদের আন্তর অনুভূতির দিব্য আলোকে তত্ত্বের উপদেশ দেন এবং সাধনার পথ নির্দেশ করেন, তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না।

যোগীশ্বর গোরক্ষনাথের নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে অনেক গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এই সব গ্রন্থের মধ্যে সবই সেই মহাযোগীর নিজের রচিত কি না, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। অনেক গ্রন্থ তাঁহার উপদেশকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার পরবর্তী ভক্ত ও যোগীদের দ্বারা রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এই সব গ্রন্থে প্রায়শঃ যোগসাধনারই উপদেশ, তত্ত্বোপদেশ তাহার অঙ্গীভূত। ঠিক ঠিক দার্শনিক গ্রন্থ খুবই অল্প। 'সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ' নামে একখানা গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা মুখ্যতঃ দার্শনিক অর্থাৎ তত্ত্বনিরূপক গ্রন্থ। কিন্তু এই গ্রন্থেও যুক্তি-তর্কের অবতারণা এবং স্বমতস্থাপন ও পরমতখণ্ডনের দার্শনিক প্রচেষ্টা নাই। হিন্দী ভাষাতেও গোরক্ষনাথের নামে অনেক গ্রন্থ আছে, এবং তাহাই হিন্দীভাষার আদিম সাহিত্য। তন্মধ্যে যে-সব গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে-সব একসঙ্গে 'গোরক্ষবাণী' নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় গোরক্ষনাথের স্বরচিত কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই বটে, কিন্তু বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যও নাথসাহিত্য,—গোরক্ষনাথ, তাঁহার গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুবর্তীদের চরিতাবলী ও উপদেশাবলী অবলম্বনেই রচিত। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষারও প্রাচীন সাহিত্যের উপর গোরক্ষনাথ ও তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন ভাষায় গোরক্ষনাথ-সম্প্রদায়ের একটা বিরাট সাহিত্য বিদ্যমান থাকিলেও 'দার্শনিক গ্রন্থ' বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, সে-জাতীয় গ্রন্থের খুবই অভাব দেখা যায়।

ইহাতে মনে হয়, ভগবান্ বুদ্ধের ন্যায় যোগীশ্বর গোরক্ষনাথ দার্শনিক তর্কযুক্তির জাল-বিস্তার পছন্দ করিতেন না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে অবশ্য দার্শনিক কূটতর্কের জাল বুদ্ধের পরবর্তী কালে বহুল বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং সেই হেতু তাঁহার সম্প্রদায় বহু উপসম্প্রদায়ে বিভক্তও হইয়াছিল। কিন্তু গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ে পর-বর্তী কালেও এই জাল তেমন প্রসার লাভ করে নাই। পরবর্তী যুগেও তাঁহার সম্প্রদায়ে অনেক মহান্ তত্ত্বজ্ঞানী ও যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন সিদ্ধযোগীর আবির্ভাব হইলেও মহান্ দার্শনিক পণ্ডিত বা আচার্যের আবির্ভাব প্রায় দেখা যায় না।

গোরক্ষনাথের সময়ও সম্ভবতঃ দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের কলহ তীব্রভাবেই ছিল। তিনি ও তাঁহার অনুবর্তী অবধূত যোগিগণ বলিতেন :

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমং তত্ত্বং ন বিন্দন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণম্ ॥
যদি সর্বগতো দেবঃ স্থিরঃ পূর্ণো নিরন্তরঃ।
অহো মায়া মহামোহো দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনা ॥

(অবধূতগীতা)

কেহ কেহ অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী এবং অপর কেহ কেহ দ্বৈতবাদের পক্ষপাতী। (এইরূপ বিভিন্ন পক্ষে বিভক্ত হইয়া দার্শনিক বিচারকগণ প্রায়শঃ বাদবিসংবাদে প্রমত্ত হন এবং ফলে তত্ত্বতঃ সমদর্শিত্ব লাভ না করিয়া প্রায়ই বিভিন্ন মতবাদ হেতু বৈষম্যদর্শীই থাকিয়া যান)। তাঁহারা কেহই সম-তত্ত্বকে বিদিত হন না, সম-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠালাভ করেন না। জীবজগতের মূলীভূত যে পরম তত্ত্ব, সেটি দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ সম-তত্ত্ব। (দ্বৈতনিষেধ-পূর্বক অদ্বৈতের প্রতিপাদন দ্বারা সেই সমতত্ত্বের

নিরূপণ হয় না, আবার অদ্বৈতনিষেধপূর্বক দ্বৈতপ্রতিপাদন দ্বারাও সেই চরম ও পরম তত্ত্বের নিরূপণ হয় না)। যদি উপলব্ধি হয় যে, এক স্বপ্রকাশ পরম দেবতা নিত্যপূর্ণ নিত্যস্থির ও সর্ববিধ ভেদরহিত এবং তিনি সর্বগত, বিচিত্র নামরূপে লীলায়মান, তবে দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনা নিতান্তই নিরর্থক। এরূপ বিকল্পনাই মায়া, ইহাই মহামোহের নিদর্শন।

এই দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ সম-তত্ত্ব সম্বন্ধে গোরক্ষনাথ বলেন :

ভাবাভাববিনির্মুক্তং নাশোৎপত্তি-বিবর্জিতম্।
সর্বসংকল্পনাতীতং পরব্রহ্ম তদুচ্যতে॥
হেতুদৃষ্টান্তনির্মুক্তং মনোবুদ্ধ্যাদ্যগোচরম্।
ব্যোমবিজ্ঞানমানন্দং তত্ত্বং তত্ত্ববিদো বিদুঃ॥
(বিবেকমার্তণ্ডঃ)

সেই পরম ও চরম সম-তত্ত্বকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের উপলব্ধি যে-সব মহাযোগীর হয়, তাঁহারা অনুভব করেন যে, এই পরম তত্ত্ব ভাব ও অভাবের দ্বন্দ্ব হইতেও বিনির্মুক্ত, ('অস্তি-নাস্তির বহির্ভূত'), নাশ- ও উৎপত্তি- (এবং সর্ববিধ বিকার) -বিরহিত, এবং সকল প্রকার কল্পনা বিকল্প ও বিতর্কের অতীত। তিনি 'এইরূপ' বা 'এইরূপ নহেন', কোন প্রকার হেতু বা দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা প্রতিপাদন করা সম্ভব নয়; (তাঁহার সম্বন্ধে কোন 'ব্যাপ্তিজ্ঞান' হওয়া সম্ভব নয়, তাঁহার নির্ধারণের জন্য কোন সমীচীন অন্বয়ী বা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তও আমাদের অভিজ্ঞতার রাজ্যে মিলে না, কারণ তাঁহার সজাতীয় কিংবা বিজাতীয় কোন কিছুই নাই ও থাকিতে পারে না)। তিনি মন বুদ্ধি প্রভৃতির অগোচর, (যেহেতু দ্বন্দ্বের রাজ্যেই মন-বুদ্ধ্যাদির বিহার ও বিলাস। যে-তত্ত্বে সব দ্বন্দ্বের, সব ভেদের, সব 'হাঁ' ও 'না' এর সম্যক্ পর্যবসান, যে-তত্ত্বে কোন বিষয়-বিষয়ী ভেদ নাই, সেই তত্ত্বকে মন ও বুদ্ধি কল্পনা বা বিচারের বিষয় করিবে কিরূপে?); কিন্তু সমাধিতে সেই তত্ত্বের উপলব্ধি হয় নির্মল নিশ্চল নিরবচ্ছিন্ন আকাশবৎ স্বয়ং-সৎরূপে, বিজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়-বিষয়ি-ভেদ-বর্জিত জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান-ভেদ-বর্জিত স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে এবং আনন্দ অর্থাৎ স্বয়ং-পূর্ণতার আস্বাদনরূপে। চরম সমাধিতে যে চরম তত্ত্বের অনুভব হয়, তাহা মনের প্রত্যক্ষ বা কল্পনার বিষয়ও নয়, বুদ্ধির নৈয়ায়িক যুক্তি-বিচার-অনুমানাদির বিষয়ও নয়, কোন প্রকার ভাষায় ব্যক্ত করিবার বিষয়ও নয়, অথচ তাহাই পরম সত্য; তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকেই তত্ত্ব বলিয়া জানেন। চরম সমাধিতে চরম সত্যের চরম অনুভূতিতে মন ও বুদ্ধি সেই সত্যের স্বরূপেই বিলীন হইয়া সত্যানুভূতি লাভ করে, সত্যকে বিষয় করিয়া অনুভূতি লাভ করে না। সুতরাং সেই অনুভূতির স্বরূপ কি প্রকার, ভেদরাজ্যবিহারী বিষয়-বিলাসী মন বুদ্ধি তাহা ধারণাও করিতে পারে না। অথচ সেই 'নিরুত্থান' অবস্থা হইতে 'ব্যুত্থান' অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, মন-বুদ্ধির সুদৃঢ় ধারণা থাকিয়া যায় যে, সেই বিলীন অবস্থা বা একীভূত অবস্থাতে যে সমতত্ত্বে, যে অনির্বচনীয় ব্যোম-বিজ্ঞান-আনন্দ-স্বরূপে স্থিতিলাভ হইয়াছিল, তাহাই বস্তুতঃ পরম সত্য, পরম তত্ত্ব।

এই ভাবাভাব-বিনির্মুক্ত দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ মনোবুদ্ধ্যগোচর পরম তত্ত্বকে যোগি-গুরু গোরক্ষনাথ নির্বিকল্প সমাধিতে বিষয়বিষয়ি-ভেদ-রহিত অপরোক্ষ জ্ঞানে অনুভব করিয়া 'অনামা' আখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন :

যথা নাস্তি স্বয়ং কর্তা কারণং ন কুলাকুলম্।
অব্যক্তং চ পরং ব্রহ্ম অনামা বিদ্যতে তদা॥
(সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ)

যখন স্বয়ং (অহংবোধ) নাই, কর্তা (কর্তৃত্ববোধ) নাই. কারণ (কার্য-কারণ ভাব) নাই, কুল ও অকুলের ভেদ নাই, পরমব্রহ্ম যখন সর্বতোভাবে অব্যক্ত, (কোন প্রকার উপাধির ভিতরে তাঁর অভিব্যক্তি নাই), তখন 'অনামা' বিদ্যমান থাকেন। (অর্থাৎ তখন যাহা থাকে, তার কোন নাম নাই, যেহেতু বিনা উপাধিতে কোন নাম হয় না, নাম উপাধিরই নামান্তর)। এই অনামাই 'স্বয়মনাদিসিদ্ধম্ একমেব অনাদিনিধনম্'। (সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ)। ইহাই সর্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব। সর্বোচ্চ স্তরের সমাধিতে এই স্বপ্রকাশ নিত্যসত্য তত্ত্বাতীত তত্ত্বেরই অপরোক্ষানুভূতি হইয়া থাকে।

উপদেশকালে উপদেশ-প্রদানের প্রয়োজনে যোগিগুরু এই অবাঙ্-মনসোগোচর অপরোক্ষানুভবসিদ্ধ তত্ত্বাতীত তত্ত্বকে বিভিন্ন নামে উপদেশ করিয়াছেন,—যথা ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, শিব, পরশিব, আত্মা, পরমাত্মা, সম্বিৎ, পরাসম্বিৎ, পদ, পরমপদ, নিরঞ্জন, শূন্য, পরমশূন্য, শূন্যাশূন্যবিলক্ষণ, পরমাকাশ, চিদাকাশ, সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি। প্রত্যেকটি সার্থক নামই সেই নিরুপাধিক তত্ত্বকে কোন না কোন প্রকারে সোপাধিক-রূপে মন-বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত করে। অথচ নাম ব্যতীত তাহার ধারণাই সম্ভব হয় না, উপদেশই অসম্ভব হয়। নাম অবলম্বনেই নামাতীতকে চিন্তা করিতে হইবে, উপাধি অবলম্বনেই নিরুপাধিককে ধারণাগোচর করিতে হইবে, এবং চরম অনুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

উপাসনার দৃষ্টিতে গোরক্ষনাথ শৈব বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি শৈবধর্মের একজন অনন্য-সাধারণ প্রচারক। ভারতের সর্বত্র গ্রামে, নগরে, শ্মশানে, বনে, পর্বতশিখরে, অসংখ্য শিবলিঙ্গ তিনি ও তাঁহার অনুবর্তিগণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শিবকে তিনি হিমালয়ের চূড়া হইতে নামাইয়া আনিয়া ঘরে ঘরে জনগণের প্রাণের দেবতারূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শিবকে তিনি একদিকে নামরূপাতীত চরম তত্ত্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন, অন্যদিকে তাঁহাকে নিত্য সিদ্ধ ক্লেশকর্মবিপাকাদি-রহিত মহাযোগীশ্বরেশ্বর-রূপে প্রচার করিয়াছেন, আবার তাঁহাকে অশেষ করুণানিধান সর্বলোকগুরু বাঞ্ছাকল্পতরু বর্ণাশ্রমভেদনিরপেক্ষ সর্বজীবপ্রেমী আশুতোষ-রূপে সকল নরনারীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শিব যেমন যোগী জ্ঞানী ত্যাগী তপস্বীদের পরমারাধ্য, তেমনি অসুর রাক্ষস চণ্ডাল ব্যাধ কিরাত প্রভৃতি সকল জাতির সকল শ্রেণীর নরনারীর পরম উপাস্য। তাঁহার পূজায় অধিকারভেদ নাই, পুরোহিতের আবশ্যকতা নাই, পূজোপকরণের বাহুল্য নাই, সকলেই প্রাণের ভক্তি-অর্ঘ্যে বিনামন্ত্রে বিনা-আড়ম্বরে সাক্ষাৎভাবে তাঁহার অর্চনা করিতে পারে। তিনি সগুণ নির্গুণের ঐক্যভূমি, সোপাধিক ও নিরুপাধিকের ঐক্যভূমি, সর্বাতীত ও সর্বময় এবং সকলের আপন জন। তিনি অবধূত যোগীদের পরম আদর্শ, এবং সমাজের সর্বনিম্নস্তরে বেদাচার-বহির্ভূত অবজ্ঞাত উপেক্ষিত নরনারীদের মধ্যেও তাঁর অবাধ গতি। যোগীগুরু গোরক্ষনাথ যোগীর ঈশ্বরকে মনুষ্যসমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত নামাইয়া আনিয়াছেন। ইহা তাঁহার সর্ব-ভূতানুকম্পী যোগি-হৃদয়ের অন্যতম নিদর্শন।

অথচ তাঁহার উপদেশে তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন। শুদ্ধ শৈব কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি :

শুদ্ধং শান্তং নিরাকারং পরানন্দং সদোদিতম্।
তং শিবং যো বিজানাতি শুদ্ধশৈবো ভবেৎ তু সঃ॥
(বিবেকমার্তণ্ডঃ)

শুদ্ধ (মলবিক্ষেপাবরণরহিত) শান্ত (সদাত্মসমাহিত) নিরাকার (রূপোপাধিবর্জিত) পরমানন্দঘন নিত্যস্বপ্রকাশ শিবকে যিনি পরিজ্ঞাত হন ও আরাধনা করেন, তিনিই শুদ্ধ শৈব হইয়া থাকেন।

গোরক্ষানুবর্তী স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র 'হঠযোগ-প্রদীপিকা'তে 'শাম্ভবী মুদ্রা' প্রসঙ্গে শিবতত্ত্ব বা শম্ভুতত্ত্বের লক্ষণ বলিয়াছেন :

শূন্যাশূন্যবিলক্ষণং স্ফুরতি তৎ তত্ত্বং পরং শাম্ভবম্।

—শ্রীগুরুপ্রসাদে শাম্ভবী মুদ্রায় সিদ্ধিলাভ হইলে 'শূন্যাশূন্যবিলক্ষণ' পরম শম্ভুতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব অন্তরে স্ফুরিত হইয়া থাকে।

ইহার ঠিক পরবর্তী শ্লোকেই তিনি বলেন :

ভবেৎ চিত্তালয়ানন্দঃ শূন্যে চিৎসুখরূপিণি।

—চিৎসুখরূপ 'শূন্যে' চিত্তলয়ের পরমানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে।

গোরক্ষনাথ সত্যের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন :

সত্যমেকমজং নিত্যমনন্তং চাক্ষয়ং ধ্রুবম্।
জ্ঞাত্বা যস্তু বদেদ্ ধীরঃ সত্যবাদী স উচ্যতে॥
(বিবেকমার্তণ্ডঃ)

—সত্য এক অজ (উৎপত্তিরহিত), নিত্য (বিনাশরহিত), অনন্ত (সীমারহিত) অক্ষয় (বিকাররহিত) ও ধ্রুব (সংশয়াতীত বাস্তব তত্ত্ব)। এই সত্য জানিয়া যে ধীর ব্যক্তি শুধু এই বিশুদ্ধ সত্যের কথাই বলেন, তিনিই বস্তুতঃ সত্যবাদী।

গোরক্ষনাথ নানাভাবে এই পরম সত্যের কথাই শান্তিপিপাসুদিগকে বলিতেন এবং এই সত্যের দিকেই সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। জীবনকে পরমসত্যময় করাই পরম পুরুষার্থ, এবং তদুদ্দেশ্যেই তিনি সকলের নিকট যোগের উপদেশ করিতেন। যোগকে তিনি সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয়, উভয় রূপেই নির্দেশ করিতেন। তিনি যোগের লক্ষণ বলিয়াছেন, 'সংযোগ যোগ ইত্যাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনোঃ' (বিবেকমার্তণ্ডঃ)—ক্ষেত্রজ্ঞ (অর্থাৎ ব্যষ্টি-আত্মা) এবং পরমাত্মার (অর্থাৎ বিশ্বাত্মার) সংযোগ (অর্থাৎ অভেদানুভব) যোগ নামে আখ্যাত হয়। যোগীদের সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা পরস্পরকে 'আদেশ, আদেশ' বলিয়া অভিবাদন করেন ; এই রীতি সম্ভবতঃ গোরক্ষনাথই প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আদেশের তাৎপর্য তিনি এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারণে।
ত্রয়াণামৈক্যসম্ভূতিরাদেশঃ পরিকীর্তিতঃ॥
আদেশ ইতি সদ্‌বাণীং সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়াবহাম্।
যোগিনং প্রতিবদেত স বেত্ত্যাত্মানমীশ্বরম্॥
(সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ)

—আত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মা,—উপাধি-বিচারে এক আত্মা বা ব্রহ্ম বা শিবেরই এই ত্রিবিধ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই তিনের যে সম্যক্ ঐক্যানুভূতি, তাহাই 'আদেশ' শব্দের তাৎপর্য। 'আদেশ'—এই সদ্‌বাণী সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব বা দ্বৈতভাবের ক্ষয়কে নির্দেশ করে। এই তাৎপর্য হৃদয়ে রাখিয়া প্রত্যেক যোগী অপর প্রত্যেক যোগীর প্রতি এই বাণী প্রয়োগ করিবেন। তাহাতে প্রত্যেকের মধ্যে আত্মা বা ঈশ্বরের অনুভূতি উদ্দীপিত হয়।

একই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম বা শিব বা ঈশ্বরই সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী আত্মারূপে পরমাত্মা, ব্যষ্টিপিণ্ডের অভিমানী আত্মারূপে জীবাত্মা, এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি সকলের অবভাসকরূপে আত্মা বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকেন। গোরক্ষনাথ বিশ্বপ্রপঞ্চকে শিব বা ব্রহ্মের 'মহাসাকারপিণ্ড' বা 'সমষ্টিপিণ্ড' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং জীবদেহকে 'ক্ষুদ্র-সাকারপিণ্ড' বা 'ব্যষ্টিপিণ্ড' বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন। সব দেহে এক শিব বা ব্রহ্মই দেহী, তিনিই সব দেহে বিরাজমান।

অলুপ্তশক্তিমান্ নিত্যং সর্বাকারতয়া স্ফুরন্।
পুনঃ স্বেনৈব রূপেণ এক এবাবশিষ্যতে॥

(সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ)

—অলুপ্তশক্তিমান্ শিব বা ব্রহ্ম দেশে কালে নিত্যই বিচিত্র দেহ পরিগ্রহ করিয়া বিচিত্র আকারে স্ফুরিত হইতেছেন, আবার দেশ-কালাতীত স্ব-স্বরূপে তিনি নিত্যই এক অবিক্রিয় চৈতন্যানন্দসত্তায় বিরাজমান। তিনি নিত্যই একস্বরূপ, নিত্যই বহুরূপ, নিত্যই দেশকালাতীত, নিত্যই দেশকালে বিলসমান, নিত্যই নিষ্ক্রিয় নির্বিকার, নিত্যই অনন্তক্রিয় অনন্তবিকারাধার, নিত্যই আত্মসমাহিত, নিত্যই সংসারবিলাসী।

'একাকারোঽনন্তশক্তিমান্ নিজানন্দতয়া অবস্থিতোঽপি নানাকারত্বেন বিলসন্ স্বপ্রতিষ্ঠাং স্বয়মেব ভজতি ইতি ব্যবহারঃ।' (সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতিঃ)

বিভিন্ন জীবদেহে তিনিই বিচিত্র উপাধি গ্রহণ করিয়া বিচিত্রভাবে আপনার অনন্তত্বকে অসংখ্য স্তরবিভক্ত অগণিত সান্তরূপে' আস্বাদন করিতেছেন। বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁর চিদানন্দের বিলাস, প্রত্যেক জীবদেহেও তাঁর চিদানন্দের বিলাস।

উপনিষদ্ ও বেদান্তের অদ্বয় ব্রহ্মবাদের সহিত যোগীশ্বর গোরক্ষনাথের দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ শিববাদের বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব বা শিব-তত্ত্বই তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন। এই পরমতত্ত্ব সমাধিস্থ প্রজ্ঞার উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের চরম ও পরম সত্যত্ব স্বীকার করিবার নিমিত্ত জীব জগতের মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদন তিনি আবশ্যক মনে করেন না। সুপ্রাচীন সিদ্ধযোগি-সম্প্রদায় ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দরসপানে নিমগ্ন থাকিয়াও বিশ্বপ্রপঞ্চকে কখন মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। পতঞ্জলির 'যোগদর্শন' দার্শনিক বিচারে সাংখ্যমতের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও সাধনমার্গের উপদেশে তিনি প্রাচীন সিদ্ধ-যোগীদের পন্থাই অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ কপিল বা পতঞ্জলির তত্ত্ববিচার গ্রহণ করেন নাই, যদিও তিনি তাঁহাদেরই সাধনপন্থার অনুবর্তী। তত্ত্ববিচারে তিনি উপনিষদের ঋষিদের সহিত একমত এবং ইহাই প্রাচীনতম আগমশাস্ত্রের মত। তিনি বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা শিবকে বিশ্বজগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, এবং তাঁহার দৃষ্টিতে এই কারণত্ব শুধু প্রাতীতিক বা আধ্যাসিক নহে, ইহা তাত্ত্বিক বা বাস্তব। ব্রহ্ম মিথ্যা-জগতের মিথ্যা-কারণ নহে, দেশকালপ্রসারিত সুনিয়ত পরিণামশীল অনাদি অনন্ত সত্য জগৎপ্রবাহের সত্য কারণ। ইহাতে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের হানি হয় না। এই জগৎকে তিনি 'চিদ্ বিবর্ত' না বলিয়া 'চিদ্-বিলাস' রূপে বর্ণন করেন। এ বিষয়ে প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত তিনি একমত।

ব্রহ্ম বা শিব নিত্য দেশকালাতীত নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নির্বিকার সচ্চিদানন্দস্বরূপে বিরাজমান থাকিয়াও আপনার স্বরূপভূতা পরমাশক্তি দ্বারা আপনাকে অনাদি অনন্তকাল অনন্ত-বৈচিত্র্যসমাকুল জীবজগদ্রূপে লীলায়মান করিতেছেন। উভয় রূপই সত্য। সমাধিতে তাঁহার দেশকালাতীত দ্বৈতবিহীন চৈতন্য-স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়, এবং সমাধিজ-প্রজ্ঞালোকিত বিশুদ্ধ জাগ্রদ্বুদ্ধির সম্মুখে তাঁহার বিচিত্র বহুময় পরিণামশীল বিলাসরূপের পরিচয়

হয়। তিনি স্বরূপতঃ এক থাকিয়াও শক্তি-প্রকাশে বহু, স্বরূপতঃ নির্বিকার থাকিয়াও স্বকীয় শক্তিপ্রসূত বহুবিধ বিকারের আধার ও আশ্রয়। এই বিশ্বজগৎ তাঁহারই লীলাবিলাসরূপ।

ব্রহ্ম বা শিবের আত্মভূতা এই মহাশক্তিকে গোরক্ষনাথ মিথ্যা বা অনির্বচনীয়া মায়া আখ্যা না দিয়া সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তি মহামায়া যোগমায়া প্রভৃতি রূপে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেমের সহিত বর্ণন করেন। ব্রহ্মের স্বরূপভূতা মহাশক্তিই বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে প্রকটিত; এই বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মময়ী মহাশক্তিরই দেশকালব্যাপী অনন্তবৈচিত্র্যোজ্জ্বল প্রকট মূর্তি। বস্তুতঃ ব্রহ্ম বা শিবের সহিত তাঁহার শক্তির কোন পার্থক্য নাই। শিবই শক্তি, শক্তিই শিব। বিশ্বাতীত স্বরূপে তিনি শিব বা ব্রহ্ম, বিশ্বে লীলায়মান-রূপে তিনিই শক্তি। গোরক্ষনাথ বলেন:

শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।
অন্তরং নৈব জানীয়াৎ চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব॥
(সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ)

শিবের অভ্যন্তরে শক্তি, শক্তির অভ্যন্তরে শিব; শিব ও শক্তির মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি করিবে না। যেমন চন্দ্র ও চন্দ্রিকায় কোন ভেদ নাই, তেমনি শিব ও শক্তিতে কোন ভেদ নাই। তিনি আরও বলেন, 'সৈব শক্তির্যদা সহজেন স্বস্মিন্ উন্মীলিন্যাং নিরুত্থানদশায়াং বর্ততে, তদা শিবঃ স এব ভবতি।' যে শক্তি বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভব ধারণ ও বিলয়কারিণী, যিনি 'নিজাশক্তি' 'আধারশক্তি' 'পরাশক্তি' ইত্যাদি নামে কথিত হন, সেই শক্তিই যখন সহজভাবে আপনার মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া নিরুত্থানদশায় স্ব-স্বরূপে বিরাজমান হন, তখন তিনি 'শিব' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

গোরক্ষনাথের দর্শনে পরমতত্ত্বের আত্মভূতা পরমা শক্তির নিত্যই দ্বিবিধ রূপে অভিব্যক্তি। এই দুই রূপকে তিনি 'প্রকাশ' ও 'বিমর্শ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকাশ-শক্তির অভিব্যক্তিতে পরমতত্ত্ব নিত্যই বিশুদ্ধ চিদানন্দ-স্বরূপে প্রকাশমান থাকেন, বিমর্শ-শক্তির অভিব্যক্তিতে সেই পরম তত্ত্বই আপনার অদ্বয় চিদানন্দস্বরূপ আবৃত করিয়া আপনাকে আপনি বিচিত্র নামে বিচিত্র রূপে বিচিত্র উপাধিতে অলংকৃত করিয়া দেশে কালে লীলায়িত হইয়া বিচিত্র ভাবে আস্বাদন করেন। বিমর্শ-শক্তি শিব বা ব্রহ্মকে আবরণ ও বিক্ষেপের ভিতর দিয়া প্রকাশ করেন। বিমর্শ-শক্তিই ব্রহ্মের আবরণ-বিক্ষেপাত্মিকা ত্রিগুণময়ী শক্তি। বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁহার বিমর্শ-শক্তিরই বিলাস। বিমর্শশক্তি-বিলসিত ব্রহ্ম বা শিবই বিশ্বরূপ। তিনি নিজেকে বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে উপলব্ধি ও সম্ভোগ করেন। আবার প্রকাশ-শক্তি-সহায়ে তিনি নিজেকে নিত্যই বিশ্বাতীত স্বরূপে আস্বাদন করেন। শক্তির এই উভয়রূপই ব্রহ্ম বা শিবের আত্মভূতা, স্বরূপভূতা, তাঁহার পারমার্থিক স্বরূপ হইতে অভিন্না। গোরক্ষনাথ ব্রহ্মের বিশ্বাতীত স্বরূপ ও বিশ্বময় স্বরূপ উভয়ই স্বীকার করেন। আপন স্বরূপের উভয়বিধ আস্বাদন লইয়াই ব্রহ্ম বা শিব অদ্বয় পরম তত্ত্ব। ব্যাবহারিক বিশ্বাত্মক স্বরূপকে যুক্তি-জাল দ্বারা মিথ্যাপ্রতিপাদন করিয়া পারমার্থিক বিশ্বাতীত স্বরূপকেই একমাত্র সত্য বলিয়া তিনি প্রচার করেন নাই।

জীবাত্মার জীবত্ব তিনি মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই, পক্ষান্তরে জীবাত্মাকে তিনি স্বরূপতঃ 'বহু' বলিয়াও বর্ণনা করেন নাই। জীবাত্মা অণুপরিমাণ কিংবা বিভু-পরিমাণ কিংবা মধ্যম-পরিমাণ, তাহা লইয়াও তিনি বিবাদে প্রবৃত্ত হন নাই। জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ কিংবা ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ হইয়াও

ব্রহ্মের অধীন ও আশ্রিত, এ-সব তর্কও তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই। চৈতন্যস্বরূপে পরিমাণের কোন প্রশ্ন উঠে না, অংশ-অংশী-ভেদ এবং আশ্রয়-আশ্রিত-ভেদও ঔপাধিক। গোরক্ষনাথের উপদেশ অনুসারে, শিব বা ব্রহ্মই আপনার শক্তি-পরিমাণকে অবলম্বন করিয়া অসংখ্য দেহপিণ্ডে অসংখ্য জীবাত্মা-রূপে অসংখ্য স্তরের আবরণ-বিক্ষেপ-প্রকাশের ভিতর দিয়া আপনাকে ও আপনার বিশ্বরূপকে আপনি বিচিত্রভাবে আস্বাদন করিতেছেন। অবিদ্যার অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে আপনি খুঁজিয়া হয়রান হওয়া, নানাপ্রকার দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণায় ছটফট করা, নানাবিধ বাসনা-কামনা দ্বারা জর্জরিত হওয়া এ-সবই তাঁহার বিমর্শ-শক্তি অবলম্বনে লীলা-বিলাস। এ-সকলের ভিতরেই তাঁহার নিজেকে নিজে আংশিক-ভাবে আস্বাদন। সকল জীবাত্মার মধ্যে সাক্ষিরূপেও তিনি নিত্য বিরাজমান। তিনিই জীবাত্মারূপে নিজেকে নিজে দেহাভিমানী ও বদ্ধ বোধ করেন, মুক্তি-পিপাসা দ্বারা চালিত হইয়া তিনিই নিজে নিজের পারমার্থিক স্বরূপ অন্বেষণ করেন। আবার প্রত্যেক জীবাত্মার মুক্তি-সাধনার ভিতর দিয়া তিনিই নিজের পারমার্থিক স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মুক্তির আস্বাদন করেন।

যে স্বতন্ত্রা জ্ঞানময়ী ইচ্ছাস্বরূপিণী মহাশক্তি বিশ্বাভিব্যক্তির অন্তরালে অদ্বয় পরমপুরুষ ব্রহ্ম বা শিবের বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে লীনা হইয়া অভিন্নভাবে অবস্থান করেন, সেই শিবানী মহাশক্তিই পরা অপরা সূক্ষ্মা ও কুণ্ডলিনী শক্তি-রূপে ক্রমশঃ আত্মবিকাশ করিয়া শিবের মহা-সাকারপিণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড দেহ রচনা করেন; আবার সেই মহাশক্তিই বিভিন্ন স্তরে বিচিত্র ব্যষ্টিপিণ্ড বা জীবদেহ-রূপে আপনাকে লীলায়িত করিয়া শিবকে অসংখ্য ক্ষুদ্রবৃহৎ দেহধারী জীব-রূপে বিচিত্র দ্বন্দ্বময় সংসারের বিচিত্র রসের আস্বাদন করান। শিবাত্মভূতা অচিন্ত্যা মহাশক্তির অনন্ত লীলাবিলাস। আত্মবিকাশ ও আত্মসঙ্কোচ তাঁহার চিরন্তন স্বভাব। সর্ব-প্রকার বিকাশ সঙ্কোচময় লীলাবিলাসের মধ্যেই শিব তাঁহার আত্মা, তাঁহার স্বামী, তাঁহার লীলাস্বাদক। সমষ্টিজগতে ও ব্যষ্টিজগতে শিবাভিন্না শিবসেবারতা মহাশক্তির অনন্ত লীলাবিলাসে, অসংখ্য স্তরে অসংখ্য ভাবের সঙ্কোচ-বিকাশে, নিত্য স্বরূপানন্দ-সমাহিত শিবের বিচিত্র উপাধি, বিচিত্র নামরূপ, বিচিত্র ভাব ও রসের আস্বাদন।

'নিজা পরাঽপরা সূক্ষ্মা কুণ্ডলিন্যাস্থ পঞ্চধা।
শক্তিচক্রক্রমেণোত্থো জাতঃ পিণ্ডঃ পরঃ শিবঃ।'
(সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ)

যে শিবময়ী মহাশক্তি অনন্ত বৈচিত্র্য-সমন্বিত বিশ্বপ্রপঞ্চের রচয়িত্রী, নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড জননী, সেই মহাশক্তিই আপনাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে সীমিত করিয়া, কুণ্ডলীকৃত রূপে প্রকটিত করিয়া, প্রত্যেক জীবদেহে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরূপে বিরাজ করেন। এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই জীবের বিচিত্র দেহেন্দ্রিয়-প্রাণমন-বুদ্ধির সংগঠনকারিণী, তিনিই সব জীবের আধ্যাত্মিক প্রেরণার আধার ও উৎস, তাঁহার অলক্ষিত প্রেরণাতেই সব জীব ক্রমশঃ আত্মোৎকর্ষের জন্য উৎসুক ও প্রযত্নশীল হয়, তাঁহারই অনুপ্রাণনাতে জীবের অন্তরে সীমার মধ্যেও অসীমের সহিত মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, জীবত্বের মধ্যেও শিবত্বের আস্বাদনের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক লালসা জন্মে। মানবদেহে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির এই অন্তঃপ্রেরণা বিশেষভাবে প্রকট হইয়া থাকে। তথাপি অধিকাংশ মনুষ্যের স্বভাবেই এই আধ্যাত্মিক

অন্তঃপ্রেরণা প্রায় প্রসুপ্ত অবস্থায় থাকে, তাহাদের অন্তশ্চেতনায় এই প্রেরণার ক্রিয়া হইতে থাকিলেও স্ফুটচেতনায় ইহার অনুভব হয় না। এই সব মানুষকে 'বদ্ধ জীব' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের প্রাণেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিযুক্ত দেহের মূলপ্রদেশে (মূলাধারে) কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতাবস্থায় ব্রহ্মদ্বার (সুষুম্নামার্গ) আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যমান থাকেন ; তিনি যেন একটি নিদ্রিত সর্প—কুণ্ডলী পাকাইয়া ব্রহ্মদ্বারে মুখ রাখিয়া শয়ন করিয়া আছেন, যোগিগণ এরূপ বর্ণনা করেন। অথচ তাঁহারই অন্তঃপ্রেরণায় তাঁহাকে জানাইবার জন্য মনবুদ্ধির ভিতরে ঔৎসুক্য সমুদিত হয়। গুরুনির্দিষ্ট যোগসাধন অবলম্বনে বিচারশীল বুদ্ধি প্রাণমন-ইন্দ্রিয়সমূহকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত করিয়া নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনীকে (অর্থাৎ অবিকশিত আধ্যাত্মিক চেতনাকে) জাগ্রত করিতে সচেষ্ট হয়। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে ব্রহ্মদ্বার খুলিয়া যায়, সুষুম্নামার্গ অবলম্বনে এই প্রবুদ্ধ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রার-স্থিত শিব-সুন্দরের সহিত পুনর্মিলনের জন্য ঊর্ধ্ব ঊর্ধ্বতর স্তরে উঠিতে থাকে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমবিকাশে জীব ক্রমশঃ আপনার শিবত্ব উপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং অবশেষে তত্ত্বালোকিত সমাধিতে সচ্চিদানন্দঘন শিব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গোরক্ষনাথ প্রভৃতি মহাযোগিগণ এই ব্যষ্টিদেহের মধ্যেই চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চকে উপলব্ধি করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ বলেন, 'পিণ্ডমধ্যে চরাচরং যো জানাতি স যোগী পিণ্ডসংবিত্তি-র্ভবতি'—এই দেহ মধ্যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-প্রপঞ্চকে যিনি উপলব্ধি করেন, সেই যোগীরই দেহের সম্যক্ জ্ঞান হইয়াছে, নিজ দেহের সহিত সম্যক্ পরিচয় হইয়াছে। ব্যষ্টিপিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সমরস সাধন, ব্যষ্টি ও সমষ্টি-পিণ্ডের সহিত পরমানন্দ বা শিবস্বরূপের সমরস সাধন, জীবত্ব ও ব্রহ্মত্বের সমরস সাধন, লীলাবিলাসিনী শক্তির সহিত দেশ-কালাতীত ব্রহ্ম বা শিবের সমরস সাধন,—এইরূপ সর্বাঙ্গীণ সমরস সাধিত হইলেই সমতত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান হয় এবং যোগে সিদ্ধিলাভ হয়। এইরূপ সমরস সাধিত হইলে এই স্থূল দেহও আর জড় পার্থিব দেহ থাকে না, এই দেহ চিন্ময় হইয়া যায়, এই দেহেই পূর্ণ মুক্তি ও অমরত্ব লাভ হয়।

যে সব স্তর ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিত বা অবিদ্যাচ্ছন্ন ভাব হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া সম্যক্ পূর্ণতম প্রবুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হন এবং শিবের সহিত পূর্ণভাবে একীভূত হন, এবং জীবচেতনা শিবচেতনায় পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা লাভ করে, গোরক্ষনাথ ও অন্যান্য সিদ্ধ যোগিগণ সেই সব স্তরকে চক্ররূপে ও পদ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন। দেহের মধ্যেই তাঁহারা সেই সব চক্রের ও পদ্মের নির্দেশ করিয়াছেন। এই সব চক্র ভেদ করিলে বিশ্বপ্রপঞ্চেরও সমস্ত চক্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অবিদ্যাচ্ছন্ন অবস্থায় এই দেহ ও বিশ্বপ্রপঞ্চ মাঝখানে থাকিয়া যেন জীব ও শিবকে পৃথক্ করিয়া দুই প্রান্তে রাখিয়াছে। দেহ ও বিশ্বপ্রপঞ্চের চিন্ময়ত্ব সাধন করিতে পারিলেই জীব ও শিবের কোন ব্যবধান থাকে না, তখন সব শক্তিবিলাসের মধ্যে অন্তরে বাহিরে জীব এই এক অদ্বিতীয় শিব বা ব্রহ্মকেই উপলব্ধি করে। যুক্তিদ্বারা দ্বৈত নিরসনপূর্বক অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা নয়, সব দ্বৈতের মধ্যে এক অদ্বৈতেরই জাজ্বল্যমান সাক্ষাৎকার হয়। ইহাই যোগের লক্ষ্য।

কালোর চোখে আলোই কালো

(কথিকা)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বড় নামডাক তার,
আশ্চর্য গণককার,
রাজার সভায়
বলে : "আমি হে রাজন্
যোগে সবাকার মন
জানি লহমায়।"

মন্ত্রী করে ব্যঙ্গ : "জানি—
জ্যোতিষী সবাই জ্ঞানী,
ধ্যানী, অন্তর্যামী ;
তবু বলো দেখি শুনি
কারে এ-ভুবনে গুণী
জ্ঞানী গণি আমি ?"

কহিল গণক : "মান
তারে তুমি করো দান
যে রহে বাহিরে
কর্মাসক্ত অনুক্ষণ
চিন্তা করি' বিসর্জন ;
মজে না গভীরে ;

প্রচার যে করে নিতি
বাহুবল ; দেয় বিধি
শক্তি মদ ভরে ;
বিক্রমাদিত্যের কীর্তি
গণে যে পরম সিদ্ধি,
চায় যে অন্তরে

প্রজার ভয়েরি অর্ঘ ;
কামনা-রঙিন স্বর্গ
গৌরবে সাজায় ;
শাশ্বতে না চেয়ে হায়
স্বর্ণমৃগ তরে ধায়
লুব্ধ বাসনায়।"

রাজা কহে হাসি' : "মন
সবার জানো যখন,
বলো দেখি আমি
বরেণ্য গণি বা কারে,
ধূপ-দীপ-উপচারে
নিবেদি' প্রণামী ?"

কহিল গণক : "মান
তারে তুমি করো দান—
নির্লক্ষ্য গতির
যে পূজারী নিশিদিন,
চায় শুধু প্রদক্ষিণ
করিতে মহীর

চারিধারে মত্তপ্রায়
উল্কার ঝলকে হায়,
যে দর্পে রটায়—
'গতি বিনা গতি নাই,
আরো বেগে ধাও তাই
নির্লক্ষ্য নেশায়।'

হে রণেন্দ্র। ভক্তি শান্তি
তুমি মনে করো ভ্রান্তি,
চাও নির্বাসিতে
তব রাজ্য হ'তে ছলে
বলে কি বা সুকৌশলে
যারা ধরণীতে

প্রেমের সাধনা করে ;
রুষি' তাহাদের 'পরে
ব্যঙ্গবাণ হানো ;
শিব সত্য সুন্দরেরে
শাঙ্কি' দৃপ্ত অশান্তেরে
মহাজন মানো।

শুধু প্রভু, সাবধান!
মিথ্যারে সত্যের মান
যে দেয় ধরায়,
বিপরীত বুদ্ধি তার
আনে টেনে হাহাকার
আসুরী মায়ায় :

কালোরে যে বাসে ভালো
আলোরে সে দেখে কালো,
বরি' আত্মঘাত ;
ভগবানে সে না মানি'
উন্মাদেরে গণে জ্ঞানী,
জ্ঞানীরে উন্মাদ।"

মন্ত্রী মহাক্রোধে কহে :
"হে লোকেশ! নাহি সহে
এহেন স্পর্ধার—"
রাজা বলে : "নাহি ক্ষতি
প্রমাণ দেখাতে যদি
পারে এ-কথার।"

কহিল সে : "পারি—তবে
অপেক্ষা করিতে হবে
ত্রিসপ্তাহ—যবে
ঘোর অমাবস্যা-রাতে
নামিবে অঝোর-পাতে
মোহমদ ভবে—

দানবী আসব-ধারা—
পান করি' দিশাহারা
হবে জনে জনে ;
কোরো না সে-সুরাপান,
তা হ'লে পাবে প্রমাণ
সেই দুর্লগনে।"

কাল অমাবস্যা-রাতে
সে-বারুণী-ধারাপাতে
মাতিল এ-মহী ;
শুধু ওরা দুই জন
করিল না আস্বাদন
কৌতূহল বহি'।

দেখিতে দেখিতে কারা
আসে ওই আত্মহারা
ফাটায়ে গগন
আসুরিক অট্টহাসে
চমকিয়া মহাত্রাসে
নিরীহ ভুবন।

কেহ করে নৃত্য, কেহ
চায় লালসার গেহ
বরি' অন্ধকার ;
কেহ বা করে প্রলাপ,
কেহ দেয় অভিশাপ,
কেহ বা টঙ্কার

করে বিশ্বধ্বংসী ধনু ;
কেহ ধায় নগ্নতনু ;
কেহ পঙ্কে লোটে ;
কেহ বা উল্লাসে মাতি'
অন্ধসম আত্মঘাতী
দিগ্বিজয়ে ছোটে।

কেহ বলে : "বর্ম চর্ম
পরি' চলো, কোথা ধর্ম?
কোথা দয়াময়?
প্রতি অণুদৈত্যে গতি-
দীক্ষা দিলে সর্ব ক্ষতি
পূরিবে নিশ্চয়।"

রাজার প্রাসাদে এসে
প্রমত্তেরা কহে হেসে :
"ওঠ্ মূঢ় ! চল্ !
জ্বালায়ে মশাল বাতি
পিঙ্গলিয়া অমারাতি
আজ যে পাগল

আমাদের হ'তে হবে
তাণ্ডবের মহোৎসবে,
শুধু মত্ততায়
আনন্দের পাবি দিশা,
পোহাবে তমিস্রা-নিশা
হিংস্র মহিমায়।"

চলে রাজা মন্ত্রী সাথে,
ভয়াল লোহিত রাতে
শোনে—ওরা বলে :
"এরা আমাদেরি মতো
রক্তরসাতলব্রত
তাই সাথে চলে।

যারা অন্ধ—শুধু তারা
জানে না যে, আত্মহারা
যাহারা না হয়,
তারাই উন্মাদ ভবে ;
লক্ষ্যহীন গতিস্তবে
মিলিবে অভয়।"

রাজা মন্ত্রী ভয়ে বলে :
"না না আছে ধরাতলে
জ্ঞানী স্নিগ্ধ স্থির।
তোমাদের মতো ভ্রান্ত
তারা নয়, তারা শান্ত,
প্রেমল, সুধীর।"

উন্মাদেরা হেসে মরে :
"শুনে যা প্রলাপ ওরে,
বদ্ধ পাগলের—
বলে কিনা—ভক্তি প্রেমে
আসে ভ্রান্তি বুকে নেমে
শান্তি অনন্তের !

দেখ্ ফল মূঢ়তার—
করে না যে অনিবার
গতিরে বন্দন,
চায় ধ্যান-শান্তি-ধাম—
হয় তার পরিণাম
কী ঘোর ভীষণ !

বিনা শক্তি-উন্মাদনা
এ-জীবন বিড়ম্বনা ;
প্রবৃত্তি-বিহারী
যে চঞ্চল, স্বয়ম্বরা
হ'য়ে দেয় বসুন্ধরা
মালা গলে তারি।"

মোহান্ধেরা দলে দলে
জয়ধ্বনি ঘোষি' চলে
গণমন-গৌরবের আনন্দে অধীর :
"শুধু মত্ত গতি-ব্রতে
দিশা মিলে এ-জগতে
নিরীশ্বর বস্তুবাদী বিজ্ঞানী সিদ্ধির।"

জনসংঘ মদমত্ত
সে-সংক্ষোভ মাঝে সত্য
দেখে হায় অপ্রমত্ত দু-জন কেবল।
অসংখ্যেরা অট্টহেসে
বলে : "দেখে যারে, এসে
জ্ঞানীদের দেশে কে দুটো পাগল !"

শিশুশিক্ষায় মন্তেসরীর আকর্ষণ

শ্রীমতী রেণুকা সেন

কলিকাতার একটি নামকরা বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ করতে করতে দেখলাম, ওপরের শ্রেণীগুলিতে পড়াতে মন্দ লাগছে না, বিশেষ ক'রে মেয়েদের নিয়ে এখানে সেখানে বেড়াতে যাওয়া, পিকনিক করা, তাদের দিয়ে অভিনয় করানো, তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো চলাফেরা বেশ ভালই লাগছিল। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, ততই আমার প্রশ্ন জাগলো, ওপরের শ্রেণীর মেয়েদের প্রতি যে-ভাবে নজর রাখা হয়, নীচের শ্রেণীগুলিতে কেন সে-রকমটি হয় না? বিদ্যালয়ের আধা-অন্ধকার ঘরগুলিতে সারি সারি বাঁকা তোবড়ানো বেঞ্চিতে ঠাসাঠাসি ক'রে বসেছে চল্লিশ-পঞ্চাশটি মেয়ে, তাদের বয়স তিন চার বছর থেকে সাত আট বছরের বেশী নয়। তার ওপর পড়াশোনাও তাদের ঠিকমত হয় না। অর্ধেক দিন দেখি, শিক্ষিকা অনুপস্থিত, শিশুরা ক্লাসের মধ্যে কাজের অভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু কারও সেদিকে দৃষ্টি নেই। আশ্চর্য লাগলো।

এই সব দেখে শুনে শিশুদের জন্য আমার সাধ্যমত কিছু একটা করার প্রেরণা অনুভব করতে লাগলাম। অবশ্য আগে থেকেই গঠনমূলক কোন একটা কাজ করার ইচ্ছা আমার ছিল। এইবার শিক্ষকতা করতে এসে পথ খুঁজে পেলাম। শিশুর প্রতি সব দিক থেকে সমাজের অবহেলা আমাকে সচেতন ক'রে তুললো এই দিকের কিছু কাজ করতে। ভাবতে লাগলাম, শিশুশিক্ষার অভাব কি ক'রে দূর করা যায় এবং কোন্ পথে গেলে শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হওয়া সম্ভব। নানা রকম বই এবং বিভিন্ন শিক্ষাবিদের লেখা পড়ে চেষ্টা করতে লাগলাম সর্বাঙ্গসুন্দর শিশুশিক্ষার একটা পথ খুঁজে বার করতে। রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি আমাকে প্রচুর প্রেরণা দিয়েছে এবং আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছে যে, চিরাচরিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমাদের শিশুদের শিক্ষা কিছুতেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ইতিমধ্যে কয়েকটি পত্রিকায় মাদাম মন্তেসরীর আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার কথা পড়ে ভাল লাগলো; কিন্তু মন্তেসরী-প্রণালীতে শিশুশিক্ষার ব্যাপারে আমি কোন অভিজ্ঞতাই লাভ করিনি।

তাই যখন বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করবার একটা সুযোগ এসে গেল, তখন আমার মন্তেসরী ট্রেনিং-এর কথাই প্রথমে মনে প'ড়ল। হিতৈষীরাও বললেন, 'তোমার যখন শিশুশিক্ষার দিকে উৎসাহ, তখন তুমি মন্তেসরী-প্রণালীর শিক্ষাই ওখান থেকে নিয়ে এস।' কিন্তু এমনই অদৃষ্টের পরিহাস, শিশুদের বিষয়ে কোন ট্রেনিং আমার নেওয়া হ'ল না। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের তাগিদে আমাকে বড় ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধেই ট্রেনিং নিয়ে আসতে হ'ল। কিন্তু বড়দের পড়াতে আর ভাল লাগে না; বড়দের ক্লাসে বসেই মনে হ'ত, একবার দেখে আসি, ছোটরা এখন কি ভাবে আছে, কি করছে, ওদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা? সময় পেলেই কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম। ওরা প্রায়ই আমার কাছে পড়তে চাইত; কাজ করতে চাইত, আমার সঙ্গে খেলতে চাইত। ছবি আঁকা, কাগজ কাটা, রকমারি ছোট ছোট

খেলার জিনিস বানানোয় দেখতাম তাদের প্রচুর উৎসাহ।

বিদেশের বিভিন্ন শিশুবিদ্যালয়ে এই ধরনের কাজের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা লক্ষ্য করেছি। মাদাম মন্তেসরীর লেখাতেও পড়েছি যে, আনন্দ ও স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে শিশু যা শেখে তা অনায়াসে ও সহজে শেখে, প্রত্যেক চরিত্রেই এক একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য শৈশব স্বভাবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা বিকশিত হ'তে পায় না। বয়স্কদের নিষেধ, শাসন ও বিরোধিতার ফলে শৈশবেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়। মাদাম মন্তেসরীর মতে আনন্দ ও স্বাধীনতার মধ্যে ছাড়া পেলে সেই বৈশিষ্ট্য শিশুর স্বভাবে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রথম প্রয়োজন শিশুর চার পাশে আনন্দপূর্ণ একটি স্বাধীন পরিবেশ সৃষ্টি করা। আবার বয়স্কদের সস্নেহ সহযোগিতা ছাড়া সেটি হওয়াও সম্ভব নয়। বড়দের যাতে আনন্দ, ছোট শিশুর যে তাতে আনন্দ, তা নয়। শিশুর প্রথম ও প্রধান আনন্দই হ'ল খেলা। সদা-চঞ্চল শিশু সর্বদাই কোন একটা খেলা নিয়ে মেতে থাকতে চায়। মন্তেসরী-প্রণালীতে তাই উপ-করণগুলিকে (apparatus) খেলার সামগ্রী মনে ক'রে খেলাচ্ছলে শিশু সবকিছু নিজেই শিখে নেয়।

মন্তেসরী-শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্বাধীনতা থাকে অনেক বেশী এবং ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষা-দান-পদ্ধতির প্রবর্তন মাদাম মন্তেসরীই প্রথম করেন। শিশু স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাই তার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কোন প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ হ'তে পারে না। শিক্ষাকালে শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের কাজ ক'রে যাবে। শিক্ষিকা শিশুর প্রয়োজন মতো তাকে সাহায্য করবেন, নির্দেশ দেবেন মাত্র, কিন্তু তার কোন প্রচেষ্টায় বাধা দিতে পারবেন না।

মন্তেসরীর সুস্থ ও মুক্ত আবহাওয়াতে লাগামছেঁড়া শিশু-মন যে সত্যি সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ আমি কিছুদিনের মধ্যেই পেলাম। উচ্চ বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে, মন্তেসরী ট্রেনিং না নিয়েই শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলাম। সেখানে ট্রেনিংপ্রাপ্তা শিক্ষিকার সাহায্যে কয়েকজন শিশুকে পর্যবেক্ষণ ক'রে তাদের ক্রমোন্নতি দেখে আশ্চর্য হলাম! মন্তেসরীর প্রতি আমার আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল।

অমল ও অরুণ দুই ভাই ভরতি হ'ল জানুআরি মাসে। বড় ভাই অমল লক্ষ্মী ছেলের মতো সব কাজ ক'রে যেতে লাগলো; কিন্তু মহা মুস্কিল হ'ল তিন বছরের অরুণকে নিয়ে। সে কিছুতেই ঘরে ঢুকবে না, বারান্দায় বসে থাকবে আর কেউ তাকে বুঝিয়ে ঘরে নিতে গেলে তাকে আঁচড়ে, কামড়ে, চুল ছিঁড়ে, গায়ে থুথু দিয়ে একাকার করবে। অবশেষে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে তার সামনেই অন্য কয়েকটি শিশুকে মন্তেসরীর নানা রঙবেরঙের উপকরণ দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। আমি আড়াল থেকে অরুণের মতিগতি লক্ষ্য করতে লাগলাম। প্রথম দিন দেখলাম, সে সারাক্ষণ অবাক্ হয়ে উপকরণগুলির দিকে একবার এবং অন্য শিশুদের দিকে একবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। দ্বিতীয় দিনে দেখলাম, কিছুক্ষণ নিজের জায়গায় বসে থেকে হঠাৎ উঠে গেল যেখানে অন্য শিশুরা বসেছিল সেখানে এবং একজনকার কাছ থেকে তেকোনা টুকরো কতকগুলি ছিনিয়ে নিয়ে কাজে লেগে গেল। তখন মন্তেসরী-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তার উপযুক্ত উপকরণ সামনে রেখে দেখিয়ে দিলেন। অরুণ তখন মহানন্দে সেগুলি নিয়ে কাজ করতে শুরু ক'রে দিল। তারপর থেকে একদিনও যে

অনুপস্থিত হয়নি বা বিদ্যালয়ে এসে অবাধ্যতাও করেনি। এসেই নিজের কাজ ক'রে যেত, কারও সঙ্গে কাজের সময় কথাও বলতো না।

আড়াই বছরের টুটুলকে প্রথমে দেখতাম, কেবল ছুঁড়ে ছুঁড়ে সব উপকরণগুলি বাইরে ফেলে দেওয়ার ইচ্ছা। আর কিছুতেই একটা জিনিস নিয়ে সম্পূর্ণ কাজ করবে না। অল্প একটু করেই কাজ হয়ে গেল। কিন্তু এক মাস পরে তাকেই দেখলাম, বেশ মন দিয়ে কাজ করছে, দুমাস পরে দেখলাম টুটুল অনেক কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবে করতে শিখে গেছে। চার বছরের টুটুল পড়াশোনার দিকেও অনেক এগিয়ে গেল। আমি আর একবার বিস্মিত হলাম।

সাড়ে তিন বছরের দেবাশিস ছিল আর এক ধরনের। কোন কিছুতেই তার উৎসাহ ছিল না। এমন কি খেলাধূলার সময়েও সে একপাশে চুপ ক'রে একলাটি বসে থাকত। গান, ছবি আঁকা, গল্প, ড্রিল কোন সময়েই তাকে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিতে দেখা যেত না। তার সামনে বিভিন্ন উপকরণ সাজানো থাকত, কিন্তু সেদিকে তার যেন কোন খেয়ালই ছিল না, কেবল অন্য শিশুদের দিকে উদাসীনভাবে চেয়ে থাকত। শুনেছিলাম, সে দাদু-দিদিমার কোলে কোলে আদরে মানুষ হয়েছে। তাই আমার মনে হ'ত যে, তার নিজের ওপর বিশ্বাস খুব কম, আর কোন ব্যাপারেই আত্মনির্ভরতা তার একেবারেই যেন ছিল না; হেঁটে চলে বেড়াতে পারলেও তার মনে হ'ত যেন পড়ে যাবে। ভাবগতিক দেখে তার বাড়ীর লোকেরা প্রায়ই এসে আমাকে বলতে লাগলেন, 'দেবাশিসের কোন উন্নতি হচ্ছে না কেন?' আমি মনে মনে খানিকটা দমে গেলেও তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম, 'ধৈর্য ধরুন, নিশ্চয়ই ও উন্নতি করবে, তবে একটু বেশী সময় লাগবে, এই যা।' আমার কথা এখন সত্যে পরিণত হ'তে চলেছে। দেবাশিস আজকাল নিজের কাজকর্মে ও পড়াশোনায় বেশ সুফল দেখাচ্ছে। আত্মনির্ভরতাও তার অনেক বেড়ে গিয়েছে। আগে মা-দিদিমাকে দেখলেই কোলে ওঠার জন্য বায়না ধ'রত; আজকাল ছুটির পর তাঁদের দেখলেও ছুটে চলে যায় বাইরে খেলতে, স্লিপে চড়তে। তবে অন্যান্য শিশুর তুলনায় একটু আস্তে আস্তে সে সব কিছু শিখেছে।

এই অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, মন্তেসরী-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে শিশু ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে আত্মনির্ভরশীল, হাসিখুশি, মুক্তগতি অথচ সংযমী। শিশুর দৈহিক, মানসিক, পারিবারিক, ও সামাজিক—সবগুলি সত্তাই এক সঙ্গে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হ'য়ে ওঠে এই নতুন শিক্ষাধারার মাধ্যমে। বিদ্যালয়ের নামে যে একটা আতঙ্ক বা ভীতি, সেটা তাদের একেবারেই থাকে না। বিদ্যালয়কে তারা মনে করে তাদের নিজেদেরই আর একটি বাড়ী (second home), যেখানে তাদের অবাধ স্বাধীনতা আছে আপনার সুকুমার বৃত্তিগুলিকে প্রস্ফুটিত ক'রে তোলার, অথচ কোন কিছুতেই বিশৃঙ্খলা নেই।

আমার মতো হয়তো অনেক আগ্রহশীল শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, যাঁরা শিশুদের জন্য সত্যিকারের কিছু করতে গিয়ে মন্তেসরী-শিক্ষাপ্রণালীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন ও সুফল পেয়েছেন। শহরে ও গ্রামে বিভিন্ন সংস্থাতেও হয়তো বহু শিশুদরদী আছেন, যাঁদের কাছে মন্তেসরীর আকর্ষণ প্রবল। সেই মহীয়সী জননী ডাঃ মন্তেসরীর নামে প্রতিটি মানুষকে যদি আজ শিশুর প্রতি উৎসাহী ক'রে তুলতে পারা যায়, তা হ'লে কত মধুর হবে আমাদের

এই সমাজ। তাই আজ এই নতুন শিক্ষা-প্রণালীকে কেবলমাত্র শিক্ষকসমাজে এবং শহরের বিদ্যালয়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা ঠিক হবে না। সমাজের প্রতি-স্তরের মানুষকে—প্রধানতঃ অভিভাবকদের নিয়ে আসতে হবে এই কাজে; বিশেষ ক'রে মায়েরা সম্ভবমত যদি মন্তেসরী পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন, তবেই তাঁদের শিশুদের সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হ'তে পারে। মায়েদের সহযোগিতা পেলে শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করা খুবই সহজ, এ কথা মাদাম মন্তেসরী বহুবার ব'লে গেছেন। এই ব্যাপারে গ্রামের ও শহরের শিশুশিক্ষাবিদ্‌গণ বিভিন্ন গ্রামীণ সংগঠন ও সমাজ-কল্যাণ সংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ করলে ভবিষ্যতে যথেষ্ট সুফল আশা করা যেতে পারে।

বিজয়া-দশমীতে

শ্রীশান্তশীল দাশ

বছর পরে এলি মা তুই, আবার নাকি যাবি চলে?
চলে-যাবার ও-পথখানি পিছল হ'ল চোখের জলে।
আবার আসিস্, আসিস্ মাগো,
ভুলে মোদের থাকিস্ না গো—
বারে বারেই এই কামনা জানাই মা তোর চরণতলে।

যাওয়া-আসা কোথায় মা তোর, বিশ্বময়ী বিশ্বমাঝে!
চিরদিনের আসনখানি উজল হয়ে নিত্য রাজে।
কত উদয়, কত বা লয়,
ও-আসনের আছে কি ক্ষয়!
মিছেই বলি যাওয়া-আসা, অবোধ শিশু কী না বলে।

সংস্কৃত-ভাষার সেবায় কম্বুজ-নারী

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত পঠন-পাঠন চলে আসছিল অতি ব্যাপকভাবে—কেবল বিগত কয়েক শতাব্দীতে তা হ্রাস পেয়েছে। দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে—বিশেষভাবে বঙ্গদেশের সঙ্গে এঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে ছিল নিগূঢ় সংযোগ। হিন্দুভারত ও বৌদ্ধভারত—দুই-ই এঁদের হৃদয় গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আমাদের শৈব, বৈষ্ণব, পাশুপত প্রভৃতি সর্ব ধর্মতত্ত্ব ও তথ্য বিষয়ে এঁদের ছিল খুবই আগ্রহ। বৌদ্ধধর্ম এবং বুদ্ধজননীর প্রতিও এঁদের অগাধ শ্রদ্ধা। উমা, লক্ষ্মী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবীরা এখানে পূজা লাভ করেছেন শত শত শতাব্দী ধরে। কম্বুজ-দেশের (কাম্বোডিয়া) অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ আকর্ষণ করেছিলেন সংস্কৃত-জননী। সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোৎকৃষ্ট পাণিনি ; তার অন্যতম বৃত্তি জয়াদিত্য—বামন-কৃত 'কাশিকা' ; তার টীকা বাঙালী বৈয়াকরণ জিনেন্দ্রবুদ্ধির 'ন্যাস'। এই 'ন্যাস' অতি ব্যাপক ও গভীরভাবে পড়ানো হ'ত এই অঞ্চলে। ভগবান্ শঙ্করাচার্যের শিষ্য এখানে গিয়েছিলেন ধর্মপ্রচার করতে ; তিনি সেখানে 'রাজগুরু'র আসন লাভ ক'রে শঙ্কর-মত প্রচার করেছিলেন। 'হরি-হর' পূজাও এখানে ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

কিছু পরবর্তী সময়ে ভগবান্ বুদ্ধের ধর্মও এখানে প্রচারিত হ'ল, মহাযান বৌদ্ধধর্মও সমধিকভাবে—যার বিশিষ্ট সকল ধর্মগ্রন্থই সংস্কৃতে রচিত। ফলে—কম্বুজ-দেশবাসী হিন্দু-ধর্মাবলম্বী বা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীই হোন, ধর্ম-শিক্ষার জন্য তাঁরা সকলেই সংস্কৃত বিশেষভাবে শিক্ষা করতেন। মাতৃজাতিরও ধর্মপ্রচারে প্রচুর উৎসাহ ছিল। তাঁরাও সংস্কৃতে নিষ্ণাতা হয়ে জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় দিকেই অভ্যুন্নতির নিমিত্ত—কেবল সার্থকতা-লাভে ধন্য হননি, স্বকীয় রচনার মাধ্যমে স্থায়ী কীর্তিও উত্তরাধিকার-সূত্রে আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতমা হচ্ছেন—ইন্দ্রদেবী।

সৌভাগ্যক্রমে ইন্দ্রদেবী-বিরচিত জয়বর্ম-দেবের সময়ের ফিমলক (Phimlok) প্রস্তরলিপি আঙ্কোর থোমে (Angkor Thom) মন্দিরের নিম্নস্থ ভূগর্ভ থেকে প্রোথিত হয়েছে।[১] এই লিপিটি ১০২টি সংস্কৃত শ্লোকে সম্পূর্ণ। উপজাতি, বংশস্থ, বসন্ততিলক প্রভৃতি ছন্দ এতে প্রযুক্ত হয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে ইন্দ্রদেবী এই রচনায় নিজের বিষয়ে, নিজের ভগিনীর বিষয়ে, রাজা জয়বর্মদেবের বিষয়ে অনেক কথাই বলেছেন। লিপির প্রথমাংশ অতি খণ্ডিতভাবে আমাদের হাতে এসেছে ; শেষের দিকটায় অনেকটা অব্যাহত আছে। তা থেকে ইন্দ্রদেবীর বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি।

ইন্দ্রদেবী নিজের কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রশংসায় মুখর। তিনি নিজেই তাঁকে সংস্কৃত ভাষায়

---

১ BEFEO (Bulletin d' Ecole Francaise d' Extreme Orient, Hanoi), XXV. 372 ; Coedes, Inscriptions du Cambodge. II. 161

পরম-পণ্ডিতা ক'রে তুলেছিলেন। তিনি নিজে নগেন্দ্রতুঙ্গ, তিলকোত্তর এবং নরেন্দ্রাশ্রম—এই তিন স্থানের বিহারসমূহের ভিক্ষুণীবৃন্দকে বিশেষ ক'রে ধর্মশিক্ষা দিতেন।

এই লিপিতে কম্বুজদেশ-নিবাসী জয়বর্মদেবের চম্পার রাজধানী শ্রীবিজয়-বিজয়ের উদ্দেশ্যে অভিযানের বর্ণনা আছে। জয়বর্মদেবের হস্তে চম্পারাজ যশোবর্মদেব (দ্বিতীয়) নিহত হন এবং জয়বর্মদেব জয়লাভ করেন।

জয়বর্মদেব যখন চম্পা আক্রমণে নির্গত হন, তখন তাঁর পত্নী কি কঠোর তপশ্চর্যায় দীর্ঘকাল আত্মনিয়োগ করেছেন, তার বর্ণনা রয়েছে ৪০—৫৮ সংখ্যক শ্লোকে :

> শ্রীইন্দ্রদেব্যগ্রভবানুশিষ্টা
> বুদ্ধং প্রিয়ং সাধ্যমবেক্ষমাণা।
> দুঃখাম্বু-তাপানল-মধ্যবর্তি-
> বর্ত্মাচরৎ সা সুগতস্য শান্তম্ ॥ ৫৮

এমন কঠোর তপশ্চর্যা তিনি করেছিলেন, যার ফলে যেন সর্বদা নিজের পতিকে চোখের সম্মুখেই দেখতে পেতেন (শ্লোক ৬১—৬৪)। পতির স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর তিনি ধর্মচর্যার মাত্রা কমাননি, বরং অধিকতর ধর্মাচরণে মনোনিবেশ করলেন (৭১—৯৩)। জাতক থেকে ঘটনা অবলম্বনপূর্বক একটি নাটক রচনা করিয়ে তিনি ভিক্ষুণীদের দিয়ে তা অভিনয় করিয়েছিলেন। বিশিষ্ট মন্দিরসমূহে কত অজস্র দান করলেন তিনি।

ঈদৃশী তপোবৃদ্ধা রাজমহিষীর দেহপাতের পরে রাজা জয়বর্মদেব মহিষীর অগ্রজা ইন্দ্রদেবীর অর্থাৎ বর্তমান শিলালিপির রচয়িত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। রাজার অনুমতিক্রমে তিনি বিদ্যাদানে মনোনিবেশ করলেন।

> "স্থিতা নরেন্দ্রাশ্রমনাম্নি ধাম্নি যা
> নরেন্দ্রকান্তাধ্যয়নৈর্মনোরমে।
> ররাজ শিষ্যাভিরজস্রচিন্তিতা
> সরস্বতী মূর্তিমতীব তদ্বিতা ॥" ৯৯

ভগিনীর অপূর্ব জীবনচর্যা এবং পতি জয়বর্মার বিজয়গৌরব প্রভৃতি কীর্তন-মানসে তিনি রচনা করলেন এই মন্দিরগাত্র-লিপি :

> স্বভাবভূতপ্রতিমা বহুশ্রুতা
> সুনির্মলা শ্রীজয়দেববর্মভাক্।
> ইদং প্রশস্তং বিমলং বিধায় সা
> নিরস্তসর্বাণ্যকলা বিদিদ্যুতে ॥ ১০২

১০০ সংখ্যক শ্লোক থেকে জানা যায়—ইন্দ্রদেবী ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা; বিবাহ করেছিলেন ক্ষত্ররাজকে। অন্যান্য রচনা থেকেও মনে হয় না ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বিবাহে কোনও বাধা ছিল।

কম্বুজ-দেশের আর একজন মহিমময়ী সংস্কৃতবিদ্যানিপুণা রমণী 'নমঃশিবায়'-পত্নী এবং ভূপেন্দ্রপণ্ডিত-জননী 'তিলকা দেবী'—যাঁর পরবর্তী নাম 'বাগীশ্বরী ভগবতী'। তাঁর কীর্তি-গাথায় কম্বুজ-দেশের সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস পরিপূর্ণ। বংশপরম্পরা-ক্রমে তাঁর পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রগণ রাজগুরু এবং শ্রেষ্ঠ মন্ত্রদাতৃরূপে দেশের করেছেন অকৃত্রিম সেবা।

এভাবে এশিয়ার অনেক দেশেই সংস্কৃতের সেবা চলেছিল অব্যাহতভাবে।

ভগবতীর অর্চনা-কালে এই মাতৃ-'গণ'কে প্রণতি নিবেদন করি।

সমালোচনা

Reminiscences of Swami Vivekananda : By His Eastern and Western Admirers. Published by Swami Gambhirananda, President, Advaita Ashrama, Mayavati, Almora, Himalayas. Calcutta Centre : Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Calcutta 14. Pp 404 ; Price : Rs. 7·50.

আসন্ন শতবার্ষিকীর পটভূমিতে স্বামীজীর শিষ্য, ভক্ত ও গুণমুগ্ধদের এই স্মৃতিসঞ্চয়নটি আবার আমাদের নতুন ক'রে সেই দেবমানবের সান্নিধ্যে উপনীত করেছে।

এজন্য অদ্বৈত আশ্রম-কর্তৃপক্ষ সাধারণ পাঠকদের অশেষ ধন্যবাদভাজন। বাস্তবিক অন্তরঙ্গ স্মৃতিকথার যে মধুর বৈচিত্র্য এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত, তার ফলে বিবেকানন্দ-জীবনের বহুমুখী প্রভাব সম্বন্ধে অনায়াসে একটি সামগ্রিক ধারণা জন্মাতে পারে। সহপাঠী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শিষ্য হরিপদ মিত্র, গুণমুগ্ধ সুন্দররামা আয়ার ও মাদাম কালভে, নিবেদিতপ্রাণা ভগিনী ক্রিস্টিন ও নিবেদিতা, ভক্তবন্ধু জোসেফাইন ম্যাকলাউড—এমনি নানা জনের স্মৃতিকথায় বিবেকানন্দের বাণী ও কাহিনীতে মিলে পরমসত্যের এই প্রাণদীপ্ত প্রকাশের সমুজ্জ্বল জ্যোতি পাঠকচিত্তকে সশ্রদ্ধ অনুরাগে উদ্ভাসিত করে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভগিনী ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথন। এমন সরল প্রাণময় বর্ণনাভঙ্গী সাহিত্যে দুর্লভ সামগ্রী।

এই অমূল্য গ্রন্থটির অধিকাংশই মূলতঃ ইংরেজী রচনা। তাদের মধ্যে যে-সব রচনা এখনও বাংলায় অনূদিত হয়নি, সেগুলি অনুবাদ ক'রে এ গ্রন্থের একটি বাংলা সংস্করণ যথাশীঘ্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে এ কথাও স্মরণীয়, লেখকদের ব্যক্তি-পরিচয় না থাকলে স্মৃতিকথা অপূর্ণ থেকে যায়।

শোভন পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ এই গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। যাঁরা স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভালবাসেন এবং নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আগ্রহশীল, এ গ্রন্থ তাঁদের নিত্যসহচর হয়ে উঠবে—এ কথা বলাই বাহুল্য।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কুমারবিজয়—ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন-মন্দির, পোঃ—কুণ্ডা, দেওঘর (এস. পি.)। পৃষ্ঠা ৯৮ ; মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি মহিষাসুরের ইতিবৃত্ত, গণেশের জন্মবৃত্তান্ত, কুমারবিজয় ও কুরুক্ষেত্রে মহাত্মা বর্বরীক—এই কাহিনী-চতুষ্টয়ের সংকলন। ইহার প্রথম সংস্করণ 'তপঃকুমার' নামে প্রকাশিত হয়। স্মরণাতীত কাল হ'তে এপর্যন্ত জগতে যত মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে, প্রত্যেকেরই মাতা-পিতা কঠোর সংযমী ও তপস্বী। আত্মসংযম ও তপস্যা ছাড়া কখনও সুসন্তান লাভ হয় না—কাহিনীগুলিতে এই এই শিক্ষাই নিহিত। কাহিনীগুলি সুখপাঠ্য ও সৎশিক্ষাপ্রদ। গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল—সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বসু ঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮১; মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থটিতে গুরুপূজা, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, শক্তিপূজা, কালীতত্ত্ব, বাগ্‌দেবী সরস্বতী, শিবরাত্রি-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের রহস্য ও তত্ত্বকথা আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষাংশে আচার্য শঙ্করের 'মণিরত্ন-মালা'র শ্লোকগুলি পদ্যানুবাদ-সহ সংযোজিত। রচনাগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুগণ এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন। গ্রন্থের ভাষা সহজ সরল। ইহা প্রচারের বিশেষ উপযোগিতা আছে।

—সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

Precepts for Perfection—Teachings of the disciples of Sri Ramakrishna—Compiled by Sabina Thorne. Ganesh & Co. (*Madras*) *Private Ltd.* Madras 17. Pp. 235 ; Price Rs. 10.

ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরগণের বাণী-সঙ্কলন। মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—পূর্ণতার উপলব্ধি; শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ এই বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সময়ে যে-সব উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা নির্বাচন করিয়া আলোচ্য গ্রন্থে বিষয়সূচীক্রমে সাজানো হইয়াছে। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ধর্ম, বেদান্ত, আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া, সুখ-দুঃখ, জ্ঞান-অজ্ঞান, কর্ম, জন্মান্তর, মৃত্যু, অমরত্ব, আধ্যাত্মিক রূপান্তর, গুরু, মহাপুরুষসঙ্গ, সেবা, তীর্থভ্রমণ, নৈতিকতা, সত্য, কর্তব্য, দয়া, পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য, আত্মসংযম, বিচার, ত্যাগ, বৈরাগ্য, পুরুষকার, বিনয়, অহংকার, ভক্তি, শরণাগতি, ধৈর্য, অধ্যবসায়, আনন্দ, পূজা, প্রাণায়াম, প্রার্থনা, জপ, ধ্যান, অনুভূতি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত। এই সব বিষয়ে শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশও উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের উপদেশ এবং গৃহী ভক্ত গিরিশচন্দ্র, মাস্টার মহাশয় (শ্রীম) ও নাগ মহাশয়ের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের এই ধরনের বাণী-সঙ্কলন প্রশংসনীয়। আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি-কামী ব্যক্তিমাত্রই পুস্তকটি পাঠ করিলে লাভবান্ হইবেন।

ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল।

মহাবোধ—মনীষা দেবী চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক: অর্চনা পাবলিশার্স, ৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা ৭। পৃষ্ঠা ২২, মূল্য পঞ্চাশ নঃ পঃ।

পুস্তিকাটি ২৬টি কবিতার সঙ্কলন, তন্মধ্যে 'রাষ্ট্রনেতা', 'বিশ্বমৈত্রী', যৌথকাজ', 'জনধর্ম' উল্লেখযোগ্য।

গৌরভাবিনী—(নবপর্যায়) শ্রীভবন, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। পৃষ্ঠা ২৪, বার্ষিক মূল্য এক টাকা। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী শতবার্ষিকী, প্রাচীন ভারতের ছাত্রশালা, ভারতযুদ্ধ প্রভৃতি আলোচিত।

বিদ্যার্থী (৩৭ বর্ষ, ১৩৬৭): প্রকাশক—স্বামী সন্তোষানন্দ, সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১০৬।

কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ছাত্রগণ-পরিচালিত সুমুদ্রিত 'বিদ্যার্থী' পত্রিকাটি উৎকৃষ্ট রচনা ও কবিতায় সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী নির্বেদানন্দের দুইটি রচনা 'শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈত সাধনা' ও 'Tittle-Tattle' পত্রিকাটি অলংকৃত করিয়াছে। 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভাবীকাল' লেখাটিতে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, ইহাতে স্বামীজীর ভাবধারা যে দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহা যুক্তিপূর্ণ ভাষায় আলোচিত। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা: স্পুটনিক, জন্মাষ্টমী, 'পূরবী'র কবি রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্যে 'বিজয়া'গান, পুরীর পথে, Lord Buddha, What next ? 'আমাদের আশ্রম' রচনাটিতে আশ্রমের ক্রমোন্নতির ইতিহাস ও জীবন-ধারা বিবৃত।

বিশ্বভারতী পত্রিকা (বিশেষ সংখ্যা)—সপ্তদশ বর্ষ (১৩৬৭-৬৮): সম্পাদক—শ্রীসুধীরঞ্জন দাস; প্রকাশক—শ্রীশরদিন্দু বসু, বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭। পৃষ্ঠা ৪১; মূল্য চার টাকা।

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী পত্রিকার এই খণ্ডটি প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা, অঙ্কিত চিত্র এবং তাঁহার আলোকচিত্রের প্রতিলিপি দ্বারা পত্রিকাটি অলংকৃত। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে তাঁহার রচনা যেভাবে পরিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান-সময়ে তাঁহাকে লিখিত কবির পত্রের প্রতিলিপি-মুদ্রণ সময়োপযোগী হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপির মধ্যে 'ভগ্নহৃদয়', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'খেয়া', 'গোরা', 'বিদায়-অভিশাপ', 'ঘরে বাইরে' ও 'শেষ সপ্তক'এর একটি করিয়া পৃষ্ঠা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীর উদ্দেশে রচিত কবিতা স্থান পাইয়াছে। প্রতিকৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'সংবর্ধনা'—নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে, 'বাল্মীকিপ্রতিভা' 'বিসর্জন' ও 'ডাকঘর' অভিনয়ে, সুহৃদ্বর্গসহ, 'সাধনা'-সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি, জাপানে, রাশিয়ায়, তিরোধানের এক বৎসর পূর্বে, আশি বৎসরের জন্মোৎসবে।

কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। মূল্যবান্ বিষয়ে সমৃদ্ধ পত্রিকাটি প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই রাখিবার মতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে ঃ—যথাযোগ্য গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর উপাসনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আকাশ সাধারণতঃ পরিষ্কার থাকায় পূজার কয়দিনই মঠে বহুলোকের সমাগম হয়। মহাষ্টমীর দিন ৬,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন; অন্য দুইদিন হাতে হাতে বহু ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শাখাকেন্দ্রে ঃ আসানসোল, করিমগঞ্জ, কামারপুকুর, কাঁথি, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বরিশাল, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, শিলচর, শিলং, শ্রীহট্ট ও সোনার গাঁ আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বোম্বাই আশ্রমে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় অন্তর্দেশীয় ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বারোদ্ঘাটন ও উদ্বোধন

কলিকাতা ঃ গত ১লা নভেম্বর রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারের (Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park, Calcutta 29) নূতন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলনের (East-West Cultural Conference) উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু। ইনস্টিট্যুটের বিবেকানন্দ হলে ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠান শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। ইনস্টিট্যুটের সম্পাদক স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ এই ভবনের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা বর্ণনা করেন। প্রধান মন্ত্রীর ভাষণের পর ইউনেস্কোর (UNESCO) প্রতিনিধি, প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংস্কৃতি-সম্মেলনের সভাপতি ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ার এবং কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বক্তৃতা দেন। সভাপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ভাষণ প্রদান করিলে পর ইনস্টিট্যুটের পক্ষে শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সম্মানিত অতিথিবর্গ ও সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের শেষে 'জনগণমন' গীত হয়।

প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। নানা দেশের বিভিন্ন বক্তাগণ সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিবেন।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উৎসব

বেলুড় ঃ গত ৫ই হইতে ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে চারিদিবসব্যাপী উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রারম্ভে ব্রহ্মচারিবৃন্দ বেদমন্ত্র দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিলে পর শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেদগান করেন। স্বামী বিমুক্তানন্দ কবিপ্রতিকৃতিতে মাল্যদান করিয়া শতদীপ প্রজ্বালনের দ্বারা উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করিলে স্বামী তেজসানন্দ সমাগত সুধীমণ্ডলীকে স্বাগত

জানান। কবিগুরুর ভারতচিন্তা এবং বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার প্রভাব—এই দুইটি বিষয় প্রথম দুইদিনের সাহিত্য-সভায় আলোচিত হয়। প্রথম দিনের সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত এবং ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র যথাক্রমে সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এই দুই দিনের সাহিত্য-সভায় বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপক ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার, শ্রীশীতলপ্রসাদ ভট্টাচার্য এবং শ্রীপুলিনবিহারী দাস অংশগ্রহণ করেন।

তৃতীয় দিন বিশ্বভারতী সঙ্গীত-ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার সভাপতিত্ব করেন। কথায় ও গানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য-রূপায়ণ ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কণ্ঠসঙ্গীতের দ্বারা সভাপতির সঙ্গে সহযোগিতা করেন। বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপকবৃন্দ ঐ দিন কবিগুরুর 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকটি দক্ষতার সহিত মঞ্চস্থ করিয়া সকলেরই প্রশংসাভাজন হন।

চতুর্থ দিন প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রবৃন্দ এবং অধ্যাপকবৃন্দের মিলিত উদ্যমে বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। বিদ্যামন্দির-ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক কবিগুরুর 'গুরুবাক্য', 'অন্ত্যেষ্টি-সৎকার' এবং 'শারদোৎসব'—এই তিনটি নাট্যাভিনয় এই দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ছাত্রবৃন্দের অপূর্ব অভিনয়-সাফল্য সকলকে চমৎকৃত করে।

বক্তৃতা-সফর

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন স্থানে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত বিষয় অবলম্বনে বক্তৃতা করেন।

তারিখ	স্থান	বিষয়
মার্চ, ২৪	পাটন (উত্তর গুজরাত)	বর্তমানে প্রয়োজন (হিন্দী)
২৫	পাটন টি. বি. স্যানাটেরিয়াম	স্বাস্থ্যই মানব-জীবনের পরম সম্পদ্ (ইংরেজী)
এপ্রিল, ৮	কলিকাতা বলরাম-মন্দির	জগতের রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণ
৯	পুরুলিয়া রামবাগান	ভারত-গঠনে শ্রীরামকৃষ্ণ
১০	রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়	বর্তমানে প্রয়োজনীয় শিক্ষা
১১	দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ	চরিত্র-গঠনের শিক্ষা
১৯	কলিকাতা পূর্ব রেলওয়ে অফিস	জগতের ধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের দান
২০	বারাসত শিবানন্দ-ধাম	স্বামী শিবানন্দের জীবন ও বাণী
২০	গবর্নমেণ্ট হাই স্কুল	শ্রীরামকৃষ্ণের মহান্ শিষ্যগণ
২২	ভুবনেশ্বর হাইস্কুল হল	বর্তমানে যে শিক্ষার প্রয়োজন
২৩	কলামন্দির	বর্তমানে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা (ইং)
২৭	কটক নারী-সঙ্ঘ	নব ভারত গঠনে শ্রীরামকৃষ্ণের দান (ইংরেজী)
মে, ৩	কলিকাতা আনন্দ আশ্রম	জীবনের উদ্দেশ্য
১৮	বোম্বাই বিড়লা হল	সর্বতোমুখী শিক্ষা
১৯	বোম্বাই সারদা-সঙ্ঘ	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

তারিখ	স্থান	বিষয়
মে, ২৫	হুগলি মহসীন কলেজ	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী
২৬	ইন্স্টিট্যুট অব্ টেক্নোলজি	শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম
অগস্ট, ২৪	বোম্বাই ওরলি টেম্পল	বৈদিক ধর্ম
সেপ্টে, ১৭	কলিকাতা মিত্র ইন্স্টিটিউশন	স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী

আমেরিকায় বেদান্ত

সেণ্ট লুই : বেদান্ত-সোসাইটি—১৯৬০ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী : কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারে ধর্মালোচনা : সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে সারা বৎসর রবিবারে সর্বসমেত ৪৬টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। জনসাধারণ এবং নানা ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্রগণ যোগদান করেন।

(২) ধ্যান ও কথোপকথন : প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপনা ও ব্যক্তিগত প্রশ্নের সমাধানমূলক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। মঙ্গলবারের ক্লাসের মোট সংখ্যা ৪৬। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ দিনে ভক্তগণ ধ্যানভ্যাস করেন।

(৩) অতিরিক্ত সভা : সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে ছাত্রদের জন্য দুইটি বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং 'হিন্দুর দৃষ্টিতে জীবন' বিষয়ে বক্তৃতা ও ছাত্রদের ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।

(৪) উৎসব : শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মদিবসে এবং অন্যান্য উৎসব-দিনে (দুর্গাপূজা, বড়দিন, গুড্ ফ্রাইডে প্রভৃতি) বিশেষ ধ্যান, পূজা, ভজন, শাস্ত্রপাঠ ও জীবনী-আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি উপলক্ষে সমবেত সকলকে ভোজনে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করা হয়।

(৫) অবকাশ : অগস্ট ও সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে গ্রীষ্মাবকাশের সময় বেদান্তানুরাগী ভক্তবৃন্দ রবিবার সকালের ও মঙ্গলবারের সান্ধ্য প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছেন।

(৬) অতিথি ও পরিদর্শকবৃন্দ : এই বৎসর বিভিন্ন স্থান হইতে ৩০ জন বিশিষ্ট অতিথি সোসাইটি পরিদর্শন করেন। ইঁহাদের অনেকেই উপাসনায় যোগদান করেন। সেণ্ট লুই হইতে কয়েকজন স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের সহিত সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যেই আসেন।

(৭) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রাধ্যক্ষ ৮৫ জনকে সাধন-নির্দেশ দেন।

(৮) গ্রন্থাগার : সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

(৯) প্রচারের পরিধি বিস্তার : ক্যানসাস শহর, মিস্থরী ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রচার কার্য ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী', 'ধ্যান', 'ধর্ম ও ভারতীয় দর্শন' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন' বিষয়ে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ বক্তৃতা দিয়া জনসাধারণের আগ্রহ উদ্দীপিত করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

গ্রন্থাগার-উদ্বোধন

পোর্টব্লেয়ার: গত ১৫ই সেপ্টেম্বর চীফ কমিশনার শ্রী বি. এন. মহেশ্বরী আই. এ. এস বিশিষ্ট অতিথি ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে নবপ্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ সেণ্টারের' গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। শ্রীমহেশ্বরী তাঁহার ভাষণে বলেন, ভগবানের দরবারে উচ্চনীচ ভেদ নাই, সেখানে সকলেই সমান। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন, এই প্রতিষ্ঠান আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হইবে।

সমাগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীবিনয়কুমার লাহিড়ী বলেন, সত্যকারের সুখ এবং শান্তি একমাত্র ধর্মের পথেই পাওয়া সম্ভব। বর্তমান জগৎ ধর্মের পথ ত্যাগ করিয়া অলীক মায়ার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ধ্বংসের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সকলের নিকট হইতে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন।

সভায় স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাবিষয়ক একটি বক্তৃতা পাঠ করিয়া শোনানো হয়। কুমারী মনোরমার শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী পাঠ এবং শ্রীসাকলানীর ভাষণ মনোগ্রাহী হইয়াছিল। ধর্ম ও ভক্তি সঙ্গীত গাহিয়া অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

কার্যবিবরণী

চেতলা: শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডপের বার্ষিক (১৯৫৮-৬১) কার্যবিবরণীতে প্রকাশ: আলোচ্য বর্ষগুলিতে এখানে পূজা, শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনা, উৎসব ও নরনারায়ণ সেবা নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুইটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের প্রত্যেকটিতে প্রতি বর্ষে দশ হাজারের অধিক রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে। সমিতির দুগ্ধ-বিতরণ কার্যও উল্লেখযোগ্য। এই মণ্ডপের ফলতা শাখা-আশ্রমটি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতমহাসাগর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা সম্প্রতি একটি ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, ভারতমহাসাগর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহে নিম্নলিখিত ২২টি রাষ্ট্র সহযোগিতা করিতেছেন: অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি জাপান, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, সোভিয়েট রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, চীন প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, ভারত, ইণ্ডোনেশিয়া, ইজরায়েল, নেদারল্যাণ্ডস, পর্তুগাল, মালয়, ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড, পূর্ব-আফ্রিকার বৃটিশ রাজ্যাঞ্চল এবং মরিশাস।

ইণ্টারন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক ইউনিয়নস এবং রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার উদ্যোগে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সমীক্ষায় ৪৫টি জাহাজ নিয়োগ করা হইতেছে। ভারত-মহাসাগর সম্পর্কে অতি অল্প তথ্যই সংগৃহীত হইযাছে এবং এই মহাসাগরের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই এই অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বায়ুপ্রবাহ, নূতন নূতন রাসায়নিক পদার্থ, সামুদ্রিক জীবজন্তু এবং সমুদ্রতলের পর্বত ও পাহাড় সম্পর্কে বহু নূতন

তথ্যের সন্ধান করা হইবে এবং মানচিত্র তৈয়ার করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞানীদের ধারণা উত্তরপূর্ব এবং দক্ষিণপশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত মৌসুমী বায়ুর প্রতিক্রিয়া সামুদ্রিক প্রবাহের উপর রহিয়াছে—এ-সম্পর্কে বিশেষ তথ্যানুসন্ধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে ও অতলান্তিক মহাসাগরের ভূসংস্থানিক অবস্থা একপ্রকার নহে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টির সঙ্গে ভারত-মহাসাগরের সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে জানা যাইবে। ইহাতে যে সকল অগভীর অঞ্চল রহিয়াছে সেখানে প্রচুর মৎস্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া বিজ্ঞানীরা আশা করিতেছেন।

(মার্কিন বার্তা হইতে)

পাল আমলের শিল্প-কলার নিদর্শন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার বর্ধমান জেলার উচালনে এক প্রাচীন স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। স্থানটিতে অতীত যুগের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ পাল আমলের এক প্রকাণ্ড নির্মাণ-কার্যকে আচ্ছন্ন করিয়া যে উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিল্পের নিদর্শনে পরিপূর্ণ।

সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্য যুগের রমণীয় মূর্তিশিল্পসৃষ্ট যে দেবীমূর্তি এই স্থানে পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্যে খৃঃ ১০ম শতকের শেষভাগে পাল শিল্পের ছন্দোময় যুগের স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় প্রসিদ্ধি এই যে, উচালন নামটি ঊষা ও অনিরুদ্ধের পৌরাণিক কাহিনী হইতে উদ্ভূত।

মধ্যযুগীয় সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ জঙ্গলাকীর্ণ গড়মান্দারণের ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শনসমূহ আবিষ্কারের জন্যও উক্ত অধিকার চেষ্টা করিতেছেন। খৃঃ ১১শ শতকে বরেন্দ্রভূমিতে যে কৈবর্ত-বিদ্রোহ হয়, উহা দমনের জন্য পাল আমলে একদা এই দুর্গের সৈন্যদল রামপালের অভিযানে যোগদান করেন।

এই সকল অনুসন্ধানের ফলে প্রায় ১,০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তর-নির্মিত একটি উপাসনা-স্থানের বিরাট ধ্বংস আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই আবিষ্কার যেমন আত্মরক্ষার্থ সুবিস্তীর্ণ ও উচ্চ মাটির ঢিবি-সমন্বিত গড়মান্দারণের ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে, তেমনি এই অভিযানে রূপনারায়ণগামী শিলাবতীর উপনদী আমোদরের তীরবর্তী শিরোমণিপুরের পার্শ্বভূমিতে মধ্যপ্রস্তরযুগীয় প্রাগৈতিহাসিক ক্ষুদ্র হাতিয়ার-সমন্বিত স্থানেরও আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। হুগলি জেলার কামারপুকুরের নিকটবর্তী এই প্রাগৈতিহাসিক স্থানটি রূপনারায়ণের দক্ষিণ-কূলের সন্নিকটস্থ প্রাচীন সভ্যতার পশ্চাদ্‌ভূমি হিসাবে প্রতিভাত হইতে পারে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত)

গুপ্তযুগের মুদ্রা

সম্প্রতি হুগলি জেলার মহানাদ গ্রামে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর একটি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাটির একদিকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের দণ্ডায়মান অবস্থার ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে, মহারাজার বামহস্তে একটি বৃহৎ ধনু এবং দক্ষিণ হস্তে বাণ। অপর দিকে অঙ্কিত আছে সিংহাসনে উপবিষ্টা ধনদাত্রী লক্ষ্মী-দেবীর মূর্তি, তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধনরত্ন দান করিতেছেন। ক্ষুদ্রলিপিতে একদিকে 'শ্রীচন্দ্র' লিখিত আছে এবং অপর দিকে 'শ্রীবিক্রম'।

নবাবিষ্কৃত মুদ্রাটি গুপ্তযুগে বাংলার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতির উপর আলোকসম্পাত করিতেছে।　　(সঙ্কলিত)

কলিকাতার জনসংখ্যা

সাম্প্রতিক লোকগণনা অনুসারে :

কলিকাতায় বসতির ঘনতা চরমে উঠিয়াছে, পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের লোকসংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছে ও মধ্য কলিকাতার কয়েকটি স্থানে বসতি কমিয়াছে।

	১৯৫১	১৯৬১	মন্তব্য
বহুবাজার	৪০,৭৯৪	৩৯,৩৩৮	—
বড়বাজার	৫৩,৮৪৬	৪৭,৯৫৮	–
জোড়াবাগান	১,২০,২০০	...	প্রায় স্থির
বেলগাছিয়া	৪৪,৯২৪	...	+ প্রায় ২০০০
কাশীপুর	...	...	+ ২৭৩
ভবানীপুর	...	...	— ৩,০০০
টালিগঞ্জ	১,৯২,৯৮৯	২,০০,০০০	+
আলিপুর	৬৪,৭০৪	৮০,৬৮৯	
ট্যাংরা	...	...	+ ১৭,০০০
বালিগঞ্জ	...	...	+ ৫,০০০
বেলিয়াঘাটা	...	...	+ ১১,০০০
মাণিকতলা	...	...	+ ১২,০০০
নিউ আলিপুর	...	...	+ ১২,০০০
কলিকাতা (নূতন)	...	২৯,২৬,৪৯৮	
কলিকাতা (পুরাতন)	২৫,৪৮,৬৭৭	...	+১,১০,০ ৫
টালিগঞ্জের (নূতন ৫টি পল্লী)		২,৬৭,৬১৬	

কলিকাতার ৮০টি পল্লীর মধ্যে বাগমারি উল্টাডাঙ্গার লোকসংখ্যা সর্বাধিক—৭৪,৭১৭, তারপর যাদবপুরের— ৭০,২৮৩

কলিকাতায় মোট পুরুষ—১৮,১৪,১৩১
নারী ১১,১২,৩৬৭

পল্লীহিসাবে শিক্ষিতের সংখ্যা সর্বাধিক যাদবপুরে,

	কলিকাতা	যাদবপুর
মোট শিক্ষিত	১৭,১২,৫৭৩	৪৯,১১৪
পুরুষ	১১,৩৯,৪০২	২৭,৮৪৫
নারী	৫,৭৩,১৭১	২১,২৬৯

শতকরা হিসাবে ডালহৌসি নর্থ (৩৮ নং) পল্লীতে শিক্ষিতের হার সর্বোচ্চ—প্রায় ৭০%।

যুক্তরাজ্যে ব্যক্তিগত আয়

যুক্তরাজ্যে (U. K.) ব্যক্তিগত আয়ের মোট পরিমাণ ৪০,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই বিপুল অর্থের ৩০% জমিজায়গা, বাড়ীঘর, আসবাবপত্র ও গৃহস্থালির জন্য ব্যয় হয়। ২০% স্টক ও শেয়ারে, ১৭% গবর্নমেণ্ট সিকিউরিটিতে, ১৭% নগদ ও ব্যাঙ্কে জমা এবং ১৬% সমাজসংগঠনে।

(সঙ্কলিত)

আবেদন

বিহারে বন্যার্ত-সেবা

বিহারে মুঙ্গের জেলায় বারহিয়া (Barhiya) থানায় (কিউলের পরে তৃতীয় স্টেশন) রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যার্তদিগের সেবা (Relief) করা হইতেছে। বারহিয়া থানাটি সাম্প্রতিক বন্যায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। বন্যাপীড়িতদের সর্বপ্রকার সাহায্যই প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে তুলার কম্বল, ধুতি, শাড়ি এবং শিশুদের পোষাক দেওয়া হইতেছে।

এই সেবাকার্যে অর্থ-সাহায্যের জন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমরা আবেদন করিতেছি। রামকৃষ্ণ মিশন সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সকল প্রকার সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া

৩১.১০.৬১

অন্তর্যামী ব্রহ্ম

যস্মাৎ সর্বমিদং প্রপঞ্চরচিতং মায়াজগজ্জায়তে
যস্মিংস্তিষ্ঠতি যাতি চান্তসময়ে কল্পানুকল্পে পুনঃ।
যং ধ্যাত্বা মুনয়ঃ প্রপঞ্চরহিতং বিন্দন্তি মোক্ষং ধ্রুবং
তং বন্দে পুরুষোত্তমাখ্যমমলং নিত্যং বিভুং নিশ্চলম্ ॥

—ব্রহ্মপুরাণ ১।১

এই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় জগৎ কোথা হইতে আসিল? তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, ইহা মায়ারচিত। মায়া কোথায় অধিষ্ঠিত? সর্বকারণ-কারণ ব্রহ্মই অনির্বচনীয়া মায়ার অধিষ্ঠান। তাই ব্রহ্মের ধ্যান এবং উপাসনাতেই মানব-জীবনের সার্থকতা।

এই প্রপঞ্চময় নিখিল মায়াজগৎ যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে এবং প্রলয়ে যাঁহাতেই পুনরায় বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে, অথচ যিনি প্রপঞ্চ-বিরহিত, সেই পরমতত্ত্বকে ধ্যান করিয়া মুনিগণ মোক্ষপদ লাভ করেন; 'পুরুষোত্তম'-নামে অভিহিত নিত্য নির্মল নিশ্চল অন্তর্যামী সেই বিশ্বব্যাপী ভগবানকে আমি বন্দনা করি।

সর্বদা সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, নির্লিপ্ত, তর্কের অতীত, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব কিছুর আদি মধ্য অন্ত আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম সকলের নিকট প্রকাশিত হউন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যিনি ব্রহ্ম, যোগীর যিনি অন্তর্যামী পরমাত্মা,—ভক্তের হৃদয়ে তিনিই ভগবান্, তাঁহাকেই আমরা বন্দনা করি।

কথাপ্রসঙ্গে

'এক পৃথিবী'র অভিমুখে

'পৃথিবী এক, না দুই, না বহু ?'—এ প্রশ্ন উঠিয়াছে আজ নয়; বিভিন্ন সময় এ প্রশ্ন বিভিন্ন-ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, এবং যুগভেদে নানাবিধ উত্তরও পাওয়া গিয়াছে। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, উর্ধ্বলোক অধোলোক—শুধু পৃথিবীকে নয়, মানুষকে—মানুষের মনকে বিভক্ত করিয়াছে। দেবতা-অসুর, আর্য-ম্লেচ্ছ, ইহুদী-জেণ্টাইল, ক্রিশ্চান-হিদেন, মুসলিম-কাফের—প্রভৃতি দ্বন্দ্বাত্মক নামের মাধ্যমে 'আমরা ও তোমরা'—এই সহজ সর্বনামই বিচিত্র নামে শ্রুত হইয়াছে।

বর্তমান যুগে এই 'আমরা ও তোমরা'ই আবার নূতন নূতন রূপে দেখা দিয়াছে, প্রাচীন-পন্থী ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, আধ্যাত্মিক (চেতনবাদী) ও জড়বাদী, ধর্মে বিশ্বাসী ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী। সম্প্রতি আবার এই বিভেদ ও বিভাগ আর এক নূতন আকারে দেখা দিয়াছে, এখানেও পৃথিবী যেন দুই ভাগে বিভক্ত হইতেছে; স্বাধীনতাপন্থী গণতন্ত্র ও একনায়কপন্থী সাম্যবাদী। প্রথমটিকে বলা হয়, 'মুক্ত পৃথিবী'; দ্বিতীয়টি যবনিকার অন্তরালে।

এ সকল বিভেদের মূল রহস্যের সন্ধানে অগ্রসর হইয়া দেখি, যখন যে দেশ বা মনুষ্যগোষ্ঠী কি ধর্ম- ও কৃষ্টি-ব্যাপারে, কি রাজনীতিক ও ঐহিক ব্যাপারে উন্নত হইয়াছে, তখনই তাহারা অপরাপর দুর্বল অনুন্নত প্রতিবেশীদের হীন ভাবিয়াছে, তাহাদের প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে—যেখানে সম্ভব হইয়াছে, সেখানে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া নিজেদের ধর্ম, কৃষ্টি, রাজনীতি ও সমাজাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহাই মানবজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এইখানেই প্রশ্নটি আর একরূপে প্রতিফলিত হয়: 'মানবজাতি—এক, না দুই, না বহু?' ভৌগোলিক পৃথিবী যদি বা এক হয়, তাহাকে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করিয়াছে তো এই মানুষ? এই মানুষকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিতেছে কোন শক্তি?

সৃষ্টির মূল উর্ধ্বদিকে না অধোদিকে, বিরাট পরমাত্মা না ক্ষুদ্র পরমাণু? যে দিকেই হউক, যদি একটি মূল স্বীকার করি, তবে প্রশ্ন ওঠে: বিভেদ কোথা হইতে আসিল—কেন আসিল?

যদি বলি, সৃষ্টির মধ্যেই এই বৈপরীত্যের বীজ অন্তর্নিহিত, তাহা হইলে সৃষ্টির স্বরূপ হয়তো কিছুটা বর্ণিত হইল, কিন্তু প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর মিলিল কি?

যাহাই হউক সৃষ্টির মধ্যে বিপরীত-ধর্মী দুইটি শক্তির পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ—সংস্পর্শ ও সংঘাত নূতন সৃষ্টির সূচনা করে। ইহা সকল বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সত্য—জড়বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান 'এমন কি সমাজবিজ্ঞানেও ইহা পরীক্ষিত।

এখানে আমাদের প্রশ্ন জড় মাটির পৃথিবীকে লইয়া তত নয়, যত পৃথিবীর মানুষকে লইয়া। এই মানুষ যুগে যুগে বিভিন্নভাবে বিকশিত হইতেছে—প্রথমে ক্ষুদ্র পরিবার হইতে গোষ্ঠীতে, তারপর গোষ্ঠী হইতে জাতিতে, এখন যে যুগ আসিতেছে—তাহাতে জাতিকে মহাজাতিতে অথবা মানবকে বিশ্বমানবে পরিণত

হইতে হইবে। বিভিন্ন জাতির সহ-অবস্থান (co-existence) যদি সম্ভব না হয়, সহ-অবসান (co-extinction) তবে অনিবার্য।

পূর্ব পূর্ব যুগের অনেক বিভাগই আজ অচল হইয়া গিয়াছে। একদিন ছিল যখন সভ্যতার সোপানে অগ্রসর এক মানবশ্রেণী নিজেদিগকে পৃথিবীর কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া পূর্বে পশ্চিমে অপরাপর জাতিদের স্থাপন করিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নামদুটি এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কলম্বাসের 'পশ্চিম ভারত' আবিষ্কারের পর, ম্যাগিল্যান ও ড্রেকের পৃথিবীর প্রদক্ষিণের পর হইতে মানুষ বুঝিয়াছে পূর্ব ও পশ্চিম নিতান্তই আপেক্ষিক। তথাপি বলিতে হয়, এই বিভাগের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত হইয়া গিয়াছে।

ইওরোপের তুলনায় এশিয়া প্রাচ্য; এশিয়ার তুলনায় ইওরোপ পাশ্চাত্ত্য। কিন্তু আমেরিকার আবির্ভাবের পর ভৌগোলিক দিক হইতে এই ধারণার আর কোন মূল্য থাকিতে পারে না। কারণ আমেরিকার তুলনায় ইওরোপ প্রাচ্য, এশিয়া পাশ্চাত্ত্য! এখন আমরা ভৌগোলিক অর্থ ত্যাগ করিয়া কথা দুটির রূঢ় অর্থে উপনীত হই। 'প্রাচ্য' অর্থে এশিয়া মহাদেশের কৃষ্টিজাত আধ্যাত্মিক ভাব ও বিশ্বাস, 'পাশ্চাত্ত্য' অর্থে ইওরোপীয় কৃষ্টি, বিজ্ঞান, সমাজ, যন্ত্রসভ্যতা, যুক্তিবাদ প্রভৃতি। প্রাচ্য প্রাচীন, পাশ্চাত্ত্য আধুনিক।

এই বিভাগও আজকাল আর চলিতেছে না। যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির সহিত পৃথিবীর সর্বত্র এক প্রকার সমতা পরিব্যাপ্ত হইতেছে। বিমানযোগে যাঁহারা বড় বড় রাজধানীর উপর দিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহারা বাহ্যতঃ কোথাও কোন বিশেষ পার্থক্য অনুভব করেন না—এক ভাষার বিভিন্নতা ছাড়া। বাহ্য পণ্যদ্রব্য-গত সমতা সত্ত্বেও দেশে দেশে ভাব-গত বৈষম্য অস্বীকার করা যায় না।

যে কোন কারণেই হউক, এক-একটি দেশ বা জাতি এক-একটি ভাবকে কেন্দ্র করিয়া জীবন ধারণ করে এবং সেই ভাবটির চরমে পৌছিবার চেষ্টা করে, সেই ভাবের সাধনাতেই সেই জাতির জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে। এই ভাব একেবারে ছাড়িয়া দিলে সেই জাতি ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। বিশ্বপরিকল্পনায় তাহার আর কোন অংশ থাকে না। তবে একটি জাতি যে একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করিয়াই চলিবে, এমন কোন কথা নাই। তবে অন্য ভাবগুলি গৌণ, একটি হইবে মুখ্য! বিভিন্ন জাতি—কখন ব্যবসাক্ষেত্রে, কখন যুদ্ধক্ষেত্রে, সর্বশেষ উচ্চতর ভাবের ক্ষেত্রে পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতেছে; পরস্পরকে আঘাত করিতেছে—একে অপরকে প্রভাবিত করিতেছে!

মানবেতিহাসের প্রথম বাণী 'চরৈবেতি', 'চল, চল'—এই গতির ছন্দই মানুষকে একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে দেয় নাই, স্থাণু হইয়া যাইতে দেয় নাই। বিচরণশীলতাই বা পরিক্রমণের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে আজ 'এক পৃথিবীর' প্রতি টানিয়া লইয়া যাইতেছে—কোন দেশের গণ্ডিতে, কোন জাতির গণ্ডিতে বা কোন ভাবের গণ্ডিতে তাহাকে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়; প্রত্যেকেই চাহিতেছে তাহার ভাব সারা বিশ্বে ছড়াইয়া দিতে, অনেকেই চাহিতেছে সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠভাব একত্র করিয়া একটি মহত্তম ভাব সৃষ্টি করিতে। পণ্যদ্রব্যের মতো ভাবও দেশ-বিদেশে প্রেরিত হয়, এবং দেশ-বিদেশের ভাব আবার একদেশে ঘনীভূত হয়। পরবর্তী যুগে ঘনীভূত ভাব চতুর্দিকে প্রসারিত হয়। ইতিহাসে বহুবার এই প্রকার ঘটিয়াছে।

পুরাকালে কখন চীন বা ভারত হইতে, কখন গ্রীস, মিশর, আরব বা পারস্য হইতে সেই সেই যুগের মূলভাব প্রসারিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে ইওরোপ-আমেরিকাই এই ভাব প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। আমাদের দেখিতে হইবে, সেখানে আজ কোন্ ভাব ঘনীভূত হইতেছে—কারণ ভবিষ্যতে এই ভাবই সারা বিশ্বকে প্রভাবিত করিবে। এই ভাবের মধ্যে যদি মূলগত কোন দোষ বা ত্রুটি থাকে, তবে তাহা এখনই দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত; নতুবা সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎই বিপন্ন। এখন আর কোন সমস্যা শুধুমাত্র একটি দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অতি সত্বর তাহা সংক্রামিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। ভাল ভাবও যেমন ছড়াইয়া পড়ে, মন্দ ভাবও সেইরূপ ছড়াইয়া পড়ে। মন্দগুলিকে উৎপাটিত করিয়া ভাল ভাবগুলি কি ভাবে মানব মনে প্রোথিত করা যায়, তাহাই আজ চিন্তনীয়।

বর্তমান যুগে যে দুইটি আপাতবিরোধী শক্তি মানুষের উপর ক্রিয়া করিতেছে, সহজ ভাষায় তাহাদের নাম দেওয়া যায়—'বিজ্ঞান' ও 'ধর্ম'। বিজ্ঞান জড়বস্তুর বিষয় গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, বহিঃপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি আয়ত্ত করিয়া নানাভাবে তাহা কাজে লাগাইতেছে, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-সুবিধার মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব এ যুগের মানুষ কেন বিজ্ঞানের সমর্থক হইবে না?

অপর পক্ষে ধর্ম বলিয়া সাধারণ্যে যাহা পরিচিত, তাহা ইহজীবন অপেক্ষা পরজীবনকেই বড় করিয়া দেখে; 'ইহজীবনে দুঃখ-কষ্ট-ত্যাগ-তপস্যা কর, মৃত্যুর পর সুখে-স্বচ্ছন্দে অনন্তকাল স্বর্গে বাস করিতে পারিবে'—সাধারণ মানুষ 'ধর্ম' বলিতে তো এইরূপই একটা কিছু বুঝিয়া থাকে। এই ধর্মের প্রতি কোন বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন যুক্তিবাদী মানুষের মন আকৃষ্ট হইতে পারে না। ধর্মকে আজ যুক্তি ও অনুভূতির দৃঢ়-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে হইবে, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

রাজনীতিকদের পাঁচশালা হইতে পঁচিশ-শালা পরিকল্পনাতে পর্যন্ত মানুষ আজ বিশ্বাসী, তাহার জন্য সে ত্যাগ স্বীকার করিতে বা পরিশ্রম করিতে রাজী। যদিও পঁচিশ বৎসর পরের ভবিষ্যৎ তথাকথিত বাস্তববাদীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাহিরে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এ যুগের মানুষ অবিশ্বাসী নয়, ত্যাগতপস্যায় পরাঙ্মুখও নয়; মনের মতো উদ্দেশ্য হইলে মানুষ তাহার জন্য প্রাণপাত করিতে পারে,—তুষার-শৃঙ্গে আরোহণ করাই হউক বা সাঁতারাইয়া সাগর-উপসাগর পার হওয়াই হউক। একটা প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ কিছুর উপরেই আধুনিক মানুষের মোহ। সেই জন্যই জড়ের অতীত, ইন্দ্রিয়ানুভূতির পারে যে মহাসত্য লুকাইয়া রহিয়াছে—তাহার সাধনায় সে আকৃষ্ট হইতেছে না; অথচ প্রকৃত সত্য যে প্রত্যক্ষ নহে, অপরোক্ষ—এটুকু বুঝিবার মতো ধৈর্য ও অবসর আজ মানুষের নাই।

যে কেহ যাহা কিছু আলোচনা করিতেছে, সে বলিবে, সত্যের সন্ধানে করিতেছি। প্রত্যেকেই মনে করে, সে সত্যের সাধক। ইতিহাসের গবেষক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের নিরীক্ষক প্রত্যেকেই সত্যকে খুঁজিতেছেন? কিন্তু কি সেই চরম সত্য? কি তাহা লাভের উপায়?—এই প্রশ্নে সকলেই দিশাহারা!

প্রাচীনকালে এবং প্রাচ্যদেশে কিন্তু এরূপ

ছিল না, সে যুগে সেই মহান্ সাধকগণ যখন বুঝিয়াছিলেন, জীবনের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করিতে হয়, তখন তাঁহারা 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' বলিয়া বসিয়া গিয়াছিলেন—একাকীর সাধনায়। সত্য লাভের পথ সত্যই অতি সরল এবং সংকীর্ণ (narrow and straight)। প্রশস্ত রাজপথে নানাবিধ দ্রুতগামী যান চলাচল করিতে পারে, কিন্তু তুঙ্গশীর্ষে উঠিবার পথে পাশাপাশি দুজন যাওয়া যায় না, গতিও অতি ধীরে ধীরে।

মানুষ যদি মানুষ বলিয়াই পরিচিত থাকিতে চায়, তবে তাহাকে যুগে যুগে পুরাতন সত্যকে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। এ-যুগের সাধনার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে; এ-যুগের সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতও আমরা পাইয়াছি, কোন্ ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই সংঘর্ষ-বহুল যুগের শান্তি, তাহাও বিঘোষিত হইয়াছে। আমরা কেহ শুনিয়াছি, কেহ শুনি নাই! বিজ্ঞানের চমকপ্রদ সফলতায় আমরা অন্ধপ্রায়, যন্ত্রের ঘর্ঘর কোলাহলে আমরা বধিরপ্রায়। বিজ্ঞানের চরম আবিষ্কারেব ফলে আজ মানুষের শান্তি নাই, নিরাপত্তাও বিপন্ন। মানুষ আজ ক্রমশ বুঝিতে পারিতেছে, আলাদিনের দৈত্য আজ ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পরিণত, বিজ্ঞানের কল্পতরু আজ বিষফল প্রসব করিতেছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মানুষের চিন্তায় নূতন ধারা দেখা দিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী যান্ত্রিক বিজ্ঞানের (materialistic mechanistic science) স্থলে দেখা দিতেছে এক অতিবিজ্ঞান (metaphysics)। আজিকার চিন্তাশীল মানুষ সমগ্র পৃথিবীকে এক নজরে দেখিতে চায় (Total view), সমগ্র মানব-জাতির ইতিহাস এক নিঃশ্বাসে শুনিতে বা বলিতে চায়, সমগ্র বিশ্বজীবনের তথা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক অখণ্ড দৃষ্টি ও মনোভাব লইয়া বুঝিতে চায়। উনবিংশ শতাব্দীর খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞান তাহাকে এই জ্ঞান দিতে পারে নাই; অখণ্ড সত্যকে ধরিবার কোন শক্তিমান্ যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয় নাই, এইখানেই আজ মানুষকে অপেক্ষা করিতে হইবে; হয় বিজ্ঞানের আরও উন্নতির জন্য, নতুবা পথ পরিবর্তনের জন্য। বিজ্ঞান দ্রুতগামী বিমান সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু মনকে অতিক্রম করিতে পারে নাই; সে আকাশজয় করিয়াছে, কিন্তু মনকে জয় করিতে পারে নাই; সে পরমাণু বিভাজন করিয়াছে, কিন্তু মনকে বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই; —এইখানেই বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা।

তবে আশার কথা এই, এ-যুগের যাঁহারা প্রতিনিধি, তাঁহারা বলিতে শুরু করিয়াছেন—Man is greater than machine, man is greater than mind even (মানুষ যন্ত্রের চেয়ে বড়, মানুষ মনের চেয়েও বড়)। সহস্র সংঘাত ও সংঘর্ষের পর এ-যুগের মানুষ আরও বুঝিয়াছে: কাহাকেও ঘৃণা করিয়া নয়, বর্জন করিয়া নয়, শুধুমাত্র সহন করিয়াও নয়, সর্বতোভাবে গ্রহণ (not merely tolerance, but acceptance) করিয়াই সত্যের পথে—শান্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই পথই পথ, এই পথেই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে। এ পথ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পর সামঞ্জস্যের পথ, এ পথ সশ্রদ্ধ বিনিময়ের পথ। এই পথেই আসিবে মানবজাতির ভাব-সমন্বয়, তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে 'এক-পৃথিবী'।

চলার পথে

'যাত্রী'

তুমি কে এলে, ওগো ভয়ঙ্করা, ভয়হরা, ভীষণা,ভ্রুকুটি-ভঙ্গী-রঙ্গিনী? তুমিও কি আমার মা? এ কেমন মা! তোমার সেই সুকোমল অঙ্ক কই? কই সেই পীযূষস্তন্যদায়িনী শ্যামল শান্ত স্বরূপ? কই সেই আপন সন্তানকে কোলে-জড়িয়ে রাখার মঙ্গলময় মোহন রূপ? ক্রন্দন থামিয়ে সন্তানকে বুকের 'পরে আঁকড়ে ধরে রাখার সেই সুতীব্র ব্যগ্রতাই বা কই? তোমায় দেখে কি সন্তান তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে তার জ্বালা মেটাতে চাইবে, মা?

ওগো রক্তময়ী, কি সুতীব্র রক্তলেখাতেই না নিজেকে সাজিয়েছ! তোমার লেলিহান জিহ্বায় রক্ত, তোমার উন্মুক্ত খর্পরে রক্ত, তোমার হস্তধৃত ছিন্নশির বেয়েও রক্ত ঝরে পড়ছে। ঝরে পড়ছে রক্তের ঝিলিক তোমার ঐ দীর্ঘায়ত আগুন-জাগানো চোখের ব্যঞ্জনায়। তোমার চরণ-দুটিতেও কেমন এক পিঙ্গল অলক্ত-রাগ লীলায়িত। তোমার সব কিছু ঘিরেই লোহিত প্রাণের ছোপ—যার মধ্যে স্বপ্ন-সঞ্চয়ের এতটুকুও গোপন আর্তি নেই। তাই ভাবি—তুমিও কি আমার মা!

অমাবস্যায় তোমার আবির্ভাব। দুর্গম, গহন-জটিল দুর্জ্ঞেয় রহস্যের ও হত্যা-হননের আদিম অন্ধলোকে তোমার আগমন। বাহিরের দৃষ্টিতে তোমার ঐ ভয়াল রূপ কেমন এক ত্রাসের সঞ্চার করে। আবার মানসরূপে এর মধ্যেই অন্য আর এক আনন্দময় দ্যুতি উদ্ভাসিত হয়। এই বিরুদ্ধের, এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি তোমার কি প্রয়োজনে, মা? তুমি কি বোঝাতে চাও—সন্ধ্যা-সকাল, দিবস-রজনী, শীত-বসন্ত, জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি ও ধ্বংসের মিলন-রেখার মহাসত্যকে? হয়তো তাই হবে। তাইতো তোমার নানা স্তোত্রে তোমার রূপবর্ণনার কত না চাতুরী! আর তুমি কত রূপেই না সাধককে দেখা দাও। কখন কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, কখন বা ছিন্নমস্তা ধূমাবতী, আবার কখন বগলা মাতঙ্গী কমলা!

হে অদৃষ্টস্বরূপা, কর্মফলদাত্রী, অজ্ঞানবিনাশিনী কালিকা, তুমি এস। এস, মা। এস, ওগো শরণদা, আমাদের মোহজাল ছিন্ন ক'রে দিতে এস। এস আমাদের জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ দূর ক'রে দিতে এস। মৃত্যুর বিরাট মুখব্যাদানের ভেতর আমরা তো প্রতিনিয়তই প্রবেশ করছি—আয়ুও নাশ হয়ে যাচ্ছে, যৌবনও হয়ে যাচ্ছে ক্ষয়িত। গত দিন আর ফিরবে না—এও জানি। আর চপলার মতো জীবনের এই ক্ষণিক দ্যুতি নিমেষেই মিলিয়ে যাবে। এই চেতনা যে মুহূর্তে পাই সেই মুহূর্তেই, ওগো উন্মাদিনী, তোমাকে আর ভয় করি না। ভয় করিনা তখন আর তোমার হস্তধৃত খড়্গকে কিংবা রক্তঝরা মুণ্ডকে। জানি, বাসনার কালিমা অপনোদন করতেই তো তুমি হয়েছ মেঘবর্ণা, দিগম্বরা। তুমি ক্ষেমঙ্করী, তাই তো তোমার ঐ কলুষ-নাশিনী গভীর গহন বর্ণাঢ্য। শবরূপী শিবোপরি আরূঢ়া, ওগো মুক্তকেশী, ওগো জীব-দুঃখ-হারিণী, ওগো ভক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী, ওগো অদ্বিতীয়া, তুমি যে আমাদের মা, তুমি কি আমাদের কোলে তুলে না নিয়ে পারো! আমরা এই মাতৃরূপ বুঝি না বলেই তোমার ঐ রূপ দেখে ভীত হই। কিন্তু সেই

রূপের আড়ালে যে প্রশান্তি লুকিয়ে আছে, তা বুঝি কই? শাস্ত্র-মত সংগ্রহ ক'রে বলি কই—যে তুমিই যথার্থ সংসার-ভয়-বিনাশিনী, সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী, নিত্যানন্দ-বিধায়িনী, শাস্ত্রার্থ-স্বরূপিণী; নিত্যলীলাময়ী, দয়াময়ী আমার মা! বুঝি কই যে তুমিই বরাভয়াকরা, সংসারের সারভূতা, অন্তর্যামিনী! বুঝি কই যে তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করেই মানব অনায়াসে সংসার-সাগর অতিক্রম ক'রে চলে যেতে পারে!

আর কি করেই বা বুঝব—তোমার ঐ অপার রূপ, তুমি বুঝিয়ে না দিলে? আমরা যে সদাই মিথ্যা-মোহদ্বারা পীড়িত, নিজ শরীরসুখেই সতত নিবিষ্ট। আমরা যে পরাধীন, নিদ্রা ও আলস্যে ব্যয়িত আমাদের জীবন। তাই তো বুঝতে পারি না যে তুমি শুধু এই পৃথিবীর নয়, ত্রিলোকেরও পাপ-রাশি নাশ করতে সমর্থা। পরমানন্দ-সম্ভোগে নিমগ্না তোমাকে ধ্যান করলে তুমি যে তোমার সচ্চিদানন্দ-শক্তি দিয়ে অতি মূঢ় ব্যক্তিরও জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত ক'রে দিতে পারো—এ-টুকুও আমরা বুঝি না। তাইতো আজ পৃথিবী-জোড়া এত অবিশ্বাসের রাজত্ব, এত হানাহানি—এত শিবাদলের আম-মাংসলোলুপতার রেষারেষি—এই পৃথিবীব্যাপী মহাশ্মশানের এই বীভৎস রূপ তো আজ এই কারণেই।

হে মহাকালমোহিনী, তুমি আমাদের এই অজ্ঞানান্ধকার দূর ক'রে দাও,—ব্যর্থতার ভস্ম দাও ভুলিয়ে, আমাদের ধৃষ্টতা ক্ষমা কর মা। হে সর্বজীবপালিকা, হে বিশ্বজীব-জননী, আমাদের এই পৃথিবী-শ্মশানে আবির্ভূতা হও। আবির্ভূতা হও আনন্দের ডালি নিয়ে আমাদের হৃদয়পদ্মে। আমাদের চেতনা দাও, চৈতন্য জাগাও। নিজ কৃপায় আমাদের প্রতি তুমি প্রসন্না হও। ক্রন্দনাতুর আমরা আমাদের কোলে তুলে নিয়ে মাতৃস্তন্যদানে কান্না থামাও। আমাদের অন্তরের ষড়রিপু বলি দিয়ে তোমাকে পূজা করতে শেখাও। হে মাতঃ, এ পৃথিবী-পাত্র নিদারুণ বিষে ভরা। এখানে সহজ দাক্ষিণ্য নেই, আলোকের পরশ নেই। বিশ্ব-প্রাঙ্গণের পুতুলখেলায় আছে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতার নৃত্য। কবরের অন্ধকারে বাস ক'রে আমরা যে হাঁপিয়ে উঠেছি; হে দুঃখবিনাশিনী সন্তানদের প্রতি প্রসন্ন হও মা।

চল পথিক, আজ ঐ ভয়ঙ্করীর—তথা ক্ষেমঙ্করীর আবাহনে চল। চল ঐ আনন্দসত্তার মাধুর্যময়তায় হৃদয় মধু ক'রে নেবে চল। চল আর দেরী নয়, মাকে ডাকবে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

জাগ্রত দেবতা*

স্বামী বিবেকানন্দ

সেই এক বিরাজিত অন্তরে বাহিরে
সব হাতে তাঁরি কাজ
সব পায়ে তাঁরি চলা
তাঁরি দেহ তোমরা সবাই ;—
কর তাঁর উপাসনা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল-প্রতিমা।

মহামহীয়ান যিনি, দান হ'তে দীন,
একাধারে কীট ও দেবতা যিনি,
পাপী পুণ্যবান,
দৃশ্যমান, জ্ঞানগম্য, সর্বব্যাপী, প্রত্যক্ষ মহান,—
কর তাঁর উপাসনা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল-প্রতিমা।

অতীত জীবনধারা নাই তাঁর মাঝে,
অথবা আগামী কোন জনম-মরণ,
নিয়ত ছিলাম মোরা তাঁহাতে বিলীন,
চিরকাল এক হ'য়ে রবো তাঁরি বুকে ;—
কর তাঁর উপাসনা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল-প্রতিমা।

ওরে মূর্খদল !
জীবন্ত দেবতা ঠেলি',
অবহেলা করি'
অনন্ত প্রকাশ তাঁর এ ভুবনময়,
চলেছিস ছুটে মিথ্যা মায়ার পিছনে
বৃথা দ্বন্দ্ব-কলহের পানে—
কর তাঁর উপাসনা, একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল-প্রতিমা।

---

* 'The Living God' : ১৮৯৭, ৯ই জুলাই আলমোড়া হইতে জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে লিখিত পত্রে একটি কবিতার অনুবাদ : শ্রীপ্রণব রঞ্জন ঘোষ।

ভাগনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন

[নিবেদিতা-বক্তৃতা : পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর রমা চৌধুরী

অতএব দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল—কি সেই কাজ? আমাদের সম্মুখে রয়েছে কি কর্তব্য কর্ম, সাধারণভাবে এক্ষেত্রেও নিবেদিতা সেই একই কথা বলছেন—তেজের কথা—সাহসভরে, দৃপ্তভাবে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া, সকলকে মুক্তহস্তে স্বীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য দান করার কথা। তিনি এই প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছেন তাঁর গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের একটি সুন্দর তেজোদৃপ্ত বাণী উদ্ধৃত ক'রে—

Forgiveness, if weak and passive, is not good ; fight is better. Forgive, when you can bring legions of angels to an easy victory.

অর্থাৎ যে ক্ষমা দুর্বলতা ও নিষ্ক্রিয়তার পরিচায়ক, তাকে কোনক্রমেই ভাল বলা চলে না। তার চেয়ে সংগ্রাম শ্রেয়ঃ। যদি তোমার সহস্র দেবতাকে সহজেই জয় করবার শক্তি থাকে, তাহলেই কেবল তুমি ক্ষমা করতে অগ্রসর হয়ো।

সেজন্য ক্ষমাকে হ'তে হবে সবলের ক্ষমা, বীরের ক্ষমা, দুর্বলের নয়। এই ভাবে অন্তরের তেজ, আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতেই আমাদের বর্তমান কর্তব্য-কর্মে অগ্রসর হ'তে হবে।

এই কর্তব্য নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্থির ক'রে নিতে হবে, এই যুগের বিশেষ সমস্যার বিষয়। এই যুগের বিশেষ সমস্যা—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা। এই যোগাযোগ বর্তমানে বিজ্ঞানের কল্যাণে একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সেজন্য যোগাযোগ যখন আছেই, তখন তা সুষ্ঠুভাবে, শোভনভাবে, যথোপযুক্তভাবে থাকাই তো কর্তব্য। এই কারণে বর্তমান যুগে কেবল স্বীয় স্বতন্ত্র স্থিতি নিয়েই ব্যস্ত থাকলে চলবে না; সেই সঙ্গে চিন্তা করতে হবে পরস্পরের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের কথাও। এই সম্বন্ধেরও আছে দুটি দিক—যা পূর্বেই বলা হয়েছে—গ্রহণ এবং দান; নিজেকে পূর্ণ করা, এবং অপরকেও পূর্ণ করা। সেজন্য একদিকে যেরূপ আমরা নিজেদের মধ্যে নিজেরাই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বসে থাকব না, ঠিক তেমনি অন্য দিকে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞাও ক'রব না। সেজন্য একদিকে যেমন প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা পরিহার্য, ঠিক তেমনি অন্যদিকে অতি-বিশ্বজনীনতাও হাস্যকর। কারণ স্বভাবতই যিনি নিজেকে উন্নত করতে পারেন না, তিনি অপরকেও উন্নত করতে পারেন না; যিনি দেশকে ভালবাসেন না, তিনি বিদেশকেও ভালবাসতে পারেন না; যিনি নিজেকে ও নিজের দেশকে নিঃস্ব ব'লে মনে করেন, তিনি বিশ্বকে পূর্ণ করবেন কি প্রকারে? সেজন্য যে-যুগে 'Inter-nationalism' বা 'আন্তর্জাতিকতাবাদ' হয়ে উঠেছে প্রায় একটি মহাধর্মপর্যায়ভুক্ত, সে-যুগেও নিবেদিতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নির্ভীকতা-সহকারে বলছেন :

Only the tree that is firm-rooted in its own soil can offer us a perfect crown of leaf and blossom.... Only the fully national can possibly contribute to the cosmo-national.

অর্থাৎ যে বৃক্ষটি তার নিজের ভূমিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে আছে, সেই কেবল আমাদের পত্র-পুষ্পের পূর্ণ শোভায় আনন্দদান করতে পারে। একই ভাবে, যিনি পূর্ণভাবে স্বদেশ-প্রেমিক ও স্বদেশ-সেবক, তিনিই কেবল বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্ব-সেবক হ'তে পারেন।

এইভাবে Nationalism (জাতীয়তা)-কে Inter-nationalism (আন্তর্জাতিকতা) অথবা Cosmo-nationalism (বিশ্বজাতীয়তা)-র উপর স্থান দিয়েছেন ব'লে, নিবেদিতাকে কিন্তু কোনক্রমেই অনুদার অথবা সঙ্কীর্ণ-হৃদয়া ব'লে গ্রহণ করা চলবে না। নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ ক'রে তিনি নির্ভয়ে বাহির হয়েছিলেন সেই চিরসত্যের সন্ধানে যা দেশকাল-পাত্রাতীত; যা কোন বিশেষ ধর্মে, কোন বিশেষ দর্শনে, কোন বিশেষ নীতিতত্ত্বেই কেবল আবদ্ধ হয়ে থাকে না; যা তার স্থির শাশ্বত গৌরবে চিরভাস্বর। কোন অন্ধবিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা তাঁকে সেদিন বাধা দান করতে পারেনি। অপরপক্ষে সত্য সর্বত্র বিরাজিত হলেও তার আভা বিশেষ বিশেষ আধারে বিশেষ বিশেষ রঙে প্রতিফলিত হয়, যেমন একই শুভ্র সূর্যালোক বিশেষ বিশেষ বস্তুতে বিভিন্ন সাতটি রঙে প্রকাশিত হয়। কোন্ সাধন-বলে কে জানে, সত্যের এই এক একটি রঙ ধরে যায় এক একটি চিত্তে কোন এক শুভ মুহূর্তে। তখন সত্যের সেই আধার—সেই দর্শন, সেই ধর্ম এবং সেই দেশ হয় সেই ব্যক্তির আত্মার আত্মীয়—তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার মহা-উত্তর, তাঁর জীবন-পিপাসার মহা-শান্তি, তাঁর মাতৃভূমি, সাধনক্ষেত্র, মোক্ষ-সোপান। তারপরে এই সবেরই ভিত্তিতে তিনি জগতে ভিত্তিলাভ করেন। নিবেদিতাও তাই করেছিলেন। এই হ'ল নিবেদিতার Nationalism-এর ভিত্তিতে Inter-nationalism অথবা Cosmo-nationalism-এর মর্ম-কথা। অসীম উত্তাল সংসার-সমুদ্রে আমরা ভেসে চলেছি অহরহ তৃণগুচ্ছ-সম। আমাদের কি একদিন প্রয়োজন হয় না নোঙরের? নয়তো সমুদ্রে এই ভাবে লক্ষ্যহীন হয়ে ভেসে বেড়ানোই তো আমাদের সার হবে, সেই অনন্তের সঙ্গে প্রকৃত যোগই বা আমাদের হবে কি ক'রে। যোগ হ'তে পারে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, স্থিতির সঙ্গে স্থিতির, ভিত্তির সঙ্গে ভিত্তির—ব্যক্তিত্ববিহীন স্থিতিবিসর্জিত ভিত্তি-বিবর্জিত কারও সঙ্গে নয়। দেশের মধ্যেই আমার ব্যক্তিত্ব, আমার পরিচয়, আমার গৌরব, আমার সত্তা; জগতের মধ্যে তেমনি আমার ব্যক্তিত্ব, আমার পরিচয়, আমার গৌরব, আমার স্বদেশ-সত্তা। এর মধ্যে কূপমণ্ডূকতাই বা কোথায়, আর বদ্ধচিত্ততাই বা কোন্খানে?

বিশেষ ক'রে নিবেদিতা যখন এই কথা বলেছিলেন, তখন তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল নিঃসন্দেহে। কারণ সেই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার মোহে দেশের যুব-সম্প্রদায় দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে যেন হীনচক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন; এবং স্বদেশের সব কিছুই মন্দ, এবং বিদেশের সব কিছুই অনিন্দ্য, এই ভাবটিই শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করেছিল। তেজস্বিনী নিবেদিতা এরূপ দুঃখকর, অপমান-জনক প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করা তাঁর অবশ্য-কর্তব্য ব'লে মনে করেছিলেন। সেজন্য বারংবার মুক্তকণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে, বিনা-দ্বিধায় তিনি বলছেন:

And similarly, only the heart that responds perfectly to the claims of its immediate environment, only the character that fulfills to the utmost its stint of civic duty, only this heart and mind is capable of taking its place in the ranks of the truly cosmopolitan.

অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ন্যায়সঙ্গত দাবি যে-চিত্ত পরিপূর্ণভাবে মেটাতে পারে, সামাজিক কর্তব্য যে-চরিত্র পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পারে—সেই চিত্ত ও মনই কেবল যাঁরা সত্যই আন্তর্জাতিক বা সর্বজনীন স্বভাব-সম্পন্ন, তাঁদের মধ্যে স্থানলাভ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা দুটি চরম—এবং সেজন্য ত্যাজ্য—মনোভাবের উল্লেখ করেছেন। একটি হ'ল—অতি-উদারতা অথবা অতি-বিদেশপ্রেম, অপরটি হ'ল—অতি-সঙ্কীর্ণতা অথবা অতি-স্বদেশপ্রেম। দুটিই অবশ্য সমভাবে নিন্দনীয়, বর্জনীয় ও অসহনীয়। তা সত্ত্বেও প্রথমটি দ্বিতীয়টির অপেক্ষা অধিকতর মন্দ, যেহেতু তা আত্মসম্মানকে, জাতীয় সম্মানকে ব্যাহত করে ; বিদেশের নিকট স্বদেশকে হেয় প্রতিপন্ন করে ; অন্ধ অনুকরণ-প্রবণতাকে এক মহাদস্তুরূপে গ্রহণ করে। জগৎসভায় এরূপ নির্বোধ ব্যক্তির সম্মান ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের অপেক্ষা বিন্দুমাত্র অধিক নয়, নিঃসন্দেহ। কারণ বিশ্ব-সম্পদ্‌ভাণ্ডারে যদি তাঁর দানযোগ্য কিছুই না থাকে, তা হ'লে তাঁর প্রয়োজনই বা কি, আর প্রকৃষ্টতাই বা কোথায় ? অপর পক্ষে অতি-স্বদেশপ্রেমও সহস্রগুণে অধিক আত্মসম্মানজনক ও পৌরুষব্যঞ্জক হলেও সমভাবে নিরর্থক। নিবেদিতা প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদের বলেছেন, 'Vulgar' অথবা অশিষ্ট বা অসভ্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের 'Provincial' অথবা সাম্প্রদায়িক বা সঙ্কীর্ণমনা এবং সেই সঙ্গে এও বলেছেন যে, 'Vulgar' হওয়া অপেক্ষা 'Provincial' হওয়া শ্রেয়ঃ। তা সত্ত্বেও Vulgarism ও Provincialism উভয়ই যখন সমভাবে কাম্য নয়, তখন দুটির মধ্যবর্তী একটি তৃতীয় পন্থা গ্রহণই বাঞ্ছনীয়।

এই মধ্যম-পন্থার প্রথম লক্ষণের বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা হ'ল 'Nationalism'র ভিত্তিতে Inter-nationalism অথবা Cosmo-nationalism ; অর্থাৎ প্রথমে স্বদেশকে ভালবেসে, স্বদেশকে উন্নত ক'রে, স্বদেশের সেবা ক'রে, পরে বিশ্বকে ভালবাসা, বিশ্বকে উন্নত করা, বিশ্বের সেবা করা।

দ্বিতীয় লক্ষণ হ'ল : স্বদেশের সমস্ত অতীতকে বিশ্বের সমস্ত বর্তমানের মধ্যে মিলিত ক'রে উপলব্ধি করা। তাঁর স্বভাবগত সরল ও সতেজ-ভাবে নিবেদিতা বলছেন :

> What the time demands of us is that in us our whole past shall be made a part of the world's life. This is what is called the realisation of the national idea. But it must be *realised everywhere in the world idea. (P. 17)*

অর্থাৎ বর্তমান যুগের প্রয়োজন হ'ল, আমাদের সমগ্র অতীতকে বিশ্বের জীবনের অংশ ক'রে তোলা। একেই বলা হয়, জাতীয় ভাবধারার প্রকাশ। কিন্তু সর্বত্রই জাতীয় ভাবধারাকে প্রকাশিত করতে হবে বিশ্বের ভাবধারার মধ্যে।

জাতীয় ভাবধারা ও আদর্শকে এই ভাবে বিশ্বের ভাবধারা ও আদর্শের মধ্যে মূর্ত করার করার অর্থ কি ? অর্থ হ'ল এই যে, যা নিবেদিতা বারংবার বলেও যেন শেষ ক'রে উঠতে পারছেন না— স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েও এক সর্বজনীন সত্তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া। এই যে সর্বজনীন সত্তা, এই যে বিশ্বজীবন, এই যে সর্বব্যাপী চিত্ত, তা হ'ল ইংরেজী দর্শন-শাস্ত্রের ভাষায়, একটি Concrete Unity or Organic whole, অথবা একটি পরিপূর্ণ অংশী, যে-স্থলে অংশসমূহ অংশী এবং পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। বিশ্ব এরূপ একটি সুন্দর অংশী অথবা সমগ্র সত্তা, যার মধ্যে প্রত্যেক অংশই স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্য অথবা

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও সেই অংশী অথবা সমগ্র সত্তার সমগ্র জীবনকে স্পন্দিত করছে, লীলায়িত করছে তার সৌন্দর্যকে, উচ্ছলিত করছে তার মাধুর্যকে, উদ্বেলিত করছে তার ঐশ্বর্যকে। কি অপূর্ব এই অংশী-অংশের সম্বন্ধ, কি অনুপম এই দান-প্রতিদান, কি অতুলনীয় এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। উচ্চ-নীচ, অধিক-অল্প, সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ, আশ্রয়-আশ্রিত, আধার-আধেয়ের সম্পর্ক এ নয়—এ সম্পর্ক সমপদস্থ সমগৌরববিমণ্ডিত সমশক্তিমান্ বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক। সংসারের চতুর্দিকেই একবার চোখ মেলে, প্রাণ খুলে, মন ঢেলে তাকিয়ে দেখুন—দেখবেন সেই একই লীলা—একের সঙ্গে দুয়ের, দুয়ের সঙ্গে বহুর সেই একই প্রীতির লীলা, উচ্চ-নীচ ভেদহীন, শুদ্ধ, নিঃস্বার্থ, সমপদস্থ প্রীতির লীলা। দেখুন, নববসন্তের আগমনে বৃক্ষের শাখায় শাখায় অজস্র মঞ্জরী ধরেছে। সেই সমস্ত বৃক্ষের প্রাণের রস প্রকাশ করবার জন্যই তো তাদের এ শুভাবির্ভাব—তাদের তুচ্ছ বলবে কে, কারণ তাদের একটি মুকুল ঝরে পড়লেও সমগ্র বৃক্ষটির দিক থেকে হবে অপরিসীম অনিষ্ট। দেখুন, সাগরে উর্মিমালার মধ্যে নৃত্য করছে অসংখ্য উর্মি, প্রত্যেকেরই নৃত্যের ঝঙ্কারে পূর্ণ হয়ে উঠছে সাগরের মন্দ্র-গীতধ্বনি। একটি উর্মিও যদি অকস্মাৎ নৃত্যে বিরতি দেয়, সমগ্র সাগরেরই কলনৃত্য হয়ে যাবে শেষ মুহূর্ত মধ্যেই, তার অনন্ত সুষম ছন্দের তাল যাবে কেটে। দেখুন, দিগন্তব্যাপী আকাশপটে কত মেঘের সমারোহ, কত রঙের সমাবেশ, কত গ্রহ-নক্ষত্রের সম্ভার. কিন্তু কি একটি একক সমগ্র চিত্র—কে তাতে উচ্চ, কে তাতে নীচ—সকলেরই দান সমান, গৌরব সমান, প্রয়োজনীয়তা সমান। এই তো হ'ল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক রূপ, প্রকৃত প্রতিচ্ছবি, অন্তর্নিহিত সত্য। সেইজন্যই ইওরোপীয় দর্শনে বিশ্বকে বলা হয় 'Cosmos, not a chaos'—একটি সুশৃঙ্খল সমগ্র সত্তা, বিশৃঙ্খল বস্তুসমাবেশ নয়।

বিশ্ব-সংস্কৃতির রূপটিও এই। বহু রূপ, বহু রস, বহু শব্দ, বহু স্পর্শ, বহু গন্ধ সম্মেলনে গঠিত যেমন এই সুন্দরী ধরণী, ঠিক তেমনি বহু জ্ঞান, বহু ভক্তি, বহু কর্ম, বহু চিন্তা, বহু কবিতা, বহু গীতি, বহু প্রীতি, বহু মৈত্রী, বহু শান্তি দিয়ে রচিত তার সভ্যতা, তার সংস্কৃতি, তার সম্পদ্। এরূপে সর্বত্রই তো সেই একই নিয়ম—বহুর মিলনে এক, একের প্রকাশে বহু। এই মূলীভূত তত্ত্বটিকে স্মরণে রেখে তবেই আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হ'তে।

সুতরাং এই রীতি অনুসারে বিশ্বের সঙ্গে মিলনের পদ্ধতি হ'ল, যা নিবেদিতা বারংবার বলেছেন—নিজেকে বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বকে নিজের মধ্যে সাদরে, সানন্দে, সগৌরবে স্থাপন করা। প্রথমটির অর্থ হ'ল—নিজের সম্পদ্ অপরকে দান; দ্বিতীয়টির অর্থ হ'ল—অপরের সম্পদ্ নিজে গ্রহণ। বারংবার তো সেই একই কথা এসে পড়ছে—দান-প্রতিদান, অর্পণ-গ্রহণ, স্বতন্ত্রতা-সম্পুষ্ট সর্বজনীনতা—সর্বজনীনতা-সমাশ্রিত স্বতন্ত্রতা।

নিবেদিতাও বারংবার এই মহাতত্ত্বেরই উল্লেখ ক'রে বলছেন :

> Cosmo-nationality of thought and conduct, then, is not easy for any man to reach, only through a perfect realisation of his own nationality can any one anywhere win to it. And, Cosmo-nationality consists in holding the local-idea in the world-idea. (P.17)

অর্থাৎ এরূপে চিন্তা ও কার্যের সর্বজনীনতা লাভ করা কারও পক্ষেই সহজ নয়। কেবল-

মাত্র পরিপূর্ণ জাতীয়তা-ভাব লাভ করতে পারলেই বিশ্বজনীন ভাব লাভ করা সম্ভবপর হয়। এবং এই আন্তর্জাতীয়তা বা বিশ্বজনীন ভাবের অর্থ হ'ল: আন্তর্জাতিক ভাবধারার মধ্যে জাতীয় ভাবধারাকে ধারণ করা।

কিন্তু এই ভাবে আন্তর্জাতীয়তা বা বিশ্বজনীনতার কথা বললেও নিবেদিতার প্রাণ পড়ে ছিল জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের মধ্যেই চিরকাল। শেষ পর্যন্ত সেজন্য তিনি ব'লে যাচ্ছেন:

In order to attain a larger power of giving, we may break through any barrier of custom. But it is written inexorably in the very nature of things that, if we sacrifice custom merely for some mean or selfish motive, fine men and women everywhere will refuse to admit us to their fellowship. (P. 17)

অর্থাৎ যাতে আমরা অধিকতর দানশক্তি লাভ করতে পারি, সেজন্য আমরা প্রচলিত রীতি-নীতির বন্ধন লঙ্ঘন করতে পারি নিশ্চয়ই। কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এ কথাও সত্য যে, যদি আমরা কোন হীন বা স্বার্থপর উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আমাদের জাতীয় রীতি-নীতি বর্জন করি, তা হ'লে সর্বত্রই ভাল লোকেরা আমাদের তাঁদের বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে অস্বীকার করবেন।

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, নিবেদিতা ভারতীয়-সমাজে 'Custom' বা পূর্বপ্রচলিত অনড় অচল রীতি-নীতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি যে পুনরায় এস্থলে বলছেন, অকারণে স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে 'Custom' বর্জন করবে না—সে-কথা স্ববিরোধদোষদুষ্ট নয়। তার কারণ দুটি। একটি হ'ল যে, 'Custom'মাত্রই পরিত্যাজ্য নয়। কারণ প্রাচীন রীতি-নীতির মধ্যেও তারতম্য আছে; কোন-কোনটা ভাল, কোন-কোনটা দেশাচার-ক্রমে মন্দ, ইত্যাদি ভেদ আছে। দ্বিতীয় কারণ হ'ল এই যে, উপরেই যা বলা হ'ল, নিবেদিতার স্বদেশপ্রেম, আত্মসম্মানজ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব এরূপ প্রখর ছিল যে, তিনি কোনক্রমেই যেন দেশকে মন্দ ব'লে ভাবতেই পারতেন না—ভাল-মন্দ সব কিছু জড়িয়ে দেশ তো একমাত্র দেশই, আমাদের প্রাণের দেশ, আমাদের অতি আদরের দেশ, আমাদের চিরস্বপ্ন, চিরকল্পনা, চিরসাধনার ধন দেশ। তার সব কিছুই তো আমার, আমারই নিজের, আমারই পাপপুণ্যের ফল। দেশই তো আমি, আমিই তো দেশ। সুতরাং তার কোন কিছুকেই 'আমার নয়' ব'লে অস্বীকার করা যাবে না, যেরূপ কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না নিজের জীবনকে, নিজের সত্তাকে, নিজের আত্মাকে। নিবেদিতা-চরিত্রের দুটি মূলীভূত সত্য হ'ল—তেজস্বিতা এবং স্বদেশপ্রীতি। সেজন্য তিনি চিরকাল ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য তার কুসংস্কার, কুপ্রথা, কুরীতি-নীতির বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করলেও দেশের সংস্কার-প্রথা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ছিলেন, এবং অকারণ বিদেশীর অনুকরণ ও পদলেহন ছিল তাঁর দুই চক্ষুর বিষ।

এই ভাবে নিবেদিতা বলছেন, বর্তমানে আমাদের প্রধান কর্তব্য হ'ল জাতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্ব-সংস্কৃতির মধ্যে সগৌরবে স্থাপন করা। সেজন্য আজ আমাদের বিশ্বের ভাব-ধারা, চিন্তা-প্রবাহ, আকৃতি ও প্রাপ্তির বিষয়ে সর্ব প্রথম জানতে হবে পরিপূর্ণভাবে, শ্রদ্ধা-সহকারে, বিনয়-ভরে। সেইদিক থেকে আমাদের আধুনিক শিক্ষা-তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি-পাত করতে হবে। বস্তুত: বিশ্বসংস্কৃতির বিষয় জানতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সেই সম্বন্ধে

বাহিরের জ্ঞানমাত্রই নয়, অন্তরের সহানুভূতি, সাক্ষাৎ উপলব্ধি। দূরদর্শী নিবেদিতা সেজন্য পূর্বাহ্নেই সাবধান-বাণী উচ্চারণ ক'রে বলছেন :

It is well-known that culture is a matter of sympathy, rather than of information. It would follow that the cultivation of the sense of humanity as a whole is the essential feature of a modern education. (P. 17)

অর্থাৎ একথা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃতি জানবার মূল উপায় হ'ল সহানুভূতি, কেবল বাহিরের সংবাদ আহরণ-মাত্রই নয়। সেজন্য আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হ'ল 'Sense of Humanity' অথবা বিশ্বাত্মবাদের অনুশীলন করা।

কি মধুর, কি গভীর, কি বিরাট এই দুটি শব্দ 'Sense of Humanity'—এ হ'ল 'Sense' বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অথবা অনুভূতি। এইভাবে বিশ্বকে আজ কেবল মস্তিষ্কে নয়, কেবল জ্ঞানের ভারাক্রান্ত বদ্ধ গৃহে নয়, কিন্তু হৃদয়ে, সুধাসিক্ত অন্তরের উন্মুক্ত অঙ্গনে সাদরে সানন্দে স্থাপন করতে হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিষয়ে আমাদের কর্তব্য কি? সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, বিশ্বকে জানতে হ'লে কেবল ভূগোল-জ্ঞানই যথেষ্ট। কিন্তু নিবেদিতার মতে ভূগোলের ন্যায় ইতিহাসও সমভাবে প্রয়োজন। ভূগোল দিতে পারে কেবল বিশ্বের দেহের সংবাদ, কিন্তু তার প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাবে তার ইতিহাসেই কেবল; তার আশা-নিরাশা, উন্নতি-অবনতি, সাফল্য-অসাফল্য, তার পুঞ্জীভূত ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা, ঐশ্বর্য প্রভৃতির চিত্র আর অন্য কোথায় পাওয়া যাবে?

এই ভাবে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে 'Comparative Study' অথবা তুলনামূলক অধ্যয়ন একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। যেমন প্রাণিতত্ত্ব-শিক্ষাকালে কুকুরকে কুকুর, গাভীকে গাভীরূপে জানলেই তো আজ আমাদের চলে না—আমাদের সেই সঙ্গে সঙ্গে জানতে হবে তাদের প্রকৃত পারস্পরিক সম্বন্ধ, তাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি অন্যান্য বহু তত্ত্বও একই সঙ্গে।

শিল্প ও সাহিত্য-শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই একই কথা প্রযোজ্য। এই সব ক্ষেত্রেও তুলনামূলক অধ্যয়ন ও বিচার বর্তমানে প্রধান স্থান অধিকার করেছে। নিবেদিতা সর্বদাই সাহিত্য ও শিল্পকে সম-মর্যাদা দান করতেন। তখনও আমাদের দেশে শিল্পের সমাদর পূর্ণভাবে হয়নি। কিন্তু নিবেদিতা শিল্পোন্নতি বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি বলতেন যে, সাহিত্য ও শিল্প উভয়েই তো মানবজীবনের চিত্র। সেজন্য শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনও সমধিক; এবং সাহিত্যিকের ন্যায় শিল্পীও দেশকে অমর ক'রে রাখেন তাঁদের অমূল্য সৃষ্টিতে।

এই ভাবে বিশ্বকে সুষ্ঠুভাবে জানবার জন্য একদিক থেকে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা ক'রব নিশ্চয়ই। অন্যদিক থেকে দেশকে জানবার জন্যও আমাদের সমভাবে প্রাণপণ ক'রে চেষ্টা করতে হবে। হয়তো মনে হ'তে পারে যে, দেশকে জানবার জন্য কোন বিশেষ প্রযত্নের প্রয়োজন আমাদের নেই, কারণ দেশ তো আমাদের নিজেদেরই, আমাদের সম্মুখেই প্রসারিত, আমাদের চতুষ্পার্শ্বেই বিস্তৃত, আমাদের করতলগত ও আয়ত্তাধীন। সুতরাং সেই দেশকেই জানবার জন্য এরূপ প্রয়াসের প্রয়োজন হবে কেন পুনরায়?

কিন্তু সামান্য চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা যাবে যে, একটি পরাধীন জাতির পক্ষে দেশকে জানা বিদেশকে জানা অপেক্ষা শতগুণ কঠিনতর। কারণ স্বভাবতই বিদেশী

শাসকগণ নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাবধারা, আচার-আচরণ প্রভৃতি বিজিতগণের উপর চাপাতে চেষ্টা করেন এবং দেশীয় সংস্কৃতিকে অবহেলা করেন। সেজন্য পরাধীন জাতির বালক-বালিকারা শিশুকাল থেকেই হয় দেশের সম্বন্ধে অজ্ঞই থেকে যায় অথবা মন্দ ধারণা পায়। ভারতবর্ষেও তো ঠিক তাই হয়েছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আরেকটি বিশেষ অসুবিধা হ'ল এই যে, অতি প্রাচীন এই দেশ, তার সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-ঐশ্বর্য, ভাবধারা-রীতিনীতির সঙ্গে যেন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বর্তমান যুগের কোনরূপ সম্বন্ধই নেই।

সেজন্যই দেশমাতৃকার শ্রীচরণে নিবেদিত-প্রাণ নিবেদিতা বিদেশকে জানা অপেক্ষা স্বদেশকে জানার দিকেই বারংবার অধিক জোর দিয়েছেন। বস্তুত: যা পূর্বেই বলা হয়েছে—সেই সময়ে ভারতবর্ষের যা অবস্থা ছিল, তাতে বরং বিদেশকে জানা সহজতর ছিল স্বদেশকে জানা অপেক্ষা।

এই কারণে 'আমাদের সম্মুখের কর্তব্য কর্ম কি?' —এই যে প্রশ্ন নিয়ে নিবেদিতা আরম্ভ করেছিলেন, তার উত্তর তিনি এখন সব মিলিয়ে দিচ্ছেন, পূর্বের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে, তাঁর পরমপ্রিয় বিষয়েরই বারংবার উল্লেখ ক'রে। তিনি সক্ষোভে বলছেন যে, বিশ্ব-সংস্কৃতিতে বহু 'ফাঁক'—শূন্যস্থান আজও রয়ে গিয়েছে। যেমন প্রাচ্য দেশগুলি সম্বন্ধে প্রতীচ্যের অজ্ঞতা আজও গগনস্পর্শী। একই ভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানও বিদেশীদের অতি অল্প। তার কারণ হ'ল এই :

The Indian Mind has not reacted out to conquer and possess its own land as its own undeniable share and trust in the world as a whole. It has been content even in things modern, to take obediently whatever was given to it. (P. 19)

অর্থাৎ আজ পর্যন্ত ভারতীয় মন জয় করতে পারার মতো শক্তি অর্জন করেনি; বিশ্বের দরবারে তার ন্যায্য দাবি-দাওয়াও সে পেশ করতে পারেনি। এমন কি আধুনিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও সন্তুষ্টভাবে যা কিছু তাকে দেওয়া হয়েছে, তাই সে স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

কিন্তু নিরাশার কোনও কারণ নেই। কারণ আমাদের লক্ষ্য তো আমরা পূর্বেই স্থির ক'রে নিয়েছি—'Aggression'—আক্রমণ। পুনরায় শুনুন নিবেদিতার তেজোদৃপ্ত বাণী :

But to-day, in the deliberate adoption of an aggressive policy, we have put all this behind. ...Our part henceforth is active and not passive. .. We accept no more programmes. Henceforth, we become the makers of programmes. We obey no more policies. Henceforth, do we create policies.

— আজ থেকে যখন আমরা স্বেচ্ছায় একটি আক্রমণশীল পন্থা অবলম্বন করেছি, তখন সবই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সংসার যে যুদ্ধ—এই মহাতত্ত্ব যখন আমরা গ্রহণ করেছি, তখন যারা আমাদের বিরুদ্ধে বাধা-রূপে বিরাজ করছে, তাদের যুদ্ধে পরাজিত করাও আমাদের অবশ্য-কর্তব্য কর্ম। এইভাবে বিশ্ব-সংস্কৃতিতে আমাদের নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি দান করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়—স্মরণ রেখো—শুধু গ্রহণ নয়, দান। এইভাবে আমরা এখন সক্রিয় হবো, নিষ্ক্রিয় নয়। 'এইভাবে, ভারতে ভারতীয়ত্ব আনতে, আমাদের জাতীয় চিন্তাধারা সুসংবদ্ধ করতে, আমাদের যাত্রাপথ স্থির করতে আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর নির্ভর ক'রব, অপরের উপর নয়। এইভাবে আমরা অন্যদের দ্বারা কৃত কার্যপন্থা আর গ্রহণ ক'রব না, নিজেরাই সেই পন্থা স্থির ক'রব। আমরা অন্যদের দ্বারা

উদ্ভাবিত নিয়ম-কানুন আর পালন ক'রব না, নিজেরাই নিয়ম কানুন স্থির ক'রব। আমরা নিজেদের জ্ঞানের দিক থেকে মুক্ত ব'লে বিধান দেব।'

ভগিনী নিবেদিতার অন্তরের অন্তঃস্থলে এই 'Aggressive Policy'র আকৃতি যে কত গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল, কত শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে দৃঢ়মূল হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, তিনি বারংবার ছু-ছত্র পরে-পরেই এর উল্লেখ করেছেন। সেজন্য পুনরুক্তি-দোষের ভয় ছেড়েও আমরাও বারংবার তাই করেছি, তিনি আক্রমণশীলতার প্রতি কি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা বোঝবার জন্য। [ক্রমশঃ]

ভর্তৃহরি থেকে

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পরিজনে দয়া-ভাব,
অনুগত আত্মীয়-স্বজনে,
দুর্জনের সাথে শাঠ্য,
আর প্রীতি সদাশয়-সনে,
রাজনীতি নৃপ-সাথে,
পণ্ডিতের সঙ্গে নম্র নতি,
শত্রু-সাথে শৌর্য রাখা,
সহিষ্ণুতা গুরুজন প্রতি,
যুবভাব নারী-সঙ্গে,—
এই সব বিবিধ কৌশল
যে-জন আয়ত্তে রাখে,
জীবনে সে সম্যক্ সফল।

*

সুরসিক কবিগণ সর্বজয়ী
সুকৃতির ফলে :
তাঁদের যশের গতি জরা-মৃত্যু-
ভয়ে নাহি টলে।

*

সাধুসঙ্গ ফলবান,
মূর্খতার গ্লানি করে নাশ,
চিন্তা-মাঝে এনে দেয়
সত্য-দীপ্ত বাণীর প্রকাশ।
পাপ-বোধ অহংকার
দূর ক'রে প্রগতির পথ
সর্বদা উন্মুক্ত রাখে,
এনে দেয় আকাঙ্ক্ষা মহৎ।

*

উল্কজনের বিঘ্ন-ভয়ে
মহৎ-কর্মে বিমুখ বহু লোক,
অনেকে হায় মহৎ পথে
বাধা পেলেই হঠাৎ থেমে যায়,
অসাধারণ তারাই, যারা
হাজার বিপদ তুচ্ছ ক'রে ধায়
লক্ষ্য পানে অবিরত,
সরণী সে যতই ভয়াল হোক।

সূক্ষ্মশরীর

স্বামী সুন্দরানন্দ

সামান্য সন্ধান করিলেই জানা যায় যে, দৃশ্যমান স্থূলদেহমাত্রেরই কারণরূপে উহার অভ্যন্তরে অদৃশ্য সূক্ষ্মদেহ বিদ্যমান। জরায়ুজ, স্বেদজ ও অণ্ডজ জীবদেহের জন্ম হয় অতি সূক্ষ্ম অণুপরিমিত প্রাণবান্ ভ্রূণ (embryo) হইতে এবং উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদির জন্মের কারণ প্রাণশক্তিসম্পন্ন অতি সূক্ষ্ম অঙ্কুর বা বীজ। সকল ক্ষেত্রে সূক্ষ্মই অনুকূল অবস্থাধীনে স্থূলে পরিণত হয়। সুতরাং সূক্ষ্মই স্থূলের কারণ। সূক্ষ্মশরীরমাত্রেরই পশ্চাতে আবার কারণ-শরীর আছে, এবং 'সর্বকারণকারণানাং' ব্রহ্মই স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ—সকলেরই কারণ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-মতে অন্নের পরিণাম পাঞ্চভৌতিক দেহ। ইহা পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়- ও পঞ্চবায়ু-সমবায়ে গঠিত অন্নময়-কোষ নামে অভিহিত। এই কোষই দৃশ্যমান স্থূলশরীর। ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট প্রাণময়-কোষ হইতে স্বতন্ত্র অথচ তদভ্যন্তরে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন মিলিত হইয়া মনের প্রাধান্যবশতঃ মনোময়-কোষ নামে বর্ণিত। এই কোষ হইতে পৃথক্ থাকিয়াও ইহার অভ্যন্তরে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-সহ বুদ্ধির সমবায়ে নিশ্চয়াত্মক বিজ্ঞানময়-কোষ বিরাজিত। বিজ্ঞানবাহুল্য এবং আত্মার আবরকত্বপ্রযুক্ত পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই নামটি প্রদত্ত। এই প্রাণময় বিজ্ঞানময় ও মনোময়-কোষের সম্মিলনে সূক্ষ্মশরীর গঠিত। হিন্দুশাস্ত্রমতে ইহাই অষ্টপাশাবদ্ধ জীবাত্মা।

এই কোষচতুষ্টয় তরবারির স্থূল খাপের ভিতরে সূক্ষ্মতর ও তদভ্যন্তরে সূক্ষ্মতম খাপের ন্যায় অবস্থিত। সর্বসাক্ষী ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সকলের ভিতরে বর্তমান এবং তাঁহার অধিষ্ঠান বশতই কোষগুলিও প্রাণবান্ ও ক্রিয়াশীল। সূক্ষ্মশরীর অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং আত্মার অনুমাপক বলিয়া 'লিঙ্গশরীর' নামে বেদান্তে বর্ণিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন: বহির্মুখ অবস্থায় স্থূল দেখে; তখন অন্নময়-কোষে মন থাকে। তার পর সূক্ষ্মশরীর—লিঙ্গশরীর। মনোময় ও বিজ্ঞানময়-কোষে মন যায়। এর পর কারণ-শরীর। যখন মন কারণ-শরীরে যায়, তখন আনন্দ, আনন্দময়-কোষে মন আসে। এইটি চৈতন্যদেবের অর্ধবাহ্যদশা। এর পর মন লীন হয়ে যায়; মনের নাশ হয়। মহাকারণে নাশ হয়। মনের নাশ হ'লে আর খবর নাই। এইটি চৈতন্যদেবের অন্তর্দশা। অন্তর্মুখ অবস্থা কি রকম জানো? দয়ানন্দ বলেছিল, অন্তরে এস কপাট বন্ধ ক'রে। অন্দর-বাড়ীতে যে-সে যেতে পারে না। আমি দীপশিখাকে শিরে আরোপ করতুম। লালচে রংটাকে বলতুম স্থূল, তার ভিতর সাদা সাদা ভাগটাকে বলতুম সূক্ষ্ম, সবের ভিতরে কাল খড়কের মতো ভাগটাকে বলতুম কারণ-শরীর।

অন্যত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন: এই কারণের উপরে আছে মহাকারণ (তুরীয়)। তাঁহার স্বরূপ বাক্যমনাতীত। এই মহাকারণই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ—সকলের উৎস। স্থূলশরীরের জীব-কোষগুলিও সূক্ষ্মশরীরের সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সূক্ষ্মশরীর সমষ্টি ও ব্যষ্টি দুই প্রকার: হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি-সূক্ষ্মশরীর এবং তৈজস ব্যষ্টি-সূক্ষ্মশরীরের অধিষ্ঠান। উভয়ের

প্রভেদ কেবল উপাধিগত ; প্রকৃতপক্ষে বন ও বৃক্ষের ন্যায় উভয়ে এক ও অভেদ।

বেদান্তমতে অক্ষর-ব্রহ্মের মায়াশ্রিত সংকল্প হইতে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত এবং তাহা হইতে পঞ্চীকৃত স্থূলভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র উপনিষৎ সমস্বরে বলেন যে, সৃষ্টির পূর্বে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অক্ষরব্রহ্মমাত্র ছিলেন ; তিনিই মায়াশ্রয়ে সংকল্প করিয়া বহু হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ঘোষণা করেন : 'অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ'—আত্মা (ব্রহ্ম) মায়াশ্রিত অনীশ্বর জীবরূপে ভোক্তৃত্ব অবলম্বন হেতু অর্থাৎ বিশ্বকে ভোগ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং জীবে জীবে অধিষ্ঠিত দেহেন্দ্রিয়মন ইত্যাদি যুক্ত কর্মফলভোক্তা জীবাত্মা সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ এক অদ্বিতীয় নিরুপাধিক নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই জীবোপাধিক পরিচ্ছিন্ন রূপ।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন : এই জীবাত্মা 'প্রাণশরীরনেতা মনোময়ঃ'—মনোবৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত এবং প্রাণ ও সূক্ষ্মশরীরের নেতা বা পরিচালক। কঠোপনিষৎ-মতে ইনিই 'অশরীরং শরীরেষু'—বিভিন্ন স্থূলশরীরে অতি সূক্ষ্ম এক অনির্বচনীয় অশরীরী-রূপে এবং অনিত্য দেহে এক অত্যাশ্চর্য নিত্যসত্তারূপে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—সকল জীবের হৃদয়ে অতি সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান। উপনিষৎ ঘোষণা করেন যে, ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রিত হইলেও 'কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ'—ভোক্তৃত্ব চরিতার্থের জন্য সূক্ষ্মশরীরস্থ কর্মফলভোগী পুরুষ (জীবাত্মা) অভিপ্রেত ভোগ্যবিষয়সমূহ নির্মাণ করিয়া সর্বদা জাগ্রত থাকেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন : 'নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ'—পরমাত্মা জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া নয়টি দ্বারযুক্ত (চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসারন্ধ্রদ্বয়, মুখ, লিঙ্গ ও গুহ্য) দেহপুরে অবস্থান করিয়া বাহ্য ভোগ্যবিষয়-গ্রহণে সচেষ্ট।

গীতা বলেন, 'দেহাধিপতি জীবাত্মা চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া রূপ-শব্দাদি পঞ্চবিষয় মনের সাহায্যে ভোগ করেন।' সূক্ষ্মশরীরের অধিপতি জীবাত্মা তাঁহার ভোগের প্রেরণাতেই স্থূলদেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের সহায়ে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বেদান্তে ব্যষ্টি-স্থূলদেহাভিমানী চৈতন্য স্থূলভোগের কর্তা বাহ্য আত্মা বা 'বিশ্ব' এবং ব্যষ্টি-সূক্ষ্মদেহাভিমানী চৈতন্য সূক্ষ্মভোগের কর্তা অন্তরাত্মা বা 'তৈজস' নামে পরিচিত। স্বপ্নকালে তৈজস অভিব্যক্ত। এইরূপে সমষ্টি-স্থূলদেহাভিমানী চৈতন্যকে 'বৈশ্বানর' এবং সমষ্টি-সূক্ষ্মদেহাভিমানী চৈতন্যকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলা হয়। সূক্ষ্মশরীর যেন ভোক্তা জীবাত্মার অন্তর্বাস এবং স্থূলশরীর যেন তাঁহার বহির্বাস।

মহারাজ যেমন সুরম্য প্রাসাদে বাস করিয়া বহু ভৃত্যদ্বারা সযত্নে সেবিত হইয়া নানাবিধ বিষয় ভোগ করেন, ভোক্তা জীবাত্মাও সেইরূপ সূক্ষ্মশরীররূপে রমণীয় প্রাসাদে অবস্থান করিয়া পঞ্চপ্রাণ দশেন্দ্রিয় ও মনবুদ্ধি—এই সপ্তদশ অপঞ্চীকৃত অতি সূক্ষ্ম অবয়বধারী ভৃত্যকর্তৃক সসম্মানে সেবিত হইয়া সূক্ষ্মবিষয়সমূহ ভোগ করিতেছেন। ইহাতে মনের অত্যন্ত প্রাধান্য বিদ্যমান। দেখা যায়—গৃহস্বামীর ভোগের জন্যই গৃহাদি নির্মিত। দেহরূপ গৃহের স্বামী জীবাত্মার ভোগের উদ্দেশ্যে তাঁহারই নির্দেশে দেহেন্দ্রিয়ের সকল কর্ম পরিচালিত না হইলে উহাদের সংহতি সম্ভব হইত না এবং কার্যসমূহও নিরর্থক ও বিশৃংখল হইত। এই ভাবটি পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে কঠোপনিষৎ দেহকে রথ, জীবাত্মাকে রথী, ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্ব,

বুদ্ধিকে সারথি, মনকে লাগাম ও ভোগ্য বিষয়সমূহকে রথের গমনপথ বলিয়া মনোমুগ্ধকর কবিত্বের ভাষায় এই জটিল বিষয়টি পরিবেশন করিয়াছেন।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন যে, সর্বেন্দ্রিয়পথে যে ভোগ আহৃত হয়, মনই সেই ভোগের আয়তন বা অধিষ্ঠান। কেবল ইহজন্মে নহে, পরন্তু জন্মজন্মান্তর যাবৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে মনরূপ অপার অসীম মহাসমুদ্রে ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে অনন্ত বিষয়-ভোগের যে সংখ্যাতীত বৃত্তিতরঙ্গ উঠিতেছে, উহাদের এবং অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের পরিকল্পনারূপ অগণন বৃত্তি-তরঙ্গ ও উহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্রগুলিও মনে যে অতি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত আছে, ইহা অনুভবসিদ্ধ সত্য। ইহাদের অধিকাংশ অতীত বৃত্তিই মনের অচেতন ও অবচেতন জ্ঞানস্তরে লুক্কায়িত। এইজন্য মনের এই দুইটি স্তর সুবিশাল এবং ইহাদের শক্তি ও সম্ভাবনা অপরিমেয় এবং অসীম। এই দুই স্তরের অনেক বৃত্তি সময়ে সময়ে অবস্থাধীনে চেতনস্তরে উপস্থিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। বহুকালের বহুবিধ নিদ্রিত জ্ঞান স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত সংস্কারে পরিণত হইয়া মনের অন্তরালে অবস্থান করিতেছে।

মানসিক ও শারীরিক সর্ববিধ শক্তি মনেই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। মানব-জীবন মনের বৃত্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোটি কোটি পরস্পর-বিরোধী বৃত্তি আপন আপন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখিয়াও মন তথা সূক্ষ্মশরীররূপ অত্যাশ্চর্য দুর্ভেদ্য রাহস্যিক শক্তির প্রাসাদে সমবেত থাকিয়া সতত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিতে উন্মুখ। মন অনন্ত শক্তির আধার চেতনশক্তিসম্পন্ন অপঞ্চীকৃত অস্থূল অতিসূক্ষ্ম এক ভাবময় বাক্যমনাতীত রাহস্যিক সত্তা-বিশেষ বলিয়াই ইহাতে মহাসমুদ্রের ন্যায় সংখ্যাতীত বৃত্তি-তরঙ্গ এবং ইহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব হইতেছে। স্থূলদেহস্থ অচেতন জড় স্থূল স্নায়ুসমূহের পক্ষে মহাসমুদ্রের ন্যায় সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ মনোবৃত্তিতরঙ্গের প্রতিটির বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া উহাদিগকে একাধারে সমবেত রাখা এবং উহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ একেবারেই সম্ভব নহে।

বেদান্ত বলেন, 'কর্মানুরূপেণ গুণোদয়ো ভবেৎ, গুণানুরূপেণ মনঃপ্রবৃত্তিঃ'—বাহ্য ও আভ্যন্তর কারণজাত মনোবৃত্তি অনুসারে মনে গুণের আবির্ভাব হয় এবং ঐ মতে মনের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, দশটি ইন্দ্রিয় ও মনদ্বারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে মানুষ যাহা কিছু করে, তাহাই কর্ম। তাহার পূর্বজন্মকৃত কর্ম প্রারব্ধ, অতীত জীবনের কর্ম সঞ্চিত এবং যাহা কিছু সে করিতেছে, উহা ক্রিয়মাণ নামে অভিহিত।

হিন্দুশাস্ত্রমতে ঈশ্বরে পরমাসক্তি বা ভক্তি, নিষ্কাম নিঃস্বার্থ পরার্থ কর্ম, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ, তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান অথবা কর্মফল ভোগ-দ্বারা কর্মের নাশ হয়। যে পর্যন্ত ঐ উপায়ে কর্মফল বিনষ্ট না হইবে, সে পর্যন্ত মনঃপ্রধান সূক্ষ্মশরীর তথা মনই উহার গুণানুযায়ী 'গতাগতিঃ পুনঃ পুনঃ'—বাধ্য হইয়া বারংবার দেহ পরিগ্রহ করে। গীতা বলেন, 'বায়ু যেরূপ গন্ধ বহন করে, শরীরান্তর-গ্রহণকালে জীবও সেইরূপ পূর্বদেহ হইতে মনাদি সঙ্গে লইয়া যায়।' অর্থাৎ পূর্বদেহের মনাদি সূক্ষ্মশরীর নূতন দেহে প্রবেশ করে। সুতরাং বলা যায় যে, মনই একদেহ ত্যাগ করিয়া,

অপর দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। মনের এইরূপ অসাধারণ কারণের জন্য প্রাচীন যুগের আচার্য শংকর এবং বর্তমান যুগধর্মাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ মনকেই 'সূক্ষ্ম শরীর' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বাসনাশ্রিত মনই উহার ভোগ চরিতার্থের জন্য বারংবার দেহধারণ করে। মন তমঃ ও রজঃ গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া সত্ত্বগুণময় হইলে বাসনানাশে অমনীভাব প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে মনের নাশ হইয়া থাকে। মনরূপ উপাধিনাশে দ্বৈতজ্ঞান চিরতরে চলিয়া যায়। 'জীবন্মুক্তি-বিবেক' বলেন যে, মনোনাশ বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান—একটি অপরটির সাপেক্ষ, অথবা একটি হইলে অপর দুইটির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য মনোনাশ আর সূক্ষ্মশরীর-নাশ একই কথা। মনোনাশ হইলে সূক্ষ্মশরীরের নাশ হয় এবং জীবাত্মা সর্ববন্ধন-বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতায় বা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৎস্বরূপে অধিষ্ঠিত হন।

প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার (Ramakrishna Mission Institute of Culture) এবং ইউনেস্কো (Unesco)-র মিলিত প্রচেষ্টায় কলিকাতায় গোলপার্কে ইনস্টিট্যুট-ভবনে ১লা নভেম্বর হইতে ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত একটি প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি সম্মেলন (East-West Cultural Conference) হইয়া গেল। এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ার (Dr. C. P. Ramaswami Aiyar)। নয়টি দেশের বহু বিশেষজ্ঞ এই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (U.S.A.) মিঃ ক্যালিস ও হোয়েবল্, অস্ট্রিয়ার কাউণ্ট কৈশরলিং, কানাডার মিঃ লেড্ডি, ভারতের ডক্টর মহাদেবন, রমেশ মজুমদার ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বার্মার মং, জার্মানির মেনশিং, ইরানের মঃ সাফা, জাপানের টনাকা, যুক্তরাজ্যের (U.K.) মিঃ টমলিন।*

*1. Helmut G. Callis, Professor of Oriental History, University of Utah.
2. E. Adamsom Hoebel, Professor of Anthropology, University of Minnesota.
3. Count Arnold Keyserling, Formerly Director of the Kriterian, the Philosophical Institute in Vienna.
4. John F. Leddy, Professor of Classics, Saskatchewan University.
5. T. M. P. Mahadevan, Professor of Philosophy, Madras University.
6. R. C. Majumder, Formerly Vice-Chancellor of Dacca University.
7. E. Maung Minister of Education, Burma.
8. Gustav Mensching, Professor of Comparative Religion, University of Bonn.
9. Radhakamal Mukherjee, Director, J. K. Institute of Sociology, Lucknow. Formerly Vice-Chancellor of Lucknow University.
10. Z. Safa, Professor of History of Persian Literature, Teheran University.
11. Otoya Tanaka, Professor of Indian Philosophy, Chuo University, Tokyo.
12. E. W. F. Tomlin. British Council.

শেষ পর্যন্ত দুইজন প্রতিনিধির পক্ষে এই অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভবপর হয় নাই—মং (Maung) ও টমলিন (Tomlin)। টমলিন অবশ্য তাঁহার লিখিত ভাষণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, মং কোন ভাষণ পাঠাইতে পারেন নাই।

সমগ্র অধিবেশনটি ইউনেস্কো প্রাচ্য-প্রতীচ্য প্রধান পরিকল্পনার (Unesco East-West Major Project) সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সেই পরিকল্পনার একটি রূপায়ণ। অধিবেশনের মূল আলোচনার বিষয় ছিল :

Reactions of the peoples of East-West to the basic problems of modern life—আধুনিক জীবনের মৌলিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মানুষের প্রতিক্রিয়া। অধিবেশনের বহু পূর্বেই বিভিন্ন প্রতিনিধিদের নিকট উদ্যোক্তাদের কর্তৃপক্ষ আলোচনার বিষয়গুলি প্রশ্নাকারে (Questionnaire) পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রতিনিধি নিজ নিজ উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়া দেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের উত্তরগুলি দেখিবার সুযোগ পান। এই প্রশ্নোত্তরগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। অধিবেশনে আলোচনার সময় এই পুস্তকখানি প্রত্যেক প্রতিনিধি সমগ্র আলোচনার মূল দলিল হিসাবে ব্যবহার করেন। আলোচনা ও বিতর্ক ঐ প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে।

আলোচনার (Symposium) বিষয়কে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল : (1) Religious thought as a component of cultural values. (2) Modern Socio-Economic patterns as affecting Cultural values. (3) Cultural values as affecting the evolution and inter-relations of cultures.—(১. সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের উপাদানরূপে ধর্মীয় চিন্তা। ২. সংস্কৃতির উপর আধুনিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ধরনের ব্যবস্থার প্রভাব। ৩. বিভিন্ন কৃষ্টির ক্রমবিকাশ ও পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর সংস্কৃতির প্রভাব)।

প্রতিদিন সকালে প্রতিনিধিরা ৯টা হইতে ১২টা পর্যন্ত এই আলোচনায় যোগদান করেন। সভাপতি প্রত্যেক অধিবেশনের শেষে আলোচনার মূল সিদ্ধান্তগুলি শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পরিবেশন করেন। সমগ্র আলোচনার সার সংকলন করিয়া শেষ দিন ৯ই নভেম্বর তারিখে অপরাহ্ণে এক সাধারণ সভায় সভাপতি তাঁহার ভাষণ দেন।

প্রথমদিনের আলোচনা

সমগ্র আলোচনা প্রীতি- শান্তি- ও সহানুভূতিপূর্ণ পরিমণ্ডলে হইয়াছিল। ঐতিহাসিক দিক হইতে ডক্টর মজুমদার সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ করেন, হোয়েবল্ দেখেন নৃতত্ত্বের (anthropology) দিক হইতে, এবং ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এক অখণ্ড বিশ্বদৃষ্টিতে (cosmic view-point) সমস্যাগুলি আলোচনা করিবার জন্য আবেদন জানান।

তুলনামূলক ধর্মের (comparative religion) দিক হইতে দেখিয়া অধ্যাপক মেনশিং বলেন : বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ধর্মের বিচার করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেরই লক্ষ্য এক। অনুভূতিমূলক ও বিশ্বাসমূলক ধর্মের (mystical religion and prophetic religion) মধ্যে পার্থক্যটি তিনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি সকল দেশের চিন্তাশীল লোকের প্রতি আবেদন জানান—সাম্প্রদায়িক অহমিকা (group-egoism of the members of a religious organisation) পরিহার

করিবার জন্য। মেনশিং-এর মতে ধর্মের সংজ্ঞা হইল: Emotional encounter of man with holy reality and an answering action of certain people which is somehow under the impact of this holy reality. (পবিত্র সত্তার সহিত মানুষের ভাব-সংঘর্ষ এবং পবিত্র সত্তার সংঘাতে প্রভাবান্বিত কতকগুলি ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া)।

ডক্টর মহাদেবন অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির উপর বিশেষ জোর দেন এবং 'যত মত তত পথের' সূত্রটিকে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের বাহিরের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তর্নিহিত সার সত্য এক অদ্বয় অনুভূতি।

কৈশরলিং বলেন যে, বিজ্ঞান ধর্মানুভূতির উপর একটা সংঘাত (impact) আনিয়াছে। বর্তমান যুবসম্প্রদায় (বিশেষতঃ অস্ট্রিয়াতে) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী (scientific point of view) হইতে ধর্মকে দেখিতে চায় এবং মনে করে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা কেবল আন্দাজ (guess-work) করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য যুবসম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে ধর্মের মধ্যে নির্ভুল যথাযথ ভাব (exactitude, precision) আনিতে হইবে—বৈজ্ঞানিক পরিভাষার (scientific terminology) সর্বজনগ্রাহ্য লক্ষণ আনিতে হইবে। তিনি ধর্মের গোঁড়ামি (orthodox religious thought) এবং ব্যক্তিগত ধর্মীয় চিন্তার (private religious thought) পার্থক্য দেখান।

হোয়েবুল্ বলেন: Mankind is one, civilizations are many. Man is exceedingly plastic in nature.—(মানবজাতি এক, সভ্যতা অনেক, মানুষ নমনীয় স্বভাবের)। সেইজন্য সে অন্য সমাজগোষ্ঠীর আচরণ নিজস্ব করিয়া লইতে পারে। হোয়েবুল্ প্রকৃত ও আদর্শ সংস্কৃতির (real culture and ideal culture) মধ্যে পার্থক্য দেখান। প্রত্যেক মানুষ একটি আদর্শ সংস্কৃতি লইয়া থাকে। এই আদর্শ সংস্কৃতি হইল এক-মনুষ্যসমাজ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তাহার দৈনন্দিন ব্যবহারে সে এই এক-মনুষ্যসমাজের প্রতিনিধিরূপে প্রতিভাত হয় না। তাহার কারণ দুই জাতির মধ্যে ভৌগোলিক বাধা (geographical barrier between one nation and another) দূরীভূত হইলেও সামাজিক প্রাচীর (social barriers) এখনও আছে। ইহা দূর করিতে হইলে মূল্যায়নের সাধারণ মান (common standard of value-judgments) খুঁজিতে হইবে। মানুষে মানুষে সংযোগ আজ সহজ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের ধ্বংসের পথও প্রশস্ত করিতেছে। যে উড়ো জাহাজে চাপিয়া আমরা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এখানে আসিলাম, সেই উড়ো জাহাজ হইতেই বোমা ফেলিয়া আমাদের সকলকে ধ্বংস করা যাইতে পারে।

ডক্টর মজুমদার উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি দেখান যে, চিন্তার স্বাধীনতা ও যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী (freedom of thought and rational outlook) আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী কুসংস্কার ও ধর্মের প্রতি অন্ধমোহ ত্যাগ করে। আজ আর পূর্ব-পশ্চিমের সংস্কৃতি বলিতে কোন ধরাবাঁধা (rigid and absolute) পার্থক্য বোঝায় না। তাহার মতে বর্তমানে ভারতবাসী ধর্মের প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়,

যেমন অনুরক্ত সে ছিল এক শতাব্দী আগে। ইহার পিছনে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলি ডক্টর মজুমদার বিশ্লেষণ করেন। তথাপি নৈতিক আদর্শের মধ্যে ভারতবাসী বরাবর বিশ্বজনীনতাকে খুঁজিতেছে। বর্তমান ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের সমস্যাক্লিষ্ট জীবনে অবশ্য ধর্ম আর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না।

ডক্টর সাফা ফরাসী ভাষায় যাহা বলেন, তাহার ইংরেজী অনুবাদ :

Every prophet and saint has a path of his own, but in taking to God, all are one. According to one Iranian thinker, all those who have firm faith in their own convictions are worthy of respect, whether they be idol-worshippers or monists[১]. Who gave beauty to the idol ? If God willed it not, who would have become an idol-worshipper !

—প্রত্যেক ধর্মপ্রবর্তক ও মহাপুরুষেরই নিজস্ব একটি পথ থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার জন্য সব পথই সমান। একজন ইরানী চিন্তানায়কের মতে : যাঁহাদের নিজেদের রীতি-নীতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস বর্তমান, তাঁহারা পৌত্তলিক বা একেশ্বরবাদী যাহাই হউন না কেন, শ্রদ্ধার পাত্র। মূর্তিকে কে সৌন্দর্য দিয়াছেন ? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইত, তবে কেই বা মূর্তিপূজক হইতে পারিত ?

মিঃ লেভিড বলেন : আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাতত্ত্বে একরূপতা (uniformity) নাই। আমরা যে আদর্শ (—মানবজাতির ঐক্য) লইয়া এখানে আসিয়াছি, তাহা হয়তো একদিন উত্তর আমেরিকার জীবনে রূপায়িত হইবে, কিন্তু এখনও দেখি যে, যুবসম্প্রদায় ধর্মের সমস্যায় বিব্রত নহে। তাহারা ঐহিক উন্নতি লইয়া বিশেষ ব্যগ্র। কিন্তু তাহাদের মনে একটা শূন্যতা (vacuum) আসিতেছে, ইহা শীঘ্রই নাস্তিকতাবাদের (nihilistic trend) দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে, যদি না আমরা একটা সাধারণ আদর্শ (common ideal) খুঁজিয়া পাই। [ক্রমশঃ]

১ Monotheists ?—উঃ সঃ

East and West

Each of these types has its grandeur, each has its glory. The present adjustment will be harmonising, the blending, of these two ideals. To the oriental the world of spirit is as real as to the occidental is the world of senses....To the occidental the oriental is a dreamer. To the oriental the occidental is a dreamer. Each calls the other a dreamer. But the oriental ideal is as necessary for the progress of human race as the occidental, and I think it is more necessary.

—*Swami Vivekananda*

প্রার্থনা

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

সৃষ্টির গহনলোকে
কালের গঙ্গোত্রীপারে,
বাক্যের অতীত লক্ষণা
যেথায় ধূসর হয়ে আসে—
সেই অদ্বৈত সত্তার সমুচ্চ কোটিতে
অকম্পিত স্তব্ধতাকে তরঙ্গিত ক'রে
যে এষণা অভীপ্সিত হয়ে উঠেছিল—
বিশ্বে বিশ্বে ফেনে ফেনে
সেই কি বিবর্ত-তরঙ্গে—
মহাকালে বিসর্পিত হয়ে ফুটে ওঠেনি
সৃষ্টির ফুলে ও ফলে—
বীজে অঙ্কুরে শ্যামল স্বপনে ?

হে অরূপ, তুমি কি অপরূপ আলোকে
উদ্ভাসিত করনি ঋষির ধেয়ানকে ?
দেবের মূঢ়তাকে দীর্ণ ক'রে
হৈমদ্যুতিতে—
কনকোজ্জ্বল রূপ আর রেখায়
হে অম্বিকে,
বিভাসিত করনি কি মেধের স্বপ্নপুরীকে ?

মুনির মনন-ভূমি
সন্তের মানস-পট
ভক্ত-বিদগ্ধের সাধনতীর্থ
রোমাঞ্চিত—অভিষিঞ্চিত হয়েছে
তোমার বাৎসল্যের প্লাবনে।

কিন্তু জননি,
বিবর্তের রূপবাহ কি নিঃশেষিত হবে
শুধু মনেরই শিল্পপটে !
তুমি কী কেবল জ্ঞানী গুণী ধ্যানীরই জননী ?
বিমূর্ত তুমি—বিমুক্ত হও
স্থূলে—আরো স্থূলে—আরো স্থূলে-
নভোবাহী বিবস্বান্ রূপ
বিম্বিত হোক ঘটে ঘটে জড়ে জড়ে।

বরেণ্যের কল্পপুরী হ'তে
হে অম্বিকে, আবির্ভূত হও
নগণ্যের স্নায়ুঘেরা আঁখির সম্মুখে !
চিন্ময়ী তুমি—মৃন্ময়ী হও—মৃন্ময়ী হও !
মানব-জীবনের নগ্নতা খিন্নতা অসম্পন্নতার মাঝে
উদিত হও পরমার্থিকে !
হে তুরীয়ানন্দ-বিহারিণী, মহাকাল-কল্লোলিনী,
উদ্বর্তিত হও—লীলায়িত হও—বিলসিত হও
পৃথিবীর পঙ্কজের দলে দলে
সৌরভে ও অশ্রুর শিশিরে
সার্থক হোক অসার্থক মানুষ।

চল্লিশ বছর পরে

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

শোকসন্তপ্ত ও জীবন-সংগ্রামে সম্পূর্ণ পরাজিত মানব যখন জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হয়, ভবিষ্যৎ যখন ঘনতমসাচ্ছন্ন এবং বর্তমান যখন তাহার নিকট নিতান্ত বিষময় ও দুর্বিষহ বলিয়া মনে হয়, তখন একমাত্র সুদূর অতীতের সুমধুর স্মৃতিগুলিই তাহার ভগ্নহৃদয়ে ও ব্যথিত-চিত্তে যৎকিঞ্চিৎ আনন্দ ও শান্তি-বারি সিঞ্চন করে। তাহারই কিয়দংশ, আজ সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার সমীপে উপস্থিত করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

আজ ঠিক স্মরণ নেই, বোধ হয় জীবনে সর্বপ্রথম সেই আমার মায়ের সঙ্গে ১৯১০।১১ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারে উদ্বোধন অফিসে দোতলার ঘরে জগদারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণ-কমল স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। যাইবার পূর্বে আমার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'মা, তুমি আজ কোথায় যাবে?' মা বলিলেন, 'চল্, আমার সঙ্গে, মা-ঠাকরুনকে দর্শন ক'রে আসবি।' আমার তখন ১০।১১ বছর বয়স এবং আমার জননীর মুখে 'মা-ঠাকুরানী' শব্দটি শ্রবণমাত্র আমার মানস-পটে এক ত্রিশূলধারিণী রুদ্রাক্ষ-বিলম্বিতা ভৈরবীমূর্তির চিত্র প্রতিফলিত হইল এবং ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কম্পিত হইয়া উঠিল। সভয়ে আমি মাকে বলিলাম, 'না, আমি যাব না।' আমার মাতৃদেবী সন্তানের ভীতিবিহ্বল মুখ দর্শনে মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'চল্, তোর কিছু ভয় নেই, তাঁকে দেখলে তোর খুব আনন্দ হবে।' তখন অগত্যা আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর সহিত আমরা তখনকার সেই খর্বকায় 'অশ্বিনীকুমার-দ্বয়'-বাহিত, আমার অত্যন্তপ্রিয় থার্ডক্লাস অশ্বযানে বৈকালে বাগবাজার উদ্বোধন অফিসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। আমার এই হতভাগ্য জীবনের সেই একমাত্র মধুর ও চিরস্মরণীয় দিবস।

সদরে প্রবেশ করিয়া বামদিকের যে ঘরখানি দেখা যায় তাহাতে বসিয়া, ছোট একটি হাত-ডেস্কে লিখিতেন এবং তাম্রকূট সেবন করিতেন আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সহপাঠী মহাপুরুষ স্বামী সারদানন্দ। তিনি আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া, মাকে ও আমাকে উপরে পাঠাইয়া দিয়া আমার পিতৃদেবের সহিত কথোপকথনে রত হইলেন। আমি শঙ্কিত-চিত্তে ও স্পন্দিত-হৃদয়ে আমার জননীর পিছু পিছু দোতলায় রাস্তার দিকের ঘরখানিতে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু আমার বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পূর্বে আমার মানস-পটে মা-ঠাকুরানীর যে জটাজুটধারিণী গৈরিকবসনা রুদ্রাক্ষহারশোভিতা ত্রিশূল-ধারিণী ভৈরবীমূর্তি চিত্রিত হইয়াছিল, তাহা যে আমার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত-ধারণা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে লজ্জিত হইলাম। শুধু দেখিতে পাইলাম, একজন সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর সাধারণ গৃহস্থ-বেশ-ধারিণী সুহাসিনী সরলা প্রশান্তবদনা নারীকে পরিবেষ্টিত করিয়া অন্যান্য পাঁচ-ছয়টি স্ত্রীলোক কথোপকথন করিতেছেন। তিনি আমার মাকে দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'এই যে, আসুন, অনেক দিন আপনি আসেননি। এটি কি আপনার ছেলে?' মা আমাকে ঈষৎ

ধাক্কা দিয়া ইসারা করিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিতে। আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অবনতমস্তকে সেই জীবন্ত জগদ্ধাত্রী-রূপিণী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরানীর পদরজঃ লইয়া স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলাম। সে যে কী এক অপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহা আজও স্মরণ করিলে সাংসারিক দুঃখ ও অশান্তি সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হইয়া যাই। প্রণাম করিবামাত্র তিনি স্বর্গীয় সুষমা-মণ্ডিত মৃদুহাস্যে আমার মস্তকে হাত বুলাইয়া আশীর্বাণী উচ্চারণ করিলেন, 'দীর্ঘজীবী হও, সুখে থাকো, বাবা।' শ্রীশ্রীমায়ের সেই সুধামাখা কোমল করস্পর্শ আজ ষাটবছর বয়সেও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন্ত প্রতিমা স্বচক্ষে যিনি দর্শন করিবার ও তাঁহার পদরজঃ লইবার এবং তাঁহার অমিয়-বাণী স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ কল্পনাও করিতে পারিবেন না, শ্রীশ্রীমায়ের সেই বালিকা-সুলভ সরলতা ও স্বর্গীয়-জ্যোতি-উদ্ভাসিত করুণাময়ী মূর্তি কি! কী মধুর কল্যাণময়ী ছিল তাঁহার সুকোমল করস্পর্শ ও আশীর্বাণী!

আমার মায়ের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল আলাপ করিলেন। আমি সেখানে উপবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ-নেত্রে দেখিতেছি, শ্রীশ্রীমা ও মদীয় জননী উভয়ে কত সুখ-দুঃখের কথোপকথন করিতেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের হাতে একগাছা করিয়া স্বর্ণালঙ্কার ও পরিধানে দেখিলাম সরুপাড় ধুতি। এইভাবে প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক ধরিয়া শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আমার জননীর কত গল্প ও হাসি হইল, কিন্তু সেদিনকার সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই, সেদিন আমার মা ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের আলোচ্য বিষয় ছিল—সাধারণ গার্হস্থ্য-জীবনের সুখ-দুঃখ, আপদ্-বিপদ্; কোন প্রকার গুরু-গম্ভীর ধর্মালোচনা শুনিলাম না। বাহির হইতে কাহার সাধ্য, বুঝিতে পারে যে, ইনি মৈত্রেয়ী-সদৃশা ব্রহ্মবিদুষী!

আমার জননী সুনিপুণভাবে কার্পেটের উপর সূচিশিল্পে নানাবিধ দেব-দেবীর মূর্তি আঁকিতে পারিতেন। মা স্বহস্তে ঐরূপ এক-খানি 'নাড়ুগোপাল' করিয়া, ফ্রেমে বাঁধাইয়া শ্রীশ্রীমাকে ভক্তি-উপহার দিয়াছিলেন। নাড়ু-গোপালের ঐ ছবিখানি ঐ ঘরেই দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখা ছিল। যখন কোন ভক্ত আমার মাকে দেখিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করিতেন, 'ইনি কে?' শ্রীশ্রীমা তৎক্ষণাৎ দেওয়ালে নাড়ুগোপালের পশমের চিত্রখানির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, হাসিয়া পরিচয় দিতেন, 'ইনি গোপালের মা।'

শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আমার জননীর কথা-বার্তায় প্রায় ঘণ্টাদেড়েক অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এমন সময় একজন সাধু আসিয়া দ্বারদেশ হইতে শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, 'শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর যে বন্ধুর স্ত্রী উপরে এসেছেন, তিনি কি আপনার দর্শন পেয়েছেন?' শ্রীশ্রীমা আমার মায়ের দিকে চাহিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'বলো যে, তিনি খুব ভালভাবেই দর্শন পেয়েছেন।' এইবার আমরা শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে প্রণামান্তে আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় তিনি মাকে বলিলেন, 'আবার আসবেন। আর একটু চেষ্টা ক'রে দেখবেন, যদি আমার আইবুড়ো ভাইঝি রাধুর জন্য একটি সৎপাত্র পান।'

শ্রীশ্রীমাকে দর্শন আমার জীবনে বোধ হয়, এই প্রথম ও এই শেষ। আমার জননী মাঝে মাঝে বাগবাজারে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে

দেখিতে আসিতেন। আমার পিতৃদেব আমাকে সঙ্গে লইয়া মাঝে মাঝে তাঁহার সোদর-প্রতিম বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী শরৎ মহারাজকে দেখিতে এই উদ্বোধন অফিসে আসিতেন। বাবাকে দেখিয়াই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিতেন, 'এস জ্ঞান, এস; এবারে অনেকদিন পরে এসেছ। এস, তামাক খাও।' জানি না, পাঠক-পাঠিকাগণ আমার কথা হয়তো হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। সমগ্র রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান সেক্রেটারি ও পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য বিরাট পুরুষ স্বামী সারদানন্দ এবং তাঁহার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ঘোরসংসারী আমার পিতৃদেবের মধ্যে কী সরল, প্রাণখোলা, কতই না সুখ-দুঃখের আলোচনা হইত, আর তামাক পুড়িত! আমি বাবার কাছে বসিয়া এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও এক ঘোরসংসারী—দুই বাল্যবন্ধুর এই অপূর্ব মিলন ও পরমানন্দে তাম্রকূট-সেবন নিরীক্ষণ করিতাম।

ফিরিয়া আসিবার সময় শরৎ মহারাজের কথায় তাঁহার লিখিত কোন না কোন পুস্তক আমার পিতা প্রায়ই ক্রয় করিয়া আনিতেন। আমার বেশ স্মরণ আছে, তখন সবেমাত্র স্বামী সারদানন্দ-লিখিত সর্বজনপ্রিয় 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' মুদ্রিত হইয়া বাহির হইয়াছে। শরৎ মহারাজের অনুরোধে একদিন আসিবার সময় বাবা ঐ পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিলেন। আর একবার কিনিয়া আনিয়াছিলেন 'ভারতে শক্তিপূজা', 'সাধু নাগ মহাশয়' ইত্যাদি। বাবা উঠিবার উপক্রম করিলে শরৎ মহারাজ সস্নেহে আমার বাবাকে বলিতেন, 'জ্ঞান ভাই, আমাকে ভুলে থেকো না। আবার এস, দেরি ক'রো না।'

আমি শৈশবাবধি বাপ-মায়ের একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলাম বলিয়া, বাবা আমাকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন এবং তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য অনেক ঘটনা আমাকে বলিতেন: 'হেয়ার স্কুলে ও পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) আমার সঙ্গে প'ড়ত। স্কুল-কলেজের ছুটির পরে মাঝে মাঝে একত্রে শরৎ ও আমি শরতের বাড়ীতে বেড়াতে যেতুম। শরতের মা আমাকে বড় ভালবাসতেন ও যত্ন ক'রে খাওয়াতেন। শরতের বাবা খুব সজ্জন ছিলেন এবং তিনিও আমাকে বড় স্নেহ করতেন।' আমার পিতৃদেব গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবেশ করিলেও একদিনের জন্য কদাচ তাঁহার বাল্যবন্ধু শরৎ মহারাজের প্রীতি ও স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন নাই।

১৯১৭ খৃঃ—প্রথম মহাসমর চলিতেছে। এই সময়ে আমাদের এই ক্ষুদ্র শান্তিময় সংসারে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইয়া অকস্মাৎ আমার পিতৃদেব পরলোক গমন করিলেন। সংসারে কেবল মা আর আমি। আমি স্কুলে পড়িতেছি। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে পড়িব অথবা চাকরি করিব, এই সমস্যায় পড়িলাম। আমার মাতৃদেবী শোকে কাতর হইয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন।

মা একদিন আমাকে বলিলেন, 'তুই একদিন তাঁর বাল্যবন্ধু শরৎ মহারাজের কাছে যা, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কী উপদেশ দেন, শুনে আয়, আর তাঁকে জিজ্ঞসা করিস্, মা বলেছেন, আমার বিয়ের জন্য কী ক'রব দয়া ক'রে পরামর্শ দিন।' একদিন সকালে ৮৷৯টার সময় বাগবাজার উদ্বোধন অফিসে সদর দরজায় প্রবেশ করিয়া সেই বামদিকের ঘর-খানিতে প্রবেশ করিলাম। সামনে সেই ছোট

হাত-ডেস্কখানি; শরৎ মহারাজ তাম্রকূট সেবন করিতেছেন। আমি তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, 'দাঁড়াও বাবা, হুঁকোটা আগে রাখি।' হুঁকোটি রাখিয়া তিনি করজোড়ে 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলিতে লাগিলেন, আর আমি তাঁহার পদধূলি লইতে লাগিলাম। সস্নেহে তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন এবং আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা শুনিয়া তিনি বাবার মৃত্যুসংবাদে, ব্যথিত অন্তরে দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'তোমাদের সংসারে এখন কে আছে? তুমি কী ক'রছ?' আমি বলিলাম, 'সংসারে শয্যাশায়িনী আমার মা ও আমি। এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। মা আমাকে আপনার নিকটে পাঠালেন, এখন কী ক'রব, আপনার উপদেশ গ্রহণ করতে এবং মায়ের ইচ্ছা, তিনি আমায় সংসারী করবেন। দয়া ক'রে বলুন, এখন কী করা কর্তব্য?' মহাপুরুষ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন, 'আমার মনে হয়, কলেজে পড়ার চেয়ে কোন কিছু শিখিয়া কিছু উপার্জন করাই তোমার পক্ষে ভাল। তোমার কিছু শিখতে ইচ্ছা আছে?' তদুত্তরে আমি বলিলাম, 'মায়ের ও আমার উভয়ের ইচ্ছা, আমি Shorthand-Typewriting শিখি, আপনার কী ইচ্ছা দয়া ক'রে বলুন।' তিনি সানন্দে বলিলেন, 'Shorthand খুব ভাল, তাই মনোযোগ দিয়ে শেখো, ভাল হবে। বিবাহ ক'রো না। মাঝে মাঝে এখানে এসো।' স্বামী সারদানন্দের পদধূলি ও আশীর্বাদ গ্রহণান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জননীকে মহাপুরুষের মতামত আদ্যোপান্ত বলিলাম।

ষড়্‌রিপুর বশে আমরা নিজেরা জীবনে ভুল-ভ্রান্তি করিয়া দুঃখকষ্ট পাই; অবশেষে জগজ্জননী মহামায়ার উপরে দোষারোপ করিয়া বলি, 'যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।'

Shorthand শিখিয়া আমি চাকরিতে প্রবেশ করিলাম। এদিকে মৃত্যু আসন্ন জানিয়া, মা অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমার বিবাহ দিলেন। প্রায় বছর-দেড়েক অতিবাহিত হইলে মাতৃদেবী সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন। মহাপুরুষের নিষেধ-বাণী লঙ্ঘন করিয়া ঘোর সংসারী হইলাম।

ইতিপূর্বে হাতীবাগানে অবস্থিত বিবেকানন্দ সোসাইটিতে শ্রদ্ধেয় স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ কিছুকাল আমাকে সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র' সযত্নে পড়াইয়াছিলেন।

অনতিকাল পরে একদিন সংবাদপত্রে পড়িলাম, রামকৃষ্ণ মিশন বন্যার্তদের জন্য জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আমার আত্মীয় ও প্রতিবেশী-দিগের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ও পুরাতন বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া, একদিন প্রাতে বাগবাজার উদ্বোধন অফিসে প্রবেশ করিয়া, ঐ পুরাতন বস্ত্রগুলি ও অর্থ বন্যার্তের সাহায্য-কল্পে জমা দিয়া পার্শ্ববর্তী ঘরে স্বামী সারদানন্দের পদধূলি গ্রহণার্থে প্রবেশ করিলাম।

স্বামী সারদানন্দ বসিয়া তাঁহার সেই ছোট ডেস্কটিতে লিখিতেছেন। আমি তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম, তিনিও কলমটি রাখিয়া করযোড়ে 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলিতে লাগিলেন। পিতৃদেবের নাম করিয়া পরিচয় দিবামাত্রই তিনি আমাকে সস্নেহে আমার বাড়ীর কুশল প্রশ্ন করিলেন। আমার জননী পরলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন তোমার সংসারে আর কে আছেন?' অপরাধীর ন্যায় আমি

ধীরে ধীরে অবনতমস্তকে বলিলাম, 'আমি বিবাহ করেছি।' আমি বিবাহিত শ্রবণ করিয়া, অন্তর্যামী মহাপুরুষ বিমর্ষভাবে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি বিবাহ করেছ?' কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, 'আজ আমি ব্যস্ত আছি। আচ্ছা এস।' আমি পুনর্বার তাঁহার শ্রীচরণে জন্মের মতন প্রণাম করিয়া, নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় বিবেক-দংশনে অস্থির হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি অন্তর্যামী আত্মদর্শী মহাপুরুষ; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি তাঁহার বাল্যবন্ধুর পুত্রের ভবিষ্যতের মঙ্গলার্থেই তাহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সংসারের জ্বালায় ও শোকতাপে দগ্ধ হইয়া আজ আমি আমার জীবনের সায়াহ্নে অনুতাপ করিতেছি, কেন সেই আমার অশেষকল্যাণকামী মহাপুরুষ স্বামী সারদানন্দের নিষেধ-বাণী লঙ্ঘন করিলাম?

সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন:

'আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা···'

বিবাহ না করিলে স্ত্রী-বিয়োগের শোক পাইতে হইত না, কন্যাদায়ে জ্বলিয়া পুড়িয়া রাস্তায় রাস্তায় ছুটাছুটি করিতে হইত না। তিল তিল করিয়া তুষানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইত না!

বাট বছর অতিক্রম করিয়াছি। জীবনে ভালমন্দ উভয় প্রকারের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। বাল্যাবধি ভূরি ভূরি বক্তৃতা ও ধর্মালোচনা শুনিয়াছি। বাল্যকালে স্বদেশী যুগে বহু তেজস্বী বক্তার অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা এবং পরে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর ধর্মবক্তৃতাও শুনিয়াছি। তারপর এখন শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-অনুযায়ী 'মনে, বনে, কোণে' সেই 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'কে স্মরণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়: বিবেচনা করি। নির্জন স্থানে, ভাগীরথী-তীরে, অথবা পার্কের বেঞ্চে বসিয়া ঈশ্বর-চিন্তাই আমার এখন ভালো লাগে।

* * *

আজ শনিবার, ২২শে জুলাই ১৯৬১; প্রায় চল্লিশ বছর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বাগবাজার উদ্বোধন অফিসের ঐ বাড়ীতে এই সুদীর্ঘ কাল আর আমার যাতায়াত নাই। সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর প্রায়ই বৈকালে একটু বেড়াইতে যাই, গন্তব্য স্থানের কোনই স্থিরতা নাই। কোন দিন বাগানে, কোন দিন গঙ্গার ধারে, কোন দিন আত্মীয়-বন্ধুর গৃহে যাইয়া আমার মানসিক অবসাদ দূর করিতে চেষ্টা করি। সত্য কথা বলিতে কি, যে কারণেই হোক আর কীর্তন-কোলাহল বা ধর্মালোচনা, বক্তৃতা—এ-সব কিছুই ভাল লাগে না। যথারীতি বৈকালে ভাবিতেছি, আজ কোথায় যাওয়া যায়? শ্রাবণ মাস, বর্ষাকাল; ছাতাটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে আসিয়া উত্তর দিকে অর্থাৎ বাগ-বাজারের দিকে চলিলাম। বলরামবাবুর বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখি, দুইজন সন্ন্যাসী প্রবেশ করিলেন। বোধ হইল, আজ শনিবার কিছু ধর্মালোচনা বা কীর্তন—কিছু একটা হইবে। এখানেও প্রবেশ করিলাম না। মনে হইল, কী যেন আনন্দময়, একটা অদৃশ্য শক্তি আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে, আমাকে কোথায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। বাগবাজার স্ট্রীটে পড়িয়া, বামদিকে ভাঙিয়া রামকৃষ্ণ লেনে প্রবেশ করিলাম। উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া, কেমন দিশাহারা হইয়া গিয়াছি; উদ্বোধন অফিস কোন্ দিকে—বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। স্মৃতি-শক্তির অপরাধ কী? প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ওখানে আমার যাতায়াত নাই।

অবশেষে একব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই আমার পুণ্য-স্মৃতিবিজড়িত চিরপরিচিত শ্রীশ্রীসারদা মা-ঠাকুরানী ও মহাপুরুষ স্বামী সারদানন্দের অমরস্মৃতিময় উদ্বোধন অফিসের সদরে প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে সভয়ে স্পন্দিতবক্ষে অপরাধীর ন্যায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলাম। নীচেকার বামদিকে যে-ঘরে মহাপুরুষের পদধূলি-গ্রহণান্তে বসিয়া কথোপকথন করিতাম, সেদিকে চাহিয়া দেখি, সে মহাপুরুষ নাই, তাঁহার সেই লিখিবার আসবাব-সহ হাত-ডেস্কটিও নাই। পার্শ্বের অফিস ঘরের সম্মুখে একজন দৃঢ়কায় গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান ছিলেন, আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণান্তে কিছুক্ষণ প্রাণখোলা আলাপ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। তাঁহার নির্দেশে উপরে উঠিলাম, দক্ষিণ দিকের কক্ষের দিকে চাহিয়া দেখি, খাটের উপরে একজন অধিকবয়স্ক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট হইয়া একজন ভক্তের সহিত কথোপকথনে রত। ভক্তটি বিদায় লইলে আমি সেই সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি আমাকে পরিচয়-প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি?' আমি কেমন ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিয়া ফেলিলাম, 'চল্লিশ বছর পরে, এখানে এলুম।' তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 'চল্লিশ বছর পরে এলেন কেন?' প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-বিহীন নির্বোধের ন্যায় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া জবাব দিলাম, 'এই, এই, আসিনি।' বরাবরই দেখি, একটু বিলম্বে আমার বুদ্ধির বিকাশ হয়। পরে আমার মনে হইল, বলিলেই হইত—'চল্লিশ বছর পরে শ্রীশ্রীমা নিজেই আমায় এখানে টেনে আনলেন।' আমার বোধ হয়, তাহা হইলে বেশ ভাল শ্রুতিমধুর জবাব হইত।

এইবার উত্তর দিকে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। সুদূর অতীতের কত মধুর-স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র সেই ঘরখানি! কিন্তু হায়! সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-স্বরূপিণী করুণাময়ী আমার সেই জীবন্ত শ্রীশ্রীমা আজ কোথায়? যে মহাদেবীর শ্রীচরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া একদিন আমরা মাতাপুত্রে একাধিক ঘণ্টা পরমানন্দে অতি-বাহিত করিয়াছিলাম, আমার পূজনীয়া গর্ভ-ধারিণীর সহিত যিনি পরমাত্মীয়ার মতো অবাধে কত আলাপ করিতেন, আজ সেই সদানন্দময়ী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মা কোথায়? সশরীরী জীবন্ত সদাহাস্যময়ী শ্রীশ্রীমায়ের পরিবর্তে, আজ তাঁহার ছবি রহিয়াছে। সেই গানটি মনে পড়িল, 'তুমি কী কেবলি ছবি, শুধু পটে লেখা?' আরও মনে পড়িল, কবি Cowper-এর 'My mother's picture' কবিতার সেই পঙ্‌ক্তিটি Ah, those lips had language!

অশ্রুপূর্ণলোচনে মাকে প্রণাম করিলাম। মায়া-মমতা-বিহীন দুরন্ত এ মহাকালের বিশ্ব-গ্রাসী ক্ষুধা কবে মিটিবে? অতঃপর ধীরে ধীরে পূর্বদিকের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, শ্রীশ্রীসারদানন্দের বিরাট আলোকচিত্র। নিষ্পলক নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম, আর ক্ষোভে দুঃখে ও বিবেকের তীব্র দংশনে, আমার জ্বালাময় অনুতপ্ত হৃদয় আরও লক্ষ গুণ জ্বলিতে লাগিল। 'হে প্রভো! আপনার কথা অবহেলা করিয়া যে ভুল করিয়াছি, তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আজ শোকতাপ ও অমানুষিক পীড়নে ভগ্নস্বাস্থ্য ও বিকলচিত্ত হইয়া অশান্তির তুষানলে পুড়িয়া মরিতেছি। আপনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমারই মঙ্গলের জন্য।' তারপর অনুতপ্ত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঐ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পুনর্বার শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে সাশ্রুনয়নে প্রণাম করিয়া

সোপান বাহিয়া অবতরণ করিয়া দেখিলাম, সম্মুখে দণ্ডায়মান আমার আত্মীয় ও বাল্যবন্ধু। আমাকে হঠাৎ এই মন্দিরে দেখিতে পাইয়া তিনি বোধ হয় খুবই আশ্চর্য হইয়াছিলেন। এখন নামিয়া আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এ কী, নেমে এলে যে? আবার ওপরে চল, আরতি দেখে বাড়ী যেও।' তথাস্তু, আবার উপরে উঠিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের সম্মুখে দালানে সকলে একত্র উপবেশন করিয়া ও সুমধুর ভজন শ্রবণ করিয়া, নীচে অবতরণ করিলাম। সদানন্দময় সাধুটি—যিনি আমায় উপরে যাইতে বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। মৃদুহাস্যে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, 'আবার কবে আসছেন?' আমি হাসিয়া বলিলাম, 'মা আনলেই আবার আসবো।' শরৎ মহারাজের বসিবার সেই ঘরখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথ চলিতে চলিতে স্বামীজীর সেই প্রিয় সঙ্গীতটি আমার মনে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল: 'মন চল নিজ নিকেতনে।' কিন্তু কোথায় আমার সেই 'নিজ নিকেতন?' আজও তাহা খুঁজিতেছি।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি

শ্রীমতী উমা চৌধুরী

বাংলাদেশের বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে নিষ্কাম মাধুর্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অপূর্ব ভাব ও রসের সংমিশ্রণে তাহা বৈষ্ণব কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা বা পদাবলী-সাহিত্য বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অপূর্ব ভাবসম্পদ্। আপনার দয়িত বা দয়িতার সহিত মিলনের করুণ আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-নিবেদনের কোমল আগ্রহ, পূর্বরাগের সুমধুর চিত্র, প্রেমিকার অনবদ্য রূপ-বর্ণনা, বিরহ-বেদনাক্লিষ্ট প্রেমসর্বস্ব কবিগণের নিভৃত অশ্রুর করুণ আর্তনাদের রেশ পদাবলী-সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্য প্রেমিক কবির আকুল বেদনার সকরুণ ইতিহাস। বৈষ্ণব কবিতার প্রেমবিহ্বল ভাবনার অন্তরে ফল্গুস্রোতে বহিয়া চলিতেছে অলৌকিক আধ্যাত্মিক চেতনার ভাব-সুরধুনী। মানবীয় প্রেমলীলা আপন বিরহ-বেদনার ইতিহাস জানাইতে গিয়া প্রায় স্বর্গের দ্বারে পৌছিয়াছে। ভোগবতী মিলিয়াছে মন্দাকিনীতে। সান্ত সসীম মানবীয় প্রেম আপনার বেষ্টনী হারাইয়া অসীম অনন্ত ঈশ্বরীয় বিরহ-মিলনের সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ আপন আপন ব্যক্তিগত বিরহ-মিলনানুভূতির হাসি ও অশ্রুর ডালিখানি অপূর্ব ছন্দ সুর ও ভাবে সাজাইয়া অর্ঘ্য পাঠাইয়াছেন দেবতাদের উদ্দেশে। মানবীয় প্রেমের সকাম রূপ ঈশ্বরীয় চেতনার নিকষ-পাথরে ঘষিয়া মাজিয়া নিষ্কাম অপার্থিব

অনুভূতির মধুর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাই চণ্ডীদাসের প্রেমানুভূতি 'নিকষিত হেম-সম।'

কবি জয়দেব কাব্য-সাহিত্যে গীতিকবিতার যে ঝরনা উৎসারিত করিয়াছেন, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি পরবর্তী বঙ্গকবিগণ তাহাকে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। চণ্ডীদাসের কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বিদ্যাপতির কবিতায় স্বভাবতই মৈথিল-ভাষার প্রাচুর্য থাকিলেও তাহা বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারেরই সম্পদ্। কারণ পরবর্তী বাংলা-মৈথিল মিশ্রিত 'ব্রজবুলি' তো বাংলাভাষার সমগোত্রীয় হইয়া গিয়াছে। তবে বিদ্যাপতির কাব্যে প্রেম-সম্ভোগ, মিলন-মাধুর্য, আনন্দোচ্ছ্বাস ও সুখানুভূতি চণ্ডীদাসের বিরহ-বেদনার করুণ ক্রন্দনের সুরে ও হতাশার অশ্রুজলের মাঝে যেন হারাইয়া যায়। বিদ্যাপতির যৌবনোচিত উদ্দাম উদ্দীপনা চণ্ডীদাসের প্রৌঢ় গাম্ভীর্য হইতে স্বতন্ত্র। দুঃখপ্রেমিক, বেদনা-বিলাসী বাঙালীর হৃদয় যেন চণ্ডীদাসের কাব্যলহরীর মাঝে আপন অন্তরের করুণ বাণী শুনিতে পায়। যৌবনের চঞ্চলতা বয়সের গাম্ভীর্যের কাছে বড় অগভীর বলিয়া মনে হয়। পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার রূঢ়তাই জীবনে সত্য হইয়া যায়, অল্পবয়সের আনন্দ হাসি সেখানে আর ঠাঁই পায় না। তাই চণ্ডীদাসের বিরহ-বেদনার সকরুণ ইতিহাসই একান্ত সত্য। তাই মানুষের একান্ততম জীবন-দর্শন, মানুষের আশাক্ষুব্ধ জীবনের চরমতম সত্যোপলব্ধি এই যে—

'সুখ-দুঃখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।'

ইহা তো শুধু ক্ষণিকের কল্পনাবিলাসমাত্র নহে, ইহা মানুষের বিক্ষুব্ধ জীবনের হাহাকারের মর্মবাণী। সুখাভিলাষী জীবনের সকল আশা-ভরসা বিসর্জন দিয়া মানুষকে একদিন পরম হতাশ্বাসে বলিতেই হয়—

'সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।'

ইহা শুধু ব্যক্তিগত কবির ব্যষ্টি-জীবনের ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস নহে, ইহা যুগ-যুগান্তরের প্রেমিকচিত্তের আশা-মুখরিত হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনার বাণী। এমন করিয়া অন্তরের ভাষাটিকে গহনতম প্রদেশ হইতে টানিয়া আনিয়া কে বুঝিতে চাহিয়াছে? চণ্ডীদাসের কবিতায় তাই এত ভালবাসা, তাই এত ভাল-লাগা।

অনেকের মতে চণ্ডীদাসের কবিখ্যাতি বিদ্যাপতির কবিখ্যাতির নিকট ম্লান হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির মতো শাস্ত্রজ্ঞান চণ্ডীদাসের না থাকায় এই ধারণার উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রেমরসধারা যার শিরায় শিরায় প্রবাহিত, কাব্যপ্রতিভা যার জন্মান্তরীণ সম্পদ্, ভাবে যার চিত্ত বিভোর, শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব তার কি অভাব সৃষ্টি করিবে? প্রেমের স্বভাবসুন্দর রূপখানি যে আপন অনুভূতিতে আস্বাদন করিতে পারে, শাস্ত্রের বাহুল্য তার নিকট শুধু নিষ্প্রয়োজন নহে, প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। চণ্ডীদাসের কবিতায় মধুর প্রেমই মুখ্য—ভাষার গাম্ভীর্য আর অলংকারের বাহুল্য সেখানে গৌণ! চণ্ডীদাসের কবিতা করুণ ও মধুর ভাষার সংমিশ্রণে এক অনবদ্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার কবিতার ভাষা সহজ, বর্ণনা সরল ও অনুভূতি বড় সুন্দর। তাঁহার কবিতায় শাস্ত্রজ্ঞানের আলোক পড়ে

নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বিদগ্ধ সমাজে তাহা অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া যায় নাই। স্বয়ং মহাপ্রভু সেই রসসুধা পান করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাসের কবিতা আধ্যাত্মিক ভাবসমৃদ্ধ। চণ্ডীদাসের মানবীয় প্রেম অলৌকিক প্রেম-রাজ্যের ভাবসম্পদ্। আপন প্রেমের দর্পণে, আপনার অশ্রুসিক্ত নেত্রসীমায় প্রেমরসিক মহাপ্রভুর দিব্য আঁখিদুটির অনুসন্ধান করিয়া-ছিলেন। রাধিকার ধ্যানবিভোর স্বর্গীয় রূপখানির মাঝে প্রতিফলিত হইয়াছে কৃষ্ণ-প্রেমাতুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অলৌকিক রূপরেখা। আপন দয়িতার প্রতি আত্মনিবেদনের মধ্যে তাই তাঁর অত সশ্রদ্ধ শালীনতা, প্রেমের প্রতি অত পবিত্র সম্ভ্রম। প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ সমাদরই কবির প্রেমকে চিরপবিত্র চিরসুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীদাসের নামানুরাগও মানবীয় প্রেমের ইতিহাসে অশ্রুত। আপন প্রাণসুন্দরের নাম গাহিতে গাহিতে সাধকের ভক্তিবিহ্বলচিত্ত দেহের সীমা ছাড়াইয়া, ইন্দ্রিয় চেতনার সংকীর্ণ গণ্ডি হারাইয়া এক উচ্চতম আদর্শ স্বর্গে উত্তরিত হইয়া গিয়াছে। প্রেমধন্যা প্রণয়বিধুরা রাধিকাই সুপরিচিতা, কিন্তু কানুপ্রেম-বিরহিণী রাধিকার বৈরাগ্যরূপ চণ্ডীদাসেরই মানসী কল্পনা। রাধিকাচিত্র চণ্ডীদাসের তুলিকায় কেবল সুন্দরী দয়িতার আলেখ্যই নয়, জগৎ-প্রেমিক আনন্দঘন নিমাই-প্রেমিকের পবিত্র-সুন্দর চিত্রপটের ছায়াই সেখানে প্রতিফলিত।

চণ্ডীদাসের পদগুলি প্রেমের সুগভীর সাধনমন্ত্রে সার্থক। এই স্তোত্রগুলি গায়কশ্রেণীর কণ্ঠে সুমধুর সুর-সম্ভাষিত হইয়া গীত হয়। চণ্ডীদাসের নাম, চণ্ডীদাসের গান, চণ্ডীদাসের প্রেম, তাঁহার বিরহ, সেই বিরহের সার্থক বর্ণনাভঙ্গী—সকলই নূতন। শিশির-সিক্ত শেফালিকার মতো তাহা চিরতরুণ ও চিরনবীন—ইহা যেন ভুলিবার নয়।

চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রেমিকজনচিত্তের একটি রসঘন হেমপদ্ম!—যেমন করুণ, তেমনই মধুর!—বিরহের রসজাহ্নবীসিঞ্চিত কোরকের মালিকা। রসিকজনের অন্তরে বেদনার বাণী বহন করিয়া লইয়া যায়।

চণ্ডীদাসের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে মতভেদের অন্ত নাই। দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলী-সেবক চণ্ডীদাস—এই অগণিত চণ্ডীদাসের মধ্যে খাঁটি চণ্ডীদাসকে আবিষ্কার করা কঠিন। এই বিবিধ চণ্ডীদাসের মধ্যেও একজন একক, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রসস্রষ্টার স্বাক্ষর পদাবলী-সাহিত্যে মেলে, যাহা একান্তভাবে একজনের, তিনি চতুর্দশ শতকের কবি বড়ু চণ্ডীদাস এবং দেবী বাশুলার পূজারী। তাঁহার নিবাস অজয়-বিধৌত, রাঢ়-বঙ্গের এক অখ্যাত পল্লী নান্নুরের সুরম্য ছায়ানিকেতনে। এই গ্রামেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন বাশুলী। চণ্ডীদাস পৈতৃক-সূত্রে বাশুলী-পূজার অধিকার লাভ করেন। নকুল নামে তাঁহার এক সহোদরও ছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস যে চতুর্দশ শতকে বিদ্যমান ছিলেন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতভেদ নাই। চণ্ডীদাস যে নবদ্বীপচন্দ্র চৈতন্যচন্দ্রের পূর্ববর্তী ছিলেন, তাহা বহুজনস্বীকৃত। চণ্ডীদাস দ্বাদশ শতকের জয়দেবের পরবর্তী ছিলেন, তাহাও সত্য। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনও সংঘটিত হইয়াছিল। রামীর শোক-গাথার মধ্যেও চণ্ডীদাসের কাল সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'কৃষ্ণ-কীর্তন' চণ্ডীদাসেরই রচনা।

শ্রীমদ্ভাগবতে শক্তিবাদ

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

মুখবন্ধ

একটি বিশাল বৃক্ষ যেমন অসংখ্য শাখা-প্রশাখার সমষ্টি দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে, সনাতন হিন্দুধর্মও তেমনি বহুসংখ্যক শাখা-ধর্ম দ্বারা সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। সাধারণ বৃক্ষ হইতে ধর্মরূপ মহান্ মহীরুহের পার্থক্য এই যে, সাধারণ বৃক্ষের মূল থাকে নীচে আর শাখা-প্রশাখা থাকে উপরে; অপর পক্ষে ধর্মরূপ বৃক্ষের মূল থাকে উপরে আর শাখা-প্রশাখা থাকে নীচে। সাধারণ বৃক্ষে উঠিতে হইলে মূল বাহিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে হয়, আর ধর্মরূপ বৃক্ষে আরোহণ করিতে হইলে অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ প্রশাখা ও শাখাগুলি অতিক্রম-পূর্বক মূলে পৌঁছিতে হয়। ধর্মের মূলে পৌঁছানো মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। তথায় পৌঁছিলে আর ঐহিক দুঃখ-কষ্ট, ভোগ-বাসনা প্রভৃতি কিছুই মানুষকে ক্লেশ দিতে পারে না। মানুষ তখন পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার-লাভের ফলে সতত আনন্দ-সাগরে আনন্দস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতে থাকে।

বৈষ্ণব ধর্ম বা ভাগবত-ধর্ম উল্লিখিত বহু-বিস্তৃত হিন্দুধর্মরূপ মহাবৃক্ষের একটি সমৃদ্ধ শাখা। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি আরও বহু শাখাদ্বারা এই মহান্ ধর্মতরু সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। দুঃখের বিষয়—এক শ্রেণীর লোক না বুঝিয়া, অথবা দুরভিসন্ধিবশতঃ হিন্দুধর্মের উল্লিখিত শাখাসমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করে। সাধারণ মানুষ ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব সহজে অনুভব করিতে পারে না; ফলে উক্ত অপপ্রচারের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া স্বজাতি এবং স্বধর্মের সমূহ অকল্যাণ সাধন করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকট বেদবৎ প্রমাণ। যদিও কোন হিন্দুই এই মহাপুরাণের প্রামাণ্য অস্বীকার করিতে পারেন না, তথাপি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকটই ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক আদৃত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব এবং শাক্ত-ধর্মের মধ্যে যে মূলতঃ কোন বিরোধ নাই, বর্তমান প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা দ্বারা আমরা তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

দুর্গা কালী প্রভৃতি শক্তিদেবতাকে প্রণাম করেন না, এমন বৈষ্ণব অনেক আছেন। ইঁহাদের যুক্তি এই যে, শক্তি-দেবতারাও তাঁহাদের মতো ভগবান বিষ্ণুর অধীন; অতএব বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী মনুষ্য হইতে শক্তিদেবতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য নহে। এইরূপ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল, তাহাও বর্তমান প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইবে।

মায়াশক্তির প্রভাব

মায়াশক্তি-ব্যতিরেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়—কোনটাই সম্ভব নহে। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণ-রূপে আবির্ভূত হন, তখনও দেখি—তিনি দেবকী ও বসুদেব উভয়কেই যথাক্রমে জননী ও জনকরূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন। মায়াশক্তির অংশ দেবকীকে ছাড়িয়া কেবল বসুদেবের কাছে তিনি আসেন নাই। কংসের হস্ত হইতে নিজের শিশু-দেহটিকে রক্ষা করিবার জন্যও তিনি মায়াশক্তির

সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। মায়ার প্রভাবেই সেই সময়ে প্রবল ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাত আরম্ভ হইয়াছিল। গভীর খরস্রোতা যমুনা যে শুকাইয়া গিয়াছিল, তাহাও মায়াশক্তিরই প্রভাবে। নন্দগোপের গৃহে স্বয়ং ভগবতী মায়াশক্তি কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এবং বসুদেব-কর্তৃক কংস-কারাগারে নীত হওয়ার পর যখন সেই দুর্বৃত্ত নৃপতি দেবকীর সন্তানজ্ঞানে শিশুকন্যাটিকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তিনি স্বীয় অলৌকিক শক্তি প্রকাশ-পূর্বক গগনমার্গে উঠিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণাবতারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মায়াশক্তির এতগুলি লীলা প্রকট হইয়াছিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শক্তির অংশরূপিণী গোপবালাগণের সহিত মিলিত হইয়া নিত্য নূতন লীলায় প্রবৃত্ত হইতেন। গোপীলীলা-প্রসঙ্গে মায়াশক্তির সংযোগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের উদ্বাহ প্রভৃতি ব্যাপারেও মায়াশক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাসলীলা-সম্পাদনের নিমিত্ত যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাগবতের ১০।২৯।১ শ্লোকে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে। কেবল কৃষ্ণাবতারেই নহে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কার্য-সাধনের জন্য ভগবান যে মায়াশক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহাও ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে স্বীকৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সমুদ্রমন্থনের পর অসুরদিগকে বিমোহিত করিবার জন্য ভগবানের মোহিনীরূপ ধারণ প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে (৮।৮)।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েই দেখি ঋষিগণ সূতকে প্রশ্ন করিতেছেন :

আখ্যাহি হরের্ভগবন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া॥

ঋষিগণ জানিতেন, মায়াশক্তি-ব্যতিরেকে ভগবান কখন একাকী লীলায় প্রবৃত্ত হন না ; তাই তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন, 'ভগবান মায়া-শক্তির সহিত মিলিত হইয়া কিভাবে লীলায় প্রবৃত্ত হন, তাহা আমাদিগকে বলুন।' বলা বাহুল্য, সূতের উত্তরেও সর্বত্রই মায়াশক্তির অপরিহার্যতা পরিস্ফুট হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক হইতে জানা যায়—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু এবং প্রলয়কর্তা রুদ্র সকলেই শক্তির সাহায্য লইয়া নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। দশম অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকে অধিকতর পরিষ্কার ভাষায় অনুরূপ কথাই বলা হইয়াছে ; যথা :

য এষ ঈশ জগদাত্মলীলয়া
সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে॥

সৃষ্টিকর্তা যে এই শক্তির সহায়তা লইয়াই প্রথম সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার পরিষ্কার উল্লেখ ১।২।৩০ শ্লোকে রহিয়াছে :

স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ॥

এখানে পরিষ্কারভাবেই বলা হইল যে, ভগবান স্বয়ং নির্গুণ ; কিন্তু গুণময়ী নিজ মায়া-শক্তির সহায়তায় তিনি প্রথম সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পুরাণ-মতে সৃষ্টি চারি প্রকার : যথা—প্রাকৃতিক, নৈমিত্তিক, নিত্য এবং আত্যন্তিক। তন্মধ্যে হরিশয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া যে সৃষ্টির বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা নৈমিত্তিক সৃষ্টি নামে অভিহিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতেও বর্ণিত আছে যে, নৈমিত্তিক সৃষ্টির আদিতে সর্বব্যাপী সলিল-রাশির উপর ভগবান নারায়ণ অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। এই সময়ে মহাশক্তি যোগমায়া নিদ্রারূপে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া

রাখেন, এবং ফলে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার সর্ববিধ ক্ষমতা সাময়িকভাবে অপ্রকট থাকে।

বর্তমান সৃষ্টির আদিতেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছিল। এই সময়ে নারায়ণের নাভিপদ্মে ব্রহ্মার আবির্ভাব ঘটিলে নারায়ণেরই কর্ণমল-সমুদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। যোগনিদ্রাভিভূত বিষ্ণু জড়বৎ অবস্থান করিতেছেন, আর দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে হত্যা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে, এইরূপ অবস্থায় ব্রহ্মা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল—যোগনিদ্রার স্তব করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলে জাগ্রত বিষ্ণু অবশ্যই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। ব্রহ্মা তখন ভগবতী যোগনিদ্রা বা যোগমায়ার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। মহাশক্তি যোগমায়া বিষ্ণু-নেত্রপত্রের আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং নিদ্রোত্থিত বিষ্ণু দানবদ্বয়কে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মাকে রক্ষা করিলেন। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে :

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥

প্রভৃতি শ্লোকে উল্লিখিত উপাখ্যানটি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এখানে স্বয়ং ভগবান অপেক্ষা তাঁহার মায়াশক্তির অধিকতর প্রভাব স্বীকৃত হইল। উল্লিখিত আখ্যায়িকার পশ্চাতে একটি গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব রহিয়াছে।

ভগবান যে তাঁহার মায়াশক্তিদ্বারাই সৃষ্টি করেন, তাহা নানা শ্লোকে[১] অভিহিত হইয়াছে।

এই মায়াশক্তির লোকাতীত মহিমা দেখিয়া দেবর্ষি নারদ বিস্ময়ে অভিভূত হন, এবং ইঁহাকে যোগিগণেরও দুরধিগম্য বলিয়া বর্ণনা করেন। বিস্ময়াভিভূত দেবর্ষি শ্রীভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন (১০।৬৯।৩৮):

বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দর্শা অপি যোগিনাম্।
যোগেশ্বরাত্মন্! নির্ভাতা ভবৎপাদ-নিষেবয়া॥

এইভাবে ভগবতী যোগমায়ার বিশ্ববিমোহিনী শক্তির কার্যকলাপ শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মায়াশক্তির স্বরূপ এবং শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ

যে মায়াশক্তি ব্যতিরেকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কিছুই সঙ্ঘটিত হইতে পারে না, যিনি নারায়ণকে পর্যন্ত নিদ্রাভিভূত করিয়া রাখেন, তাঁহার স্বরূপ কি—তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক। ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোকে এই মায়াশক্তি 'প্রকৃতি' নামে অভিহিতা হইয়াছেন। তৃতীয় স্কন্ধে মহর্ষি কপিল দেবহূতির নিকট সাঙ্খ্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই প্রকৃতির স্বরূপও বর্ণনা করিয়াছেন। সাঙ্খ্যমতে, সৃষ্টির প্রাক্কালে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ নামক গুণত্রয় যখন সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে, তখন সেই অবস্থাই 'প্রকৃতি' নামে অভিহিতা হন। ইহা-দ্বারা সম্ভবতঃ মহর্ষি কপিল বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সৃষ্টির আদিতে যখন অন্য কিছুই থাকে না, তখনও ভগবতী আদ্যাশক্তি সূক্ষ্মভাবে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। ক্রমে এই প্রকৃতিতে বিকার উপস্থিত হইলে তাহারই ফলে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। আবার প্রাকৃতিক প্রলয়ের অন্তেও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এই প্রকৃতিতেই বিলীন হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতি বা মায়াশক্তি আদিঅন্তহীন অর্থাৎ নিত্য। নিত্যপদার্থের কোন আকৃতি থাকা সম্ভবপর নহে, অতএব ভগবতী মায়াশক্তি নিরাকারও বটেন। তবে

---

১ ১।৫।২৭, ১।৫।৩১, ৩।২।১০, ৩।৪।৩, ৩।৫।২৫, ৬।১০।১২, ৬।১৬।১৫ প্রভৃতি শ্লোক উল্লেখযোগ্য।

তিনি সর্বশক্তিময়ী বলিয়া ইচ্ছা করিলেই যে-কোন রূপ ধারণ করিতে পারেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রকৃতিদেবীর পাঁচটি বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দেখা যায়, যথা:

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা॥

অর্থাৎ মনুষ্য, তির্যক্ প্রভৃতি যাবতীয় গণসমষ্টির জননী এই প্রকৃতিদেবী কখন দুর্গারূপে, কখন বা লক্ষ্মী সরস্বতী বা সাবিত্রীরূপে সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। দুর্গারূপে তিনি আমাদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, রাধারূপে দেন মুক্তি, লক্ষ্মীরূপে দেন ধনরত্ন যশ ইত্যাদি, সরস্বতীরূপে দেন বিদ্যা, আর সাবিত্রীরূপে করেন জীব প্রভৃতির সৃষ্টি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই: ভগবানের সহিত এই দেবীর কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, এবং থাকিলে তাহা কি প্রকার? ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোকে 'দেবস্য মায়য়া' (৩।২।১০), 'যোগমায়ান্তে' (১০।৬৯।৩৮) প্রভৃতি উক্তিদ্বারা ভগবানের বাচক-শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীবিভক্তির যোগ করা হইয়াছে। কোন একটি সম্বন্ধ বুঝাইলে তবেই ষষ্ঠী বিভক্তির যোগ হইতে পারে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, ভাগবতের মতে মায়াশক্তির সহিত ভগবানের একটি সম্বন্ধ আছে। 'সম্বন্ধ' নানাপ্রকার হইতে পারে। যদি স্ব-স্বামিভাব-সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইয়া থাকে, তবে বলিতে হয়—মায়াশক্তি ভগবানের অধীন। ৬।১৯।১১ শ্লোকে ভগবানকে মায়াশক্তির অধীশ্বররূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা:

ইয়ং হি প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা মায়াশক্তির্দুরত্যয়া।
তস্যা অধীশ্বরঃ সাক্ষাৎ ত্বমেব পুরুষঃ পরঃ॥

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উক্ত শ্লোকটি ভগবানের স্তুতিতে বলা হইয়াছে। যখন যাঁহার স্তব করা হয়, তখন অতিরঞ্জিতভাবে তাঁহার গুণ বর্ণনা করা হইয়া থাকে; সুতরাং স্তবস্থিত উল্লিখিত শ্লোকটি দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে কি না, তাহা বিতর্কের বিষয়।

নৈমিত্তিক সৃষ্টির বর্ণনা-প্রসঙ্গে যোগনিদ্রার সহিত নারায়ণের যে সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়—ভগবান নারায়ণ যোগনিদ্রার অধীন; কারণ যোগনিদ্রা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।

প্রথম স্কন্ধের অষ্টম-অধ্যায়স্থিত কুন্তীর একটি উক্তিতে উল্লিখিত আপাতবিরোধী উক্তিদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনের একটা প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। শ্রীভগবানের পরম ভক্ত পাণ্ডব-জননী কুন্তী বলিয়াছেন (১।৮।১৯):

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা॥

অভিনয়-প্রদর্শনকালে অভিনেতারা যেমন নব নব সাজে সজ্জিত হইয়া নূতন নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, ভগবানও তেমনি সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের জন্য মায়াশক্তিদ্বারা নিজেকে আবৃত করিয়া রাখেন। কোন ব্যক্তি যখন দেবরাজ ইন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন যেমন সাধারণ দর্শকেরা তাহার ব্যক্তিগত বাস্তব পরিচয় লাভ করিতে পারে না, অজ্ঞ মানুষও তেমনি মায়াশক্তিদ্বারা আবৃত শ্রীভগবানের বাস্তব রূপ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ যাহারা ঐ ব্যক্তির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, তাহারা যেমন সাজ-সজ্জার অন্তরালে তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারে, তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তগণও তেমনি শ্রীভগবানের মায়াশক্তি-রহিত যথার্থ রূপটির তত্ত্ব অবগত হন।

কোন কোন টীকাকার উল্লিখিত শ্লোকটি কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে 'মায়াজবনিকাচ্ছন্ন' শব্দটিদ্বারা বুঝা যায়, ভগবান মায়ারূপ-জবনিকাদ্বারা অচ্ছন্ন অর্থাৎ অনাচ্ছাদিত থাকেন। ইঁহারা বলিতে চাহেন—কুন্তীর মতে, ভগবান মায়াশক্তিদ্বারা আচ্ছাদিত হন না। বস্তুতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ তাহা হইলে একদিকে যেমন মায়াকে জবনিকাতুল্য বলা ব্যর্থ হয়, অপরদিকে তেমনি 'নটো নাট্যধরো যথা' এই উপমাটিও অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

কুন্তী-প্রদর্শিত উল্লিখিত উপমাটি হইতে বুঝা যায়, তিনি মায়াশক্তির সাময়িক-প্রাধান্য-মাত্র স্বীকার করিয়া মায়া-রহিত ভগবানের স্থায়ী প্রাধান্যই স্বীকার করিয়াছেন। নট যেমন ইচ্ছা করিলেই নিজের বাহ্য সাজ-সজ্জা পরিত্যাগ করিতে পারে, উক্ত মত স্বীকার করিলে তেমনি বলিতে হয়—ভগবান ইচ্ছা করিলেই মায়াশক্তিকে ত্যাগ করিতে পারেন।

ভাগবতের ৪।১৫।৩ শ্লোকে ঋষিগণ মায়া-শক্তিকে পুরুষরূপী ভগবান বিষ্ণুর অনপায়িনী-শক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অপায় শব্দের অর্থ 'বিশ্লেষ'; সুতরাং 'অনপায়িনী' বলিতে বুঝায়—যাঁহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করা যায় না। মায়াশক্তি-ব্যতিরেকে ভগবানের ভগবত্তাই থাকে না বুঝিয়াই সম্ভবতঃ ঋষিগণ ইঁহাকে শ্রীভগবানের অনপায়িনী-শক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নটের সজ্জা এবং ভগবানের মায়া-শক্তি সমধর্মাক্রান্ত নহে। ভগবান ইচ্ছা করিলেও সকল সময়ে মায়াশক্তিকে ত্যাগ করিতে পারেন না। এই জন্যই যোগমায়ার আবেশ হইতে শ্রীভগবানকে মুক্ত করিবার জন্য যোগমায়ার স্তব করা ব্রহ্মার প্রয়োজন হইয়াছিল। বস্তুতঃ মায়াশক্তি ভগবান হইতে অভিন্ন বলিয়াই তাঁহাকে ত্যাগ করা ভগবানের পক্ষে সম্ভব হয় না।

ভগবান এবং মায়াশক্তি যে বস্তুতঃ অভিন্ন, তাহার পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে ভাগবতের ১১।২৪।১০ শ্লোকে। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন:

প্রকৃতির্হ্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎত্রিতয়ং ত্বহম্॥

—প্রকৃতি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-কারণ-স্বরূপ; পরমপুরুষ (বা বিরাট্ পুরুষ) ইহার আধারসদৃশ এবং কাল সমুদয় বিদ্যমান পদার্থের প্রকাশক। ব্রহ্মরূপ আমি এই তিনটি হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে কি কুন্তী উপরের শ্লোকে অযথার্থ কথা বলিয়াছেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, কুন্তীর উল্লিখিত উক্তিটি সম্পূর্ণ অযথার্থ নহে; ভক্তির আতিশয্যে অধিকারী-বিশেষের অনুভূতি যে উক্তপ্রকারও হইতে পারে, তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

মায়াশক্তি এবং শ্রীভগবান যে বস্তুতঃ অভিন্ন তাহার অন্যবিধ প্রমাণও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়। ১।১৭।২৩ শ্লোকে পরম-ভাগবত রাজা পরীক্ষিৎ বলিয়াছেন:

অথবা দেবমায়ায়া নূনং গতিরগোচরা।
চেতসো বচসশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ॥

এই শ্লোকে মায়াশক্তিকে বাক্য ও মনের অগোচর বলা হইল। উপনিষৎসমূহে একমাত্র পরব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচর (অবাঙ্-মনসোগোচরম্) বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম এবং মায়াশক্তি বস্তুতঃ অভিন্ন বলিয়াই এক্ষেত্রে রাজা পরীক্ষিৎ মায়াশক্তিকেও উল্লিখিত বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে সকল শ্লোকে ভগবান ও মায়াশক্তির উল্লেখক্রমে ভগবানের বাচক-শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে, তাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা স্ব-স্বামি-ভাব-সম্বন্ধ প্রকাশিত হইতেছে না। 'রাহোঃ শিরঃ' (রাহুর মস্তক) প্রভৃতি প্রয়োগে যেমন অভেদ-সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, উল্লিখিত স্থল-সমূহেও তেমনি অভেদ-সম্বন্ধেই ষষ্ঠী হইয়াছে। রাহু এবং মস্তক যেমন অভিন্ন, মায়াশক্তি এবং শ্রীভগবানও তেমনি অভিন্ন। ইঁহাদের মধ্যে যে ভেদ কল্পনা করা হয়, তাহা কেবলমাত্র লোকব্যবহারবশতই করা হইয়া থাকে ; বাস্তব অর্থে নহে।

ইহার পরও প্রশ্ন উঠিতে পারে—ষষ্ঠী বিভক্তি না হয় অভেদ-সম্বন্ধেই স্বীকার করিলাম ; কিন্তু ভাগবতের কোন কোন স্থলে যে ভগবান ও মায়াশক্তির একত্র উল্লেখে ভগবানের বাচক-শব্দের সহিত প্রথমা বিভক্তি যোগ করিয়া মায়াশক্তির সহিত তৃতীয়া বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে, তাহার কিরূপ ব্যাখ্যা করিবেন? যদি সহার্থে বা করণ-কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ভগবান হইতে মায়াশক্তি অপ্রধান হইয়া পড়েন ; আবার অনুক্ত কর্তায় বা হেতু-অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বলিলে মায়াশক্তি হইতে ভগবানকে ন্যূন বলিতে হয়।

অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলাঃ বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া॥

প্রভৃতি শ্লোকে মায়া-শব্দের সঙ্গে অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, মায়াশক্তি-কর্তৃক ভগবানের অবতারসমূহ সৃষ্ট হইয়াছিলেন। এইরূপে 'মায়য়োপাত্তবিগ্রহম্' (১।৯।১০) প্রভৃতি পদেও অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বলিয়া ভগবান হইতে মায়াশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো যাইতে পারে।

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥

প্রভৃতি শ্লোকে ভগবানকে প্রকৃতি বা মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ (প্রকৃতেঃ পরঃ) বলা হইয়াছে। আবার অন্যান্য স্থলে যে কোথাও মায়ার শ্রেষ্ঠত্ব, কোথাও বা মায়া ও ভগবানের অভিন্নত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। বস্তুতঃ ভক্তগণ নিজ নিজ রুচি ও ধারণা অনুসারে কখন ভগবানকে, কখন বা যোগমায়াকে শ্রেষ্ঠরূপে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদ্বারা ভগবান এবং যোগমায়ার মধ্যে বাস্তব ভেদ প্রমাণিত হয় না।

মাতা শ্রেষ্ঠ না পিতা শ্রেষ্ঠ—এইরূপ প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামানো যেমন সন্তানের কর্তব্য নহে ; তেমনি ভগবান শ্রেষ্ঠ না মায়াশক্তি শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে অধিক বিচার-বিতর্কও শোভা পায় না। কোন কোন সন্তান মনে করে—তাহার মাতার চেয়েও পিতা শ্রেষ্ঠ, কারণ পিতা মাতারও গুরুজন। আবার অন্যেরা মনে করে—পিতার চেয়েও মাতা শ্রেষ্ঠ, কারণ গর্ভধারণ ও লালন-পালনের জন্য মাতার কাছেই তাহারা অধিকতর ঋণী। শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও দ্বিবিধ উক্তিই দেখা যায়। কোথাও দেখি—'মাতা-ভস্ত্রা, পিতুঃ পুত্রঃ' অর্থাৎ সন্তানের জন্মব্যাপারে মাতা যন্ত্রমাত্র, সন্তান বস্তুতঃ পিতারই। আবার অন্যত্র দেখি, 'সহস্রন্তু পিতৄন্ মাতা গৌরবেণা-তিরিচ্যতে'—অর্থাৎ সহস্র পিতার চেয়েও মাতার গৌরব অধিক।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মাতা ও পিতার মধ্যে কে বড় আর কে ছোট—ইহার

মীমাংসা করা সহজসাধ্য তো নহেই, হয়তো বা সম্ভবপরও নহে। সন্তানের কাছে মাতা-পিতা দুইজনই দেবতুল্য, দুইজনই সমান পূজ্য। এখানেও আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে, ভগবতী আদ্যাশক্তি আমাদের সকলের জননী, এবং পরমপুরুষ শ্রীভগবান আমাদের সকলের জনক। এই আদ্যাশক্তি ও শ্রীভগবান বস্তুতঃ দুই ব্যক্তি নহেন। একই মহাশক্তি কখন শ্রীভগবানরূপে কখন বা শক্তিরূপে—ভগবতীরূপে ভক্তগণ কর্তৃক উপাসিত হইয়া থাকেন। ইহা কেবল আমাদেরই কথা নহে; শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায় যদি অন্যবিধ হইত, তাহা হইলে এই মহাগ্রন্থের ১১।২৪।১৯ শ্লোকে স্বয়ং শ্রীভগবান্ নিজেকে মায়াশক্তি হইতে অভিন্নরূপে বর্ণনা করিতেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২২।২৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে—'প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষর্ষভ!' কোন কোন টীকাকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—এক্ষেত্রে বিকল্প শব্দের অর্থ 'পরস্পর ভিন্ন'। এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইলে তো প্রকৃতি এবং ভগবানের অভিন্নত্ব স্বীকার করা চলে না। উল্লিখিত সংশয়ের উত্তরে বক্তব্য এই যে, যে সকল টীকাকার উক্তপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা মানিয়া লওয়া চলে না; কারণ তাহা যে কেবল ভাগবতের অন্যান্য উক্তির বিরোধী এমন নহে, ব্যাকরণ অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেরও বিরোধী বটে।[১]

উল্লিখিত ১১।২২।২৯ শ্লোকে বিকল্প শব্দদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত প্রকৃতি এবং পুরুষের মৌলিক অভিন্নতাই প্রকাশ করিতেছেন। অর্থাৎ একই মহাশক্তি কখন প্রকৃতিরূপে, কখন বা পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন—ইহাই উল্লিখিত ভাগবত-বাক্যের অভিপ্রায়।

'স্ত্রীণান্তু শতরূপাহং পুংসাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
নারায়ণো মুনীনাঞ্চ কুমারো ব্রহ্মচারিণাম্॥'

এই শ্লোকেও শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

ভাগবতে শক্তিপূজার বিধান ও ব্যবহার

শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন অংশে মায়াশক্তির অর্চনার বিধান এবং গোপকন্যা প্রভৃতি কর্তৃক শক্তিপূজার বর্ণনাও লিপিবদ্ধ আছে। পুরাণ-পাঠের পূর্বে দেবীসরস্বতীকে প্রণাম করা বিধেয়:

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ঐশ্বর্যলাভের জন্য মায়াশক্তির অর্চনা কর্তব্য, শ্লোক ২।৩।৩ যথা:

দেবীং মায়ান্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্যকামোঽথ বীর্যবান্॥

পুংসবন-ব্রতের বিধান-প্রসঙ্গে মহামতি শুকদেব যে অবশ্য-পাঠ্য মন্ত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ভগবতী মায়াশক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করা হইয়াছে। উল্লিখিত মন্ত্র (৬।১৯।৬):

---

১ ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিকল্প শব্দের অর্থ 'ব্যবস্থিত-বিভাষা'। এই ব্যবস্থিত-বিভাষা কেবলমাত্র পদের বিভিন্নতা সম্পাদন করে; অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটায় না। 'যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা ॥ ৮।৪।৪৫ ॥' এই পাণিনিসূত্রে বিকল্পবিধানের দ্বারা বলা হইয়াছে—অনুনাসিক বর্ণ পরে থাকিলে পদান্তস্থিত যর্ বর্ণস্থানে বিকল্প অনুনাসিক বর্ণ হয়। ফলে এতৎ+মুরারিঃ এই সন্ধিতে একবার এতদ্‌-মুরারিঃ এবং অন্যবার এতন্মুরারিঃ এইরূপ দুইটি পদই হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উভয় পদেরই অর্থ সম্পূর্ণ অভিন্ন। এইরূপে 'মন্যকর্মণ্যনাদরে বিভাষাঽপ্রাণিষু ॥ ২।৩।১৭ ॥' এই পাণিনিসূত্রদ্বারা মন্ ধাতুর কর্মে বিকল্পে দ্বিতীয়া এবং চতুর্থী দুইটি বিভক্তিই হয় বটে, কিন্তু মূল অনাদররূপ অর্থ অভিন্নই থাকে।

'বিকল্পস্তুল্যবলয়োর্বিরোধশ্চাতুরীযুতঃ।'

এই বিকল্প-অলঙ্কারের লক্ষণদ্বারা বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকেরাও অনুরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'নময়্যন্তাং শিরাংসি ধনূংষি বা' প্রভৃতি বিকল্প অলঙ্কারের উদাহরণে নতিস্বীকাররূপ মূল অর্থ অভিন্নই থাকে।

বিষ্ণুপত্নি ! মহামায়ে ! মহাপুরুষলক্ষণে !
প্রীয়েথা মে মহাভাগে ! লোকমাতর্নমোঽস্তু তে ॥

দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখি, শ্রীভগবান ভগবতী যোগমায়াকে বলিতেছেন : হে দেবি ! যেহেতু তুমি মানুষের সর্ববিধ অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকো, এই কারণে মানুষ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে তোমার অর্চনা করিবে। মানুষ কি কি নামে দেবীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার অর্চনা করিবে, তাহারও কিছু কিছু উল্লেখ শ্রীভগবান করিয়াছেন। শ্রীযোগমায়ার প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি (১০।২।১০-১২) :

অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্তাং সর্বকামবরেশ্বরীম্।
নানোপহারবলিভিঃ সর্বকাম-বরপ্রদাম্ ॥
নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানা শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥

দশম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখি—কংসকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া শিশুরূপিণী যোগমায়া যখন গগনমার্গে আরোহণ করিলেন, তখন কংসের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ প্রদান করত তিনি আপাতদৃষ্টিতে অন্তর্হিতা হইয়া যান বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পৃথিবী ত্যাগ করেন নাই। দেবীর এই লোকাতীত প্রভাব দেখিয়া তাহার পর হইতে অধিক-সংখ্যক লোক নানা স্থানে নানা নামে দেবীর প্রতিকৃতি স্থাপনপূর্বক নূতনভাবে তাঁহার অর্চনা আরম্ভ করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪।১৩) বলিয়াছেন :

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।
বহুনাম-নিকেতেষু বহুনামা বভূব হ ॥

দশম স্কন্ধের ২২শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই—গোপকন্যাগণ নন্দগোপের পুত্রকে পতিরূপে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কাত্যায়নী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই কাত্যায়নী যে দেবী মহামায়া ভিন্ন অন্য কেহ নহেন, পূজার মন্ত্রগুলি হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। গোপীগণ নিম্নলিখিত মন্ত্রটি জপ করিয়া দেবী কাত্যায়নীর নিকট নিজেদের বাসনা নিবেদন করিয়াছিলেন (১০।২২।৪) :

কাত্যায়নি ! মহামায়ে ! মহাযোগিন্যধীশ্বরি !
নন্দগোপসুতং দেবি ! পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥

উল্লিখিত কাত্যায়নীব্রতের অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয় নাই, কারণ ইহার ফলে গোপকন্যাগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন।

১০ম স্কন্ধেরই ৫৬তম অধ্যায়ে স্যমন্তক-মণির উপাখ্যান-প্রসঙ্গে আবার দেখিতে পাই—শ্রীকৃষ্ণের পরিবারবর্গ দ্বারকার অন্যান্য অধিবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গার উপাসনা করিতেছেন। উদ্দেশ্য—সত্রাজিতের কবল হইতে যেন শ্রীকৃষ্ণ নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিতে পারেন। এখানে মূল শ্লোকে 'দুর্গা' শব্দটিরই উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়গণের এই দুর্গাপূজা ব্যর্থ হয় নাই ; কারণ ভগবতী দুর্গা তাঁহাদের উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদেরই সম্মুখে আবির্ভূতা হন, এবং 'শ্রীকৃষ্ণ বিপন্মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবেন' এই বর দিয়া অন্তর্হিতা হন। তাহার অব্যবহিত পরেই স্যমন্তকমণি উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে :

সত্রাজিতং শপন্তস্তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ।
উপতস্থুশ্চন্দ্রভাগাং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে ॥
তেষান্তু দেব্যুপস্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষা সহ।
প্রাদুর্বভুব সিদ্ধার্থঃ সদারো হর্ষয়ন্ হরিঃ ॥

এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্থানেও কোথাও শক্তিপূজার সমর্থন, কোথাও বা তাহার সমর্থনের ইঙ্গিত দেখা যায়।

উপসংহার

আমাদের বিবেচনায় যে শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান ও মায়াশক্তির মধ্যে কোনরূপ বাস্তব ভেদ স্বীকার করা হয় নাই, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। শক্তিপূজার বিধান এবং তাহার আচরণের দৃষ্টান্তও যে ভাগবতে রহিয়াছে, তাহাও প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে—মানুষ যদি নিজ নিজ রুচি, প্রকৃতি ও ধারণা অনুসারে একই ভগবানকে বিভিন্ন ভাবে পূজা করে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিভিন্ন ফল-কামনায় ভগবান ও মায়াশক্তির অর্চনা করা হইয়া থাকে, এইরূপ বলা যাইতে পারে কি না? ঋগ্বেদ বলিয়াছেন (১।১৪৮।৩৬):

একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি,
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

তন্ত্রশাস্ত্র (কুলার্ণব-তন্ত্র) বলিয়াছেন:

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

উল্লিখিত শ্লোকসমূহে এমন কথা বলা হয় নাই যে, বিভিন্ন ফলকামনায় একই পরব্রহ্মকে বিভিন্ন নামে অর্চনা করা হয় না। সুতরাং উপরের লেখা-মত ব্যাখ্যা করার পক্ষে তো কোন বাধা দেখা যায় না।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলেও উক্ত প্রকার অভিমত গ্রহণই সঙ্গত মনে হইবে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলিয়াছেন: 'মা' শব্দের অর্থ 'ঐশ্বর্য' আর 'যা' শব্দের অর্থ 'প্রাপণ'; সুতরাং যাঁহার অর্চনার ফলে সত্বর অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া যায়, তিনিই 'মায়া' নামে অভিহিতা হন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড, ২৭শ অধ্যায়ে:

রাজন্! শ্রীবচনো মাশ্চ যাশ্চ প্রাপণবাচকঃ।
তাং প্রাপয়তি যা সদ্যঃ সা মায়া পরিকীর্তিতা॥

ঐশ্বর্য-কামনায় যে দেবী-মায়ার উপাসনা করা হয়, উপরে প্রদর্শিত 'দেবীং মায়াঞ্চ শ্রীকামঃ (২।৩।৩)' প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোকেও তাহাই বলা হইয়াছে।

অন্যপক্ষে আবার 'কৃষ্ণ'শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রসঙ্গে পুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীধরস্বামী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'কৃষি'শব্দের অর্থ সংসার এবং 'ন'শব্দের অর্থ নিবৃত্তি; সুতরাং যাঁহার উপাসনা করিলে বিষয়াসক্তি বিনষ্ট হয়, তিনিই কৃষ্ণ।

কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো নশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

শ্রীহরির উপাসনা করিলে যে মানুষ নির্গুণ বা আসক্তিহীন হইতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকেও (১০।৮৮।৫) এই কথাই বলা হইয়াছে:

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥

এতদ্ব্যতীত,

আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দনাৎ॥

এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটিতেও মুক্তি-কামনাতেই জনার্দন বা বিষ্ণুর উপাসনা করিবার কথা বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত সংশয়ের উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, সাধারণভাবে বিভিন্ন ফলকামনায় বিভিন্ন দেবতার অর্চনা করা হয় বলিয়া স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। এইরূপ নিয়ম শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে 'প্রায়িক নিয়ম' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

শ্রীভগবান যেমন সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অধীশ্বররূপে বর্ণিত হইয়াছেন, মায়াশক্তিও তেমনি উল্লিখিত ত্রিবিধ কার্যই সাধন করেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত-প্রকার উক্তির কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ তো পরিষ্কার ভাষাতেই মায়াশক্তির বর্ণনায় বলিয়াছেন :

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥

অর্থাৎ এই আদ্যাশক্তিই বিভিন্ন রূপে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়—সমুদয় কার্যই সম্পাদন করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানও যে কেবল মুক্তিদানই করেন, এমন নহে, তিনি প্রার্থীর প্রার্থনা অনুসারে তাহাকে ঐহিক ভোগও দান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণাবতারে গোপীগণের প্রার্থনা-পূরণে তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দানবকে বিনাশ করিবার সময় তিনি স্বকীয় রুদ্ররূপও প্রকটিত করিয়াছেন। ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত মায়াশক্তি এবং ভগবান উভয়েই পুনঃ পুনঃ দানবগণকে বিনাশ করিয়া সাধর্ম্যের পরিচয় দিয়াছেন।

দেবী যোগমায়ার ক্ষেত্রে দেখি, তিনি কখন দুর্গারূপে ভক্তের দুর্গতি-হরণ, কখন বা শিবা মঙ্গলচণ্ডীরূপে তাহার অষ্টবিধ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। প্রার্থিগণের প্রার্থনা-অনুসারে তিনি তাহাদিগকে রূপ, জয়, যশ, ধন, রাজ্য, মনোরমা পত্নী—সব কিছুই দান করিয়া থাকেন। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহাদের শত্রুনাশ বা অধিকারী-ভেদে মুক্তিদানেও তিনি পরাঙ্মুখ হন না। 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি' প্রভৃতি শ্রীশ্রীচণ্ডীর উক্তিগুলিই ইহার প্রমাণ।

দুর্গাপূজার বিধানেও দেখিতে পাই, অধিকারী-ভেদে সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক ত্রিবিধ পূজারই উল্লেখ রহিয়াছে। সাত্ত্বিক পূজার ফলে হয় জ্ঞান ও মুক্তিলাভ, আর রাজসিক পূজা করিলে হয় ঐশ্বর্যলাভ, তামসিক পূজার কথা ছাড়িয়াই দিলাম।

উল্লিখিত বিধান ও শাস্ত্রবাক্যসমূহ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যে-কোন মানুষ যে-কোন কামনা লইয়া অথবা সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে ভগবতী বা ভগবানের যে-কোন রূপে পরব্রহ্মের উপাসনা ও অর্চনা করিতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত যে শক্তিপূজার বিরোধী নহেন, আশা করি উপরের লেখাদ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ

স্বামী তেজসানন্দ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যুগে যুগে মানবের চিন্তা ও কর্মজগতে বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধিকল্পে ক্ষণজন্মা প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লববিচিন্তাসমন্বিত যে-সকল মানব দেশে দেশে স্ব-স্ব অমূল্য অবদানের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই অন্যতম। যে সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকূল বলিয়া প্রতিভাত হইলেও রবীন্দ্রনাথ যে অসামান্য সাহিত্য-প্রতিভা ও অসাধারণ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রকাশের পক্ষে সেইরূপ পরিস্থিতিরই যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাহা অনস্বীকার্য। সেই যুগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কৃষ্টির পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে পুরাতন ও আধুনিকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ভাঙাগড়ার যে প্রবল প্লাবন সমাজের উপর দিয়া প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই আবর্ত-সঙ্কুল স্রোতোমুখে কত মনীষী তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা—তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের কৌতূহলী মনকে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর উপাসনায় মগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। বিদ্যায়তনের নির্দিষ্ট পুঁথিপুস্তকের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে স্বীয় মন-বুদ্ধিকে চিরতরে শৃঙ্খলিত রাখিয়া তিনি গতানুগতিকভাবে প্রতিভা-বিকাশের চেষ্টা কখনও করেন নাই; অথবা মনুষ্যসমাজকে বর্জন করিয়া গভীর অরণ্যে বা নির্জন গিরিদরীতলে যোগাসনে কৃচ্ছ্রসাধনেও নিমগ্ন হন নাই। তাই তিনি 'মুক্তি' কবিতায় স্বকীয় সাধনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:

> ইন্দ্রিয়ের দ্বার
> রুদ্ধ করি যোগাসন,—সে নহে আমার।
> যা-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
> তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
> মোহ মোর—মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
> প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া॥

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আত্মিক মিলনের প্রয়াসের মাধ্যমেই তিনি মানবজীবনের গূঢ়-রহস্য-উদ্‌ঘাটনে নিজেকে অজ্ঞাতসারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ধর্ম সম্বন্ধে নিজেই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন:

আমার ধর্ম বস্তুতঃ কবির ধর্ম। সঙ্গীতের অজ্ঞাত প্রেরণার মতই এক অচেনা রেখাহীন পথ বাহিয়া আমার ধর্ম আমার অন্তরে স্পর্শ দিয়াছে। আমার কবি-জীবন যে-ভাবে বিকশিত হইয়াছে, ধর্মজীবনও ঠিক সেইরূপ দুর্বোধ্য রহস্যময় পথ অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহারা উভয়েই এক অচ্ছেদ্য মিলনসূত্রে সম্বদ্ধ। কিন্তু কখন কিভাবে যে ইহাদের মিলনপর্ব শুরু হয়, তাহা দীর্ঘকাল আমার নিকট অজ্ঞাতই ছিল। সহসা এক শুভমুহূর্তে এই মিলন আমার মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করে।

কবির এই সহজাত ধর্ম তাঁহাকে অন্তর্মুখী করিয়া একদিকে যেমন আত্মবিকাশের পথের

সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া অন্তরের নিভৃত প্রদেশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, অপরদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মবোধ তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে উদাত্ত গম্ভীর সুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনুভূতি তাঁহার হৃদয়ে কেমন করিয়া ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, তাহাই রূপায়িত করিয়া কবি গাহিয়াছেন :

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর—
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর॥

'অরূপরতনে'ও ঠিক এই একই সুর বাজিয়া উঠিয়াছে :

যে গান কানে যায় না শোনা, সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভামাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে, শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি।
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।

তাই প্রগতিবাদী হইয়াও প্রকৃতির গভীরে যে নিগূঢ় সনাতন সত্য নিহিত, তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে ও তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিতে তিনি কোন দিনই কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এই সমন্বয়াত্মক দৃষ্টিভঙ্গীই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে বিশাল উদারতা ও মহামানবতার পূজারী করিয়া তুলিয়াছিল। বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যেও এক অখণ্ড ঐকতান শুনিতে পাইয়া কবি গাহিয়াছেন :

এই সুরুতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্তকল্লোল॥

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মতোই যাঁহার দরদী হৃদয় পাষাণকারা ভঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে মানবকল্যাণে ধাবিত হইয়াছিল, সেই মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বরঙ্গমঞ্চের খেলাধূলা সাঙ্গ করিয়া বিদায়বেলায় অন্তরের উপলব্ধি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন :

বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলাম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ ক'রে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই॥

বলা বাহুল্য, এই গভীর অনুভূতিই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে এত রসসমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

মানবেতিহাসে এ-দৃশ্যও বিরল নহে—স্বদেশবাসীর সুখ-দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশীর কল্যাণেই সমগ্র চিন্তা ঢালিয়া দিয়া কেহ কেহ বিশ্বপ্রেমিক সাজিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমিকতা স্বদেশবাসীকে বাদ দিয়া বা দেশবাসীর লাঞ্ছনা দারিদ্র্য ও অশিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া কোন দিনই বহির্দেশে ধাবিত হয় নাই। তাঁহার সর্বজনীনতা একদিকে যেমন জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সামগ্রিকভাবে সকলকে আলিঙ্গন করিতে শিখাইয়াছিল, তেমনি স্বদেশের প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে মিলিত করিয়া দেশবাসীর বেদনাভরা মর্মের প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে সাড়া দিয়া তাঁহাকে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে প্রেরণা দিয়াছিল। তাই তো তিনি গাহিয়াছেন :

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।
রাখ রে ধ্যান, থাক রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি—
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে॥

ঐক্যমন্ত্রের উদ্গাতা রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগ্যগঠনকল্পে প্রতীচ্যের সম্পদ্কে কখনও প্রত্যাখ্যান করেন নাই; তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতের বিশাল প্রাঙ্গণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অবদানের অপূর্ব সম্মিলন ও সামঞ্জস্যের মধ্যেই ভারত ও ভারতের সমগ্র দেশের কল্যাণবীজ নিহিত রহিয়াছে। তিনি মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন:

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে, মিলিবে,
যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

বাণীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের লেখনী জ্বালাময়ী ভাষায় স্বদেশবাসীর জাড্য-তামসিকতা ও প্রাণহীন আচার-পদ্ধতিকে যেমন তীব্র কশাঘাত করিয়াছে, তৎকালীন বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও শোষণ-নীতির মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া বিশ্ব-দরবারে তাহাদের কদর্য স্বরূপ প্রকাশ করিতে কখনও সঙ্কুচিত হয় নাই। স্বদেশবাসীর যুগসঞ্চিত পঙ্কিল আবর্জনা বিদূরিত করিবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশসেবকরূপে বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। যেখানেই মহাসর্বনাশ নিষ্পলক-নেত্রে জাতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের দরদী হৃদয় নির্ভয়ে দেশবাসীর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছে। নিপীড়িত দেশবাসীর আর্তনাদে ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ সিংহবিক্রমে বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের প্রাণে উৎসাহ, উদ্যম ও উদ্দীপনা জাগ্রত করিয়াছেন। ১৯০৫ খৃঃ আসন্ন বঙ্গচ্ছেদের ঘনঘটা যখন বাংলার ভাগ্যাকাশ আচ্ছন্ন করিল, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বাংলার সন্তানগণকে মিলনমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার আবেগময় উদাত্ত সুর রবীন্দ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল:

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন—
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতা লিখিয়াই তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন নাই; তিনি বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভদ্র-অভদ্র, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য-নির্বিচারে সকলের হস্তে মিলনের রাখী বাঁধিয়া দিলেন; সকলকে নিবিড় ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বানে বাংলার নরনারীর বুকে সেদিন যে অমিত বিক্রম ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার দুর্বার বেগ প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ সিংহের হৃদয়েও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। সেদিনের সৌভ্রাতৃত্ব ও স্বাদেশিকতা তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া জয়যাত্রার পথের সমগ্র বন্ধন ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, কূটনীতিজ্ঞ ব্রিটিশের বঙ্গভঙ্গ-সিদ্ধান্তকে সমূলে বিচ্ছিন্ন করিয়া একপ্রাণতা ও সংঘশক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া দিল। সত্যের জয় বিঘোষিত হইল।

১৯১৯ খৃঃ ১৩ই এপ্রিল। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সহসা তথাকথিত সভ্য ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায়ের জনৈক সেনাধ্যক্ষ নিরীহ নরনারীর উপর অতর্কিত গুলি বর্ষণ করিয়া মুহূর্তমধ্যে তিন শত উনআশী জন শিখ, হিন্দু, মুসলমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া মানবেতিহাসকে কলঙ্কিত করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এই লোমহর্ষণ কাহিনী রবীন্দ্র-

নাথের মর্মস্থানে তীব্র আঘাত হানিয়া তাঁহাকে কিরূপ ব্যথিত ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার রাজকীয় সম্মানের নিদর্শন 'নাইট' উপাধি বর্জনের মাধ্যমেই তাহা প্রকৃষ্টভাবে প্রকট হইয়াছিল। এই বর্বরতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তিনি ১৯১৯ খৃঃ ৩০শে মে ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনালব্ধ শক্তির কি প্রদীপ্ত প্রকাশ আমরা তাঁহার এই তীব্র প্রতিবাদ ও দেশবাসীর লাঞ্ছনায় স্বীয় অপমান-বোধের মধ্যে দেখিতে পাই। তাঁহার রুদ্রবীণা তাই একদিন দীপক-রাগিণীতে বাজিয়া উঠিয়াছিল :

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে॥

পরাধীন জাতির ইতিহাসে এইরূপ মর্মন্তুদ ঘটনা দিনের পর দিন ঘটিয়া থাকে। ১৯৩১ খৃঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের হিজলী জেলে নিরস্ত্র নিঃসহায় বন্দীগণের উপর ব্রিটিশ সৈনিকের গুলিবর্ষণ জালিয়ানওয়ালাবাগেরই পুনরভিনয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিদারুণ সংবাদ রোগ-শয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথের নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার স্বাধীন চিত্ত কখনও মনুষ্যত্বের এত লাঞ্ছনা ও অপমানের নিকট নতিস্বীকার করিতে শিখে নাই। তাই জাতির প্রতিনিধিরূপে উন্মুক্ত অম্বরতলে কলিকাতা মনুমেণ্টের পাদমূলে লক্ষাধিক ক্ষুব্ধ নরনারীর সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ সেদিন দৃপ্তকণ্ঠে জ্বালাময়ী ভাষায় প্রতিবাদ জানাইয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা অচিরকালমধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। স্বাধীন ভারত আজ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি মদগর্বিত ইংরেজকে সতর্কবাণী শুনাইয়া বলিয়াছিলেন :

এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ ; এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত্র করতে পারে কোন্ শক্তি? এ-কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের উপরেই বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বদেশবাসীকেও সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন : এ-কথাও মনে রাখতে হবে, আমরা নিজেদের চিত্তে সেই গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা ক'রে পাপের মূলগত প্রতি-কারের কথা চিন্তা করবার স্থৈর্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর দুঃখস্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'তে পারি।

ভারতের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের শান্তি ও মানবতার বাণী সীমাবদ্ধ থাকে নাই, এ-কথা আমরা প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি ভারতের মর্মবাণী বহন করিয়া যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই সমবেত সুরে জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া ভারতের তথা প্রাচ্যের সমুন্নত আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে

চেকোশ্লোভাকিয়া পরিভ্রমণকালে· তদানীন্তন প্রখ্যাত প্রাচ্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক Mortiz Winternitz প্রাগ শহরে তদ্দেশবাসীর পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে যে বিপুল সংবর্ধনা জানাইয়াছিলেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্যপ্রতিভার অমূল্য অবদানের প্রতিই তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

স্বদেশে বা বিদেশে যখনই সত্যের অমর্যাদা ঘটিয়াছে, যখনই বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতা বন্ধুত্বের মুখোশ পরিয়া একটা জাতির সর্বনাশ সাধনে সচেষ্ট হইয়াছে, তখনই রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে তীব্র প্রতিবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার তথাকথিত বন্ধুবর্গের অমার্জনীয় দুর্বলতা ও জার্মান-ভীতি ইওরোপীয় ইতিহাসে Munich Betrayal-রূপ এক মসীলিপ্ত অধ্যায় রচনা করিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ তদানীন্তন চেক মনীষী Vincent Lesny-কে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা সত্যসন্ধ জাতিমাত্রেরই অন্তর্বেদনার উত্তপ্ত উৎসার বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

তিনি স্বাধীনতাপ্রিয় সমগ্র জাতিকে অসত্য ও কপটতার বিরুদ্ধে সদর্পে দণ্ডায়মান হইবার জন্য যে উদাত্তগম্ভীর আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত Call-কবিতার প্রতি ছত্রে প্রকটিত হইয়াছে:

......Come young nations,
Proclaim the fight for freedom,
Raise up the banner of invincible faith.
Build bridges with your life
across the gaping earth
Blasted by hatred,
Do not submit yourself to carry
the burden of insult upon your head.
Kicked by terror,
And dig not a trench
with falsehood and cunning
To build a shelter
for your dishonoured manhood;
Offer not the weak
as sacrifice to the strong
To save yourself.

সেই একই সুরে রবীন্দ্রনাথ জীবনের গোধূলিলগ্নে তাঁহার অশীতিতম জন্মবার্ষিকীর শুভবাসরে বর্তমান সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া উৎসবমুখর শান্তিনিকেতনের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে তাঁহার সারগর্ভ মনোজ্ঞ ভাষণে মানবজাতির সম্মুখে যে চিন্তাসম্পদ্ পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিয়াছিলেন:

...The demon of barbarity has given up all pretence and has emerged with unconcealed fangs and teeth, ready to tear up the world and spread devastation. From one end to another poisonous fumes of hatred defile the atmosphere. This plauge of persecution which lay dormant in the civilization of the West has at last roused itself to create havoc and desecrate the spirit of man. In our present luckless, helpless and hopeless poverty, have we not already seen this world-wide destruction at work? A mortal combat has begun between one power and another, and no one knows what it will bring about in the end.

The wheels of Fate will some day compel the English to give up their Indian empire. But what kind of India will they leave behind, what stark misery? When the stream of their centuries' administration runs dry at last, what a waste of mud and filth will they leave behind them! I had at one time believed that the springs of civilisation would issue out of the heart of Europe. And today when I am about to quit the world, that stubborn faith has gone bankrupt altogether.

ভারতবন্ধু ইংরেজ Sir Daniel Hamilton-এর কণ্ঠেও ভারতে ইংরেজ-শাসনের পরিণতি

সম্বন্ধে ঠিক একই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে। তিনিও লিখিয়াছেন :

If Britain has to leave India as suddenly as Rome had to leave Britain, then England shall leave behind a country minus education, minus sanitation and minus money.

ভাগ্যের কি তীব্র পরিহাস! দুর্নিবার ঘটনা-পরম্পরায় ভারতের পরাধীনতার সুচির শর্বরীর অবসান হইতে বিলম্ব হইল না। যে সাম্রাজ্যবাদ 'Rule Britannia'—সঙ্গীত-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে জীবন-জোয়ারে ভাসিয়া আসিয়া ভারতের উপকূলে অবতরণ করিয়াছিল, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তাহাই আবার ভাটার টানে গা-ভাসাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। শৃঙ্খল-মুক্ত ভারত সিন্ধুসলিলে মুক্তিস্নান করিয়া সমুন্নত শিরে বিশ্বসভায় সগর্বে সম্মানিত আসন অধিকার করিল। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, বাণী ও সাহিত্য-সাধনা সার্থক হইল।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক উৎসবের এই শুভলগ্নে* আমরা শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার অমূল্য অবদানের কথা স্মরণ করি। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া একই সুরে গাহিব :

জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর
পেতে হবে তব পরিচয় ;
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়।
ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে,
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহবাহনে—
মিলনযজ্ঞে অগ্নি জালাবে
যজ্ঞশিখার দাহনে।
তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে ॥

* বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ-উৎসবের উদ্বোধন-দিবসে (৫.১০.৬১) পঠিত ভাষণ হইতে সংকলিত।

সমালোচনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (দ্বিতীয় ষট্‌ক—শ্রীধর-টীকা সহ): স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড় (হাওড়া)। পৃষ্ঠা ২৯২ + ৪৪ ; মূল্য ৫৲।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রথম ষট্‌কের ন্যায় প্রতি শ্লোকের মূল, অন্বয় ও অনুবাদ এবং শ্রীধর স্বামীর সুবোধিনী টীকা ও তাহার আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের গীতাভাষ্য হইতে বহু উদ্ধৃতি এবং মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, শঙ্করানন্দ সরস্বতী, অভিনব গুপ্ত, নীলকণ্ঠ, বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকারের বহু বাক্য এবং নানা শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে অনেক উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা-সহ গীতার অর্থ-প্রকাশের জন্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুবোধিনী টীকায় যে সব শ্রুতি-বাক্য বা শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইগুলি কোন্ গ্রন্থে কোথায় আছে, তাহা পাদটীকায় লিপিবদ্ধ হওয়ায় টীকার তাৎপর্য উপলব্ধির সহায়ক হইয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে 'অলৌকিক গীতাধ্যান' ও 'কল্কিগীতা' ও শেষাংশে 'কল্যাণেশ্বরী মোক্ষতীর্থে' প্রবন্ধ-তিনটিতে এমন সব অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লিখিত হইয়াছে, যাহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই সব বিষয় স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে পারিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একখানি উৎকৃষ্ট টীকার অনুবাদ-সহ এইগুলি প্রকাশিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বের আলো শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—এ মুখার্জি এণ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৯০ ; মূল্য টাকা ১.৫০।

আলোচ্য পুস্তকটি ছোটদের উপযোগী ক'রে লেখা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী। বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বংশপরিচয়, জন্ম ও বাল্যকাল, কলকাতায় আগমন, দক্ষিণেশ্বরে গদাধর, সাধকরূপে ঠাকুর, বিবাহ ও শ্রীশ্রীমা, তীর্থযাত্রা, ভক্তসমাগম, দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর প্রভৃতি আলোচিত। ইহা ছাড়া দুটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬ জন ত্যাগী সন্তানের কথা এবং ৮ জন গৃহী ভক্তের বিষয় সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮টি উপদেশ লিপিবদ্ধ। বইটি বালক-বালিকাদের জন্য লেখা হলেও একসঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকায় বড়রাও পড়ে আনন্দ পাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর শিষ্য-ভক্তদের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা বইটি থেকে পাওয়া যাবে।

সরল গীতা—শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ। প্রকাশক: পি. কে. ঘোষ এণ্ড কোং, ৫এ অক্ষয় বোস লেন, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ৮৭ ; মূল্য টাকা ১.৫০।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহজ গদ্যানুবাদ। অনুবাদ আক্ষরিক করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এই পুস্তকপাঠে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও গীতার বিষয়বস্তু ও শিক্ষার সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন।

বাল্মীকি রামায়ণ (যুদ্ধকাণ্ড)—সারাংশের পদ্যানুবাদ: আশালতা সেন। প্রকাশক: শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, ১৩নং কাশীনাথ চ্যাটার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া। প্রাপ্তিস্থান:

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ২২০ ; মূল্য টাকা ৩'৫০।

আদিকবি মহামুনি বাল্মীকির অপূর্ব গ্রন্থ রামায়ণ সরলতায়, ভাবসম্পদে, চরিত্র-সৃষ্টিতে, কাব্যসৌন্দর্যে অনবদ্য। বাল্মীকি-রামায়ণ একাধারে মহাকাব্য ও মহাসঙ্গীত। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই এই রামায়ণের জ্ঞান থাকা উচিত। মূল বাল্মীকি-রামায়ণ অবলম্বনেই ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষায় বহু রামায়ণ রচিত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি সমগ্র বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ নয়, ইহা শুধু যুদ্ধকাণ্ডের সারাংশের পদ্যানুবাদ হইলেও যুদ্ধকাণ্ডের পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের পরিচয়-প্রদানের উদ্দেশ্যে আদিকাণ্ডের প্রথম দুই সর্গের অধিকাংশ শ্লোক সানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। যুদ্ধকাণ্ডস্থিত কাহিনীগুলি যথা—নাগপাশ-বন্ধন, রাবণের যুদ্ধ-সজ্জা, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ, ইন্দ্রজিৎ-বধ, রাবণের শোক খুব হৃদয়স্পর্শী। পুস্তকটি পাঠ করিলে মূল রামায়ণের বৈশিষ্ট্যের সহিত কিঞ্চিৎ কাব্যাস্বাদও লাভ হইবে। অনুবাদ স্বচ্ছ ও সহজ, অথচ মূলানুগ।

সম্পূর্ণ বাল্মীকি-রামায়ণের মূল সহিত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইলে পাঠক-সমাজে আদৃত হইবে।

কয়েকটি পূজার তত্ত্ব—শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৪।৩ সি, বলরাম বসু ঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮১ ; মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থটিতে গুরুপূজা, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, শক্তিপূজা, কালীতত্ত্ব, বাগ্‌দেবী সরস্বতী, শিবরাত্রি-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের রহস্য ও তত্ত্বকথা আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষাংশে আচার্য শঙ্করের 'মণিরত্ন-মালা'র শ্লোকগুলি পদ্যানুবাদ-সহ সংযোজিত। রচনাগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুগণ এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন। গ্রন্থের ভাষা সহজ সরল।

—সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিদ্যামন্দির পত্রিকা—(রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ-সংখ্যা, ১৯৬১)—প্রকাশক : স্বামী তেজসানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ১০২।

রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে প্রকাশিত সুমুদ্রিত 'বিদ্যামন্দিরে'র এই বিশেষ সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সুলিখিত প্রবন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত। অন্যান্য লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'যুগসমস্যা-সমাধানে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'Talking about History', 'A new experiment in the field of education at Belur.'

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী সৎসঙ্গানন্দের দেহত্যাগ

গত ৩রা নভেম্বর শুক্রবার রাত্রি ১০-৪৩ মিনিটের সময় স্বামী সৎসঙ্গানন্দ ৭৮ বৎসর বয়সে জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে দেহরক্ষা করিয়াছেন। প্রথম জীবনেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর সরকারী কর্ম হইতে উপযুক্ত সময়ের পূর্বেই অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-জীবনের প্রথম দিকে তিনি কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে দীর্ঘকাল তপস্যায় রত ছিলেন। শেষ জীবনে ১৫ বৎসরের অধিককাল জয়রামবাটী মঠে থাকিয়া সাধন-ভজনে অতিবাহিত করেন। তিনি খুব ধ্যানজপ-পরায়ণ সাধু ছিলেন। তাঁহার আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

কার্যবিবরণী

শিলং: ১৯২৪ খৃঃ আসামের রাজধানী শিলং হইতে ৪৫ মাইল দূরে শেলাগ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খাসি-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যের সূত্রপাত হয়। ক্রমশঃ নংওয়ার, চেরাপুঞ্জি, শিলং-এ কার্যধারা বিস্তৃতি লাভ করে। শিলং কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯২৯ খৃঃ এবং ১৯৩৭ খৃঃ রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। উপযুক্ত পরিচালনার জন্য শেলা ও নংওয়ার বিদ্যালয়ের সহিত চেরাপুঞ্জিকে ১৯৪৯ খৃঃ স্বতন্ত্র কেন্দ্রে পরিণত করা হইয়াছে।

শিলং কেন্দ্রের জানুআরি '৬০ হইতে মার্চ '৬১ বার্ষিক বিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

দাতব্য চিকিৎসালয়ে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৭,৫২৮ (নূতন ২৮,৬৩৬) ও ১৮,৮২০ (নূতন ১১,৩৩৩)। ল্যাবরেটরিতে ১,১৩৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এক্স-রে বিভাগে পরীক্ষিত রোগীর সংখ্যা ২৮০। চক্ষু ও E.N.T. বিভাগে যথাক্রমে ৫৪৫ জন ও ৯২৫ জন রোগী চিকিৎসিত হয়; সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসা ২৪১। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ে ৩,৪২৯ গ্রামবাসী চিকিৎসা লাভ করে।

বিবেকানন্দ-গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৪,৯১৪ (নূতন সংযোজিত ২৩৬); পাঠাগারে ১২টি সংবাদপত্র ও ২৭টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়; দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ৪৩।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ২৭ জন (৪ জন ফ্রি) বিদ্যার্থী ছিল। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের জন্য ১২০টি ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করা হয়। হরিজন কলোনির প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নারটিয়াং নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৩৩ ও ২১। সারদা-সংসদ শিশু-বিদ্যালয়ে অঙ্কন সঙ্গীত প্রভৃতি শিখানো হয়, শিক্ষার্থীদের জন্য শতাধিক ক্লাস ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়।

আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে সাপ্তাহিক ধর্মসভার সংখ্যা যথাক্রমে ৭৮ ও ১৬; শ্রোতৃ-সংখ্যা গড়ে যথাক্রমে ১০১ ও ৫৮। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

অনুষ্ঠেয় জন্মতিথিগুলি এবং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

১৯৬০ খৃঃ এপ্রিল মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী

বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ এখানে আসেন এবং তিন সপ্তাহকাল থাকিয়া ১২টি ধর্মপ্রসঙ্গ করেন।

এই আশ্রম কর্তৃক আলোচ্যবর্ষে 'সৎপ্রসঙ্গ' (২য় ভাগ)—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ এবং স্বামী সারদেশানন্দ-রচিত 'শ্রীচৈতন্যদেব' প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচী-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন

কলিকাতা : গত ২রা হইতে ৪ঠা এবং ৬ই হইতে ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারে (Gol Park, Calcutta 29) নব-নির্মিত বিবেকানন্দ-হলে প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিভিন্ন দিনে দেশ-বিদেশের মনীষিগণ বিভিন্ন ভাষায় (প্রধানতঃ ইংরেজীতে) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন :

২রা : অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'সভ্যতার বিশ্বজনীন নীতি ও প্রকার';

৩রা : অধ্যাপক মেনশিং 'বিশ্বে ধর্মগুলির সহিষ্ণুতা ও অসহিষ্ণুতার উদ্দেশ্য ও প্রকার' এবং অধ্যাপক মহাদেবন 'ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সার্বভৌম আবেদন';

৪ঠা : অধ্যাপক লেভিড 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য সাংস্কৃতিক মূল্যায়নে পারস্পরিক গুণাবধারণ' এবং অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার 'আধুনিক জীবন-সমস্যায় জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া';

৬ই : অধ্যাপক হোয়েবেল 'নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে আধুনিক জীবনের মূল সমস্যা' এবং অধ্যাপক টনাকা 'সাহিত্য-প্রচারে ধর্ম';

৭ই : অধ্যাপক কৈশরলিং 'কৃষ্টি কি অপরিহার্য?' এবং অধ্যাপক সাফা 'কৃষ্টিগত ঐক্য';

৮ই : অধ্যাপক ক্যান্সিস 'প্রাচীন ঐতিহ্য ও এক-জগৎ সমস্যা'।

৯ই : প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলনের সভাপতি ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ার নিজস্ব মন্তব্যের সহিত কয় দিনের আলোচনার (Symposium) সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, এই সম্মেলনে যে সব বিষয়ের সুচিন্তিত আলোচনা হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলনের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। ভারত, ইওরোপ ও আমেরিকার চিন্তাশীল অধ্যাপকগণের এই গবেষণামূলক বৈঠক আমাদের চিন্তার পরিধি বাড়াইয়া দিয়াছে।

এই বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদের জন্য এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দের বক্তৃতা-সফর

লণ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনারের এবং লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অনুরোধে ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা- ও সংস্কৃতি-বিভাগের মন্ত্রী-দপ্তরের উদ্যোগে নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ইওরোপের ১৬টি দেশে গত এপ্রিল হইতে অগস্ট মাসে বক্তৃতা সফর করেন।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দের বক্তৃতার প্রধান বিষয়গুলি ছিল : (১) ভারতীয় কৃষ্টির শক্তি, (২) ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক জীবন, (৩) উপনিষদের (বেদান্তের) মাধুর্য, (৪) গীতার সার্বভৌম বাণী, (৫) ভারতের মহাপুরুষগণ, (৬) বুদ্ধের শাশ্বত বাণী, (৭) বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক পটভূমিকা, (৮) উপাস্য খৃষ্ট, (৯) শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানবের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার, (১০) স্বামী বিবেকানন্দে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্মিলন, (১১) বর্তমান জগতে বেদান্তের আবেদন, (১২) বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্ম, (১৩) ভারতের নব জাগরণ, (১৪) নারী-জাতির ভারতীয় আদর্শ, (১৫) শিল্প-যুগে আধ্যাত্মিক জীবন, (১৬) ভগবদ্গীতার মূল কথা।

নিম্নে তারিখ ও স্থান প্রদত্ত হইল :

তারিখ	দেশ	নগর
এপ্রিল, ১১—১৬	গ্রীস	এথেন্স
১৭—২০	ইটালি	রোম
		ফ্লোরেন্স, আসিসি
২১—	যুক্তরাজ্য (U K)	লণ্ডন
মে ১১		অক্সফোর্ড, মাঞ্চেষ্টার
		লীডস্, বাকিংহাম
		কেমব্রিজ, নিউকাস্‌ল্
		এডিনবার্গ, গ্যাসগো
মে, ১২—১৫	ডেনমার্ক	কোপেনহাগেন
		এলসিনোর
১৬-১৯	নরওয়ে	ওস্‌লো
২০—২৩	সুইডেন	ষ্টকহল্‌ম্, কিরুনা
২৪	ফিন্‌ল্যাণ্ড	হেলসিঙ্কি
২৯—২৯	হল্যাণ্ড	হেগ
৩০,—জুন ১	বেলজিয়াম	ব্রাসেল্‌স্
জুন, ২—১০	জার্মানি	ষ্টাট্‌গার্ট
		হিডেলবার্গ, মারবার্গ
		গটিন্‌জেন, হামবুর্গ
		মিউনিক
১১—১৫	অষ্ট্রিয়া	ভিয়েনা
১৬—১৮	পোল্যাণ্ড	ওয়ার-স
১৯—২৩	চেকোস্লোভাকিয়া	প্রাগ
২৪—২৭	সুইট্‌সারল্যাণ্ড	জুরিথ, বার্ন
২৮ ৩০	স্পেন	মাদ্রিদ
জুলাই, ১—৯	ফ্রান্স	প্যারিস, অরলিয়েন্স
১০—৫১	ইংলণ্ড	লণ্ডন
অ.ষ্ট, ১—৮	রাশিয়া	মস্কো, লেনিনগার্ড

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যান ফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি) : নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টার সময় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শ.ন্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। জুলাই মাসের শেষ বুধবারের বক্তৃতাটি দেন স্বামী পবিত্রানন্দ। অগস্ট মাসে গ্রীষ্মাবকাশের জন্য কোন বক্তৃতা হয় নাই।

জুন : ঈশ্বর-দর্শন না হইলে ধর্মজীবনে কি লাভ? গীতায় ঈশ্বর-তত্ত্ব; সকলেরই ভগবান বুদ্ধের উপাসনা করা উচিত; গীতার আধ্যাত্মিক শিক্ষা; আত্মশক্তি; মানস ও অতিমানস; ঈশ্বরকে খুঁজিও না, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর; স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অপর শিষ্যগণ।

জুলাই : প্রাচ্য জগতের জন্য বুদ্ধদেবের যেরূপ বিশেষ বাণী ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের সেরূপ পাশ্চাত্যের জন্য; যোগ—নূতন ও পুরাতন; কিরূপে ও কাহাকে উপাসনা করিব? শক্তি কিভাবে জাগরিত হয়? যদি তুমি জানিতে, তুমি কে? শ্রীগুরু ও দীক্ষার অর্থ।

সেপ্টেম্বর : ধ্যান ও একাগ্রতা; ধর্ম ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, মৃত্যু ও জীবন-দীপ্তি; স্বপ্নের আধ্যাত্মিক অর্থ।

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

পুরাতন মন্দিরে : প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ্' আলোচনা করেন। রবিবার ব্যতীত অন্য দিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগত-ভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেলা ১১টা হইতে ১২টা শিশুদের সময়। জুলাই মাসে পুরাতন মন্দিরে ক্লাস ও দর্শনাদি বন্ধ থাকে।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় দর্শন-সম্মেলন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিকী জয়ন্তীর অঙ্গরূপে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৯শে অক্টোবর হইতে ১লা নভেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় দর্শন-মহাসভার ৩৬ তম অধিবেশন হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় দুই শত প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডক্টর সুধীরঞ্জন দাস অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক এ. আর. ওয়াদিয়া অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে শান্তি-নিকেতনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এবং রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভা ভারতীয় চারুকলার যে পুনরভ্যুত্থান ঘটাইয়াছে, সে বিষয়ে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। অধিবেশনের মূল সভাপতি সভাপতি ডক্টর টি. আর. ভি. মূর্তি অসুস্থ হওয়ায় মহাসভার কর্মসমিতির সভাপতি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর মূল সভাপতির কার্য করেন। 'বর্তমানে সামাজিক জীবনে ঐক্য এবং জাতীয় সংহতি-রক্ষায় ভারতীয় দার্শনিকদের কর্তব্য' বিষয়ে তিনি সারগর্ভ ভাষণ দেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা-সভায় ডক্টর সুধীরঞ্জন দাস, ডক্টর শচীন সেন, অধ্যাপক বিনয়গোপাল রায়, ডক্টর সরোজ-কুমার দাস, ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার এবং ডক্টর আর. জে. কুপার ভাষণ দেন। আর এক আলোচনা-সভায় 'রাষ্ট্রের কোন দর্শনের আবশ্যকতা আছে কি না?'—এ-বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা হয়।

তর্কশাস্ত্র- ও তত্ত্ববিদ্যা-শাখার সভাপতি ডক্টর মোহান্তি, দর্শনের ইতিহাস-শাখার সভাপতি অধ্যাপক কে. কে. ব্যানার্জি মনোবিদ্যা-শাখার সভাপতি ডক্টর মাসি এবং নীতিশাস্ত্র- ও সমাজ-দর্শন-শাখার সভাপতি অধ্যাপক অনিরুদ্ধ ঝা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। এ সব শাখায় অনেক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়।

ডক্টর তান্ ইউন্ সান বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বুদ্ধ-জয়ন্তী বক্তৃতা এবং ডক্টর জে. এন. চাব বেদান্ত-সম্বন্ধে শ্রীমন্ত প্রতাপ শেঠ বক্তৃতা প্রদান করেন। শেষে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর ঘোষণা করেন যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মৃতি রক্ষার্থে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করিবার উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছে। এজন্য তিনি দর্শনানুরাগী জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন এবং অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (৫৯-বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা ২৯) সাহায্য পাঠাইতে বলেন।

কার্যবিবরণী

বিকানীর: শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীরের বার্ষিক (১৯৫৮-৬০) কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। রাজস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা ও বেদান্ত প্রচার এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানে নিত্য পূজা ও সাময়িক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ হইয়া থাকে।

একটি নৈশ বিদ্যালয় ও একটি গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে। শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। হিন্দীতে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য: শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনচরিত, গীতাবোধ, শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্র, ভক্তিতত্ত্ব, মহাপুরুষ-বাণী, জ্ঞান-দীপিকা। প্রতি বৎসর বিকানীরের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে চিত্রকলা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

কটক: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক-সম্প্রদায়ের বার্ষিক (১৯৫৫-৬০) কার্যবিবরণীতে প্রকাশ: এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির আদি নাম ছিল রামকৃষ্ণ ভিক্ষু-সম্প্রদায়। ১৮৯৬ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত কয়েকজন বালক গৃহে গৃহে চাউল সংগ্রহ করিয়া এই সম্প্রদায়ের সূত্রপাত করে। বর্তমানে 'রামকৃষ্ণ কুটীর' নামে নিজস্ব ভবনে ৩২ জন বিদ্যার্থীর থাকিবার উপযোগী একটি ছাত্রাবাস পরি-চালিত হইতেছে; এখানকার ছাত্রদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল ভাল হইয়া থাকে। পরিচালিত গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১,৯৫৫; গ্রন্থাগারে কয়েকটি সাময়িক পত্র-পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়।

নিবেদন

আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনের' নূতন (৬৪ তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম-ও ঠিকানা সহ বার্ষিক চাঁদা ৫৲ (পাঁচ টাকা) ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি-তে কাগজ পাঠাইবার অতিরিক্ত ডাক-ব্যয় বাঁচিয়া যায় ও অযথা বিলম্ব হয় না। কুপনে **গ্রাহক-সংখ্যা** অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময়: সকাল ৭টা হইতে ১০-৩০ টা; বিকাল ২-৩০ হইতে ৫টা; রবিবার ৩টা হইতে ৫টা। ইতি—

কার্যাধ্যক্ষ,
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা ৩

ঈশ্বরের দেহধারণ বা অবতার

[খ্রীষ্ট-বিষয়ক]

স্বামী বিবেকানন্দ

যীশুখ্রীষ্ট ভগবান ছিলেন—মানবদেহে অবতীর্ণ সগুণ ঈশ্বর। বহুরূপে তিনি বহুবার নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং তোমরা শুধু তাঁর সেই রূপগুলিরই উপাসনা করতে পারো। পরব্রহ্ম উপাসনার বস্তু নন। ঈশ্বরের ঐ ভাবকে উপাসনা করা অর্থহীন। নরদেহে অবতীর্ণ যীশুখ্রীষ্টকেই আমাদের ঈশ্বর ব'লে পূজা করতে হবে। ঈশ্বরের এরূপ বিকাশের চেয়ে উচ্চতর কোন কিছুর পূজা কেউ করতে পারে না। খ্রীষ্ট থেকে পৃথক্ কোন ভগবানের উপাসনা যত শীঘ্র ত্যাগ করবে, ততই তোমাদের কল্যাণ। তোমাদের কল্পনা-নির্মিত যিহোবার কথা ধর, আবার সুন্দর মহান্ খ্রীষ্টের কথাও ভেবে দেখ। যখন খ্রীষ্টের ঊর্ধ্বে কোন ভগবান সৃষ্টি কর, তখনই সব পণ্ড কর। দেবতাই কেবল দেবতার উপাসনা করতে পারে, মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়, এবং ঈশ্বরের প্রচলিত প্রকাশের ঊর্ধ্বে তাঁকে উপাসনা করার যে-কোন প্রয়াস মানুষের পক্ষে বিপজ্জনকই হবে। যদি মুক্তি চাও তো খ্রীষ্টের সমীপবর্তী হও; তোমাদের কল্পিত যে-কোন ঈশ্বরের চেয়ে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। যদি মনে কর যে, খ্রীষ্ট একজন মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর উপাসনা ক'রো না। কিন্তু যখন ধারণা করতে পারবে—তিনি ঈশ্বর, তখনই তাঁর উপাসনা ক'রো। যারা বলে—তিনি মানুষ ছিলেন, আবার তাঁকে পূজাও করে, তারা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় অধর্মের কাজই করে। এখানে মধ্যপন্থা ব'লে কিছু নেই, সমগ্র শক্তিকেই গ্রহণ করতে হবে। 'যে পুত্রকে দেখেছে, সে পিতাকেই দর্শন করেছে', আর পুত্রকে না দেখে কেউ পিতার দর্শন পাবে না। শুধু লম্বা লম্বা কথা, অসার দার্শনিক বিচার আর স্বপ্ন ও কল্পনা! যদি আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু উপলব্ধি করতে চাও, তবে খ্রীষ্টে প্রকাশিত ঈশ্বরকে নিবিড়ভাবে ধরে থাকো।

দার্শনিক দিক দিয়ে, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ ব'লে কোন মানুষ ছিলেন না, তাঁদের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকেই দেখেছিলাম। কোরানে মহম্মদ বার বার বলেছেন, খ্রীষ্ট কখনও ক্রুশবিদ্ধ হননি—ও একটা রূপকমাত্র; খ্রীষ্টকে কেউ ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে না।

যুক্তিমূলক ধর্মের সর্বনিম্নস্তর দ্বৈতভাব, আর 'একের মধ্যে তিনে'র অবস্থিতিই উচ্চতম। জগৎ ও জীব ঈশ্বরের দ্বারাই অনুস্যূত; ঈশ্বর জগৎ এবং জীব—এই 'একের মধ্যে তিন'-কেই আমরা দেখছি। আবার সঙ্গে সঙ্গে আভাস পাচ্ছি যে, এক থেকেই এই তিনটি হয়েছে। এই দেহটি যেমন জীবাত্মার আবরণ, তেমনই এই জীবাত্মা যেন পরমাত্মার আবরণ বা দেহ। 'আমি' যেমন বিশ্বপ্রকৃতির চেতন আত্মা, ঈশ্বর তেমনই আমার আত্মারও আত্মা—পরমাত্মা। তুমিই হচ্ছ সেই কেন্দ্র—যার মাধ্যমে তুমি বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখছ, আবার তার মধ্যেই তুমি রয়েছ। জগৎ জীব আর ঈশ্বর, এই নিয়েই একটি সত্তা—নিখিল বিশ্ব। সুতরাং এগুলি মিলে একটি একক, তথাপি একই-কালে এগুলি আবার পৃথকও বটে।

আবার আর এক প্রকারের 'ত্রিত্ব' (তিনে এক) আছে, অনেকটা খ্রীষ্টানদের 'ট্রিনিটি'-র মতো। ঈশ্বরই পরব্রহ্ম, এই নির্বিশেষ সত্তায় আমরা তাঁকে অনুভব করতে পারি না; শুধু 'নেতি নেতি' বলতে পারি মাত্র। তবুও ঈশ্বরীয় সত্তার সান্নিধ্যসূচক কয়েকটি গুণ কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি। প্রথমতঃ সৎ বা অস্তিত্ব, দ্বিতীয়তঃ চিৎ বা জ্ঞান, তৃতীয়তঃ আনন্দ,—অনেকটা যেন তোমাদের 'পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার' অনুরূপ। পিতা হচ্ছেন সৎ-স্বরূপ, যা থেকে সব কিছুর সৃষ্টি; পুত্র হচ্ছেন চিৎ-স্বরূপ। খ্রীষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। খ্রীষ্টের পূর্বেও ঈশ্বর সর্বত্র ছিলেন এবং সকল প্রাণীর মধ্যে ছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্টের আবির্ভাবে আমরা তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পেরেছি। ইনিই ঈশ্বর। তৃতীয় হচ্ছে আনন্দ, পবিত্র আত্মার আবেশ। এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ আনন্দের অধিকারী হয়। যে-মুহূর্ত থেকে তুমি খ্রীষ্টকে তোমার হৃদয়ে বসাবে, তখন থেকেই তোমার পরমানন্দ; আর তাতেই হবে তিনের একত্ব সাধন।*

* The Divine Incarnation or Avatara : বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপির অনুবাদ
(দ্রষ্টব্য : Complete Works Vol. VIII, pp. 190—191)

কথাপ্রসঙ্গে

'স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে'

স্বর্গরাজ্যের সন্ধানে মানুষ বাহির হইয়াছে জ্ঞানোন্মেষের প্রথম দিন হইতেই। ইহুদী পুরাণের মতে মানুষ ভগবানের অবাধ্য স্বর্গচ্যুত সন্তান, স্বর্গে ফিরিয়া যাওয়াতেই তাহার জীবনের সার্থকতা—পরিপূর্ণতা। ইহা যে নিছক পুরাণ বা কল্পনা, তা নয়। ইহার মধ্যে মানুষের একটি চিরন্তন ও বিশ্বজনীন অভীপ্সা লুক্কায়িত রহিয়াছে; ইহার মধ্যে নিহিত আছে মানুষের ভাল হইবার ইচ্ছা, সম্ভাবনা ও চেষ্টা। অতএব স্বর্গের কল্পনাকে আমরা যতই আদিম মনে করি না কেন, মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিতে পারি না।

কোন মানুষই বর্তমান পরিস্থিতিতে সুখী নয়; তাহার দুই চক্ষু—একটি অতীতে, অপরটি ভবিষ্যতে নিবদ্ধ। অতীতের সুখস্মৃতি রোমন্থন তাহার ইতিহাস ও পুরাণ, ভবিষ্যতের সুখের পরিকল্পনাই তাহার ধর্ম ও নীতি—হাঁ, রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি, সবই ইহার অন্তর্গত।

বর্তমানের অসম্পূর্ণতা ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে, বর্তমানের দুঃখ-কষ্ট দূর হইবে, ভবিষ্যৎ সুখশান্তিতে ভরিয়া উঠিবে—এই আশা লইয়াই তো মানুষ বাঁচিয়া আছে। তবে এই ভবিষ্যৎ কখন অদূরে, কখন সুদূরে! শেষ পর্যন্ত মানুষ মনে করে, যদি ইহলোকে আশা পূর্ণ হইল না তো পরলোকে নিশ্চয় হইবে। ইহজীবনে না হয়, পরজীবনে সুখদুঃখের একটা হিসাব-নিকাশ হইবেই। দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে মানুষ জীবনের পরিসমাপ্তি ভাবিতেই পারে না। তাই তাহাকে কল্পনা করিতে হইয়াছে মৃত্যুর পরেও জীবন আছে—সেখানে ভগবানের ন্যায়বিচারে পাপী শাস্তি পাইবেই, পুণ্যবানও তাহার পুণ্যের ফলভোগ করিবেই। এই কল্পনা হইতেই স্বর্গ ও নরকের সৃষ্টি, কর্মফলের অমোঘতায় বিশ্বাস। এই সকল ধারণা ও বিশ্বাস যুগ যুগ ধরিয়া দেশে দেশে মানুষের জীবন চালিত করিতেছে, সংযত করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

বিভিন্ন দেশের পুরাণে স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা যতই পৃথক্ হউক, কয়েকটি বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। সর্বপ্রথম—স্বর্গে সকলই সুখ, স্বর্গে মৃত্যু নাই, অভাব নাই, এতটা বৈষম্য নাই। স্বর্গে শুধু তাহাদেরই স্থান, মর্ত্যে যাহারা ভাল কাজ করিয়াছে। অবশ্য ভাল কাজ যে কি, তাহা লইয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

একদা ছিল—যজ্ঞে আহুতি দিয়া অভীষ্ট দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই স্বর্গে যাওয়া যাইত। পরবর্তী যুগে দেখা গেল—শস্ত্রাঘাতে সম্মুখ যুদ্ধে মরিলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত! গ্রীক পুরাণেও দেখা যায় স্বর্গ শুধু বীরদের বাসভূমি, বীর্য বা বীরত্ব এবং virtue সে ভাষায় সমার্থক। কোন কোন দেশের শাস্ত্রে শোনা যায়—বিদেশী, শত্রু বা বিধর্মীকে হত্যা করিতে পারিলে স্বর্গের চাবি হস্তগত হয়।

অবশেষে স্বর্গের নানা চিত্র আমরা পাই সাহিত্যে। ভারতীয় মহাকাব্যে তো কথাই নাই, সেখানে স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলন ঘটিয়াছে বহুস্থলে বহুভাবে। গ্যেটে তো কালিদাসের 'শকুন্তলা'য় স্বর্গ-মর্ত্যের এরূপ একটি মিলন দেখিয়াই মোহিত হইয়াছিলেন। স্বর্গচ্যুত

মানবকে স্বর্গে পুনরধিষ্ঠিত করিয়া মিলটন মহাকবি হইয়াছেন। দান্তে স্বর্গ-নরকের বর্ণনা করিয়াছেন সৌন্দর্য-পিপাসু প্রেমপিপাসু মানবাত্মার পরিপূর্ণতা-লাভের চরম অভিযানে।

এ পৃথিবীই শেষ নয়, এ জীবনই শেষ নয়, মৃত্যুই পূর্ণচ্ছেদ নয়,—ইহাই যেন মানবাত্মার চিরন্তন মর্মবাণী সর্ব দেশে, সর্ব কালে! কখন ঋষির কণ্ঠে, কখন কবির কাব্যে, কখনও শিল্পীর শিল্পে এই আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—নানা ছন্দে নানা ভাবে। পৃথিবীর পরে স্বর্গ আছে, মৃত্যুর পরে অমৃত আছে, জীবনের পরে আরও জীবন আছে, চরম সার্থকতা লাভ না করা পর্যন্ত জীবন আছে।

এই খানেই শুরু হয় দার্শনিকের যুক্তি ও অনুভূতি! এই ভাবেই শুরু হইয়াছে কর্মবাদের কঠিন শৃঙ্খল, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই শৃঙ্খল ভাঙিবার মহামন্ত্র! বন্ধনবোধের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়াছে মুক্তির আপ্রাণ চেষ্টা! ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম এই চেষ্টাকেই জাতীয় সাধনায় রূপান্তরিত করিয়াছে। এই সাধনায় স্বর্গও কাম্য নয়—স্বর্গও বন্ধন, স্বর্গও শৃঙ্খল—স্বর্ণ-শৃঙ্খল! মানবাত্মাকে সূক্ষ্মতর ভোগে বাঁধিয়া স্বর্গসুখ উচ্চতর সত্যানুভূতির পথে বাধা দেয়। উচ্চতম সত্যানুভূতি লাভ করিতে হইলে স্বর্গসুখও ত্যাগ করিতে হইবে। সত্যের সাধককে পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্যলোকে আসিয়া আবার সাধনা করিতে হইবে। স্বর্গই চরম লক্ষ্য নয়; চরম লক্ষ্য ইহজীবনে আত্মানুভূতি। স্বর্গবাসী দেবতা অপেক্ষা আত্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ! স্বর্গকে অতিক্রম করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ভারতের দর্শন-ভিত্তিক ধর্মের এই যে ভাব, ইহা সাধারণের বোধগম্য নয়।

কিন্তু মানুষের মন যতই যুক্তিপ্রবণ হইবে, যতই অন্তর্মুখী হইবে, ততই এই মতের সত্যতা ও সারবত্তা বুঝিয়া বিবেকবৈরাগ্য সহায়ে ত্যাগতপস্যাদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ইহলোক ও পরলোকের সর্ববিধ ভোগ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ ইহজীবনেই জীবন্মুক্ত হইয়া বিরাজ করিবে, ইহাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। এই অবস্থা লাভের কথাই উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে কীর্তিত হইয়াছে।

এই উচ্চতম ভাবের কথা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখিয়া দেখা যাক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে মানুষ স্বর্গের ভাব লইয়া কিরূপ আগাইয়া চলিয়াছে।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রচলিত ধারণা—পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষগণ স্বর্গে গিয়াছেন, আমরা যদি তাঁহাদের মতো জীবন যাপন করিতে পারি আমরাও স্বর্গে যাইব। চীন, জাপান, ভারতেও এই ধারণা প্রচলিত।

অলিম্পাসের স্বর্গে যাইবার জন্য গ্রীক বীরগণ হাসিমুখে যুদ্ধে প্রাণ দিত। ইহুদীগণ এই পৃথিবীতেই 'স্বর্গরাজ্য' প্রতিষ্ঠার আশা করিয়াছিল; তাই খৃষ্ট যখন বলিয়াছিলেন, 'স্বর্গরাজ্য অতি সন্নিকট; প্রস্তুত হও; অনুতাপ কর; পুনরায় জন্ম গ্রহণ না করিলে তোমরা কেহই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না' তখন ইহুদীরা তাঁহাকে বোঝে নাই।

রোমের শাসনে নিপীড়িত ইহুদীরা ভাবিয়াছিল এবার তাহারা স্বাধীন হইবে, তাহাদের রাজা আবির্ভূত হইয়াছেন! কিন্তু খৃষ্ট যখন বলিলেন 'সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দাও; ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও' তখনও তাহারা বুঝে নাই—খৃষ্ট যে স্বর্গরাজ্যের কথা বলিতেছেন, তাহা বাহিরে নয়, ভিতরে। এই ভুল বোঝার মাশুল তাহারা আজও

দিতেছে। কিন্তু যাহারা খৃষ্টকে মানে বলিয়া মনে করে, যে ইওরোপীয় জাতিগুলি খৃষ্টের নামে 'পবিত্র সাম্রাজ্য' স্থাপন করিয়াছিল, তাহারাই কি তাঁহার এই কথার মর্ম বুঝিয়াছে। তবে আর ইওরোপে সহস্র বৎসর ধরিয়া কখন যুদ্ধ, কখন যুদ্ধের মহড়া চলিতেছে কেন?

বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পতাকাবাহী আধুনিক মানবও পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে; তবে তাহাতে অশরীরী জিহোবা বা সশরীরী কোন ঈশ্বরের স্থান নাই। মানবের ভ্রাতৃভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা জীবজন্তুর ক্রমবিকাশ মানুষের বাহ্য সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ-রাষ্ট্রও প্রাচীন স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিচ্ছায়া। 'ইউটোপিয়া' ব্যর্থ কল্পনায় পর্যবসিত।

প্রাচীন জাতিগুলি ইতিহাসের বহু উত্থান-পতন দেখিয়াছে, ধর্মের গ্লানি ও ধর্মস্থাপন ভারত বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বুঝিয়াছে, পৌনঃপুনিকতাই জড়-জগতের ধর্ম; বুঝিয়াছে প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি এ জগতে নাই, স্বর্গেও নাই, যদি থাকে তো আছে মানুষের মনে।

'স্বর্গরাজ্য বাহিরে নয়, ভিতরে!' স্বর্গ শব্দের অর্থ যদি হয় সুখ, শান্তি, কল্যাণ, তবে সর্বপ্রথম এইগুলির প্রতিবন্ধক কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতির মনের কুভাব-গুলিকে দূর করিতে হইবে! স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাহিরের সংগ্রাম অপেক্ষা প্রয়োজন ভিতরের সংগ্রাম ও সাধনা। স্বর্গরাজ্য একটি মানসিক রাজ্য, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে লব্ধ জ্ঞানময় শান্তিময় কল্যাণময় জ্যোতির্ময় একটি জীবন, যাহার আলোকে শত শত জীবন আলোকিত হয়, যাহার স্পর্শে শত শত জীবন শান্তিলাভ করে।

গীতা এই অবস্থাকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার কুণ্ঠাবিহীন এই বৈকুণ্ঠ স্বর্গেরও উর্ধ্বে। স্বর্গ হইতেও পুনরাবৃত্তি হয়, বৈকুণ্ঠ হইতে হয় না—কারণ সেখানে বাসনা কামনা নাই। এই বৈকুণ্ঠ ভক্তের শুদ্ধ হৃদয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণও কি বলেন নাই, 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা'? এখানে তাঁহাকে পাওয়া যায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা ঈশ্বররূপে নয়, শাস্তি-পুরস্কার-বিধাতা কর্মফলদাতারূপে নয়, নিকটতমরূপে, প্রিয়তমরূপে, অন্তরতমরূপে, পিতামাতা-বন্ধুরূপে, অতি আপনভাবে, সকল ঐশ্বর্য-বিবর্জিত পরম-মাধুর্য-বিমণ্ডিতভাবে। ঈশ্বরকে অন্তর্যামীরূপে অনুভব করিয়াই আমরা বুঝি খৃষ্টবাণীর প্রকৃত মর্ম:

'স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরে।'

চলার পথে

'যাত্রী'

ভারতের দিকে দিকে মন্দির। আর তাতে কত না বিগ্রহ, কত না রূপ! যখনি তা চোখে পড়েছে, তখনি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি—এই রূপ-সৌন্দর্যের উৎস কোথায়? কেন ভারতের শিল্পীরা তাঁদের প্রাণ-ঢালা আবেগ দিয়ে এঁদের রূপায়িত করেছেন? এ সব কি নিছক মূর্তিপূজা, না এর পেছনে কোন মহৎ অনুভূতিকে রূপায়িত করবার প্রয়াস আছে? এই কথা নিয়ে কত মনীষী কত বিচার করেছেন—সেই বাঙ্ময়ী পূজার বেদীমূলে আর এক পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করি।

মানবের মধ্যে প্রাচীন আর্যেরাই বোধ হয় অসীম আকাশে প্রতীয়মান গোলার্ধকে মন্দিরের আকাশের মধ্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। তাঁদের প্রাচীন আবাসভূমি পর্বত-গহ্বরকে মন্দিরে রূপান্তরিত করা এবং তন্মধ্যস্থ স্থিতধী ঋষিকে বিগ্রহরূপে আহ্বান করার কথাও অনেকে বলেন। কপিল, অগস্ত্য, পুলস্ত্য, বেদব্যাস প্রভৃতি ঋষির বিগ্রহরূপ ঐ কথারই সমর্থন করে। চণ্ডীতে পড়ি, 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্' অর্থাৎ দেবী-নিত্যস্বরূপা, জগৎই তাঁর মূর্তি, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত ক'রে রয়েছেন, সে-কথা ধরলে মহান্ আকাশের তলে ঐ পরব্রহ্মকে আকর্ষণ করলে মন্দির ও বিগ্রহের মূলসূত্রের ব্যাখ্যা বুঝতে পারি। অবশ্য ভারতের বিগ্রহ কেবল ইঁট-কাঠ-প্রস্তরে তৈরী জড়-বিগ্রহ বা পুতুল-পূজা নয়, এ-কথা দেবীসূক্তেই স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে, 'মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে' অর্থাৎ যা থেকে জীব জগৎ প্রভৃতি নির্গত হচ্ছে সে-সকলের কারণস্বরূপ আমিই তা পরব্রহ্মে নিত্য বিদ্যমানা। এর মর্ম বুঝলে মূর্তির পেছনে যে অমূর্ত ঐশী শক্তি রয়েছে তা বিশ্বাস না ক'রে উপায় নেই।

কারও মতে মন্দির বলতে দেহ-মন্দির এবং মূর্তি বলতে দেহস্থ আত্মাকে বোঝায়। আমাদের এই পাঞ্চভৌতিক দেহই, তার পরমবিকাশের কারণস্বরূপ আত্মাকে নিয়েই, এ জগতে আবির্ভূত হয়েছে—এ কথা ভাবলে আমরা জন্মাবধিই মূর্তি-পূজারী হবো এবং দেহরূপ মন্দিরকে শিল্পায়নের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে স্বীকার ক'রব, এতে আর বিস্মিত হবার কিছু নেই। অবশ্য আত্মার রূপকল্পনা—বিশেষতঃ যার সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—সত্যই অসম্ভব। তবু এ-যুগের মহাবাক্য—শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্মরণ করলে এর একটা হদিশ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান তিনে এক, একে তিন'; আবার বলেছেন: গাছ পাথর নিয়ে ভগবানের বিশেষ লীলার প্রকাশ নয়, মানুষেই তাঁর বিশেষ লীলার স্থান। সেই মানুষের মনের অভিব্যক্তিতে—শিল্প ও কলাতে—ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ থাকাই তো স্বাভাবিক। সেই কারণেই ভারতে দেহরূপ মন্দিরের বিকাশ করতে গিয়ে মস্তিষ্করূপ গর্ভগৃহের মধ্যে আত্মারূপ দেবতার প্রকাশ চিন্তা করা হয়েছে এবং দেহ-কাণ্ডরূপ 'জগমোহন' সৃষ্টি করা হয়েছে। 'জগমোহনে'র দু-দিকের চত্বরই দেহরূপ মন্দিরের হাত ও পা এবং এই উভয় পাদমূলের মধ্যকার পথই সিংহদ্বার। তান্ত্রিক মতের কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের প্রথম অবস্থা বা দ্বার যে মূলাধার তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে ক্রমশঃ হৃদয়পদ্মে বা মন্দিরের 'জগমোহনে'র মধ্যস্থ আলোচনা-বেদীতে প্রবেশ করা যায় এবং শেষে ঐ শ্রেষ্ঠ অংশে অর্থাৎ সহস্রারে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করলে তবেই আত্মরূপ বিগ্রহের দর্শন সম্ভব।

আত্মার বা ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা আমাদের সাধনার প্রথম সোপান—সেই কারণেই বলা হয়: সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে: রক্তমাংসে গড়া নারীমূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার স্তুতি করাই পৌত্তলিকতার—পুতুলপূজার চরম অভিব্যক্তি, কারণ এই পূজায় বাহ্য কায়াকেই কায়ামাত্র-বোধে আরাধনা করা হয়। বেড়ালের বেড়ালত্ব ভুলে পূজা করলে বা পুতুলের জড়ত্ব ভুলে তাতে চেতন খুঁজলে তখন আর তা পুতুলপূজা থাকে না, বরং তখন তা এক প্রতীকের সাহায্যে অতনু অপ্রাকৃত সেই ঐশী শক্তির পূজাতেই পর্যবসিত হয়। অরুন্ধতী নামক ক্ষুদ্র তারকাকে দেখাতে হ'লে যেমন তার নিকটস্থ অন্য বড় তারকাকে নির্দেশ করতে হয় বা বালককে চাঁদ দেখাবার জন্য সামনের গাছের ডালের দিকে প্রথমে নজর করতে ব'লে চাঁদ দেখাতে হয় (শাখাচন্দ্রবৎ বা অরুন্ধতীন্যায়) তেমনি মূর্তিপূজার নির্দেশে সেই অমূর্তকে দেখাবার প্রয়াসেই ভারতবর্ষে মূর্তিপূজার এত ছড়াছড়ি।

স্বামীজী বলেছেন: সাধনার প্রথমাবস্থায় সকলেই মূর্তি বা প্রতীক পূজারী। তাইতো মুসলমানও কাবাকে (পাথর) পশ্চিমে স্মরণ ক'রে নামাজ পড়ে। খৃষ্টান ঘুঘুরূপে ঈশ্বরের আবির্ভাব কল্পনা করে। আর হিন্দু মনুষ্যাকৃতি দেবদেবীরূপে বা নর-নারীরূপে ঈশ্বরের পূজার অর্ঘ্য সাজায়। একটি গ্লোব দেখিয়ে যদি ছাত্রদের বিশ্বের বা পৃথিবীর রূপকল্পনায় সাহায্য করা যায়, কিংবা একটি ম্যাপ দেখিয়ে যদি দেশ বা মহাদেশের ধারণা দেওয়া যায়, তবে মূর্তির প্রতীক দেখিয়ে অমূর্ত বিরাটকে বোঝানো এমন আর কি অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার?

তা-ছাড়া জগৎটাতো সমস্তই প্রতীকের খেলা—নামরূপের খেলা, ভাষার যে নিহিতার্থ, লেখার মাধ্যমে যে প্রতীকের ছায়াছবি, সবই তো কোন-না-কোন ভাবে মূর্তিসাধনা—নামরূপের অভিনব বিকাশ-কল্পনা। এই নামরূপের খেলা ছাড়লে আমাদের তো নির্বাক্ জড়রূপে থাকা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাই আধ্যাত্মিক ভাববিকাশের সাহায্যে মূর্তিকে টেনে আনায় দোষ কি? বরং বহুভাষাভাষী ভারতে মূর্তি একটি সাধারণ ভাষা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ তাই তীর্থে তীর্থে মন্দির ও মূর্তি দর্শনে একই উদারভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। এই একই ভাষার সাহায্যে সকল ভাষাভাষীকে কথা যোগায়। আমাদের ভারতবর্ষে তাই মূর্তি বা মন্দির একটি সাধারণ ভাষা (common language)। এর লিপিশিল্প (script) এক, ভাব এক, অর্থও এক। অসমীয়া, বাঙালী, উৎকলবাসী, পাঞ্জাবী, অন্ধ্রপ্রদেশবাসী বা মগের মুলুককে এই একই ভাষার সাহায্যে কোন ভাব বুঝিয়ে দেওয়া যায়। মন্দিরাত্মা ভারতের এ এক অদ্ভুত একতাবোধের সচেতন রূপ। এইরূপকে ধরেই শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ অরূপে পৌঁছেছেন।

তাই বলি পথিক, নিজেকে পুতুলপূজারী ব'লে মনে ক'রো না। দেহবাসী যে আত্মাকে নিয়ে তুমি দেহ-পূজক বা মূর্তিপূজক হয়ে জন্মেছ, তারই তো চরম অভিব্যক্তি তোমার ভারতের মন্দিরে মন্দিরে। সেই পূজার পটভূমিকার দর্শনকে আয়ত্ত ক'রে তুমি শ্রেষ্ঠ পূজারী সাজো। তাই বলি, চল মন্দিরে, চল মূর্তিপূজায়—সেই নাম-রূপকে ধরে চল নাম-রূপের পারে। চল, চল আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

আবেদন

[হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে সেবাকার্যে সাহায্যের জন্য]

পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে আগামী ৪ঠা মার্চ, ৪ঠা এপ্রিল ও ১৩ই এপ্রিল প্রসিদ্ধ পূর্ণকুম্ভ স্নান উপলক্ষে আনুমানিক ২০।২৫ লক্ষ স্নানার্থী, সাধু ও তীর্থযাত্রীর সমাগম হইবে। ইঁহাদের সেবার জন্য কনখল (হরিদ্বার) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম একটি সাহায্যকেন্দ্র খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। সাহায্যকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে :

(১) সেবাশ্রমের ইন্‌ডোর হাসপাতালে অতিরিক্ত ৭৫ বেড্।

(২) যে সকল রোগী সেবাশ্রমে বা অন্যান্য সাহায্যকেন্দ্রে যাইতে অসমর্থ, তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ সেবাদল।

(৩) প্রায় পাঁচশত সাধু, ব্রহ্মচারী ও তীর্থযাত্রীর আহার ও বাসস্থানের জন্য সেবাশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি আশ্রয়-বিভাগ।

সেবাকার্য-পরিচালনার জন্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসক, পুরুষ-শুশ্রূষাকারী, কম্পাউণ্ডার, স্বেচ্ছাসেবক এবং বস্ত্র ও ঔষধপত্রাদি আবশ্যক। এই সকল কার্যের ব্যয়নির্বাহার্থ ৩৫,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। মেলা উপলক্ষে যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক-রূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ বয়স ও যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া ৩১শে জানুআরি, ১৯৬২এর পূর্বে সেবাশ্রমের সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

এই মহৎ কার্যের জন্য আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট আর্থিক ও অন্যান্য সর্বপ্রকার সাহায্যের আবেদন করিতেছি। যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে এবং উহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

(১) সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম,
পোঃ কনখল, জেলা সাহারানপুর, (ইউ. পি.)

(২) প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

(৩) কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম
৫, ডিহি ইণ্টালি রোড, কলিকাতা ১৪।

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন

ডক্টর রমা চৌধুরী

[নিবেদিতা-বক্তৃতা : পূর্বানুবৃত্তি]

জীবনলক্ষ্য

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নিবেদিতার মতে 'Spirituality' অথবা আধ্যাত্মিকতা মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ও শ্রেষ্ঠ দানের বস্তু, এবং এইটিই হ'ল আমাদের জীবনলক্ষ্য।

বস্তুত: জীবনপথে জীবনলক্ষ্য অতি প্রয়োজনীয়। লক্ষ্যহীন যাত্রা যাত্রাই নয়। বিশেষ ক'রে পূর্বোক্ত 'Aggressive Policy' গ্রহণ করবার পরে জীবনলক্ষ্যই হয়েছে জীবনের সব। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে, এরূপ 'আক্রমণশীল নীতি'র মূল কথাই হ'ল সক্রিয়তা, নিরলসতা, গতি। কিন্তু গতির স্থিতি লক্ষ্যে। এই কারণে গতিবাদী মতবাদে লক্ষ্যের স্থান অতি উচ্চে। নিবেদিতা বলছেন :

We sight now nothing but the Goal. Means have become ends ; ends, means.

—আমরা এখন লক্ষ্য ব্যতীত আর কিছুই দেখি না। উপায় হয়েছে উদ্দেশ্য ; উদ্দেশ্য উপায়।

নিবেদিতা বলছেন, এই 'Aggressive attitude of mind'—মনের এরূপ আক্রমণশীল সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমগ্র জীবন ও জীবনতত্ত্ব যেন পরিবর্তিত ক'রে দিয়েছে। সাধারণ জীবনে প্রথমত: লক্ষ্যের বিষয় কেই বা ভাবেন? তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শীঘ্র-সমাপ্য বিষয় ও কার্যই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের সব, দূরদর্শিতার কোন চিহ্নই থাকে না এক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত: লক্ষ্যের বিষয় যদি বা চিন্তা করা যায় ক্ষণকাল, সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার সাহসের অভাব আমাদের পঙ্গু ক'রে রাখে। তৃতীয়ত: কর্মবাদের কদর্থ ক'রে বলা হয় যে, পূর্বজন্মের কর্মেই তো এ জন্মের কর্মপন্থা স্থির হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংগ্রাম, প্রচেষ্টা, অগ্রসর হওয়া প্রভৃতি কথাগুলি নিরর্থক বলেই মনে হয়।

সেইজন্য প্রারম্ভেই নিবেদিতা এরূপ নিষ্ক্রিয়তাবাদের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন : তিনটি মূল তত্ত্বই না হয় এস্থলে উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক ; সেই তিনটি হ'ল—কর্ম, শক্তি, ইচ্ছা।

ভারতীয় কর্মবাদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য জগতে বহু অভিযোগ উপস্থাপিত করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হ'ল এই যে, কর্মবাদ—নিষ্ক্রিয়তা, উৎসাহহীনতা ও অলসতার জনক। কারণ কর্মবাদ-অনুসারে পূর্ব পূর্ব জন্মের অভুক্ত কর্মফল ভোগ করবার জন্যই আমাদের বর্তমান জন্ম। এই কারণে আমাদের বর্তমান জীবন যেন আগে থেকেই আমাদের পূর্ব জীবন দ্বারা স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে—নূতন ক'রে তার জন্য আমাদের করণীয় কিছুই নেই, থাকতেও পারে না, যেহেতু কর্মের অমোঘ বিধান অন্যথা করতে কেউই পারে না।

প্রকৃতপক্ষে এটি হ'ল কর্মবাদের কদর্থ মাত্র। কর্মবাদ যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন প্রচেষ্টা ব্যাহত করে, তা মোটেই নয়। উপরন্তু কর্মবাদের মূল কথাই হ'ল, স্বীয় কর্মের দ্বারা—অপরের সাহায্যের দ্বারা নয়, ঈশ্বরের প্রসাদ দ্বারা নয়, কিন্তু কেবল স্বীয় কর্মের দ্বারাই

লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়া। পূর্ব কর্ম আমাদের প্রভাবান্বিত করে, আমাদের জন্য বিশেষ বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি করে; আমাদের ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত, দেশগত—বিশেষ বিশেষ অনুকূল সুযোগ-সুবিধা, অথবা প্রতিকূল সুযোগাভাব, অসুবিধা প্রভৃতির সম্মুখীন করে নিশ্চয়ই। কিন্তু যাঁরা ভারতীয় কর্মবাদ স্বীকার করেন না, তাঁদেরও এগুলি অস্বীকার করবার উপায় নেই। কারণ, সাধারণ দিক্ থেকে দেখতে গেলেও প্রত্যেক কর্মই কয়েকটি বাইরের অবস্থা ও পরিবেশ এবং ভেতরের গুণ, শক্তি, উদ্দেশ্য, আকৃতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। অথচ সমগ্র কার্যটিকে বলা হয়, Voluntary Action—পরপ্রণোদিত কার্য নয়, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত স্বাধীন কার্য। তার কারণ হ'ল এই যে, বাহ্য ও আন্তর, এই সকল অবস্থা সত্ত্বেও পরিশেষে কার্যটি Free Action—অথবা স্বাধীন কার্য, যেহেতু কর্মকর্তার স্বাধীন ইচ্ছাই পরিশেষে এর প্রকৃত কারণ, এবং সকল পরিবেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও পরিবেশের ঊর্ধ্বে ওঠবার শক্তি তার আছে। একেই ইওরোপীয় দর্শনে বলা হয়, 'Self-determination'। ভারতীয় কর্মবাদও এরূপ 'Self-determination'-এর একটি দৃষ্টান্ত। বস্তুত: সাধারণ নিয়ম হ'ল এই যে, পূর্ব অবস্থা পরের অবস্থাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে। পূর্ব কর্ম বা এ-জন্ম একইভাবে পরবর্তী কর্মকে প্রভাবান্বিত করে, কিন্তু তার অধিক কিছুই নয়। ভারতীয় কর্মবাদের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি উপলব্ধি ক'রে নিবেদিতাও অতি সুন্দরভাবে বলছেন:

Words have changed their meanings. Karma is no longer a **destiny**, but an **opportunity**. (P. 26).

অর্থাৎ 'Aggressive Attitude' বা উপরে বর্ণিত সতেজ সক্রিয়ভাব অবলম্বন করবার পরে আমাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিই পরিবর্তিত হয়ে যায়। সত্যই, ভারতীয় কর্মবাদকে নানা লোকে নানাদিক্ থেকে, নানাভাবে দেখে। যাঁরা স্বভাবতই নিস্তেজ নিষ্ক্রিয় অলস-প্রকৃতির, তাঁরা কর্মকে দেখেন 'Destiny' রূপে—অদৃষ্টবাদী ভাগ্যনির্ভরশীল তাঁরা, তাঁরা মনে করেন যে, তাঁদের পূর্ব কর্মই তাঁদের বর্তমান জীবন সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত ক'রে রেখেছে, তাঁদের আর নূতন ক'রে অগ্রসর হয়ে সাহস ভরে করবার কিছুই নেই। তেজস্বিনী আত্ম-নির্ভরশীলা আত্মবিশ্বাসপরায়ণা নিবেদিতা এরূপ নিষ্ক্রিয় নিস্তেজ জীবনধারণ-প্রণালীর বিরুদ্ধে সতেজে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ক'রে বলছেন যে, প্রত্যেক কর্মই প্রত্যেক কর্তার সম্মুখে একটি নূতন সুযোগ-সুবিধার প্রতীকরূপেই উপস্থিত হয়, তাকে অবহেলা করা নির্বোধতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এইভাবে প্রত্যেক বারেই নবোৎসাহে নির্ভয়ে কর্ম করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: কর্ম করতে হবে শক্তির সঙ্গে। 'শক্তি'র একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়ে তিনি বলছেন:

Strength is the power, to take our own life at its most perfect, and break it if need be, across the knee.

—সেই হ'ল শক্তি, যা আমাদের অতি সুন্দর সুষ্ঠু পূর্ণ জীবনকেও অনায়াসে বিসর্জন দিতে বল দেয়।

সাধারণ জীবনের দিক্ থেকে জীবন ত্যাগ করা অতি কঠিন। এই যে জীবনধারণের ইচ্ছা, যাকে বলা হয় Instinct of self-preservation' (আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি), তা জীবের একটি অতি সাধারণ

মূলীভূত প্রবৃত্তি। সেই জীবনকেই অনায়াসে বিসর্জন দেওয়া সাধারণ সাংসারিক জীবের পক্ষে অতি কঠিন। সেই জন্যই নিবেদিতা উপরের অতি যোগ্য উদাহরণ দ্বারা শক্তির স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

তৃতীয়তঃ ইচ্ছার কথা। সাধারণতঃ দর্শন ও ধর্ম উভয় দিক্ থেকে, বিশেষ ক'রে ভারতীয় দর্শনের দিক্ থেকে, বাসনা-কামনাকে সাধক-জীবনের প্রথম পরিত্যাজ্য বস্তুরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু নিবেদিতা বলছেন যে, এরূপ জৈব সঙ্কীর্ণ বাসনা-কামনা ও উচ্চ-আধ্যাত্মিক ইচ্ছা বা আকুতির মধ্যে প্রভেদ মূলগত। তিনি বলছেন :

Our desires have grown innumerable. But they are desires to give, not to receive. We would fair win that we may abandon to those behind us and pass on.

—এই সক্রিয়ভাব অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা বা আকুতিও বেড়ে যাচ্ছে। এই সব অসংখ্য আকুতি হ'ল—অর্জনের আকুতি নয়, ত্যাগের আকুতি; গ্রহণের আকুতি নয়, দানের আকুতি।

এরূপে নিবেদিতার মতে জীবনের লক্ষ্য হ'ল এরূপ আত্মবিকাশ, যাকে তিনি পূর্বে 'Aggressive Attitude' বলেছেন। যখন এরূপ বিকাশ লাভ হয়, তখন কি অবস্থা হয় আত্মার? তখন যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থার সাধারণ ভারতীয় দার্শনিক নাম হ'ল 'মোক্ষ' বা 'মুক্তি'। ভারতীয় দর্শনের মতে এইটিই হ'ল জীবনের পরম লক্ষ্য, চরম লাভ, সকল সাধনার সিদ্ধি, সকল তপস্যার পূর্ণতা, সকল আকুতির পরিসমাপ্তি। সমগ্র ভারতীয় দর্শন এই মুক্তির অতুল মহিমায় মহিমান্বিত। সেই শ্রেষ্ঠ ধন মুক্তি কি? কি থেকে মুক্তি বা পরিত্রাণ? মুক্তি জীবত্ব থেকে, 'অহং-মমত্ব' থেকে, জড়ত্ব থেকে মুক্তি। এই সম্বন্ধে কত আলোচনায় ভারতীয় দর্শন পরিপূর্ণ। সে-সবের বিস্তৃত বিবরণীর স্থান এ নয়। তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত। সেটি হ'ল এই যে, মুক্তি সকল পাপতাপের অতীত অবস্থা। তারও উপরে এতে আনন্দের অস্তিত্ব আছে কিনা—সে অবশ্য অন্য প্রশ্ন এবং জীবন্মুক্তি সম্ভবপর কিনা, অথবা কেবল বিদেহ-মুক্তি সম্ভব—সেও একটি স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়। এইভাবে মুক্তপুরুষের স্বরূপ-সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন মতবাদ ভারতীয় দর্শনে পাওয়া যায়।

তাঁর 'The Ideal' শীর্ষক নিবন্ধে নিবেদিতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঋজুতা-সহকারে এই সকল দার্শনিক তত্ত্বালোচনা অথবা বাদানুবাদের মধ্যে একেবারেই প্রবেশ করেননি। তিনি কেবল নয়টি প্রধান দিক্ থেকে মুক্ত পুরুষের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন অতি সুললিত ভাবে, তাঁর প্রাণপ্রিয় তত্ত্বানুসারে। আমরা জানি যে, তাঁর প্রাণপ্রিয় তত্ত্ব হ'ল পূর্বোক্ত 'Aggressive Attitude' বা সক্রিয় ও সতেজ ভাবে আত্মবিকাশের তত্ত্ব। সেই তত্ত্বানুসারে তিনি বলছেন যে, এরূপ আত্মবিকাশ লাভ হ'লে আমাদের সমগ্র জীবনই পরিবর্তিত হয়ে যায়, স্বভাবতই—উদ্দেশ্য ও সাধনের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হয়ে যায়, উদ্দেশ্যই হয় জীবন, জীবনই উদ্দেশ্য। অপূর্ব মহিমময়, মধুরিমময়, মঙ্গলময় এই জীবন। এরূপ জীবনই জীবনের পথপ্রদর্শক। সেজন্য এরূপ মুক্তপুরুষ আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন কত দিক্ থেকে, কত ভাবে, কত সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে মাধুর্যে। তাঁদেরই আদর্শে মুমুক্ষু আমরাও নূতন রূপে, নূতন রঙে, নূতন রসে, নূতন গন্ধে জীবন গড়ে তুলছি কি অতুলনীয় গরিমায়। এইভাবে প্রধান নয়টি দিক্ থেকে নিবেদিতা

মোক্ষ বা পরম লক্ষ্য বিষয়ে আলোচনা করছেন।

প্রথমতঃ কর্মের দিক্। এ বিষয়ে পূর্বেই কিছু বলা হয়েছে। যিনি মুক্ত ও যিনি মুমুক্ষু উভয়েই সমভাবে হবেন নিষ্কাম কর্মী, অথচ তেজই হবে তাঁদের জীবনকেন্দ্র। মুক্তের দৃষ্টান্তানুসারে মুমুক্ষুও অদৃষ্টবাদী হবেন না। অদৃষ্টজয়ী হবেন, কর্মের দ্বারা কর্মকে বর্ধিত না ক'রে কর্মের দ্বারাই কর্মকে ক্ষয় করবেন, অদৃষ্ট যে কোন অদৃশ্য শক্তির সৃষ্টি নয়, সম্পূর্ণরূপে নিজেরই সৃষ্টি, এই কথা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি ক'রে নূতন উৎসাহে নূতন জীবন গঠন করবেন। এই তো হ'ল কর্মের প্রকৃত মর্ম, এই তো হ'ল শাশ্বত ধর্ম।

দ্বিতীয়তঃ শক্তির দিক্। এ সম্বন্ধেও কিছু পূর্বে বলা হয়েছে। যিনি মুক্ত, তিনি আত্মজয়ী, সেজন্য বিশ্বজয়ী। 'আত্মজয়ে'র অর্থ কি? আত্মজয়ের অর্থ—জীবত্ব জয়, ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি। সেই দিক্ থেকে সত্যই 'জয়ের' কোন প্রশ্ন এস্থলে নেই, কারণ আত্মা চিরস্থায়ী, নিত্য পূর্ণ, অনন্তস্বরূপ। আত্মা চিরকালই আত্মা, অবিনশ্বর আত্মা, অজেয় আত্মা, অনমনীয় আত্মা—তাকে জয় করবে কে? তা হ'লে নীতি ও দর্শনশাস্ত্রের এই একটি সাধারণ শব্দ 'আত্মজয়ে'র অর্থ কি? অর্থ হ'ল: 'স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতম্'- স্বীয় মহিমায় স্থিতি, আত্মস্থিতি —কেবল আত্মাতেই স্থিতি—বিশ্বে নয়, দেহে নয়, বুদ্ধিতে নয়—কেবল ব্রহ্মে, কেবল আত্মায়, কেবল জ্ঞানে। এই তো হ'ল 'ব্রাহ্মী স্থিতি'; এবং শক্তির অর্থ হ'ল: এই ভাবেই স্বীয় শক্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে চিরস্থিতি।

তৃতীয়তঃ ইচ্ছার দিক্। এ-সম্বন্ধেও পূর্বে কিছু বলা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের মূলীভূত তত্ত্ব হ'ল ইচ্ছাবিহীন স্থিতি, ইচ্ছাবিহীন কর্ম। মনস্তত্ত্বের দিক্ থেকে ইচ্ছা হ'ল স্থিতি ও কর্ম: Static এবং Dynamic, উভয় দিক্ থেকেই সমান মূলীভূত—প্রথমটি 'Will to live' (বাঁচবার ইচ্ছা), দ্বিতীয়টি 'Will to attain' (পাবার ইচ্ছা)-এর প্রকাশিত রূপ মাত্র। এরূপ Will (ইচ্ছা) দমন করাই হ'ল আত্মসংযম। সেজন্য ভারতীয় দর্শন ও নীতি-শাস্ত্র অনুসারে এরূপ ইচ্ছাসমূহকে সংযত করাই কাম্য। এমন কি, মোক্ষের ক্ষেত্রেও কোনরূপ ইচ্ছার লেশমাত্র থাকলে চলবে না। 'মুমুক্ষু' কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল অবশ্য 'মোক্ষের জন্য ইচ্ছাশীল'। কিন্তু এ ইচ্ছা সাধারণ অর্থে 'ইচ্ছা' নয়, যেহেতু সাধারণ ইচ্ছা ফলভোগের ইচ্ছা, এবং নিষ্কাম-কর্মই মোক্ষের সাধন ব'লে স্বভাবতই এরূপ ফলভোগসমন্বিত ইচ্ছার অস্তিত্বই এস্থলে থাকতে পারে না। সেজন্য এমন কি, মুমুক্ষুও মোক্ষকে ফলরূপে অভিলাষ করেন না, যেহেতু সেক্ষেত্রে তাঁর মোক্ষ প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়াবে একটি সকাম-কর্ম মাত্র। তা হ'লে তিনি 'মুমুক্ষু' অথবা মোক্ষপ্রয়াসী কেন? তিনি 'মুমুক্ষু' এই অর্থে যে, তাঁর সমগ্র জীবন-প্রবৃত্তি মোক্ষের দিকে; তাঁর সমগ্রস্বরূপ তারই মূর্ত প্রতিচ্ছবি। এরূপে সাধারণতঃ 'বুভুক্ষু' এবং 'মুমুক্ষু'র মধ্যে প্রভেদ করা হয় এই ব'লে যে, 'বুভুক্ষু' সাংসারিক বস্তুসমূহের বিষয়ই কেবল লাভ করতে ইচ্ছুক; 'মুমুক্ষু' মোক্ষলাভ করতে ইচ্ছুক। উভয়েই ইচ্ছুক নিঃসন্দেহ, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে, যা পূর্বেই বলা হয়েছে। এরূপে 'বুভুক্ষু'র ক্ষেত্রে থাকে কোন অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ করবার কামনা; কিন্তু 'মুমুক্ষু'র ক্ষেত্রে জীবন নূতনরূপে প্রাপ্য অথবা সৃজ্য জীবন নয়। অনাদি-অনন্তকালব্যাপী শাশ্বত জীবন, যাকে লাভ করতে হয় না নূতন ক'রে, বিকশিত অথবা প্রকাশিতই

করতে হয় কেবল, এ অনুভূতি বা অবস্থা লাভ ব্যতীত জীবন তো জীবনই নয়। সুতরাং যে বস্তু আমাদের নেই, তা লাভ করবার ইচ্ছায় যে কর্ম, তা সকাম-কর্ম। কিন্তু যা আমাদের চিরকাল আছে, তা প্রকাশিত করবার ইচ্ছায় যে কর্ম, তা 'নিষ্কাম কর্ম'—কারণ তা স্বরূপ-প্রকাশ মাত্র। যেমন সূর্য আলোক বিকিরণ করছে, পুষ্প গন্ধ বিতরণ করছে—এ তো তাদের স্বভাব মাত্র, এতে অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য কামনার কোন প্রশ্নই নেই। একইভাবে মোক্ষ বা মুক্ততাও আমাদের স্বভাব মাত্র, তা কামনা-বাসনার বস্তু নয়, প্রকাশের—প্রকটনের বস্তু মাত্র। এই অর্থে মুমুক্ষু সকাম-কর্মী নন, নিষ্কাম-কর্মী।

নিবেদিতাও ভারতীয় ঋষিদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সেই একই কথা, সেই শাশ্বত কথাই বলেছেন বারংবার। মুক্ত ও মুমুক্ষুর ইচ্ছা আছে নিশ্চয়; কিন্তু তা সম্পূর্ণ-রূপেই অপার্থিব ইচ্ছা। তিনি অলস, নিষ্ক্রিয় কোন ক্রমেই নন, এবং প্রকৃতকল্পে তাঁর কর্ম, তাঁর ইচ্ছা যে-কোন সাধারণ জনের কর্ম ও ইচ্ছার অপেক্ষাও বহুগুণ অধিক, বহুগুণ গভীর, বহুগুণ তীব্র। এই ইচ্ছা বিশ্বাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বসেবার নিরন্তর ইচ্ছা। কি সুন্দরভাবেই না নিবেদিতা বলছেন:

The whole of life becomes the quest of death. (P 27)—সমগ্র জীবনই হয়ে দাঁড়ায় মরণের অনুসন্ধান।

মনে হয় না কি যে, এটি একটি অদ্ভুত স্ববিরুদ্ধ কথা? 'জীবন' পুনরায় 'মরণ' হবে কিরূপে? এবং 'মরণের' অনুসন্ধান বাতুল ব্যতীত আর কে করে?

কিন্তু এই তো প্রকৃত জীবন-রহস্য, এই তো সাধনা, এই তো সিদ্ধি। ইংরেজী দর্শনে একেই প্রকাশ করা হয়েছে 'Die to live'এর মহানীতি-তত্ত্বে। মরণের মাধ্যমে জীবন, জীবনের জন্য মরণ—জড়-দেহের মরণ, অজড় আত্মার জীবন, স্বার্থান্বেষী বুভুক্ষুর মরণ, স্বার্থ-হীন মুমুক্ষুর তথা মুক্তের জীবন, অল্পের মরণ, ভূমার জীবন, জীবের মরণ, ব্রহ্মের জীবন;—এরূপ মরণ, এরূপ জীবনই আমাদের বরণ ক'রে নিতে হবে সকল পাপতরণ-তাপহরণ-রূপে। কি অপূর্ব ত্যাগ-মহিমময় এই জীবন, যার আলোকে আমাদের সমগ্র ভারতীয় দর্শন সমুজ্জ্বল। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্মরণ করুন সুবিখ্যাত ঈশোপনিষদের সেই রোমাঞ্চকর সর্ব প্রথম মন্ত্রটি:

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥১॥

—'ঈশ্বর দ্বারা ঢেকে রাখ ধরা,
যা কিছু গমনশীল।
ত্যাগ-সহকারে ভোগ কর তাঁরে,
কামনা ত্যজি আবিল ॥'

ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং ছিলেন এই মহা-ত্যাগ-মন্ত্রের মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

চতুর্থতঃ ব্রহ্মচর্যের দিক্। সকলেই জানেন যে, এটিও ভারতীয় দর্শনের আরএকটি মূলীভূত তত্ত্ব। 'ব্রহ্মচর্যের' ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল ব্রহ্মে বিচরণ। যিনি পূর্বোক্ত রীতি-অনুসারে নিষ্কাম-কর্মী, শক্তিশালী ও ত্যাগব্রতী, তিনি তো স্বভাবতই হবেন 'ব্রহ্মচারী', ব্রহ্মে বিচরণশীল, জীবে নয়; আত্মায় বিচরণশীল, দেহে নয়; ভূমায় বিচরণশীল, অল্পে নয়। সুতরাং এই যে জীবের কামনাময় জীবন, এই যে দেহের ভোগপঙ্কিল জীবন, এই যে অল্পের স্বার্থ-সঙ্কুল জীবন—মুমুক্ষুরও নয়, মুক্তেরও নয়। এরূপে যিনি ব্রহ্মচারী, তিনি নিজেকেও উপলব্ধি করেন পরিপূর্ণ আত্মারূপে,

অপরকেও ঠিক সেইভাবে উপলব্ধি করেন। নিবেদিতা বলছেন :

Celibacy, here, is only the passive side of a life that sees human being actively as minds and souls. (P. 28)

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য অথবা আত্মসংযমের অর্থ কেবল দৈহিক ভোগেচ্ছাকে দমন করাই নয়—উপরন্তু সমগ্র সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত করা—নিজেকে, অপরকে, সকলকে শুদ্ধ আত্মা-রূপে উপলব্ধি করা এবং সেইভাবে সম্মান করা।

আমাদের নীতিবিদ্‌গণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নিবেদিতাও বলছেন যে, এরূপ ব্রহ্মচর্য যে কেবল মুমুক্ষুর কেবল মুক্তের জীবন-ব্রত, তা নয়, সাধারণ গৃহীরও ব্রত—সমভাবে। সেই জন্যই তিনি বলছেন :

Marriage itself ought to be, in the first place, a friendship of the mind. And, there is a Brahmacharya of the wife, as well as of the nun. (P. 28)

—বিবাহের সর্বপ্রথম কথা হ'ল মনের বন্ধুত্ব। সেজন্য সহধর্মিণী ও সন্ন্যাসিনী উভয়েই সমভাবে ব্রহ্মচারিণী হ'তে পারেন।

এটিও ভারতবর্ষের একটি মহিমময় তত্ত্ব। নিবেদিতা যে 'Exchange of thoughts and communion of struggle'—হৃদয়বিনিময় ও সমপ্রাণতাকে বিবাহের মূল মন্ত্র ব'লে উল্লেখ করেছেন, তা ঋগ্বেদের বিবাহ-মন্ত্রেই আছে :

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু,
মম চিত্তম্ অনুচিত্তং তেঽস্তু।
যদেতদ্ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদেতদ্ হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।

—আমার ব্রতে তোমার হৃদয় দান কর।
আমার চিত্ত তোমার চিত্তের অনুগামী হোক।
তোমার যে হৃদয়, আমার হোক,
আমার যে হৃদয়, তোমার হোক।

পঞ্চমতঃ তপস্যার দিক্। তপস্যা কি? তপস্যা হ'ল : প্রচেষ্টা। কি বিষয়ে প্রচেষ্টা? আত্মধারণ বিষয়ে প্রচেষ্টা। আত্মোপলব্ধি ক'রে, আত্মধারণ ক'রে আত্মস্থিতি—এই তো হ'ল মহাজীবন-লক্ষ্য। বস্তুতঃ উপলব্ধি, ধারণ ও স্থিতি সমার্থক। যে উপলব্ধি ধৃত হয়ে থাকে না, যা ধৃত হয়ে স্থিতি করে না—তার মূল্য কতটুকু? এই কারণে ভারতীয় দর্শন-মতে, প্রকৃত উপলব্ধি শাশ্বত, এবং উপলব্ধি, ধৃতি ও স্থিতি এই কারণেই সমার্থক। যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সেজন্য তাপস, অথবা মহিমায় চির-ভাস্বর; এবং যিনি মুমুক্ষু, তিনি এই মহোপলব্ধি লাভের সঙ্গে তার শাশ্বত ধারণ ও স্থিতির জন্য সচেষ্ট হন। মুমুক্ষুর এরূপ তপস্যার একটি সুন্দর সংজ্ঞা দান ক'রে নিবেদিতা বলছেন :

In the life of Tapasya is constant renewal of energy and light. (P 28)

—তপস্যা-জীবনে সাধকের শক্তি ও জ্ঞানানুভূতি সর্বদা নতুন হয়ে উঠেছে।

আমরা কি উপলব্ধি করি? উপলব্ধি করি আত্মার অন্তরস্থ শক্তি, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, আলোক, আনন্দ, অমৃত; সাধক-স্তরে এই সব বারংবার ধরে নিতে হয়, এই সবের গরিমায় বারংবার নিজেকে ভাস্বর ক'রে নিতে হয়। এই অর্থেই নিবেদিতা এস্থলে 'renewal' অথবা 'নবীনীকরণের' কথা বলেছেন। প্রকৃতকল্পে আত্মার যে স্বরূপ, যে শক্তি ও আলোক, তার 'নবীনীকরণের' কোন প্রয়োজন অথবা সম্ভাবনামাত্র নেই, যেহেতু যা নিত্য, তা পুনরায় নবীনীকৃত হ'তে পারে না। তা সত্ত্বেও সাধকের পক্ষে মোক্ষের পন্থা স্বভাবতই অতি কঠিন পন্থা, যাকে কঠোপনিষদ্ অতি সুন্দর

ভাবে বলেছেন : ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

—শাণিত ক্ষুরের ধারের ন্যায় অতি দুর্গম, অতি দুরতিক্রমণীয় এই সাধনপথ, এই মোক্ষমার্গ। অতএব সেইপথে প্রয়োজন নিরন্তর তপস্যার, নিরন্তর সাধনার, নিরন্তর আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার।

এইভাবে মুমুক্ষু ও মুক্ত, উভয়ের জীবনই ওতপ্রোতভাবে তপস্যাবিমণ্ডিত—অবশ্য কিছু বিভিন্ন অর্থে।

সুবিখ্যাত ছান্দোগ্যোপনিষদে মানুষের—সাধারণ মানুষ, মুমুক্ষু ও মুক্ত পুরুষ—সকলেরই জীবন যে তপস্যাময়, এই তত্ত্বটি অনুপমভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে 'পুরুষ-বিদ্যা' অথবা 'পুরুষ-যজ্ঞ' প্রকরণে (৩-১৭)। এস্থলে পুরুষকে (জীব বা জীবনকে) তুলনা করা হয়েছে একটি যজ্ঞের সঙ্গে :

অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্য বচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ। (৩-১৭-৪)

—তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা এবং সত্য বচন—এই সমুদয় এই পুরুষ-যজ্ঞের দক্ষিণা।

যাঁরা এইভাবে পুরুষ বা জীবনকে তপস্যা-দান-সরলতা-অহিংসা-সত্যবচনরূপ প্রকৃষ্ট পঞ্চ গুণবিশিষ্ট রূপে দর্শন করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই 'আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্ পরো যদিধ্যতে দিবি।' (৩-১৭-৭)। —যে জ্যোতি-পরব্রহ্মে দীপ্তি পাচ্ছে, জগতের বীজ-স্বরূপ, দিবালোকের ন্যায় সর্বব্যাপী, সেই শাশ্বত, প্রাচীন জ্যোতি দর্শন করেন। তাঁরাই আনন্দে বলেন : উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি।

—অন্ধকারের উপরিভাগে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি,—সেই জ্যোতিকে স্বীয় অন্তরস্থ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিরূপে দর্শন ক'রে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে লাভ করেছি।

জ্যোতির্ময়ী নিবেদিতা এই আসল জ্যোতিরই আভাস দিয়েছেন তাঁর সুধন্য জীবনের প্রতিপদে।

স্থানাভাবে অবশিষ্ট কয়েকটি দিকের উল্লেখ আর করা গেল না।

উপসংহার

এইভাবে ভগিনী নিবেদিতা দর্শনের মাধ্যমে, ধর্মের মাধ্যমে, নীতির মাধ্যমে, শিক্ষার মাধ্যমে যে মহাজীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার রূপ তো সেই একটিই। শুনুন তাঁর শেষ বাণী :

Strong as the thunderbolt, austere as Brahmacharya, great-hearted and selfless—such should be that Sannyasin who has taken the service of others as his Sannyasa; and not less than this should be the son of Militant Hinduism. (P. 32).

—জীবনের মহাদর্শ কি? সেই মহাদর্শ হ'ল একটিই—সন্ন্যাসীর মহাদর্শ। সন্ন্যাসী কে? প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনিই, যিনি বজ্রের ন্যায় শক্তিমান্, ব্রহ্মচর্যের ন্যায় তপোযুক্ত, উদার ও নিঃস্বার্থ; যিনি পরসেবাকেই সন্ন্যাসরূপে গ্রহণ করেছেন। সংগ্রামশীল হিন্দুধর্মের প্রত্যেক সন্তানকেই তো এরূপ সন্ন্যাসী হতে হবে।

পুনরায় শুনুন, এই মহালক্ষ্য-লাভের পন্থা :

Renunciation, Renunciation, Renunciation! In the panoply of Renunciation plunge thou into the ocean of the unknown.

ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, ত্যাগ কর! এই ত্যাগের বর্ম পরিধান করেই সেই অজ্ঞাত সমুদ্রে

ঝাঁপ দাও। তোমার দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে, এই মহাযাত্রার জন্য তোমার নিজের তরণী তুমি নিজেই নির্মাণ ক'রে নাও। মনে ক'রো না যে, তোমার পূর্বগামীদের অনুকরণ ও অনুসরণ ক'রে তুমি এই ভবসাগর পার হ'তে পারবে। তাঁরা তোমাকে কেবল এই আশ্বাসই দিতে পারেন যে, তাঁরা যে যাত্রায় সফল হয়েছেন, তুমিও তাতে সফল হবে। কিন্তু তোমার নিজের যাত্রাপথ তোমাকে নিজেকেই স্থির ক'রে নিতে হবে। অতএব তরণী নির্মাণ কর, এবং নির্ভয়ে যাত্রা আরম্ভ কর। যাত্রা আরম্ভ কর—নিজেকে অনুসন্ধান করতে, নিজের আত্মাকে লাভ করতে; এবং যাঁরা এখনও যাত্রা করেননি, তোমার এই যাত্রা তাঁদের যেন উদ্বুদ্ধ করে।

নিবেদিতার এই অপূর্ব তেজোদীপ্ত বাণীর ঝঙ্কারে আমাদের নীরব জীবন-বীণাটিও আজ যেন ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে—এই প্রার্থনা।

যুগান্ত সাধনা মূর্ত আরাধনা
সমুদিতা লোকমাতা।
দেবতানৈবেদ্য রূপ নিরবদ্য
নমি সেই নিবেদিতা॥
পূজ্যা বিদেশিনী জ্ঞানপ্রদায়িনী
নিরন্তর সেবানতা।
নিবেদিতা ধর্মে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে,
নমি সেই নিবেদিতা॥

শেষ অভিযান

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জীবন-পথের প্রান্তে কী পেলি পথিক ?
সহস্র কর্মের ডাক, খ্যাতির বাতিক,
সংসার গড়ার নেশা, পুত্র-পরিবার,
রাশি রাশি পুঁথি নিয়ে রজনী কাবার—
এরা কি মর্মের শূন্য পেরেছে ভরাতে ?
ঘুরে ঘুরে কামনার তপ্ত সাহারাতে
কী লভিলি ওরে মূঢ় ? দাহ, অশ্রুজল।
জর্জর করেছে চিত্ত মৃত্যুর শৃঙ্খল !
যাঁরে পেলে আর সবই তুচ্ছ মনে হয়,
নিত্য যিনি আনন্দের শাশ্বত নিলয়—
তাঁর পানে জীবনের শেষ অভিযান
শুরু হোক এইবার। নিঃশঙ্ক-পরাণ
চলে যাবো উচ্চশিরে মৃত্যুর ছায়ায়—
চরম জয়ের মাল্য দুলিবে গলায়।

মানসলোকে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'

শ্রীপুষ্পকুমার পাল

উদ্বোধন লেনে 'মায়ের বাড়ী'র আশে-পাশের পরিবেশ মনে হয় প্রায় একই রকম আছে। সেই স্বল্পপরিসর গলি, সেই সামনের বিরাট বস্তি এবং আশে-পাশে ও পিছনের দিকে ঘেঁষাঘেঁষি কয়েকটি কোঠা বাড়ী। সেদিন কর্তব্য-ব্যপদেশে মধ্যরাত্রে ঐ অঞ্চল ঘুরিয়া বেড়াইবার পর 'মায়ের বাড়ী'র রোয়াকে কিছুক্ষণের জন্য বসিয়া পড়িলাম। রাত্রি অন্ধকার। স্বল্প-আলোকিত গ্যাসগুলি সামান্য আলোক বিকিরণ করিলেও স্থানটি প্রায় অন্ধকার হইয়া আছে। চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা। কোলাহল-মুখর কলিকাতা যেন কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রামে মগ্ন। বস্তির মধ্যে অনেক দূরে একটি শিশু মাঝে মাঝে এই নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিতেছে।

*　　*　　*

বসিয়া থাকিতে থাকিতে যেন অতীতে ফিরিয়া গেলাম। নিচের ঘরে পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজ ও মায়ের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানেরা বোধ হয় নিদ্রিত। শ্রীশ্রীমা উপরের ঘরে অবস্থান করিতেছেন। গোলাপ-মা, যোগেন-মা প্রভৃতি ভক্ত নারীরা পাশের ঘরে—বোধ হয় নিদ্রিতা। উপর ও নিম্নতল হইতে একটি পুষ্প চন্দন ও ধূপ মিশ্রিত সুগন্ধ যেন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। এই বস্তির মাঝখানে, এই ঘিঞ্জি গলির মধ্যে একটি দেবী-নিকেতন। যেন চতুর্দিকে পঙ্কের মধ্যে একটি পঙ্কজ ফুটিয়া আছে।

রাস্তা হইতে যে দুই-তিনটি সোপান দরজা অবধি উঠিয়াছে, তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও আরও কত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মহান্ সন্তান, নাগ মহাশয়, মাষ্টার মহাশয় প্রমুখ কত অগণিত ভক্ত, ভগিনী নিবেদিতা (?) গৌরী-মা ও অন্যান্য কত ভক্ত নারী ঐ সোপান অবলম্বন করিয়াই 'মায়ের বাড়ী'র ভিতরে গিয়াছেন ও মাকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ পাইয়াছেন। মানসনয়নে ঐ সোপানের উপর আমি তাঁহাদের চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের 'বাসুকি' পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ কি আন্তরিক ভাবেই না মায়ের সেবা করিয়া গিয়াছেন। মায়ের সঙ্কটাপন্ন অসুখের সময় তাঁহার কি সজাগ দৃষ্টি! মায়ের নিকট হইতে মুড়ির বাটি সরাইয়া আনিবার পর তাঁহার কি অস্থিরতা ও মাকে নিজ-হাতে বার্লি খাওয়াইবার সময় তাঁহার কি আনন্দ! সেই ধন্য সন্তানের কথা মনে পড়ায় মনে গভীর আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। মায়ের দীন সেবক ভাবিয়া নিজেকে 'দরোয়ান' বলিয়া পরিচয় দেওয়া—সেই একান্ত শরণাগত ভাব মনে পড়িয়া চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

মাষ্টার মহাশয়ের 'কথামৃত'-সংগ্রহ হইতে পাঠ এবং তাঁহার প্রতি মায়ের আশীর্বাদ, সাধু নাগ মহাশয়ের সেই আকুল ক্রন্দন 'বাপের চেয়ে মা দয়াল', তারপর মায়ের প্রসাদ পাতাশুদ্ধ খাইয়া ফেলিয়া মায়ের দেওয়া কাপড় মাথায় বাঁধিয়া সানন্দে নির্গমন—সমস্ত যেন চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। আবার যেন দেখিতে লাগিলাম, পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মায়ের নিকট স্বরচিত

সারদা-স্তোত্র' পাঠ করিতেছেন। যখন তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে বলিতেছেন :

রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণাং তন্নাম-শ্রবণ-প্রিয়াম্।
তদ্ভাব-রঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

তখন মায়ের শ্রীমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মা যেন উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার দুটি চক্ষু হইতে মুক্তাসম বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

ভগিনী নিবেদিতার কথা মনে হইতেছে। শ্রীশ্রীমায়ের পূজারত মূর্তি দেখিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পটের সম্মুখে বসিয়া মা যেন বাহ্যজ্ঞানবিরহিতা হইয়া পূজায় নিবিষ্টা। চতুর্দিক পরিচ্ছন্ন; পুষ্প, চন্দন, ধূপ ও ধুনায় ঘর আমোদিত; তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের নিশ্চল নির্বিকল্প মূর্তি; ঠাকুরের সহিত তাঁহার আত্মার যেন সংযোগ হইয়াছে। সমস্ত অবয়বে দেবীভাব; শ্রীমুখ উজ্জ্বল। সর্বাঙ্গ হইতে যেন একটি শান্ত স্নিগ্ধ আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে। কখন তন্ময়তা, কখন স্মিত হাস্য—মুখমণ্ডলে অপরূপ ভাবের বিকাশ হইতেছে। ঠাকুরের সহিত মা যেন কত ভাবে আলাপনে রত। সে স্বর্গীয় মূর্তি যাহারা দেখিয়াছে—এবং দেখিয়া সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াছে, তাহারা যথার্থই ভাগ্যবান্।

কত কথাই মনে হইতেছে। মহাপূজার একদিন—শ্রীশ্রীমা বসিয়া আছেন। আশে-পাশে ভক্ত নারীমণ্ডলী। জনৈকা সাধিকা তাঁহার উদাত্তকণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিয়া যাইতেছেন। শ্রীশ্রীমা জগজ্জননীরূপে বিরাজমানা। সেই করুণাঘন আয়ত নেত্র, মুখে সেই মৃদু হাসি, সেই অন্নপূর্ণা—আবার জগদ্ধাত্রী মূর্তি। পাঠ শেষ হইল। মা তখনও বরাভয়-মূর্তিতে অধিষ্ঠিতা। সাধিকা বলিলেন, 'আজ আমার কি সৌভাগ্য, স্বয়ং চণ্ডীকে আজ চণ্ডীপাঠ করিয়া শুনাইতে পারিলাম।' মা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সাধারণ ভক্ত-নারীমণ্ডলীর কথা মনে করিতে লাগিলাম। কত শত নারী কত প্রকারের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী মাকে শুনাইতেছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও কত আতিশয্য ও কত বিরক্তিকর ব্যবহার। গোলাপ-মা, যোগেন-মা তাঁহাদের ব্যবহারে উষ্মা প্রকাশ করিতেছেন। মায়ের কিন্তু বিরক্তি নাই। শ্রীশ্রীমা শান্ত সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। তিনি বলিতেছেন, 'আহা, বলুক না; আমাকে ছাড়া ওরা আর কাকে বলবে!' ভক্ত নারীদের হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে। অনেককে দিয়া মা কাজ করাইতেছেন। কেহ ঘর পরিষ্কার করিতেছেন, কেহ বিছানা পাট করিতেছেন, কেহ বা কাপড়-চোপড় পাট করিয়া রাখিতেছেন। এঁদের মধ্যে এমন অনেকে সচ্ছল ঘরের মেয়ে আছেন, যাঁহারা নিজ-হাতে বাড়ীতেও এ সব কাজ করেন না। যোগেন-মা পরিহাস করিয়া বলিতেছেন, 'এখানে কেন এলে? ধর্মের কথা শুনতে এসে সকলে বাজে কাজ ক'রে ম'রছ!' মা প্রতিবাদ করিয়া উপদেশ দিলেন, 'মেয়েদের কখন বসে থাকতে নেই, মা। সব সময় কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখতে হয়। এতে মনের অনেক শান্তি। আজেবাজে কথা মনে আসতে পারে না।' ভক্তনারীদের কিন্তু মায়ের কাজ করিতে অপার আনন্দ। মা কাহাকেও কোন কাজ করিতে বলিলে তাঁহারা অতিশয় আনন্দ পাইতেন। আরও মনে হইল কত কৃপা, কত দীক্ষা, কত প্রসাদ ও কত আশীর্বাদ। সমস্ত পুরানো কথা, কতবার কতভাবে বলা হইয়াছে; কিন্তু আবার বলিতে, আবার শুনিতে কত ভাল লাগে।

খড়ো-কেদারের কথা মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। বাগবাজারের কেদারনাথ খড়ের ব্যবসা করে। তাহার কত ভাগ্য যে তাহার জমিতে মা-জননীর এই অসামান্য মন্দিরের পত্তন হইল এবং শ্রীশ্রীমা এখানে বসবাস করিতে লাগিলেন। বাগবাজার বড় পুণ্যস্থান! এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর কতবার কত স্থানে যাতায়াত করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীমা কতদিন এখানে বাস করিয়াছেন!

* * *

'মায়ের বাড়ী'র রোয়াকে বসিয়া যখন একান্তচিত্তে শ্রীশ্রীমায়ের ও তাঁহার অগণিত ভক্তের কথা ভাবিতেছিলাম, তখন একটি মাতালের গুন্‌গুনানি গানে চমক ভাঙিল। মাতালটি 'মায়ের বাড়ী'র সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। পদ্মবিনোদের কথা মনে পড়িয়া গেল। এইরূপ গভীর রাত্রে সেই মদ্যপায়ী পদ্মবিনোদ এই ভাবেই এই গলি দিয়া যাইত এবং 'মায়ের বাড়ী'র সামনে আসিয়া আকুলকণ্ঠে গাহিত :

উঠো গো করুণাময়ী, খোল গো কুটিরদ্বার,
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁদে অনিবার।
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় কতবার,
সন্তানে রাখি বাহিরে—সুখে আছ অন্তঃপুরে।
দয়াময়ী হয়ে আজি একি কর ব্যবহার?

তাহার এই ব্যবহারে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ চাপা ভর্ৎসনায় তাহাকে নিরস্ত করিতে চাহিতেন। তাঁহার শঙ্কা হইত যে, এই অসময়ে সঙ্গীতে মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হইবে। ভক্ত পদ্মবিনোদ একইভাবে গান গাহিয়া যাইত। একদিন শ্রীশ্রীমা খট্ করিয়া জানালার পাখিটি খুলিলেন। জানালা খোলার শব্দ হওয়া মাত্র পদ্মবিনোদ জগজ্জননীর দর্শন পাইয়া আকুল হইয়া রাস্তায় মাথা ঠুকিয়া গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

মনে হইল—এখন সেই মাতাল পদ্মবিনোদ নাই, কিন্তু অন্য মাতাল এখনও মায়ের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া গান করিতে করিতে যায়। একান্তমনে কান পাতিয়া বসিয়া রহিলাম। আর কি কেহ এখন ঐরূপ জানালা খুলিয়া মাতালকে দেখা দিবে? আবার কি জানালা খোলার সেইরূপ আওয়াজ হইবে? আবার কি সেইরূপ মদ্যপায়ী রাস্তায় মাথা ঠুকিয়া গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম জানাইবে? ভক্ত পদ্মবিনোদের মতো মাতোয়ারা না হইলে কি করিয়াই বা সেই কৃপা পাওয়া যায়?

* * *

বস্তিতে একটি গণ্ডগোল হইতেছে। মনে হয়, কোন লম্পট স্বামী অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে। অনেক লোক উঠিয়া পড়িয়াছে। মনে ক্রোধ হইল। এমন পরিবেশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বিরক্তি বোধ করিলাম। বস্তির মধ্যে গিয়া সেই লম্পট লোকটিকে তিরস্কার করিলাম। 'মায়ের বাড়ী'র এত কাছে থাকিয়া তাহাদের এইরূপ ব্যবহার অতিশয় লজ্জাজনক, এই কথা বলিয়া তাহাদের লজ্জা দিলাম। একটি পাহারাওয়ালা আসিয়া পড়িল। সে লোকটিকে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিবার অপরাধে থানায় লইয়া যাইতে চায়। স্ত্রীলোকটি করুণ মিনতি করিতে লাগিল এবং পরে যেন বিরক্ত হইয়া সকলকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে বলিল। তাহার মতে—ইহা নিছক স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। তাহার স্বামী তাহাকে আঘাত করে নাই। পাহারাওয়ালাটিকে ইঙ্গিতে নিবৃত্ত করিয়া বস্তি হইতে বাহিরে আসিলাম।

মনে হইল ঠিক এইরূপই ঘটনা ঘটিয়াছিল

'মায়ের বাড়ী'র সম্মুখে এই বস্তিটারই কোন এক ঘরে। এইরূপ একটি স্বামী এমনই একদিন রাত্রে তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিতেছিল। স্ত্রীলোকটির ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া করুণাময়ী মা গর্জাইয়া উঠিলেন, 'বলি ও মিনসে, মেয়েটাকে কি মেরে ফেলবি ?' মায়ের এইটুকু বলাতেই সব থামিয়া গেল, কলহ মিটিয়া গেল।

পরিবেশ প্রায় সেইরূপই আছে। ঘটনাও প্রায় ঐরূপ ঘটিতেছে, কিন্তু সেই মমতাময়ী 'মা' কোথায় ? মা কি আজও তাঁহার এই পুণ্য বাড়ীতে বাস করিতেছেন ? যাঁহার অনুভূতি আছে, যাঁহার দেখিবার মতো চক্ষু আছে, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন, হ্যাঁ, তিনি এখনও আছেন। তাই দেখি, মায়ের ভক্তেরা আকুল হইয়া মায়ের ঘরের দিকে সজল নয়নে বসিয়া আছেন। গায়ক তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহার ঘরের সম্মুখে বসিয়া একের পর এক গান গাহিয়া যাইতেছেন, কেহ বা নীরবে মাকে দেখিতেছেন। ভক্তদের আসা-যাওয়া, তাঁহাদের এই বাড়ীর মধ্যে—বিশেষ করিয়া মায়ের ঘরের সম্মুখে ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, আজও যেন সেই মমতাময়ী মা স্নেহময়ী হইয়া তাঁহার ঘরে মাতৃমূর্তিতে বিরাজমানা !

তোমার চরণে আসি

শ্রীশান্তশীল দাশ

যত ব্যথা পাই ঘন বেদনায় নয়নের জলে ভাসি,
তত দিনে দিনে সে-বেদনা সাথে তোমার চরণে আসি।
দেখি চেয়ে, তুমি রয়েছ দাঁড়ায়ে,
ও দু-টি কমল-চরণ বাড়ায়ে ;
দু-নয়নে ঝরে কী করুণা ধারা, মুখে কী মধুর হাসি !

এ জীবন ভরে যারা দিল ব্যথা, ঝরালো নয়ন-ধারা,
মনে হয় আজ কত প্রিয়জন, কত না বন্ধু তারা।
আঘাতে আঘাতে নয়নের জলে,
এনে দিল তারা ও-চরণতলে ;
আমার বেদনা শতদল হয়ে ওঠে আজ উদ্‌ভাসি।

ভাবমূর্তি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র কর

সার্থকনামা রবীন্দ্রনাথ যে পুণ্যলগ্নে ভারতের তথা বিশ্বের আকাশে উদিত হয়েছিলেন, তার শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে আজ সমগ্র সভ্য জগৎ তাঁর উদ্দেশে জানাচ্ছে প্রণতি। রবীন্দ্রনাথের এই সর্বজনীন স্বীকৃতির মূলে তাঁর যে ভাবরূপটি রয়েছে, সে সম্বন্ধেই আমি একটু আলোচনা ক'রব।

রবির দ্যুতি যেমন কিরণমালায় প্রকাশিত, রবীন্দ্র-প্রতিভাও তেমনি বিবিধ ভাবধারায় অভিব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি যেমন ছিলেন কবি, কথাসাহিত্যিক, নিবন্ধকার, নাট্যকার, সমালোচক ও শিল্পী, তেমন ছিলেন বিজ্ঞানপ্রিয়, স্বদেশবৎসল ও বিশ্বপ্রেমিক। কিন্তু এই বিবিধ প্রকাশের কোনটাই তাঁর সর্বজনীন স্বীকৃতির মূল হেতু নয়, যেমন নয় তাঁর ব্যাবহারিক জীবন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমৈত্রীর বাণী তাঁকে সর্ব মানবের প্রিয় ক'রে তুলেছে ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু তা সত্য হলেও আংশিক সত্য-মাত্র, কারণ বিশ্বমৈত্রীর বাণী আর যাঁরা প্রচার করেছেন, তাঁদের পক্ষে অনুরূপ স্বীকৃতি-লাভ সম্ভব হয়নি। যেমন রবির অন্তঃস্থিত প্রচণ্ড তাপরাশি বিকীর্ণ হয়ে কিরণমালা-রূপে হয়েছে জাগতিক প্রাণশক্তির হেতু, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যে পরম বস্তুটি ছিল, তাই উৎসরূপে বিবিধ প্রকাশের মাধ্যমে রয়েছে তাঁর সর্বজনীন স্বীকৃতির মূলে ও সেই পরম বস্তুটি হচ্ছে তাঁর ভাবমূর্তি—তাঁর দার্শনিক ও ধর্মীয় অনুভূতির সমষ্টিগত রূপ। যে সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধর্মকে অস্বীকার ক'রে গর্ব বোধ করতেন, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ধর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা। এই ধর্ম কোন গোঁড়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়; ইহা মানবাত্মার ধর্ম, সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসনা।

সত্যের প্রকারভেদ নেই, কিন্তু প্রকাশভেদ রয়েছে—অর্থাৎ সত্য এক, তা নানা রকমের হ'তে পারে না; কিন্তু উপলব্ধির বৈষম্য অনুসারে তার প্রকাশে তারতম্য ঘটতে পারে। যে-কবি যে-পরিমাণে সত্যের প্রকাশে সক্ষম, মানব-মনে তার আবেদনও ঠিক সেই মাত্রাতেই হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথে হয়েছে সত্যের মহৎ প্রকাশ। 'সত্য' হয়েছেন তাঁর কাছে 'শিব ও সুন্দর' রূপে প্রতিভাত এবং তারই ধারা কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা উপধারায় ফল্গুস্রোতের ন্যায় অলক্ষ্যে তাঁর বিশাল রচনা-বলীর ভিতর দিয়ে প্রবহমান। এই সত্যানু-ভূতিমূলক ধর্মই ছিল তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের ভিত্তি ও সেই বলে বলীয়ান্ হয়েই তিনি দ্বিধাহীন অবিকম্পিত চিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন জীবনের পথে, কোন অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপস না ক'রে। সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁর একটি কথাও নিজ বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত নয়। এমনটি ছিলেন বলেই বিশ্বমনের গ্রাহকযন্ত্রে উঠেছে তাঁর বাণীর স্বাভাবিক অনুরণন ও তাঁর জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে চলেছে প্রশস্তির এক মহাসমারোহ।

এই ভাবরূপী রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, তিনি ছিলেন অন্তরাত্মার আধ্যাত্মিক

মহিমার এক অপরূপ প্রকাশ, কবিসত্তার জীবন্ত রূপ। উপনিষদের ঋষির অনুভূতি, ভগবৎ-সাযুজ্য ও শান্তির কথা তিনি মানব-কল্যাণে প্রচার ক'রে গেছেন কবির ভাষায় সুললিত ছন্দে।

যখন তাঁর 'খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?'

তখন কি মনে হয় না যে, এ বালসুলভ কৌতূহলমাত্র নয়, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে মানবাত্মার চিরন্তন জিজ্ঞাসা—আমি কোথা থেকে এসেছি, আমার স্বরূপ কি ?

কবির এই আত্মানুসন্ধানমূলক ভাবজীবনে ক্রমবিকাশের ধারা সুস্পষ্ট। তাঁর অন্তরাত্মা পরমাত্মারূপী সত্যকেই করেছিল জীবনের লক্ষ্য 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। তিনিই ছিলেন তাঁর প্রিয়তম, আর সেই প্রিয়তমের প্রতীক্ষাতেই তিনি বসেছিলেন সারা জীবন—'দূরের পানে মেলে আঁখি'—'একা দ্বারের পাশে।' মনে ছিল তাঁর শবরীর মতো ক্ষণে ক্ষণে অধীর জিজ্ঞাসা—

'তোরা শুনিসনি কি, শুনিসনি
তার পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে, আসে, আসে।

তারপর প্রিয়তমের উপস্থিতির অনুভূতি—

'মন্দিরে মম কে আসিল রে ?
দিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি
দূরে—দূরে ?'

এবং সেই অনুভূতিজাত প্রসন্নতার অভিব্যক্তি :

'দিনরজনী আছেন তিনি
আমাদের এই ঘরে,
তাঁরিমুখের প্রসন্নতায়
সমস্ত ঘর ভরে।'

অবশেষে প্রিয়তমের স্বরূপ উপলব্ধি :

'এই জ্যোতি-সমুদ্র মাঝে
যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।'

কবির প্রিয়তম তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছেন প্রেমময়রূপে—

'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে,
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে।'

আর যিনি প্রেমময়, তিনিই কল্যাণস্বরূপ ; তাই এখন 'সত্যম্' তাঁর কাছে 'শিবম্' বা মঙ্গলময়—

'সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি,
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।'

আর মঙ্গলময়ের কাছে তাঁর প্রার্থনা :

'অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।'

ইংরেজ কবি কীট্‌স্ (Keats) বলেছেন, 'A thing of beauty is a joy for ever.' অর্থাৎ তাহাই যথার্থ সুন্দর, যাহা চিরন্তন আনন্দের উৎস। সুন্দর ব'লে প্রতীয়মান বস্তুনিচয়ের আত্যন্তিক বিশ্লেষণে কবি জেনেছেন যে, একমাত্র সেই অতীন্দ্রিয় সত্তাই—'সত্যম্ শিবম্'ই শাশ্বত আনন্দের আকর। তাই 'সত্যম্ শিবম্' হয়েছেন তাঁর কাছে 'সুন্দরম্'। এখন তাঁর অনুভূতিতে ভীষণের মধ্যেও সুন্দরের প্রকাশ, বজ্রনির্ঘোষেও তার বাঁশির সুর ধ্বনিত—

'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সে কি সহজ গান।'

এই সুন্দরের সাযুজ্যলাভে তিনি ধন্য—

'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর।'

কবি এখন তাঁর প্রিয়তমকে জেনেছেন 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'রূপে এবং এই জানার অভিজ্ঞতা থেকে গেয়েছেন—

'তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোন মানা, নাহি কোন ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।'

তাই এখন জগতের কেহই তাঁর পর নয়, সবাই তাঁর আপন। এই জন্যই বিশেষ ক'রে দুর্গত উৎপীড়িত সবহারাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসিক অভিযান। তাঁর দেশপ্রেম ও বিশ্ব-প্রেমের ভিত্তিভূমিও এইখানে। এই দার্শনিক উপলব্ধি যেমন তাঁর দেশপ্রেমে করেছিল আবেগের সঞ্চার, তেমনি তাঁকে কল্পনাবিলাসী কবি থেকে কর্মযোগীতে পরিণত ক'রে তাঁর বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্নকে, পৃথিবীর সামগ্রিক রূপের কল্পনাকে করেছিল বিশ্বভারতীর বাস্তবরূপে রূপায়িত, যার শিক্ষায় ও প্রেরণায় একদিন না একদিন বিশ্বের জাতিসমূহ এই ভারততীর্থে মিলিত হয়—

'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।'

এরূপে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি যাতে মানুষের সকল প্রচেষ্টা কল্যাণমুখী হয় ও মানবাত্মার ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে, সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় ক'রে বলেছেন : শিক্ষা হবে এমন জিনিস, যার দ্বারা মানুষ আপন সমাজে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবে, হাতের হাতকড়া, পায়ের বেড়ি এবং মৃত যুগের আবর্জনা-রাশি দূর করতে পারবে, এবং জড় বিধিকে প্রাধান্য না দিয়ে জাগ্রত বিধাতাকে স্বীকার ক'রে চলতে শিখবে।—এই উপলক্ষে তিনি উল্লেখ করেছেন আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্যের কথা। বিশেষ ক'রে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীদের সম্বন্ধে দুঃখ ক'রে বলেছেন : এরা ক্ষুদ্র লক্ষ্য নিয়ে বড় ক'রে চাইতেও শিখলে না। অন্য দারিদ্র্যের লজ্জা নেই, কারণ তাহা বাহিরের ; কিন্তু আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্যের মতো লজ্জার কথা মানুষের পক্ষে আর নেই, কারণ এ দারিদ্র্য আত্মার।

প্রেমবিহ্বল কবির মনে প্রিয়তমের প্রতি মান-অভিমান নেই। প্রিয়তম তাঁর সম্মুখ থেকে কেবলই সরে যাচ্ছেন, কিন্তু কবির বিশ্বাস অটল :

'এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও ব'লে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরই যোগ্য ক'রে
আধা-ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে
বাঁচায়ে মোরে।'

প্রেমের পথে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি প্রিয়তমকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন, হে প্রিয়, যে তোমার প্রেমের আস্বাদ পেয়েছে—

'না থাকে তার মান-অভিমান লজ্জা সরম ভয়,
একলা তুমি সমস্ত তার বিশ্বভুবনময়।'

আমাদের মধ্যে দুটি আপাতবিরোধী মত-বাদ প্রচলিত রয়েছে। তাদের একটি ভগবৎ-কৃপার ও অপরটি কর্মফলের প্রভাব সম্বন্ধে। কেহ কেহ—বিশেষ ক'রে বৈষ্ণব ভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে, ভগবৎকৃপায় মানুষ কর্ম-ফলের প্রভাব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। আবার কেহ কেহ—বিশেষতঃ বৌদ্ধমতাবলম্বি-গণ, এই দৃঢ়মত পোষণ করেন যে, কর্মফল

অমোঘ; মানুষের বর্তমান তার প্রাক্তন কর্মের ও ভবিষ্যৎ তার বর্তমান কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এর অন্যথা হওয়ার জো নেই। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, এই দুই মতবাদের এক সুন্দর সামঞ্জস্য। তাঁর প্রিয়তম তাঁর প্রতি করুণা-বশতঃ স্বীয় নিয়মের রাজত্বে অনিয়মের অবতারণা ক'রে যুক্তিহীন খামখেয়ালির পরিচয় দিন, এ তাঁর অভিপ্রেত নয়। কৃতকর্মের অনিবার্য ফলে দুঃখ-তাপ-বিপদ যা-ই আসুক না কেন, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য, কর্মফলের অমোঘ প্রবাহকে প্রতিহত করার জন্য, তিনি প্রিয়তমের কাছে কৃপাপ্রার্থী নন। শুধু দুঃখ-তাপ-বিপদকে সহ্য করার, জয় করার শক্তি যেন তাঁর থাকে প্রিয়তমের কাছে এইটুকুমাত্র তাঁর প্রার্থনা—

'বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।'

কৃতকর্মের অনিবার্য ফলে দুঃখ-তাপ-বিপদের জ্বলন্ত কটাহে দগ্ধ হওয়াকে কবি তাঁর প্রিয়তমের নিষ্ঠুর আশীর্বাদ-রূপে গ্রহণ ক'রে বলেছেন:

'এই করেছ ভালো, নিঠুর
এই করেছ ভালো।
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।'

আঘাতের মাঝেও কবি এখন তাঁর প্রিয়তমের মঙ্গল হস্তের পরশ অনুভব ক'রে পুলকিত হন—

'যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার,
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই তো পুরস্কার।'

কবি তাঁর আধ্যাত্মিকতার আলোকে উপলব্ধি করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বর্ণিত 'পাকা আমি' ও 'কাঁচা আমি'র কথা। 'পাকা আমি' তার পরমদেবতার উপর নির্ভরশীল; কাজেই সে উদার, ফলনিরপেক্ষ ও প্রচণ্ড পুরুষকার সম্পন্ন হয়ে কর্ম ক'রে যায় কর্তব্য-বোধে; পরিণাম—মিলন ও মুক্তি। আর 'কাঁচা আমি' অহমিকার মাদকতায় পরমদেবতা থেকে বিচ্যুত; সুতরাং সে আত্মসর্বস্ব, ফলাসক্ত ও নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে মত্ত হয়ে চলে জীবনপথে; পরিণাম—বিচ্ছেদ ও বন্ধন। তাই প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের ও সংসারাবর্তের ঘুরপাক থেকে মুক্তিলাভের জন্য 'কাঁচা আমি'কে 'পাকা আমি'-তে পরিণত করতে কবির দীর্ঘ ও একাগ্র সাধনা এবং প্রিয়তমের কাছে একান্ত আত্মনিবেদন।

শেষে দ্বৈতভাবের—ভক্ত ভগবান-সম্পর্কের চরম অবস্থা, নিজের মধ্যে প্রিয়তমের প্রকাশ—

'সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।'

ভাবমূর্তি রবীন্দ্রনাথের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, তাঁর মধ্যে ঘটেছিল জ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ব সমাবেশ—যেন তাঁর শুভ্রজীবনবলাকা জ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে ও প্রেমের পক্ষপুটে ভর ক'রে উড়ে চলেছে অনন্ত আকাশে—দূর হ'তে দূরে; ক্রমে তা মিলিয়ে গেল কৃষ্ণমেঘের কোলে অস্তরাগ-রক্ত দিগন্তে।

শব্দাপরোক্ষবাদ

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

আজ বহু বৎসরের কথা। পুণ্যতোয়া নর্মদাতীরে অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি বৃক্ষসংলগ্ন কাষ্ঠফলক দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাতে হিন্দীভাষাতে যাহা বিজ্ঞাপিত ছিল, তাহার মর্ম এই: পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান, এই সুযোগ পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নহে।—কৌতূহল হইল। অনাদিকাল-প্রবৃত্ত এই সংসারবন্ধন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে নিবৃত্ত হয় না। ইহাই শাস্ত্র ও আচার্যগণের বাণী। সেই ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান যদি মাত্র পাঁচ মিনিটে লব্ধ হয়, কোন মূর্খের পক্ষেই সেই সুযোগ পরিত্যাজ্য নহে। উক্ত কাষ্ঠ-ফলক-নির্দিষ্ট জঙ্গলাকীর্ণ একটি সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূরে এক কুটীরে জনৈক সন্ন্যাসীকে উপবিষ্ট দেখিয়া উক্ত বিজ্ঞপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনিই বিজ্ঞপ্তিকর্তা জানিয়া সানুনয়ে ব্রহ্মাত্ম-বিদ্যাগ্রহণাঙ্গভূত কিঞ্চিৎ পূর্বানুষ্ঠেয় কৃত্য সমাপনান্তে তিনি 'তত্ত্বমসি' (তুমিই ব্রহ্মস্বরূপ), এই মহাবাক্যের উপদেশ করিলেন। জিজ্ঞাসু আমার সংসারবন্ধন কিন্তু ছিন্ন হইল না; পুনঃ পুনঃ সংশয় ও জিজ্ঞাসার বিরাম হইল না। তিনি উপনিষদুক্ত নানা পদ্ধতি অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের উপদেশ করিলেন। তথাকথিত শিষ্যের সংসারবন্ধন কিন্তু 'যথাপূর্বং' থাকিয়াই গেল। তখন সেই গুরুজী বলিলেন, 'বেদে এর চেয়ে বেশী কিছু নাই, তুমি মহা হতভাগ্য, দূর হও এখান থেকে।' শিষ্যের অগত্যা না চলিয়া গিয়া উপায়ান্তর ছিল না। ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই তো, উপনিষদে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যোপদেশের কথাই আছে। বহুবার তাহা শুনিয়াছি, আলোচনাও করিয়াছি। জ্ঞানোৎপত্তি হইতেছে না কেন?

অপর এক সময়ের কথা, উত্তর ভারতে বিনা-ভাড়ায় রেল-ভ্রমণকারী জনৈক ভেকধারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইহা তো আপনার চুরি, চুরি করেন কেন? আপনার ন্যায় ব্যক্তির ইহা উচিত নহে।' তৎক্ষণাৎ উত্তর পাইলাম: চুরি কেন হইবে? আমি 'তত্ত্বমসি' উপদেশ লাভ করিয়াছি।—অর্থবোধে অসমর্থ বিবৃতবদন আমার অবস্থাদৃষ্টে তিনি বলিলেন, 'তুমি তো মহামূর্খ হে, আবার গেরুয়াও পরেছ দেখছি; 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থটাও জানো না।' আমি অসামর্থ্য অঙ্গীকার করিয়া বিনা-ভাড়ায় ভ্রমণ ও 'তত্ত্বমসি' বাক্যের মধ্যে সম্বন্ধ কি, জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন: 'তত্ত্বমসি' শ্রবণ করিলে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্মস্বরূপ)—এই জ্ঞান হয়। আর জানো তো ব্রহ্মবস্তু সর্বাত্মক। সুতরাং আমি যদি ব্রহ্মস্বরূপই হইলাম, রেলগাড়ী কি আমা হইতে ভিন্ন? সুতরাং ভাড়া কে দিবে, কাহাকে দিবে এবং কেন দিবে? অগত্যা মূর্খতা অঙ্গীকারকারী আমার বিবৃত বদন বিবৃততর হইয়া পড়িল!

আবার দুইজন সুপ্রসিদ্ধ দিক্‌পালসদৃশ বিদ্বান্‌কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এক গীতা-গ্রন্থে দেখিলাম, 'তত্ত্বমসি' শ্রবণ করিতে করিতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান উদিত হয়, তাহার

ফলে অশেষ দুঃখের কারণস্বরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি। বুঝিলাম না, তাঁহাদের বক্তব্য কি। কেহ যদি গ্রামোফোনে ব্যবস্থা করিয়া অনবরত 'তত্ত্বমসি' শ্রবণ করিতে থাকে, তাহার ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইবে কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তর কি? লোককল্যাণকারিণী অপৌরুষেয় শ্রুতি অভ্রান্ত সত্যই উপদেশ করিতেছেন, 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ (ছাঃ ৭।১।৩), 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি। আমরা সকলেই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মহাবাক্য শ্রবণ করিতেছি, অবিদ্যার উচ্ছেদ তো হইতেছেই না, উপরন্তু সমাজে উপরিউক্ত অপসিদ্ধান্ত ও অপব্যবহার পরিদৃষ্ট হইতেছে। উক্ত শ্রুতিবাক্যসকলের তাৎপর্যই যেন লোকমধ্যে অনির্ণীত অবস্থায় থাকিয়া যাইতেছে। সেইহেতু উক্ত বিষযাবলম্বনে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বিষয়টি অত্যন্ত দুরূহ, কতটা কৃতকার্য হইব, জানি না।

শব্দাপরোক্ষবাদ কাহাকে বলে ?

'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তর পদপদার্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই জ্ঞানের উদয় হয়, ইহারই নাম ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞান, ইহাই জীবের সংসারবন্ধন নিঃশেষে ধ্বংস করে, ইহাই ভগবতী শ্রুতির সিদ্ধান্ত। শব্দশ্রবণ হইতে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি হয় বলিয়া এই মতবাদকে বলা হয় 'শব্দাপরোক্ষ-বাদ'। উত্তরমীমাংসা-ভাষ্যকার পূজ্যপাদ আচার্য শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যগণ এই মতবাদই প্রচার করিয়াছেন। ইহার বিরোধী আরও কয়েকটি মতবাদ আছে। তন্মধ্যে 'মনোঽ-পরোক্ষবাদ' অন্যতম। ইহা উত্তরমীমাংসার 'ভামতী' নামক টীকার রচয়িতা পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র এবং তাঁহার অনুগামিগণের মতবাদ। বোধসৌকর্যের জন্য শব্দাপরোক্ষ-বাদের বর্ণনাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এই মনোঽপরোক্ষবাদ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার আবশ্যকতা আছে; প্রথমে তাহাই করিতেছি।

মনোঽপরোক্ষবাদ

নিষ্কামকর্ম- ও তপস্যাদি-বলে যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে ও অবিদ্যা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, স্বপ্নাবস্থাতেও তাঁহাদের সর্বাত্মভাবের উপলব্ধি হইয়া থাকে; শ্রুতি (বৃঃ ৪।৩.২০) ইহাই বলেন, যথা: 'অহমেব ইদং সর্বম্ অস্মি ইতি মন্যতে' —স্বপ্নকালে মনোব্যতিরিক্ত কোন ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে না। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণের সম্ভাবনাও তৎকালে নাই। অথচ সর্বাত্মভাবের অনুভূতি হয়। এতদ্দ্বারা ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, মনই ব্রহ্মাত্ম-সাক্ষাৎকারের হেতু, 'তত্ত্বমস্যা'দি শব্দ নহে।

'দৃশ্যতে তু অগ্রায়া বুদ্ধ্যা' (কঠ ১।৩।১২), 'যন্মনসা ন মনুতে' (কেন ১।৬), 'অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈঃ ২।৯) ইত্যাদি বাক্যসকল পর্যালোচনা করিলে শুদ্ধ সংস্কৃত ও একাগ্র মনই ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ, অশুদ্ধ অসংস্কৃত ও বিক্ষিপ্ত মন নহে, ইহাই নির্ণীত হয়। কিন্তু মনকে একাগ্র সংস্কৃত ও শুদ্ধ করিবার উপায় কি? শ্রুতি বলেন: 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন' (বৃঃ ৪।৪।২)—নিষ্কাম কর্ম, দান ও তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা মন শুদ্ধ হয় ও ব্রহ্মবস্তুকে ধারণা করিবার যোগ্যতা লাভ করে। আবার 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'(বৃঃ২।৪।৪), 'তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ' (মুঃ ৩।১।২) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন

(ধ্যান) যে মনকে সংস্কৃত ও একাগ্র করিবার উপায়, ইহাও অবগত হওয়া যায়। এই শ্রবণ মনন ও ধ্যানের মধ্যে ধ্যানই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অন্তরঙ্গ কারণ। প্রথমে শাস্ত্র ও আচার্য হইতে ব্রহ্ম-বিষয়ে শ্রবণ করিতে হয়। অতঃপর 'যাহা শুনিলাম, তাহা যুক্তিসঙ্গত কি না' এই প্রকার সন্দেহের নিরসনের জন্য হয় মননের (বিচারের) প্রবৃত্তি। আর মননের দ্বারা বিচার্য বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইলেই তদ্বিষযে ধ্যানের প্রবৃত্তি উদিত হয়। অনন্তর সাধক অনন্যব্যাপার হইয়া ধ্যানেই নিবিষ্ট থাকেন। অপরোক্ষ যে 'ত্বং' পদার্থ (জীব-চৈতন্য), তাহার দেহেন্দ্রিয়াদি ঔপাধিক অংশকে ব্যাবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ তাহাতে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ জীবচৈতন্যের সহিত নিরুপাধিক 'তৎ'পদার্থের (শুদ্ধ ব্রহ্মবস্তুর) সহিত অভিন্নভাবে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন চিন্তনই সেই ধ্যান। এই প্রকার ধ্যানপ্রভাবে সাধকের মনে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই প্রকার অবিদ্যাধ্বংসী অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়। শ্রুতি তাহাই বলেন, 'তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্' (শ্বেঃ ১।৩) ইত্যাদি। এইরূপে দেখা গেল, শ্রবণ মনন ও ধ্যান ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের কারণ, কিন্তু করণ[১] নহে। ব্যাপারস্থানীয় সেই শ্রবণ মনন ও ধ্যান দ্বারা সংস্কৃত শুদ্ধ ও একাগ্র মনই অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের প্রতি করণ। এই যে মতবাদ, ইহাই মনোঽপরোক্ষবাদ।

মনোঽপরোক্ষবাদে যুক্তি

ইঁহারা বলেন, 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্য অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ নহে, যেহেতু শব্দ সর্বত্রই পরোক্ষজ্ঞানের জনক। শ্রুতিও বলেন, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈঃ ২।৯). সুতরাং অসংস্কৃত ও একাগ্রতা-হীন মনের ন্যায় বাণী, অর্থাৎ 'তত্ত্বমস্যা'দি বাক্যও ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ নহে। আর এক কথা, শব্দ হইতে অপরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করিলে মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ শ্রবণের ফলেই অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে সেই বিষয়ে 'অসম্ভাবনা' ও 'বিপরীত ভাবনা'[২] উদযের কোন প্রকার সম্ভাবনা না থাকায় মনন ও নিদিধ্যাসনে (ধ্যানে) কাহারও প্রবৃত্তিই হইবে না। যদি বলা হয়, মন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ হইলে 'ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদি শ্রুতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মের উপনিষৎ-প্রতিপাদ্যত্বের ব্যাঘাত হইবে। তদুত্তরে ইঁহারা বলেন, শ্রুতিনিরপেক্ষভাবে যদি মনের প্রবৃত্তি হইত, তাহা হইলেই উক্ত বিরোধ হইত। তাহা কিন্তু হয় না, কারণ উপনিষৎশ্রবণ-জন্য জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের নিমিত্ত মননা-

১ কাষ্ঠচ্ছেদনের প্রতি কুঠার ও কুঠারের উত্তমন নিপতন (উঠা ও নামা) সকলই কারণ। এই কারণ-সকলের মধ্যে কুঠারের উত্তমন ও নিপতনকে ব্যাপার এবং কুঠারকে 'করণ' বলা হয়, যেহেতু তাহাই কাষ্ঠচ্ছেদনের যাবতীয় কারণসকলের মধ্যে অসাধারণ কারণ।

২ অসম্ভাবনা—ইহা দুই প্রকার, প্রমাণবিষয়ক ও প্রমেয়বিষয়ক। তন্মধ্যে শ্রবণের দ্বারা প্রমাণবিষয়ক অসম্ভাবনাদোষ নিরাকৃত হয়। প্রমাণ-শব্দে বেদান্ত (উপনিষৎ) গ্রহণীয়। উপনিষদ্বাক্যসকল অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে অথবা অন্য কিছুকে প্রতিপাদন করে—এই প্রকার যে সন্দেহ, তাহাই প্রমাণবিষয়ক অসম্ভাবনা। মননের দ্বারা প্রমেয়বিষয়ক অসম্ভাবনা নিরাকৃত হয়। জীব ও ব্রহ্মের ভেদই সত্য অথবা অভিন্নতাই সত্য—এই প্রকার যে সন্দেহ, তাহাই প্রমেয়বিষয়ক অসম্ভাবনা। নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীত ভাবনা নিরাকৃত হয়, এবং চিত্ত একাগ্র হইয়া সূক্ষ্ম অর্থ নির্ধারণে ও ধারণে সমর্থ হয়। দেহাদি সত্য পদার্থ, জীব ও ব্রহ্মের ভেদও সত্য—এই প্রকার জ্ঞানকেই বলে বিপরীত ভাবনা। ইহা ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক।

দিতে প্রবৃত্তি হয়, সেইহেতু তাহারা উপনিষদুপজীবী হওয়ায় ব্রহ্মের উপনিষৎ-প্রতিপাদ্যত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না। অতএব কোনপ্রকার অসঙ্গতি না থাকায় শ্রবণ-মনন- ও নিদিধ্যাসন-সংস্কৃত মনই অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ, ইহাই সিদ্ধ হয়।

শব্দাপরোক্ষবাদ

শব্দাপরোক্ষবাদিগণ বলেন, মন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ হইতে পারে না, যেহেতু অন্য-ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষভাবে বর্তমানকালীন কোন পদার্থের গ্রহণ-সামর্থ্য তাহার নাই। ব্রহ্মবস্তু সদাই বর্তমান ও অতীন্দ্রিয়, সুতরাং মনের দ্বারা তিনি কি প্রকারে গৃহীত হইবেন? অন্য-ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষভাবে অতীত ও অনাগত বিষয়ের গ্রহণ-সামর্থ্য মনের আছে বটে, স্বগতাদিভেদ-বিহীন নিত্য ব্রহ্মবস্তু কিন্তু অতীত ও অনাগত নহেন, ওতপ্রোতভাবে সদাই বর্তমান, 'স এবাদ্য স উ শ্বঃ' (কঠ ২।১।১৩)। এতাদৃশ ব্রহ্মবস্তুকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতাই মনের নাই। 'তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে কিন্তু ব্রহ্ম একমাত্র উপনিষদ্‌গম্য, ইহা অবগত হওয়া যায়। সুতরাং উপনিষদে বর্ণিত 'তত্ত্বমসি' (ছাঃ ৬।৮।৭) প্রভৃতি শব্দই (মহাবাক্যই) অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের প্রতি করণ, মন উক্ত শব্দরূপ প্রমাণের সহকারী মাত্র, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

শব্দাপরোক্ষবাদে যুক্তি

এই বিষয়ে যুক্তি এই—'প্রমাণস্য প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানাৎ' (বিবরণাচার্য)—প্রমাণ প্রযুক্ত হইলে প্রমেয় পদার্থের অবগতিতে বিলম্ব হয় না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। যেমন ঘটের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারে ঘটদেশগত ঘটাকারা বৃত্তির সম্বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ ঘটজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাতে বিলম্ব হয় না। শব্দপ্রমাণ-স্থলেও তদ্রূপ 'শক্তিতাৎপর্যবিশিষ্টশব্দাবধারণং প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানেন কারণং ভবতি' (বিবরণাচার্য)—শক্তি ও তাৎপর্য-বিশিষ্ট শব্দের জ্ঞানই প্রমেয় পদার্থের অবগতির প্রতি অব্যবধানে কারণ হইয়া থাকে। যেমন 'দশমস্ত্বমসি'—তুমিই দশম ব্যক্তি[৩] ইত্যাদি স্থলে হইয়া থাকে। এই প্রকারেই 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তর শব্দের শক্তি এবং তাৎপর্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্মস্বরূপ), এই অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত।

শব্দ মাত্র পরোক্ষজ্ঞানের হেতু নহে, স্থলবিশেষে অপরোক্ষজ্ঞানেরও হেতু

কিন্তু শব্দ তো পরোক্ষজ্ঞানের হেতু। তদুত্তরে ইঁহারা বলেন, শব্দের ইহাই স্বভাব যে, বস্তু ব্যবহিত হইলে তদ্বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানই তাহা উৎপাদন করে, যথা—'স্বর্গে দেবতা আছেন' ইত্যাদি। কিন্তু প্রমেয় পদার্থ যদি অব্যবহিত হয় এবং তাহা যদি 'অসি' (হও), 'ইহা' (এই) প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বোধিত হয়, তাহা হইলে তাহা অপরোক্ষজ্ঞানেরই জনক

৩ দশজন সরল গ্রাম্য ব্যক্তি নদী পার হইয়া 'আমরা সকলে পারে আসিয়াছি কি না' জানিবার জন্য নিজদিগকে গণনা করিতে থাকে। কিন্তু নিজেকে বাদ দিয়া গণনা করার জন্য প্রতিবারই প্রত্যেকে দেখিল মাত্র নয় ব্যক্তি আছে। এক ব্যক্তি নিমজ্জিত হইয়াছে ভাবিয়া তখন তাহারা শোক করিতে থাকে। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যাপারটা বুঝিয়া তাহাদের একজনকে পুনরায় গণনা করিতে বলেন। যখন সেই ব্যক্তি নবম পর্যন্ত গণনা করিল, তখনই তিনি বলিলেন—'তুমিই দশম ব্যক্তি'। এই বাক্য শ্রবণমাত্রেই স্বীয় দশমত্ব-বিষয়ে সেই ব্যক্তির অপরোক্ষজ্ঞান উদিত হয় এবং শোকও নিবৃত্ত হইয়া যায়।

হইয়া থাকে[৪] যথা—'তুমিই দশম ব্যক্তি', 'এই যে দশম ব্যক্তি', 'ইহাই তো দশম বস্তু' ইত্যাদি। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, সুতরাং জীব হইতে ব্রহ্মবস্তু অভিন্ন, অতএব অব্যবহিত হওয়ায় 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবোধক মহাবাক্য হইতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ ১।৪।১০) এইপ্রকার অপরোক্ষজ্ঞানেরই উদয় হইয়া থাকে। 'তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ' (ছাঃ ৬।১৬।৩)—'তত্ত্বমসি' শ্রবণের অনন্তর 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে জানিয়াছিলেন, 'তমসঃ পারং দর্শয়তি' (ছাঃ ৭।২৬।২), 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ' (ছাঃ ৬।১৪।২) ইত্যাদি বাক্যসকলের পর্যালোচনা হইতে আচার্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই অপরোক্ষব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানের উদয় হইয়া সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করেন, ইহাই অবগত হওয়া যায়। আচার্য শিষ্যকে 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্যই উপদেশ করেন (ছাঃ ৬।৮।৭ —৬।১৬।৩)। সুতরাং 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যই অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের 'করণ', ইহাই সিদ্ধ হয়।

শব্দ হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উদিত হইলেও প্রতিবন্ধকবশতঃ অবিদ্যাধ্বংসে অসমর্থ

এক্ষণে স্বভাবতই জিজ্ঞাসা হয়—'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য তো আমরা সকলেই শ্রবণ ক'রতেছি, অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় তো হইতেছে না! তদুত্তরে শব্দাপরোক্ষবাদী বলেন, অপরের না হইলেও শব্দের শক্তি ও তাৎপর্যাদি বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ, তাঁহার মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তরই অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানের উদয় অবশ্যই হইয়া থাকে, ইহা অনুভবসিদ্ধ; যেমন 'তুমিই দশম ব্যক্তি' স্থলে হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলে সংসার-বন্ধনের উচ্ছেদ হয় না কেন? বলিতেছি—উক্ত শ্রোতা যদি উত্তম অধিকারী না হন, তাঁহার যদি নানাপ্রকার পাপ, অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা, চিত্তের চাঞ্চল্য ও বহির্মুখতা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকসমূহ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শব্দোত্থ সেই অপরোক্ষজ্ঞান স্থির দীপশিখার ন্যায় অচঞ্চল হইতে না পারায় অবিদ্যাকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় না। যেমন চঞ্চল দীপশিখার দ্বারা বস্তুর সম্যক্ প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ। সেইহেতু এই অপরোক্ষজ্ঞান যেন পরোক্ষই, যেন অপ্রাপ্তই[৫] হইয়া পড়ে। তখন তাদৃশ শ্রুতব্রহ্ম পুরুষকে বিধেয়[৬] শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে (ধ্যানে) প্রবৃত্ত হইতে হয়। শাস্ত্র তাহাই বলেন, যথা: 'প্রতিবন্ধকশূন্যস্য জ্ঞানং স্যাৎ শ্রুতিমাত্রতঃ। নচেৎ মননযোগেন নিদিধ্যাসনতঃ পুনঃ। প্রতিবন্ধক্ষয়ে জ্ঞানং স্বয়মেবোপজায়তে॥' (শান্তিগীতা ৩।২৩-২৪)।

---

৪ কিন্তু বস্তু অব্যবহিত হইলেও যদি 'অস্তি' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বোধিত হয়, যথা: 'দশম ব্যক্তি আছে' 'জীবাভিন্ন ব্রহ্ম আছেন' ইত্যাদি, তাহা হইলে শব্দ হইতে অব্যবহিত বস্তুর পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে।

৫ 'শব্দাৎ প্রথমম্ অপরোক্ষং বা ব্রহ্মজ্ঞানং জাতমপি তাবত্তা এব নিশ্চলাপরোক্ষানুভবরূপেণ প্রতিষ্ঠায়া অভাবাৎ অপ্রাপ্তমিব ভবতি'—বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহঃ। ২,২২৮ পৃঃ, বসুমতী সংস্করণ।

৬ 'বিধেয়শ্রবণ' অর্থ বিধিদ্বারা প্রেরিত হইয়া শ্রবণ। কর্মী পুরুষ যেমন বিধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিষ্ঠা ও ধৈর্য-সহকারে কর্মানুষ্ঠান করে, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানার্থী সাধকও তদ্রূপ বিধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিষ্ঠা ও ধৈর্যসহকারে শ্রবণ-মননাদির অনুষ্ঠানও করেন। এইস্থলে নিয়মবিধি, পরিসংখ্যাবিধি প্রভৃতি বিষয়ে নানাপ্রকার বিচার আছে। আমরা তাহার অবতারণা করিব না। তবে অনন্যকর্মা হইয়া সাধককে উক্ত শ্রবণাদি সাধনসকলেই প্রবৃত্ত থাকিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য। এই শ্রবণ তিনপ্রকার, উপশ্রবণ, বিধেয়শ্রবণ ও চরমশ্রবণ। পাঠদশাতে ছাত্র যে 'তত্ত্বমস্যা'দি শ্রবণ করে, তাহাকে বলে উপশ্রবণ। বিধেয়শ্রবণ উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে শ্রবণের পরই অবিদ্যাধ্বংসী নিশ্চল অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়, তাহাকে বলে চরম-শ্রবণ। বলা বাহুল্য নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ অধিকারীর উপশ্রবণও 'চরমশ্রবণ' হইতে পারে। সাধকের অবস্থানুসারে 'শ্রবণ' উক্ত ত্রিবিধ আখ্যা লাভ করে।

'স্বয়মেবোপজায়তে' ইহার অর্থ—শব্দনিরপেক্ষভাবে উৎপন্ন হয়, এইরূপ নহে। স্মর্যমাণ মহাবাক্য হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ইহাই তাৎপর্য; ইহা পরে পরিষ্কৃত হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিক্রম

প্রতিবন্ধকযুক্ত পুরুষের অবিদ্যাধ্বংসী ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির ক্রম এই—নিষ্কামভাবে স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া পাপক্ষয় না হইলে কাহারও বিবিদিষার উৎপত্তি[৭] ও বিধেয় শ্রবণে অধিকার হয় না। উৎপন্নবিবিদিষ নিষ্পাপ পুরুষের শমদমাদি সাধনসকলের বলে চিত্তের বিপরীত প্রবৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হয়। বিধেয়-শ্রবণের দ্বারা বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণগত অসম্ভাবনাদোষ নিরাকৃত হয় এবং 'শ্রবণনিয়মাদৃষ্ট' নামক প্রতিবন্ধকনাশকারী পুণ্যবিশেষের উৎপত্তি হয় (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, ৩।৪।১৪ অধিঃ)। মননের দ্বারা প্রমেয়গত অসম্ভাবনাদোষ নিরাকৃত হয় এবং 'তৎ' ও 'ত্বং'পদার্থের শোধন (ঈশ্বর ও জীবের উপাধিবিনির্মুক্ত শুদ্ধ স্বরূপের নিরূপণ) হয়। নিদিধ্যাসনের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা ও সূক্ষ্মবিষয়গ্রহণযোগ্যতা সম্পাদিত হয় এবং বিপরীতভাবনা নিরাকৃত হয় (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ: ২।২২৮ পৃঃ, পঞ্চদশী ৭।১০৯ ইত্যাদি দ্রঃ)। যোগশাস্ত্রোক্ত সাধনসকলের প্রবৃত্তিও এইসময় সার্থকতা লাভ করে, অর্থাৎ সমাধিপর্যন্ত যোগশাস্ত্রোক্ত সাধনসকলকে এই নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে। গীতাব্যাখ্যার প্রারম্ভে পূজ্যপাদাচার্য মধুসূদন তাহাই বলিয়াছেন, যথা: 'তত্তত্-পরিপাকেন নিদিধ্যাসননিষ্ঠতা। যোগশাস্ত্রস্তু সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ॥' (১৭ শ্লোঃ)। তাহার ফলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং 'ত্বং'পদলক্ষ্য শুদ্ধ ব্রহ্মের একত্বাবগাহী নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে সাধকের চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন যে সাধকের পূর্বশ্রুত 'তত্ত্বমসি'শব্দোত্থ অপরোক্ষ জ্ঞান প্রতিবন্ধকবশতঃ অপ্রতিষ্ঠ (চঞ্চল, অস্থির) হইয়া যেন পরোক্ষই হইয়া পড়িয়াছিল, এই-প্রকার অবস্থায় উপনীত নিবৃত্তনিখিলপ্রতিবন্ধ তাঁহার পুনঃ 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্যের শ্রবণ, অথবা স্মর্যমাণ মহাবাক্য হইতে অবিদ্যাধ্বংসী নিশ্চল[৮] অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই নির্বিকল্প-সাক্ষাৎকারাত্মক ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত হয়। ইহাই মূলাবিদ্যাসহ নিখিল কার্যপ্রপঞ্চকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া ফেলে। ফলে সাধক নিরতিশয় ব্রহ্মসুখ অনুভব করেন। (গীতা ৬।২৯, মধুসূঃ দ্রঃ)।

'জীবন্মুক্তিবিবেক' নামক গ্রন্থে প্রতিপাদিত বিষয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা

এক্ষণে আমরা কিঞ্চিৎ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করিব। পূজ্যপাদ আচার্য বিদ্যারণ্যস্বামিকৃত 'জীবন্মুক্তিবিবেক' গ্রন্থে এবং পূজ্যপাদ আচার্য মধুসূদন সরস্বতীকৃত গীতা ৬।৩২ টীকাতে—'তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও কোন কোন সাধক জীবন্মুক্তিসুখ লাভ করিতে পারেন না, সেইহেতু তাঁহাদের জন্য মনোনাশ

---

৭ 'বিবিদিষা'শব্দের অর্থ মাত্র ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছামাত্র নহে। কিন্তু দেহাভিমানরহিত বুদ্ধির শুদ্ধ আত্মাতে নিষ্ঠা। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী এইপ্রকার ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, যথা: 'বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা' (গীতা, শ্রীধরী, ১৮।২)। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও বলিয়াছেন, 'কর্ম কত দিন? যতদিন দেহে অভিমান থাকে'। (কথামৃত ৪।২১।৩।২১৩)।

৮ 'প্রথমতঃ এব শব্দাৎ উৎপন্নম্ অপরোক্ষজ্ঞানং প্রতিবন্ধাপায়ে পশ্চান্নিশ্চলং ভবতি' (বিবরণ প্রঃ সং ২।২২৮ পৃঃ)। 'ততঃ শব্দজনিতাপরোক্ষজ্ঞানং নিশ্চলং প্রতিতিষ্ঠতি।' (ঐ)। 'ধ্যানেনৈকাগ্রমাপন্নে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ' (পঞ্চদশী ১৫।৩০) ইত্যাদি দ্রঃ।

ও বাসনাক্ষয় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।' ইঁহারা এই পদার্থত্রয়ের স্থূলতঃ এইপ্রকার ব্যাখ্যা করেন: 'আত্মাই পরমার্থ সত্য বস্তু, নিখিল দ্বৈত পদার্থ মায়ার দ্বারা তাঁহাতে কল্পিত, আমিই সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বয় আত্মা' এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই 'তত্ত্বজ্ঞান'। মনের বৃত্তিসকলের নিরোধকে বলে 'মনোনাশ'। পূর্ব পূর্ব বিষয়ানুভবজনিত যে সংস্কারসকল চিত্তে অবস্থান করে, সহসা যাহারা ক্রোধাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে বলে 'বাসনা'। মনের নিরোধ হইলে সংস্কারসকলের উদ্বোধক নিমিত্ত না থাকায় তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাই 'বাসনাক্ষয়'। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে তত্ত্বজ্ঞান, যাহার উৎপত্তির পরেও মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের জন্য প্রযত্নের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরোক্ষজ্ঞান, অথবা অবিদ্যাধ্বংসী স্থির অপরোক্ষজ্ঞান? প্রথম পক্ষে কোনপ্রকার অসঙ্গতি নাই। আমাদের মনে হয়—পূজ্যপাদ আচার্যগণের ইহাই অভিপ্রায়, অন্যথা তাঁহাদের নিজেদের উক্তিই পূর্বাপর অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কি প্রকারে? দ্বিতীয় কোটিতে তাহা পরিস্ফুত হইতেছে।

দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যদি বলা হয়—সেই তত্ত্বজ্ঞান অবিদ্যাধ্বংসী স্থির অপরোক্ষজ্ঞান। তাহা হইলে মহান্ বিরোধ হইয়া পড়ে। তাহা এই প্রকার সমাধিবলে জীব ও ব্রহ্মের একত্বাবগাহী ধ্যানে মনের নিরোধ[১] না হইলে 'আমিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বয় আত্মা' এইপ্রকার অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের, অর্থাৎ অবিদ্যাধ্বংসী নিশ্চল ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয় না, ইহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং উক্তপ্রকার অবিদ্যাধ্বংসী ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইলেও সাধকের মনোনাশ হয় নাই, তাহার জন্য প্রযত্ন আবশ্যক, ইহা কি প্রকারে অঙ্গীকার করা যায়? আবার বলা হইয়াছে—যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, দেহপাত হইলে তাঁহাদের মুক্তির ব্যাঘাত না হইলেও প্রারব্ধ-কর্মের ফলে সমাধি হইতে ব্যুত্থানকালে তাঁহারা দুঃখ অনুভব করেন, জীবন্মুক্তিসুখ অনুভব করিতে পারেন না, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়, এই তিনটিরই যুগপৎ অভ্যাস করিবেন, ইত্যাদি। ইহাতেও মহান্ বিরোধ প্রতিভাত হইতেছে। তাহা এই - ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'যদৈব আত্মপ্রতিপাদক-বাক্যশ্রবণাৎ আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্ উৎপদ্যতে, তদৈব তদুৎপদ্যমানং তদ্বিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্তয়দেব উৎপদ্যতে' (বৃঃ ১।৪।৭ ভাষ্য), 'আত্ম-বিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালং তৎকালে এব তদ্বিষয়া-জ্ঞানতিরোভাবঃ' (বৃঃ ১।৪।১০ ভাষ্য), ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের প্রভাবে মূলাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও ব্যুত্থানকালে যদি ব্রহ্মাত্মবিদের দুঃখই অনুভূত হইতে থাকে, তাদৃশ ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানের মূল্য কি? দুঃখ অজ্ঞানের কার্য, সুতরাং ব্রহ্মাত্মবিদের দুঃখদৃষ্টে অজ্ঞানের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। সুতরাং যে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান অজ্ঞানকে ধ্বংসই করিতে পারিল না, তাহা ব্রহ্মবিদ্যা-পদবাচ্য কি প্রকারে হইবে? মুক্তিই বা কি প্রকারে প্রদান করিবে? যদি বলা হয়, দেহপাতকালে উদিত সেই বিজ্ঞান অজ্ঞানকে নিঃশেষে ধ্বংস করিবে। তদুত্তরে বলা যায়, তাহাতে নিশ্চয়তা কি? যে অবিদ্যাধ্বংস ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞান একবার অজ্ঞানকে ধ্বংস করিলেও

---

[১] সিদ্ধান্তে যোগশাস্ত্রোক্ত 'সর্ববৃত্তির নিরোধ' (যোঃ সূঃ ১।১৮, ব্যাসভাষ্য) মুক্তির উপায়রূপে অঙ্গীকৃত হয় না। 'নিরোধস্তর্হি অর্থান্তরম্ ইতি চেৎ' (বৃঃ ১।৪।৭ ভাষ্য) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তিতে যে মনের একাগ্রতা, তাহাতেই মনের অবরোধ, ইহাই সিদ্ধান্তসম্মত মনোনিরোধ। ইহা মোক্ষের অন্যতম সাধন।

পুনরায় উদিত হয়, তাহা দেহপাতকালে অজ্ঞানকে নিঃশেষে ধ্বংস করিতে গেলে উপরে উদ্ধৃত আচার্যোক্তির বিরোধ হইয়া পড়ে। প্রারব্ধকর্মের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ এইপ্রকার হয়, ইহাও বলা যায় না—কারণ 'অজ্ঞানজন-বোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ' (অপরোক্ষানুভূতি ৯৭, বিবেকচূড়ামণি ৪৬৩) ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্‌বচনবলে অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিদের স্বদৃষ্টিতে প্রারব্ধও থাকে না। আর যদি প্রারব্ধ অঙ্গীকারও করা হয়, তাদৃশ প্রতিকূল প্রারব্ধ থাকিলে তাহা অপরোক্ষ-ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিই হইতে দিবে না। কারণ অনুকূল প্রারব্ধলব্ধ শরীরেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব এইপ্রকার আপত্তিও সঙ্গত নহে। আর যে তাঁহারা ব্যুত্থানকালে 'তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসের' কথা বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ আচার্যপাদ সুরেশ্বর বলিয়াছেন—'দৃষ্টে এতস্মিন্ প্রত্যগাত্মনি কেবলে নাস্তি জ্ঞানম্ অনুৎপন্নং নাপ্যধ্বস্তং তথা তমঃ' (বৃ-ভাষ্য বার্তিক ২।৪।২৩০)। সুতরাং ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয়ে তমঃ অর্থাৎ মূলাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় এবং কোন জ্ঞানই অনুৎপন্ন থাকে না, ইহাই বস্তুস্থিতি। অতএব ব্যুত্থিত ব্রহ্মাত্মবিদের তত্ত্বজ্ঞান থাকে না, তাহা অভ্যাস করিতে হইবে, ইহা কি প্রকারে অঙ্গীকার করা যায়? ব্যুত্থানকালে তত্ত্বজ্ঞানের বিস্মৃতি হয়, ইহাও বলা যায় না, কারণ পূজ্যপাদ সুরেশ্বরাচার্য বলিয়াছেন, 'তদ্বাসনা নিমিত্তত্বং যাস্তি বিদ্যা-স্মৃতেঃ ধ্রুবম্' (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ৪।৫৮)—ব্রহ্মানুভবজনিত সংস্কারসকল ব্রহ্মবিদ্যার স্মৃতির প্রতি ধ্রুব (নিশ্চিত) হেতু হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মাত্মজ্ঞানবিষয়ক স্মৃতি ব্যুত্থানকালেও থাকায় তাহার বিস্মৃতির প্রশ্ন উঠে না। এই মতাবলম্বিগণ আরও বলেন, 'শুকদেব প্রথমে নিজেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পরে তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,…তাহাতে সন্দেহ গেল না বলিয়া তিনি রাজর্ষি জনকের নিকট গমন করিলেন' (জীবন্মুক্তিবিবেক, দুর্গাচরণ, ৩১২ পৃঃ) ইত্যাদি। আমরা জিজ্ঞাসা করি—ভগবান শুকদেবের এই যে তাৎকালিক তত্ত্বজ্ঞান, তাহা অবিদ্যাধ্বংসী অপরোক্ষ, অথবা পরোক্ষ? প্রথম পক্ষে 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব-সংশয়াঃ' (মুঃ ২।২।৮) এই শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে; কারণ অবিদ্যাধ্বংসী অপরোক্ষ-তত্ত্বজ্ঞান হইবে, অথবা সংশয়ও উদিত হইবে, এইপ্রকার পরিস্থিতি সম্ভব নহে। অগত্যা এইস্থলে দ্বিতীয় পক্ষই অঙ্গীকার করিতে হইবে। তবে ব্যক্তিটি যেহেতু শুকদেব, সেইহেতু তাঁহার সেই তাৎকালিক তত্ত্বজ্ঞানকে দৃঢ়নিশ্চিত, প্রায় তত্ত্বাবগাহী পরোক্ষজ্ঞানমাত্ররূপে অঙ্গীকার করিতে কোন বাধা নাই। অতএব অবিদ্যা-ধ্বংসী অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোদয়ের অনন্তর জীবন্মুক্তিসুখলাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞান ও মনোনাশাদির জন্য অভ্যাসের আবশ্যকতা অঙ্গীকার করা যায় না, ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং 'জীবন্মুক্তিবিবেকা'দি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য কি, তাহা চিন্তার বিষয়।

স্মর্যমাণ মহাবাক্য হইতে জ্ঞানোৎপত্তি, ইহার তাৎপর্য

এক্ষণে আমরা প্রস্তাবিতের অনুসরণ করিব—উপরে বলা হইয়াছে পুনঃ পুনঃ 'তত্ত্বমস্যা'দি বাক্যের শ্রবণ অথবা স্মর্যমাণ মহাবাক্য হইতে অবিদ্যাধ্বংসী নিশ্চল অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়, ইত্যাদি। এইস্থলে 'স্মর্যমাণ' বলিবার তাৎপর্য কি? বলিতেছি—অন্যান্য মানস বৃত্তির ন্যায় ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তিও তৃতীয়ক্ষণনাশ্য। সেইহেতু প্রথম 'তত্ত্বমসি' শ্রবণকালে যে জ্ঞান উদিত হয়, তাহাই নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ পুরুষের

অবিদ্যাধ্বংসকাল পর্যন্ত অবস্থান করে, ইহা অঙ্গীকার যায় না। অথচ 'তত্ত্বমসি'শব্দজন্য জ্ঞানই অবিদ্যাকে ধ্বংস করে। যদি সাধকের তৎকালে পুনঃ মহাবাক্য শ্রবণের সুযোগ হয়, উত্তম। অন্যথা স্মর্যমাণ 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্য হইতেই তাঁহার জ্ঞানোৎপত্তি হয়। শব্দ বাক্যার্থজ্ঞানের করণ নহে, কিন্তু শব্দজ্ঞানই করণ। পূর্ব পূর্ব শ্রবণকালে সাধকের শব্দ-জ্ঞানজন্য শব্দবিষয়ক সংস্কারের উৎপত্তি হয়। পরবর্তিকালে প্রতিবন্ধকসকলের নিবৃত্তি হইলে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া সাধকের 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্যের স্মৃতি[১০] সম্পাদন করে। তখন সেই স্মর্যমাণ মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মাত্মবিষয় নিশ্চল অপরোক্ষজ্ঞানের উদয় হইয়া অবিদ্যাকে ধ্বংস করে; সাধক কৃতকৃত্য হইয়া যান।

ব্রহ্মাকারা বৃত্তি কখন অবিদ্যা ধ্বংস করে? 'নিশ্চল বৃত্তি' শব্দের তাৎপর্য

এক্ষণে প্রশ্নের উদয় হয়, ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তি কতক্ষণ স্থায়ী হইলে তাহাকে নিশ্চল ও অবিদ্যাধ্বংসী বলা যাইবে? তদুত্তরে বলা যায়—এই বিষয়ে দুইপ্রকার অভিমত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ বলেন, প্রতিষ্ঠ জ্ঞান নিশ্চল রূপেই উৎপন্ন হয়, স্বোৎপত্তিক্ষণেই তাহা অবিদ্যাকে ধ্বংস করে। অপরে বলেন—স্বোৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণেই তাহা অবিদ্যা ধ্বংস করে (সংক্ষেপশারীরক ৪।২৪-২৫)। শেষোক্ত বাদিগণের অভিপ্রায় এই: একই ক্ষণে কারণের ও কার্যের উৎপত্তি সম্ভব নহে, কার্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে কারণের স্থিতি আবশ্যক। অন্যথা কার্যকারণভাবই বিঘটিত হইয়া পড়িবে। আর 'জায়তে' 'অস্তি' 'বর্ধতে' ইত্যাদি প্রকারেই উৎপদ্যমান বস্তুর পরিণাম হয়, ইহাই বস্তুর স্বভাব। সুতরাং দ্বিতীয় ক্ষণের পূর্বে যে জ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা কি প্রকারে অবিদ্যাকে ধ্বংস করিবে? অতএব জ্ঞানোৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণেই অবিদ্যার ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে প্রথম পক্ষাবলম্বিগণ বলেন—যে-ক্ষণে নিশ্চল জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ('জায়তে'ক্ষণ), সেইক্ষণে অবিদ্যা থাকে, অথবা থাকে না? বাদী অবশ্যই বলিবেন—'থাকে'। তদুত্তরে ইঁহারা বলেন—জ্ঞান ও অজ্ঞান একত্র বর্তমান থাকিলেও সেই জ্ঞান যখন অজ্ঞানকে ধ্বংস করিতে পারিল না, তখন দ্বিতীয় ক্ষণে যে তাহা পারিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? অতএব স্বোৎপত্তি-ক্ষণেই নিশ্চল জ্ঞান অবিদ্যাকে ধ্বংস করে, ইহাই অঙ্গীকার করিতে হইবে। বায়ুশূন্য গৃহে নিশ্চল দীপশিখা স্বোৎপত্তি-ক্ষণেই অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ। ভগবান শঙ্করাচার্য এই পক্ষের সমর্থক। 'আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালং তৎকালে এব তদ্বিষয়াজ্ঞানতিরোভাবঃ (বৃঃ ১।৪।১০ ভাষ্য), 'যদৈব আত্মপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাৎ আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্ উৎপদ্যতে, তদৈব তদুৎপদ্যমানং তদ্বিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্তয়দেব উৎপদ্যতে' (বৃঃ ১।৪।৭ ভাষ্য), 'প্রমাণব্যাপারসমকালৈব আত্মনি অনর্থনিবৃত্তিঃ' (মাণ্ডূক্য ৭, ভাষ্য) ইত্যাদি বচন হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। যাহা হউক, যাঁহাদের মতে ক্রিয়োপলক্ষিত কালই ক্ষণ-পদার্থ, তাঁহাদের মতে কারণক্ষণ ও কার্যক্ষণ বিভিন্ন হওয়ায় যদি দ্বিতীয় ক্ষণে অবিদ্যানাশ অঙ্গী-কৃত হয়, হউক। ইহা দৃষ্টিভেদে উপপত্তিমাত্র।

এই বিষয়ে আরও আশঙ্কা হয়, নিশ্চল জ্ঞান অবিদ্যার নাশক, ইহা বলিতেছ; কিন্তু চঞ্চল ও নিশ্চল শব্দ তখনই প্রযুক্ত হয়, যখন একই বস্তু কোন কালে চঞ্চল ও কোন কালে

১০ 'নিত্যমুক্তত্ববিজ্ঞানং বাক্যাদ্ভবতি নান্যতঃ। বাক্যার্থস্যাপি বিজ্ঞানং পদার্থস্মৃতিপূর্বকম্।' 'অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং পদার্থঃ স্মর্যতে ধ্রুবম্।' নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ৪।৩১।৩২, উপদেশসাহস্রী ১৮।১৯০-৯১ দ্রঃ)।

স্থির হয়। তোমার ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তি কিন্তু মানস বৃত্তি হওয়ায় তৃতীয়ক্ষণনাশ্য। সুতরাং তাহা উৎপত্তিক্ষণে চঞ্চল, স্থিতিক্ষণে নিশ্চল, ইহাই কি তোমার অভিপ্রায়? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, তাহাতেই যদি তুমি তৃপ্ত হও, তবে তাহাই হউক। পূজ্যপাদ আচার্য শঙ্কর কিন্তু বলিয়াছেন—'যঃ এব অবিদ্যাদিদোষ-নিবৃত্তিফলকৃৎপ্রত্যয়ঃ, আদ্যঃ অন্ত্যঃ সন্ততঃ অসন্ততঃ বা সঃ এব বিদ্যা ইতি' (বৃঃ ১।৪।১০ ভাষ্য)। অর্থাৎ যে জ্ঞান অবিদ্যাদিদোষের নিবৃত্তিরূপ ফলের জনক, তাহা প্রাথমিক হউক, অথবা চরম হউক; অবিরতভাবে একের পর অন্যটি উদিত হইতে থাকুক, অথবা একবারমাত্রই উদিত হউক, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা অঙ্গীকৃত হয়, ইত্যাদি। সুতরাং উদয়-কালেই নিশ্চল হউক. অথবা দ্বিতীয় ক্ষণেই হউক, ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। যাহা অবিদ্যাকে ধ্বংস করিবে, তাহাকেই আমরা নিশ্চল বৃত্তি বলিব। বস্তুতঃ এই প্রকার অঙ্গীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই; কারণ শ্রুতি এই বিষয়ে নির্বাক্, অন্ততঃ তাদৃশ শ্রুতিবাক্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। আর বাক্যমন- ও দেশ-কালাতীত বিষয়ে সমাধিলীন পুরুষের পক্ষে 'কতক্ষণে অবিদ্যা ধ্বংস হইল', ইহা জ্ঞাত হওয়া সম্ভবও নহে। অতএব আশঙ্কা উত্থাপনের অবসরই এখানে নাই।

শব্দ- ও মন-বিষয়ক আক্ষেপের সমাধান

এই মতবাদে পুনঃ আশঙ্কা হয়—শ্রুতি বলেন, 'যদ্বাচা অনভ্যুদিতম্' (কেন ১।৫), 'যতো বাচো নিবর্তন্তে' (তৈঃ ২।৯), ইত্যাদি। সুতরাং বাণী, অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের 'করণ' কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে শব্দা-পরোক্ষবাদী বলেন—শব্দের শক্তিবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয় না, ইহাই উক্ত বাক্যসকলের তাৎপর্য। বস্তুতঃ শব্দের লক্ষণা-বৃত্তিবলেই 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের শোধন (শুদ্ধস্বরূপের জ্ঞান) হয়। যদি শব্দের লক্ষণাবৃত্তিবলেও তাহা অঙ্গীকৃত না নয়, তাহা হইলে 'তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্যাহত হইয়া পড়িবে। যদি শব্দ হইতে ব্রহ্মাত্মবিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি তোমরা অঙ্গীকার না কর, তাহা হইলে তোমরা যে শব্দ হইতে ব্রহ্মাত্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান অঙ্গীকার কর, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? অতএব শব্দকরণতাবাদে তোমরা বিরোধ উদ্ভাবন করিতে পার না। কিন্তু মন যদি করণ না হয়, তাহা হইলে 'মনসা অনুদ্রষ্টব্যম্' (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদি বাক্যের গতি কি হইবে? তদুত্তরে শব্দাপরোক্ষবাদী বলেন, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তিতে মনের একাগ্রতা অপেক্ষিত হওয়ায় উক্ত শ্রুতি ব্যর্থ হয় না।

প্রসঙ্গের উপসংহার

যাহা হউক, এইরূপে দেখা গেল, 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যই অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের প্রতি করণ, মন নহে। সাধক মহোদয় লক্ষ্য করুন—শব্দই ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ হউক অথবা মনই হউক, সাধকের ইহাতে কিছু আসে যায় না। ইহা দার্শনিকগণের সূক্ষ্মতত্ত্বনির্ণয়ের বিচারমাত্র। অসংখ্য জন্ম ব্যাপিয়া কেবলমাত্র 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য শ্রবণ করিলেই কাহারও ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয় না, তদ্দ্বারা বিনা-ভাড়ায় রেলভ্রমণের যোগ্যতাও অর্জিত হয় না এবং নিবৃত্তপ্রতিবন্ধক অধিকারী না হইলে পাঁচ মিনিটে কাহাকেও ব্রহ্মজ্ঞান দানও করা যায় না। মনই জ্ঞানের করণ হউক বা শব্দই হউক, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান তীব্র সাধনসাপেক্ষ এবং ঈশ্বরপ্রসাদলভ্য। ভগবান শারীরক-ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন, 'তদনুগ্রহহেতুকেনৈব বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধিঃ' (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪১ ভাষ্য) ইত্যাদি ॥ ওঁ ॥

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ সেন

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী আমেরিকা হইতে কলিকাতায় ফিরিলে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি তাঁহাকে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুট-হলে নাগরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তাহার উত্তরে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার অনুলিপি সঙ্কলন-কালে জনৈক বন্ধু কথায় কথায় আমাকে বলেন, 'বেলুড় মঠে বর্তমানে একজন খুব বড় সাধু আছেন—মহাপুরুষ মহারাজ; আপনি যদি তাঁহার সহিত আলাপ করেন তো প্রচুর আনন্দ পাবেন।'

তার পর একদিন পূঃ মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য বেলুড় মঠে যাই; পৌঁছিয়া দেখিলাম—তিনি মঠের বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত। আমি প্রণাম করিলাম; তাঁহার সহিত একটু আলাপ করিবার জন্য আসিয়াছি শুনিয়া তিনি অতি কোমলভাবে বলিলেন, 'বাবা! আজ আমি বড় ব্যস্ত, আমাদের মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) অসুস্থ হইয়া (বাগবাজার) বলরাম-মন্দিরে আছেন, আমি তাঁকে দেখতে যাচ্ছি। তুমি বাবা, আর একদিন এস।' এই কথা-কয়টি এমন স্নেহভরে বলিলেন যে, আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম এবং কথা-কটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করিল। প্রত্যুত্তরে বলিলাম, 'আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'তা এস না বাবা, এতে আর আপত্তি কি?' এই বলিয়া তিনি মঠ হইতে হাঁটিয়া গিয়া বেলুড় স্টীমার-ঘাট হইতে স্টীমারে উঠিয়া বাগবাজার স্টীমার-ঘাটে নামিলেন। আমিও তাঁহার সহিত 'বলরাম-মন্দিরে' গিয়া অসুস্থ অবস্থায় রাজা মহারাজকে দর্শন করিলাম। রাজা মহারাজের অসুস্থতার জন্য মহাপুরুষ মহারাজকে বড়ই চিন্তিত দেখিয়া সেদিন আর তাঁহার সহিত বেশী কথা বলিবার সাহস হইল না। কিছুদিন পরেই পূঃ রাজা মহারাজের দেহত্যাগের সংবাদ পাই।

* * *

৪ঠা আশ্বিন ১৩২৯ (সেপ্টেম্বর, ১৯২২), আমি প্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের লেখক শ্রীম-র সংস্রবে আসি। তাঁহার কথামত প্রত্যহ ভোরে স্টীমারে করিয়া কাশীপুর হইতে মঠে যাইতাম। মঠে সাধুসঙ্গের নিমিত্ত তিনি এইরূপ অনেককেই পাঠাইতেন। মঠে গঙ্গা-স্নান, শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন ও মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিয়া সে স্টীমার শিবতলা ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলেই ঐ স্টীমারেই বাড়ী ফিরিতাম। ইহাতে কাজ-কর্ম কিছু ব্যাহত হইত না। ইহার ফলে মঠের ও সাধুদের সহিত বেশ একটা সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

কোন কোন ভক্ত বিনা-সংবাদে কখন কখন মঠে প্রসাদ পান শুনিয়া মাস্টার মহাশয় বলিয়াছিলেন : মঠে যখন তখন প্রসাদ পাইতে নাই। ইহাতে আশ্রম-পীড়া করা হয়। একদিন কোন ভক্ত মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ও সাধুসেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি যথারীতি মঠে গিয়া মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিলে পর তিনি স্নেহভরে বলিলেন, 'ওরে, আজ মঠে ঠাকুরের ভোগের বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। আজ তুই এখানে পেসাদ

পেয়ে যাবি।' আমি তখন মঠে নূতন যাওয়া-আসা করিতেছি। মহাপুরুষ মহারাজের এই কথার গুরুত্ব তখন বুঝি নাই। আমি তখন মাস্টার মহাশয়ের পূর্বোক্ত সাবধান-বাণী মনে করিয়া ভাবিলাম, মঠে প্রসাদ পাইলে তো আশ্রম-পীড়া করা যাইবে। অতএব প্রসাদ না পাইয়াই চলিয়া আসিলাম। মাস্টার মহাশয় তখন মিহিজামে ছিলেন। এই ঘটনা তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলাম যে, আশ্রম-পীড়ার আশঙ্কায় মহাপুরুষ মহারাজের কথা শুনি নাই এবং প্রসাদ ধারণ না করিয়াই চলিয়া আসিয়াছি। আমার চিঠি পাইয়া মাস্টার মহাশয় ৩রা নভেম্বর ১৯২২ খৃঃ মিহিজাম হইতে লেখেন :

> আপনি শ্রীযুত মহাপুরুষের পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও মঠে ৺মহাপ্রসাদ পান নাই শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। সাধুদের নিমন্ত্রণ অনেক ভাগ্যের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য ফলমিষ্টান্ন লইয়া আপনি যদি পূজার্থে মঠে নিবেদন করেন ও সেই দিনেই মঠে ৺মহাপ্রসাদ নিজে প্রার্থনা করিয়া ভোজন করেন, তবে বড় ভাল হয়।

মাস্টার মহাশয়ের আদেশ-মত আমি মহাপুরুষ মহারাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরে একদিন মঠে মহাপ্রসাদ ধারণ করিয়াছিলাম।

* * *

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের উপর আমার এমনি একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল যে, মঠে গিয়া তাড়াতাড়ি প্রথমে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতাম। প্রতিবারেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কিরে ঠাকুরঘরে গেছলি ?' প্রত্যেক বারেই বলিতে হইত, 'না, মহারাজ, যাইনি।' তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া দোতলার উপরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আবার তাঁহার নিকট আসিতাম। তাঁহাকে দর্শন করিলে এবং তাঁহার ঘরে একটু বসিয়া থাকিলেই হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিত, এবং মন একটি উচ্চভূমিতে উন্নীত হইত, তাঁহাকে কখন কোন প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইত না; দর্শন করিলেই মনপ্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।

এক রবিবার মঠে গিয়াছি— সেদিন আমার কাপড়জামা একটু ময়লা ছিল। মহারাজ ঠিক ধরিয়াছেন, 'হ্যাঁরে, তোর জামাকাপড় ময়লা কেন ?' আমি বলিলাম, 'মহারাজ! আজ রবিবার, মঠে এলাম। আপনাদের সকলের নিকট তো আমি পরিচিত। মনে করিলাম, আপনাদের সামনে একটু ময়লা কাপড় প'রে এলেই বা ক্ষতি কি ? আগামী কাল সোমবার, আপিসে যেতে হবে, অনেক সময় কাজের জন্য বড় সাহেবের সামনে যেতে হয়, তখন ময়লা কাপড় চলে না। আগামী কাল সোমবারে কাপড় ছাড়তেই হবে ব'লে আজ আর কাপড় ভাঙিনি।' এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'ওরে, ঠাকুর যে আমাদের বড় সাহেব রে! মঠে যখন আসবি, কখনও ময়লা কাপড় প'রে আসবি না —ঠাকুর আমাদের ময়লা কাপড় প'রে ঘোরা পছন্দ করতেন না। এখানে যখনই আসবি, ফর্সা কাপড় প'রে আসবি।'

১৯৩০ খৃঃ আমার স্ত্রীবিয়োগের দুই দিন পরে মঠে গিয়াছি সকালে প্রায় ৮টার সময়। দেখি, তিনি স্বামীজীর ঘরের সামনে মঠের পূর্ব বারান্দায় আরাম-কেদারায় দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'কিরে! তোর পরিবার কেমন আছে ?' আমি বলিলাম, মহারাজ

পরশু মারা গেছেন।' শুনিয়াই তিনি বলিলেন, 'বাবা, আর দুঃখ করতে হবে না। কিন্তু দেখিস বাবা, আর যেন বিয়ে করিসনি।' আমি বলিলাম, 'মহারাজ, আশীর্বাদ করুন, যেন ঠিক থাকতে পারি, আর যেন সংসারে মাথা গলাতে না হয়।' তখন তিনি তাঁর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিলেন, 'আশীর্বাদে এইটি হয়। নিজের মনে জোর করতে হবে বাবা! তারপর জেনো আমাদের আশীর্বাদ তো আছেই।'

আঠার দিনের একটি শিশু সন্তান রাখিয়া আমার সহধর্মিণী পরলোক গমন করেন। ২।৩ মাস পরে একদিন মঠে গিয়াছি, মহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে, তোর ছেলেটা কেমন আছে?' মায়ের দুধ না পাওয়ায় ছেলেটির শরীর শুকাইয়া গিয়াছিল। মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, 'মহারাজ! ছেলেটি রিকেটী হয়ে গেছে।' তিনি বলিলেন, 'রিকেটী হয়ে গেছে! আচ্ছা, একদিন তাকে আনিস, দেখবো কেমন হয়েছে।' এই বলিয়া তাঁহার পরিচিত এক ডাক্তারের নিকট যাইতে বলিলেন।

পরে একদিন ছেলেটি লইয়া পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের নিকট গিয়াছিলাম। মহারাজ তাঁর পদ্মহস্ত ছেলেটির গায়ে বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, 'আমাদের আর কি ওষুধ আছে বাবা! শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃতই আমাদের যা কিছু ওষুধ। তুই ছেলেটিকে একটু চরণামৃত খাইয়ে দিবি ও আর একটু গায়ে মাখিয়ে দিবি। শ্রীশ্রীঠাকুর ওকে ভাল ক'রে দেবেন।'

মহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদে ছেলেটি সারিয়া গেল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও তাঁহার অপার স্নেহের কথা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

* * *

সৌভাগ্যক্রমে আমি ১৯২১-২২ খৃঃ হইতেই পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সান্নিধ্যে যাইবার সুযোগ পাই। তাঁহার যে স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইত, যেন আমাকে উনি সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন। কিছুদিন পরে মঠের জনৈক সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন, 'মহাপুরুষ মহারাজ তোমাকে এত ভালবাসেন, তুমি ওঁর কাছে দীক্ষা নিচ্ছ না কেন?' আমি কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত বলিয়া পুনরায় দীক্ষা লইতে আগ্রহ করি নাই। আমার মনে হইত, মহারাজ আমাকে এত ভালবাসেন, আমার আর দীক্ষা লইবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ মাস্টার মহাশয় বলিতেন, দীক্ষা একবার হইলেই হয়। পুনরায় দীক্ষা লওয়ার দরকার হয় না। সুতরাং উক্ত সন্ন্যাসীকে মাস্টার মহাশয়ের কথাও বলিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, 'ও নিয়ম ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। আচ্ছা মাস্টার মহাশয়কে তুমি এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা ক'রো।'

মাস্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন, 'তুমি যাঁর কাছে দীক্ষা নিতে ইচ্ছা করেছ, তাঁকেই জিজ্ঞাসা ক'রো।' তদনুসারে একদিন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, কুলগুরুর নিকট পূর্বে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, এ কথাও বলিলাম। তিনি শুনিয়াই বলিলেন, 'কিরে! তোকে দীক্ষা দিইনি! আচ্ছা কালই আসবি।' আমি বলিলাম, 'সে কি মহারাজ! এত শীঘ্র আমি কি ক'রে প্রস্তুত হবো! আমাকে কিছু সময় দিতে হবে।' তিনি বলিলেন, 'কিছু প্রস্তুত হ'তে হবে না, ভাঁড়ার থেকে একটা হরীতকী চেয়ে নিয়ে আয়, সেইটাই আমাকে দক্ষিণা

দিবি। তোকে আর কিছু দিতে হবে না।' আমি অবশ্য তার পরদিনই কিছু ফলফুল লইয়া আসিলাম এবং যথাসময়ে তিনি আমায় কৃপা করিলেন।

* * *

মহাপুরুষ মহারাজের শরীর তখন তত ভাল নয়। ডাক্তারের নির্দেশমত বাহিরের লোককে বড় একটা তাঁর নিকটে যাইতে দেওয়া হয় না। তবে যদি কেউ কোন উপায়ে তাঁহার নিকট যাইয়া পড়ে তো যতক্ষণ না কথা শেষ হয়, ততক্ষণ তাহাকে বাহির করিয়া দিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। একদিন বিকালে আমি ও বন্ধু হি—বাবু মঠে যাইয়া দেখি, পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের ঘরের সামনের দরজা বন্ধ। হি—বাবু বাল্যকাল হইতেই মঠে যাতায়াত করেন এবং মঠের সাধুরা সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করেন। উনি সব কৌশল জানিতেন। আমাকে লইয়া স্বামীজীর ঘরের সামনে মঠের পূর্ব দিকের বারান্দা হইয়া রাজা মহারাজের ঘরের মধ্য দিয়া একেবারে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে উপস্থিত। মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের দেখিয়াই বলিলেন, 'কিরে, তোরা এসেছিস্! আয়, আয়, বোস।'

এইরূপে তাঁহার সহিত হাসিখুশি ও গল্প করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল এবং বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, এই অল্পক্ষণ তাঁহার সান্নিধ্যে থাকায় মনও আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। পরে আমরা যেমন ঘরের বাহির হইয়াছি, অমনি সেবক-মহারাজ আমাদের ধমকাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে আমাদের মনে এতটুকু আঘাত লাগিল না বা একটুকুও দুঃখ হইল না, তখন অন্তরে যে অপার আনন্দের প্রবাহ ছুটিতেছে, তাহার নিকট এ ধমক কোথায় ভাসিয়া গেল। সাধুদের তিরস্কার তো আশীর্বাদ! সে যাহা হউক মহাপুরুষ-সঙ্গ তো করিয়া লইয়াছি! এতক্ষণ তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিতে পারিয়াছি! পরে আবার মঠে যাইলে সেই সেবক-মহারাজই আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'ওরে, তোদের এত বকাবকি করি কেন জানিস? তাঁর শরীর খারাপ। ঐ অবস্থায় বেশী কথা কইলে অসুখ যে বেড়ে যাবে। সেইজন্য একটু বলি। তা কিছু মনে করিসনি।'

সেইসব পুরাতন দিনের মধুময় স্মৃতি মনে হইলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাই। তাঁহার অসীম ভালবাসার ফলে মঠ যে আমাদের কত প্রিয়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। * *

স্বামী শিবানন্দের একটি পত্র

[শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী-বিষয়ক]

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, Belur, Howrah

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ 5-8-20

শরণম্

শ্রীমান সু—

ন-কে যে পত্র লিখিয়াছ, তাহা শুনিলাম। অবশ্য শ্রীশ্রীমার স্থূলদেহ আমাদের চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছে বটে সত্য, এবং তজ্জন্য ভক্তদের খুব দুঃখ হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্তদের ইহা পূর্ণ ধারণা থাকা আবশ্যক যে, তিনি সাধারণ মানবী নন বা সাধিকা নন বা সিদ্ধা নন। তিনি নিত্যসিদ্ধা জগজ্জননীর এক বিশেষ রূপ, যেমন দশমহাবিদ্যা। তিনিই এইবার ভগবান—অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহায়িকা শ্রীমতী সারদামণি দেবী হইয়া জীব উদ্ধারের জন্য শুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া জগতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। যে ভক্তেরা তাঁর কৃপালাভ করিয়াছেন, তাঁদের মানব জন্ম সার্থক হইয়াছে। তাঁরা ধন্য হইয়াছেন। তাঁরা যখনই 'মা' বলিয়া তাঁকে কাতরে দেখিতে চাইবেন, তাঁকে দেখিতে পাইবেন, নিশ্চয়ই। তুমি কখনই হতাশ হইও না। গর্ভধারিণী মা দেহ ত্যাগ করিলে সন্তানেরা আর তাঁকে দেখিতে পান না সত্য। সহস্র ক্রন্দন করিলেও দেখিতে পান না। কিন্তু এ মা যে জগজ্জননী, জীবের ত্রাণের জন্য অবতীর্ণা হইয়াছেন।

ভক্তেরা কাতরে ক্রন্দন করিলেই তিনি দেখা দিবেন। তোমরা যে মহা ভাগ্যবান্ সাক্ষাৎ তাঁর কৃপা পাইয়াছ। তোমরা যখনই তাঁর বিচ্ছেদে কাঁদিবে, তখনই তিনি তোমাকে সান্ত্বনা করিবেন, ইহা নিশ্চয় জানিও। তুমি পত্রে যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ, সেইরূপ দুঃখ যখনই তাঁর কাছে জানাইবে, তখনই তিনি তোমায় শান্তি দিবেন। ইহা মানবীয় ব্যাপার নয়, ইহা দৈবী, ঐশ্বরিক ব্যাপার। সুতরাং তুমি কখন হতাশ হইবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। গলা কাটিয়া ফেলিলে ও জগৎ ধ্বংস হইয়া গেলেও তোমার এ বিশ্বাস অচল রাখিতে হইবে—আমি মা জগজ্জননীর ছেলে, তিনি আমায় দয়া করিয়াছেন, আর আমার জগতে কিসের ভয়, কিসের ভাবনা? আমি মুক্ত হইয়া গিয়াছি, এই বিশ্বাস তোমার মনে সদা সর্বদা জাগিবে। এ সকল কথা তোমায় সান্ত্বনা দিবার জন্য বলছি না। এ সকল প্রকৃত সত্য কথা, আমাদের প্রাণের কথা। অধিক আর কি লিখিব, তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। মা তোমায় শান্তিতে রাখুন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শিবানন্দ

মা

শ্রীবিভূতি বিদ্যাবিনোদ

কত ক্ষুদ্র শব্দটুকু মাতৃ-সম্বোধন,
মা ব'লে ডাকিলে শুধু জুড়ায় জীবন।
শান্তি, তৃপ্তি এ বিশ্বের যা কিছু আরাম
কেন্দ্র ক'রে আছে সব একাক্ষর নাম।
নিঃসঙ্গ প্রথম সেই জীবন-প্রভাতে
মা ছাড়া ছিল না কেহ আনন্দ-আঘাতে,
মা-ই দেয় ধীরে ধীরে ক'রে পরিচয়—
তখন সবাই এসে আপনার হয়।
যে ব্যথা জননী সহে সন্তানের তরে
যে নিবিড় স্নেহ রয় মায়ের অন্তরে,
উৎকণ্ঠায় তাঁর যত রাত্রিদিন কাটে
তুলনা কল্পনা মাত্র ;—কথা নাহি আঁটে।
জন্ম জন্ম সেবা করি যদি রাত্রিদিন
পরিশোধ নাহি হয় তবু মাতৃঋণ।

তোর কাজ

ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

অজানারে জানতে হবে
এই দুনিয়ার মাঝখানে,
নইলে জীবন বৃথায় যাবে
সম্পদে আর যশ-গানে।
বেদান্তের জটিলতায়
লাভ কিরে তোর ? শোন্ না রে—
প্রশ্ন করা বৃথাই যে তোর
জবাব পাবি অন্তরে।
তোর দুয়ারে দিবানিশি
ঘুরছে যে সে তার দায়ে ;
বিশ্বাসেতে নুয়ে পড়ে
বিকিয়ে দে মন তাঁর পায়ে।
তাঁকে যে তোর পেতেই হবে
এ জীবনটা না যেতে,
ভক্তিভরে ধরে থাক মন
গুরুর চরণ দুই হাতে।

প্রার্থনা

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আঁধারের জন্ম-মৃত্যু হেরিলাম জীবনে আমার,
বাষ্পাচ্ছন্ন নীহারিকা উল্কাপুঞ্জ কুজ্ঝটিকা কত!
অবিনাশী দেহ-বীজ ভূত-স্কন্ধে রহে অনিবার,
চেতনার আবির্ভাব অচেতন বস্তু হ'তে শত।
রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে জেগে ওঠে চিত্ত-অনুভূতি,
তাই নিয়ে ছায়াময় অবাস্তব কল্পনা-বিলাস,
গতিধর্ম অবসন্ন। ঋষি-হৃদয়ের দিব্যস্তুতি
বিশ্ব করে প্রদক্ষিণ অমৃতেরে পরিচর্যা করি;
মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনি, হেরি তার মহাশক্তি রূপ,
সৃষ্টির স্বরূপ সাথে মিশে গেছে জৈবলীলা মাঝে।
প্রাণের কুসুমে কেন বসে আছে মায়ার মধুপ?
শিক্ষা দাও সত্যধন, হে দেবতা, অজ্ঞান আবরি।

জীবনদেবতা

শ্রীমতী বিভা সরকার

জীবনের অন্তঃপুরে বসিয়া একেলা
স্মিত হাস্যে কি দেখিছ তুমি?
কিসের প্রকাশ?—নীরবে বাহিরে এস!
প্রিয়তম তোমায় প্রণমি!
মোর জন্ম-জন্মান্তের চির-পুণ্যালোকে
তব, করুণা-নির্ঝর তলে আসি,
জ্যোতির প্রকাশ হোক ভেদি অন্ধকার
মর্ম মোর উঠুক উদ্ভাসি!
কামনা হয়েছে সোনা পরশের রসে
লভিয়াছি চির স্পর্শমণি।
অপূর্ণ হয়েছে পূর্ণ, মুগ্ধ মোর মন
ধন্য করি দিয়েছ আপনি!

প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন

[বিবৃতি-মূলক প্রবন্ধ—পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

প্রথম অধিবেশনের শেষ কথা

প্রথম অধিবেশনের শেষদিকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা এই: নিজের ধর্মমতের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখিয়া এবং সেইভাবে জীবনযাপন করিয়া কি অপরের ধর্মমতের প্রতি সমাদর জানানো চলে?

অধ্যাপক লেডিড বলেন: অপরের ধর্ম-মতের প্রতি অসহিষ্ণুতার কারণ—আমাদের অপর ধর্ম সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের অভাব। যদি আমরা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে অপরের ধর্মশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে আমরা অপরের ধর্মমত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিতে পারি।

ডক্টর মেনশিং বলেন: অপরাপর ধর্মমতের গুণাবলী উপলব্ধি করিয়া সমাদর করিতে হইলে নিজের ধর্ম ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আমার ধর্ম আমার দেশের ঐতিহ্যের সহিত এমন ভাবে জড়িত হইয়া আছে যে, তাহা সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইলে আমার আমিত্বকেই অস্বীকার করিতে হয়।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডক্টর মহাদেবন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ ও অপরোক্ষানুভূতি ব্যাখ্যা করিয়া দেখান, মানুষ কেমন করিয়া অপরের ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াও নিজের ধর্মমত ও ধর্মবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।

দ্বিতীয় অধিবেশন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল: সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কেমন করিয়া বর্তমান জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বারা রূপান্তরিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে যে সকল প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নূতন ধরনের মূল্যবোধ আসিয়াছে, না পুরাতন মূল্যবোধ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হইয়াছে? চিরাচরিত মূল্যবোধ, যথা—সত্যের প্রতি অনুরাগ, গুণীর সমাদর, জ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা—এই সব মূল্য বর্তমান সমাজে কি একেবারেই অচল হইয়া পড়িয়াছে? জাতি-ভেদ-প্রথা কোন কোন সমাজে এখনও দৃঢ়মূল হইয়া সমাজকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। পারিবারিক জীবনে যে ভাঙন ধরিতেছে, একান্নবর্তী পরিবার যেভাবে উঠিয়া যাইতেছে, তাহাতে মানুষ অতিমাত্রায় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছে—ইহার ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কতখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে? শিল্পোন্নয়ন মানুষের সঙ্গে তাহার সমাজের সম্পর্ক কিভাবে রূপান্তরিত করিতেছে? নগরবাসী ও গ্রামবাসী পারস্পরিক জীবনে সহায়তা করিতেছে কিনা এবং করিলে কিভাবে করিতেছে?

ডক্টর ক্যালিস্ বলেন: প্রত্যেক দেশেই পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া গিয়াছে সত্য এবং তাহার ফলে মানুষ এখন আর নিজের দেশে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত পৃথিবী এখন তাহার নিজের

দেশ। তথাপি হাজার বছর আগেকার মানুষের মনে যে জীবন-জিজ্ঞাসা ছিল, সত্য ও মঙ্গল সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন ছিল, এখনও সেই প্রশ্ন মানুষের মনকে উৎকণ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাউণ্ট কাইজারলিং-এর মতে: প্রাচীন সমাজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; ইহার কারণ পর পর দুইটি মহাযুদ্ধ। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় অর্থই সম্ভ্রম ও মর্যাদার প্রধান মাপকাঠি। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অপেক্ষা একটি শিল্পসংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সম্মান অনেক বেশী।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমাজের ভাঙন ধরিয়াছে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন সমাজ-ব্যবস্থা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বর্তমানে যে সমাজ-ব্যবস্থা আমরা দেখিতে পাই, তাহা প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বর্জন নহে, তাহার রূপান্তরমাত্র। বাল্যবিবাহ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, একান্নবর্তী পরিবার ভাঙিয়া গিয়াছে, নারীজাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা বাড়িয়াছে, জাতিভেদ-প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে যদিও অস্পৃশ্যতা অপরাধ, তথাপি অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ ভাবে উঠিয়া গিয়াছে, এ কথা বলা চলে না। অধ্যাপক টানাকা বলেন, জাতিভেদ-প্রথা সম্বন্ধে জাপানের অবস্থা প্রায় ভারতবর্ষের অনুরূপ।

সমাজের সর্বনিম্নস্তরে যে কুসংস্কার, কুশিক্ষা ও আলস্য বিরাজ করিতেছে, সেই প্রসঙ্গে প্রত্যেক প্রতিনিধিই বলেন, শিক্ষার দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই পাপ ধীরে ধীরে দূর হইবে।

অধ্যাপক টমলিনের মতে: বৃটেনে পরিবারের আকার ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে। একান্নবর্তী পরিবার বলিয়া কিছুই নাই। স্বামী স্ত্রী ও সন্তান লইয়া পরিবার। সন্তান বড় হইয়া উপার্জনশীল হইলে সে পিতৃগৃহ হইতে আলাদা হইয়া থাকে, কাজেই পিতা-মাতার জীবনাদর্শ সম্পূর্ণভাবে সন্তানকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না।

কাউণ্ট কাইজারলিং বলেন: অর্থনৈতিক কারণে এবং শিল্পোন্নয়নের জন্য পরিবার ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিতেছে, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন নিজেদের মধ্যেই হইতেছে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে শিশুসন্তানের জীবনের উপর নানা ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে।

অধ্যাপক হোবেল বলেন: আমেরিকায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ই বিবাহ করিয়া থাকে। ইহার ফলে একদিকে স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক জীবনের সম্ভাবনা, তেমনি অপর দিকে তুচ্ছ কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের আশঙ্কাও আছে।

কাউণ্ট কাইজারলিং সমাজের উপর শিল্পোন্নয়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, শ্রমিকশ্রেণী এবং যুবসম্প্রদায় শিল্পোন্নয়নকে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। শিল্পোন্নয়নের ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়াছে এবং পুরাতন সমাজের নানাবিধ রূপান্তর ঘটিতেছে।

ডক্টর ক্যালিস নগর-সভ্যতার প্রভাব মানুষের মূল্যবোধ কিভাবে রূপান্তরিত করে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন: প্রকৃতির সংস্পর্শে না থাকিলে মানুষ ধীরে ধীরে স্বাধীনতার স্পৃহা, ব্যক্তিসত্তার প্রতি সম্ভ্রমবোধ প্রভৃতি মূল্যবোধ হারাইয়া ফেলে।

অধ্যাপক টমলিনের মতে: শিল্পোন্নয়নের ফলে বৃটেনে কোন জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। বৃটেনের সামাজিক জীবন প্রায় দেড়-শ বছর

ধরিয়া শিল্পায়নের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। বৃটেনের সাধারণ মানুষও নগরবাসী। কাজেই বৃটেনে সমস্যাটি অন্যপ্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে। সেখানে গ্রামসংরক্ষণ করিবার জন্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইতেছে। যন্ত্রের সাহায্যে অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থা বৃটেনে যেভাবে হইতেছে—টেলিভিসন প্রভৃতি দ্বারা—তাহার ফলে যান্ত্রিক জীবনের কুফল অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতেছে। টমলিনের মতে—'নিজে শেখ', 'নিজে কর' প্রভৃতির ফলে মানুষ যন্ত্রজীবনের কুফল হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইয়াছে; কারণ অবসর-সময়ে অহিতকর কোন নেশায় মত্ত না হইয়া সে নিজের উদ্ভাবনী শক্তির সদ্ব্যবহার করিতেছে।

শিল্পায়নের ফলে মানুষের মূল্যবোধ যে পরিবর্তিত হইয়াছে, এ কথা প্রায় সকল প্রতিনিধিই স্বীকার করেন। তবুও প্রতিনিধিরা এই আশা প্রকাশ করেন যে, যদিও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ শিথিল হইয়া আসিয়াছে, তবুও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে একটি মানবিক দর্শনের সম্ভাবনা দেখা যায়, যে দর্শন কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দর্শন নয়। পৃথিবীর সকল মানুষের দর্শন (a global oriented humanistic philosophy and a cosmological world-view)।

প্রতিনিধিরা, বিশেষ করিয়া কাউণ্ট কাইজারলিং ও ডঃ মেনশিং, আর একটি আশার কথা বলেন: প্রাচীনকালে মানুষ আধ্যাত্মিক মূল্যগুলি বিনা-বিচারে গ্রহণ করিত; এখন মানুষের মননশীলতা এত তীক্ষ্ণ হইয়াছে যে, বিনা-প্রমাণে শুধু অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সে কিছুই গ্রহণ করিতে চায় না। ইহা এক দিক দিয়া আশার কথা সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধিবেশন

তৃতীয় অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল: সাংস্কৃতিক মূল্য কেমন করিয়া মানুষের সামাজিক বিবর্তন ও বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবান্বিত করে।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার দুঃখ করিয়া বলেন যে, সাধারণ মানুষ—বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ—এখন আর দর্শন, ধর্ম বা সংস্কৃতির উচ্চ আলোচনায় এবং মননশীলতায় আত্মনিয়োগ করিতে চায় না। লঘু চিত্র, লঘু উপন্যাস, লঘু তামাসা তাহাকে বেশী আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

কাউণ্ট কাইজারলিং বলেন: কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত প্রভৃতির অনুশীলন করিয়া যাঁহারা শিল্পী বলিয়া খ্যাত, তাঁহারা একটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করেন। সাধারণ অল্পশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে তাঁহাদের ভাবের আদান-প্রদান হয় না। সেইজন্য সংস্কৃতির যতখানি ব্যাপক প্রসার আমরা আশা করিয়া থাকি, ততখানি হইতেছে না। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্বন্ধেও বলা চলে যে, spiritual groups বা 'ধর্মসংঘ' প্রাচীন কালের মতো এখন আর তেমন সমাদর লাভ করিতেছে না। মানুষের ধর্মবোধ এখন ব্যক্তিগত ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। যখন সে আন্তর অনুভূতি লাভ করিবার চেষ্টা করে, তখন সে একক এবং অসঙ্গ।

'Tradition বা ঐতিহ্য বলিতে কি বুঝিব?' এই প্রশ্ন লইয়া ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ডক্টর মেনশিং বিশদ আলোচনা করেন। প্রাচীন মূল্যবোধ যদি আমরা সত্যই হারাইয়া ফেলিয়া থাকি, তবে তাহা পুনরুদ্ধারের উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর মজুমদার বলেন, পিতামাতা ও শিক্ষক উভয়ের সম্মিলিত

প্রচেষ্টায় বালকবালিকাদিগকে নৈতিক শিক্ষা দিতে হইবে। যেমন পিতামাতা শিক্ষক ও বয়স্ক লোকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, প্রতিবেশীর ও অতিথির প্রতি আতিথেয়তা ও সহৃদয়তা প্রকাশ করা, সমাজের কল্যাণপ্রদ কাজে আত্মনিয়োগ করা, সত্যাশ্রয়ী হওয়া, আত্মশুদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া—এই সকল গুণগুলি প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কাজেই ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ভিত্তিকে দৃঢ় করিতে হইলে এই গুণগুলির সম্যক্ অনুশীলন প্রয়োজন।

ডক্টর মেনশিং-এর মতে—অন্ধভাবে কোন দেশের ঐতিহ্য অনুসরণ করা নিরর্থক। যে ঐতিহ্য—যে মূল্য মৃত, তাহাকে বাঁচাইবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া পুরাতন মূল্য (values)-গুলিকে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

টমলিনের মতে—বৃটিশ জাতি তাহার প্রাচীন ঐতিহ্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। বৃটিশ জাতি এই ঐতিহ্যকে দৃঢ়তর করিতে চায়। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, প্রাচীন ব্যবস্থার ফলে বৃটিশ সমাজে যে সকল অন্যায় ঢুকিয়াছে, তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

কাউণ্ট কাইজারলিং বলেন: তাঁহার দেশে (অস্ট্রিয়াতে) প্রাচীন ভাবধারার সম্যক্ অনুশীলন হইতেছে না। এজন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, রাজনৈতিক সংস্থার সংহতি রক্ষার জন্য, দেশ-শাসনের জন্য যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী অর্থ ব্যয় করা উচিত জাতীয় সংস্কৃতি-সংরক্ষণের জন্য। দেশবাসীর মধ্যে যদি শুভবুদ্ধি জাগ্রত করা সম্ভব হয়, তবেই অন্তর্বিরোধ দূর হয়, এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করা সম্ভব হয়।

সাংস্কৃতিক ঐক্য কেমন করিয়া স্থাপন করা সম্ভব? এই প্রশ্নের আলোচনা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক লেড্ডি বলেন: সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতিকে ভাঙিয়া চুরিয়া একটা ছাঁচে-ঢালা সংস্কৃতি কেহই কামনা করে না, কারণ তাহা অবাস্তব। সাংস্কৃতিক ঐক্যসাধন বলিতে আমরা বুঝিব—এমন কতকগুলি মূলসূত্রের স্বীকৃতি, যাহা দেশ ও কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে।

কাউণ্ট কাইজারলিং 'national culture' (জাতীয় সংস্কৃতি) কথাটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহেন; কারণ পৃথিবীর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক এক জন শিল্পী যে দান করিয়া থাকেন, তাহার মূল্য তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিভার উপর যতটা নির্ভর করে, ততটা তাঁহার জন্মভূমির উপর বা তাঁহার জাতিগত সত্তার উপর করে না। ভিয়েনার একজন চিকিৎসক আফ্রিকার চিকিৎসকবৃন্দের সঙ্গে যতখানি আন্তরিক ঐক্য অনুভব করিবেন, ভিয়েনার একজন শ্রমিকের সঙ্গে তিনি ততখানি মানসিক ঐক্য অনুভব করিবেন না।

টমলিন অন্য একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, কৃষ্ণাঙ্গ জাতির সঙ্গীত আজ সমস্ত পৃথিবী গ্রহণ করিয়াছে, যদিও শ্বেতাঙ্গ-জাতি কৃষ্ণাঙ্গ-জাতিগুলিকে স্বাধীনতা দিতে খুব তৎপর নয়। কাজেই দেখা যায় যে, যুক্তি যেখানে ব্যর্থ হয়, ভাব বা হৃদয়ের দান সেখানে অনেক সময় কাজ করিতে পারে। তাই মিঃ টমলিন সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাইবার জন্য—যুক্তিতর্ক, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির পরিবর্তে মানুষের হৃদয়ের আবেদন দ্বারা তাহার অন্তরের ভাবসম্পদকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আবেদন জানান।

সমাপ্তি

৯ই নভেম্বর তারিখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সভাপতি ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ার প্রতিনিধিদের মতামতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন এবং পর্যবেক্ষকগণের মধ্য হইতে কয়েকজনকে অনুরোধ জানান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আলোচনার ফলাফল কি, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য। পর্যবেক্ষকদের মধ্যে আলোচনা করেন শ্রীনাসিফ (ভারতে লেবাননের রাষ্ট্রদূত), ডক্টর রিয়াদ-এল্-এট্‌র্ (যুক্ত আরব রিপাবলিকের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি), অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং বর্তমান প্রবন্ধের লেখক।

পরিসমাপ্তির সময়ে প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত ভাবের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন: সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগাইবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব্ কালচার এই দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়া আসিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ আরও প্রতিষ্ঠান দেশে বিদেশে গড়িয়া উঠুক।

মাতৃ-সঙ্গীত

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

[কেদার-ইমন কল্যাণ—একতালা]

জগতধাত্রী সারদা দেবী কৃপা করি এলেন এ ধরায়।
ত্রিতাপ-তাপিত জীব উদ্ধারিতে অকাতরে সবে করুণা বিলায়॥
ত্যাগতিতিক্ষার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে।
আহুতি দিলেন বৈরাগ্য-অনলে স্বার্থসুখ (সব) অবহেলায়॥

জাগাতে ভারত এলেন ভারতী ঘুচালেন ভেদ বর্ণ ধর্ম জাতি।
এস সব মিলে হাতে পুষ্পদলে ভকতি-চন্দনে পূজিয়ে মায়॥
করুণা-আধার মা সবাকার হৃদয়-আসনে রেখো অনিবার।
লভিতে বিমলা শান্তি অপার নাহি যে জগতে অন্য উপায়॥

মাতৃ-আবির্ভাব

কথা ও সুর : স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আসিল আসিল—
আসিল আসিল এই যে জননী আসিল !
রূপের আভায় করুণা-বিভায় বিশ্বভুবন ভাসিল—
মা আসিল ॥
আদ্যা শকতি মহাবিদ্যা মহাকালিকা মহামায়া
মহাসরস্বতী 'সারদা' ঈশ্বরী শ্যামাসুতারূপে প্রকাশিল ॥
জগত-জননী প্রণত পালিনী অনাথ-অশরণ-তারিণী
সর্বসিদ্ধি-দায়িনী জননী শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গিনী।
বিতরে অযাচিতে ভকতি মুকতি সাধু পাপী তাপী নাহি বিচার
সর্বদেবদেবী-বাঞ্ছিত পদে লাঞ্ছিত জনে তুলে নিল ॥

সিন্ধু-বিজয়—তেওরা

+ ২ ৩ | + ২ ৩
II সা রা মা রা মা পা ধা | মা পা া া া া াI
আ সি ল আ সি ল ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩
সা রা মা রা মা পা া | র্সা র্সা র্সা ণা ণা পা া | রমা পধা পা মা গা া া I
আ সি ল আ সি ল ০ | এ ই যে জ ন নী ০ | আ ০ সি ল ০ ০ ০

+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩
I মা মা মা রা া সা সা | সা রা মা রা মা পা পা | র্সা া র্সা ণা া পা পা
রূ পে র আ ০ ভা য় | ক রু ণা বি ০ ভা য় | বি ০ শ্ব ভু ০ ব ন

| + ২ ৩
| রমা পধা পা মা জ্ঞা া া I
| ভা০ ০ ০ সি ল ০ ০ ০

| + ২ ৩ |
| Iরা মা জ্ঞা রাজ্ঞ রা সা াI |
| মা ০ আ সি০ ০ ল০ |

+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩
I পা র্রা র্রা র্রা র্সা । র্রা । | র্মা র্জ্জা র্মা র্রা । র্সা । | র্রা র্সা র্র্সা ণা ধা পাধা
আ ০ দ্যা শ ক তি০ | ম হা ০ বি ০ দ্যা ০ | ম হা ০০ কা০ লিকা

| + ২ ৩
| না পা না র্সা । । । ।
| ম হা মা য়া ০ ০ ০

+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩
পা র্সা না র্সা না র্সা র্রা | ধা র্সা ণা ধপা ধপা মগা মা | পা র্সা ণা ধপা ধা পাপা
ম হা স র ০ স্বতী | সা র দা ঈ০ ০ ০ শ্ব০ রী | শ্যা মা সু তা০ ০ রূপে

| + ২ ৩
| রা রা মজ্ঞা রা । সা । I
| প্র কা ০০ শি ০ ল ০

+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩
I সন্‌া সন্‌া সা রসা রসা রা । | রা জ্ঞা মা রা জ্ঞরা সাসা | সা রা মা রা মা মামা
জ্ঞ০ গ০ ত জ্ঞ০ ন০ নী ০ | প্র ণ ত পা ০ ০ লিনী | অ না থ অ শ র ণ

| + ২ ৩
| পা ধা মা প । । ।
| তা ০ রি ণী ০ ০ ০

+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩
মা ণা ণা ণা । ণা র্সা | ধা ধর্সা ণা ধা ধা পা । | রা মা রা মা ধা পা ।
স ০ র্ব সি ০ দ্ধি ০ | দা য়ি০ নী জ ন নী ০ | শ্রী রা ম কৃ ০ ষ্ণ ০

| + ২ ৩
| রা মা জ্ঞা রাজ্ঞরা সা । I
| স ০ ঙ্গি নী০০ ০ ০

+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩
I পা র্রা র্রা র্রা র্র্সা র্সা র্সা | র্রা র্মজ্ঞা র্জ্ঞা র্রা র্রা র্সা । | ণা র্রা র্সা ণা ধা পাধা
বি ত রে অ যা০ চি তে | ভ ক০ তি মু ক তি ০ | সা ধু পা পী ০ তাপী

| + ২ ৩
| না পা না র্সা । র্সা ।
| না হি বি চা ০ র ০

+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩
পা র্সা না র্সা না র্সা র্রা | ধা র্সা ণা ধপা ধপা মগা মা | পা র্সা ণা ধপা ধপা পাপা
স ০ র্ব দে ব দেবী | বা ০ ঞ্ছি ত০ ০ ০ প০ দে | লা ০ ঞ্ছি ত০ ০০ জ নে

| + ২ ৩
| রা রা মজ্ঞা রসা রা সা । II
| তু লে ০০ নি০ ০ ল ০

সমালোচনা

স্মৃতিচারণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭। পৃষ্ঠা—৬১৩+২০; মূল্য ১২৲।

এই বৃহৎ পুস্তকটিতে সুসাহিত্যিক সাধক ও সুরসুধাকর দিলীপকুমার তাঁর জীবনের অনেক ছবি তুলে ধরেছেন। মনের বাতায়নে জীবনের যে আকাশ তাঁর শিল্প-মানসে রঙ ঢেলেছে তা তিনি সরস ও সুন্দর করেই আঁকতে পেরেছেন। এ ধরনের লেখা যে আত্মকেন্দ্রিক হবে তা স্বাভাবিক। তবে এই আত্মকেন্দ্রকে ঘিরে স্মৃতির বৃত্তটির পরিসর কতখানি, তার বিচারও অপ্রাসঙ্গিক নয়; এবং এ-বিচারে এর পরিসর কেবল যে সরস সাহিত্যকে ঘিরেই দাঁড়িয়েছে তা নয়, ইতিহাসের অনেক পাতাই এতে নূতন ক'রে সংযোজিত হয়েছে বলা যায়। যে-কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই রচনার ঘুম ভেঙেছে, তাতে শিশুমনের নূতন-দেখার আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের সাথে সাথে বিজ্ঞ মনের মিলন, তথা বিদগ্ধ সাহিত্যিকের পরশ লেখাটিকে পাঠকের কাছে কেবলমাত্র কৌতূহল সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি, সুধী-মনের অনেক বিচারেরও পথিকৃৎ হয়ে ফুটেছে। তাই এ বইটিতে যেমন বিশ্লেষণমূলক আলাপ-আলোচনার সমাবেশ আছে, তেমনি আছে লেখকের 'আধ্যাত্মিক অভীপ্সা'র ক্রমবিকাশের অলৌকিক আভাস। ভাগবত মহিমার অঙ্কুরোদ্গম কিভাবে বৃক্ষে পরিণত হয়, তার সংবাদসংগ্রহে যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁরা এই পুস্তকটিতে অনেক নূতন কথা পাবেন। তা ছাড়া এতে যে-সব চরিত্র-চিত্রণ স্থান পেয়েছে, তাতে লেখকের চোখের রঙ মিশে থাকলেও তার মধ্যকার চিত্রণগুলির সঠিক মূল্যায়ন করতে অনেকেরই কষ্ট হবার কথা নয়। বরং এই নিজস্ব-রঙে রাঙানো চরিত্র-চিত্রণগুলির সরসতা অনেককেই আকৃষ্ট করবে।

সত্য-দৃষ্টির কথা তুললেও এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এই পৃথিবীর যে-কোন বস্তুকে দুটি লোক একই ভাবে দেখতে পারে না। তাদের উভয়ের চোখের মাপ, উপাদান, দৃষ্টিশক্তি, মস্তিষ্ক-শক্তি প্রভৃতি সম্পূর্ণ এক হলেই তা সম্ভব হ'ত। তা যখন নয়, তখন বৈজ্ঞানিক বিচারেও দুজনে একই বস্তু একই ভাবে দেখি—তা দাঁড়ায় না।

এ পৃথিবীতে একই মানুষের দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি পায়ের পাতার মাপ কখনও এক হয় না। তা যদি হ'ত, তা হ'লে পাদুকালয়ে পাদুকার মাপ দিতে গিয়ে কিংবা চশমা কিনতে গিয়ে লোকের অমন বিভ্রাট ঘ'টত না। তাই বলি, যথার্থ সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টি কায়িক শরীরে সম্ভব নয়। ওতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতেও personal error-এর যোগ থাকবেই। তাই দিলীপকুমার তাঁর বইয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়েছেন—এতে কিছু ভুল হয়নি, বরং তা না হ'য়ে ব্রহ্মানুভূতির দৃষ্টিতে সত্যনিষ্ঠ হ'য়ে সব বলতে পেরেছেন বললে কথাটা নির্জলা মিথ্যা হ'ত। ছবিতে আঁকা বাঘের দু-ইঞ্চি দূরে হরিণ রয়েছে—বাস্তবে তা কখনও সম্ভব নয়, অতএব তা ভুল—বাস্তব-বাদের এই দৃষ্টি দিয়ে যাঁরা শিল্প ও সাহিত্যকে দেখেন, তাঁদের এ পথে না আসাই ভাল। সেই একই কারণে যোগীর আকাশ ও ভোগীর

আকাশ কেন এক হবে না? এই যুক্তির উত্তর দেওয়াও শক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের লক্ষ্য করেই তাই বলেছিলেন—যে শুঁড়ি-পাড়ার ভেতর দিয়েই কখন গেল না, সে মদের কথা আবার বিচার করবে কি! রসিক না হ'লে তাই রসের বিচার অসম্ভব। আর এই রসের বিচারে আমাদের বইটি পড়তে ভাল লেগেছে বলতে বাধা নেই। তবে কয়েক জায়গায় তাঁর সঙ্গে অনেকের মতের মিল নাও হ'তে পারে। তবে সব জড়িয়ে, মন্দটার চেয়ে ভালোটার সমাবেশ অনেক বেশী বলেই আমরা রসিক পাঠককে বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। নিছক গল্প শোনার মন নিয়েও বইটি পড়তে বসলে শেষ না ক'রে ওঠা শক্ত হবে বলেই বিশ্বাস। তবুও 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ' কথাটা তো আছেই। বইটির পরবর্তী 'পর্ব'গুলি পড়বার ইচ্ছা নিয়েই এ-লেখা শেষ করছি। কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ চোখে পড়েছে। —মহানন্দ

ছাত্রজীবন—শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)। প্রকাশক: শুভশ্রী; ৯, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা ২৯। পৃষ্ঠা ১৩৬; মূল্য ২৲। [ভূমিকায় লিখিত: 'The popular price of the book has been possible through a subvention received from the Government.]

স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ও সুপরিচিত শিক্ষাব্রতীর লেখনীপ্রসূত 'ছাত্রজীবন' সম্বন্ধে পুস্তকখানিতে ছাত্রজীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হইয়াছে—যথা পিতামাতা ও শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সম্বন্ধ, বিভিন্ন ভাষা- ও বিষয়-শিক্ষার সমস্যা, সর্বোপরি স্বাবলম্বন, মিতব্যয়িতা, সময়ানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণ অর্জন, স্বাস্থ্যরক্ষা, বেশভূষা, খাদ্য, ক্রীড়া কিছুই বাদ যায় নাই। সর্বশেষে সৎসঙ্গ, স্বদেশপ্রেম, চরিত্রগঠন ও মানব-জীবনের উদ্দেশ্যও আলোচিত হইয়াছে।

উপক্রমণিকায় লেখক লিখিয়াছেন, 'প্রবন্ধগুলি বিশেষত স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের উদ্দেশে লিখিত।' কিন্তু পুস্তক-নির্বাচন, সংস্কৃত ও বাংলার ব্যাকরণের তুলনামূলক সমালোচনা প্রভৃতি আরও বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে, যেগুলি শিক্ষকদেরই আগে পড়িতে হইবে।

লেখা বহুস্থলে প্রবন্ধাকার ও উপদেশমূলক হইয়াছে; ছাত্রদের মনে গভীর রেখাপাত করিতে হইলে উদাহরণমূলক গল্পের প্রয়োজন। পুস্তকখানিতে তাহার অভাব অনুভূত হইল।

Sister Nivedita—Pravrajika Atmaprana. *Published by Pravrajika* Shraddhaprana, Secretary, Sister Nivedita Girls' School, 5 Nivedita Lane, Calcutta 3. Pp. 297; Price Rs. 7·50.

স্বামীজী বলিয়াছিলেন, নারীজাতির উন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতি হইতে পারে না। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিতা নিবেদিতা নারীজাতির উন্নতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার মহিমোজ্জ্বল জীবন যুগ যুগ ধরিয়া সেবাব্রতীদের উদ্বুদ্ধ করিবে। আলোচ্য গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতার জীবন বিস্তৃতভাবে আলোচিত। নিবেদিতা-জীবনের গতি ও পরিণতি-বিষয়ক কয়েকটি পরিচ্ছেদের উল্লেখ করা হইল:

Early life, Seeker of Truth, Swami Vivekananda the Master, The Ramakrishna Math & Mission, Wanderings in North India, Amarnath & Kshir-Bhavani, Kali and Kali-worship Plunge into Action, New Thoughts The Holy Land of Buddha, Political stirrings, Nation and nationality Nivedita Girls' School, With the Holy Mother, Life Literature and Art Passing into Eternity.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা পুস্তকখানিকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছে। মোট ৪৭টি অধ্যায়ে সুলিখিত পুস্তকখানি ভগিনী নিবেদিতার প্রামাণ্য ইংরেজী জীবনীরূপে সমাদৃত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা-প্রণীত বাংলা জীবনী পূর্বেই প্রকাশিত হইয়া সমাদৃত হইয়াছে।

বৈদিকী—শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: বাণীতীর্থ, ২৬-বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ৭০; মূল্য ২৲।

ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা ঋগ্‌বেদের সূক্ত অবলম্বনে অভিব্যক্ত। 'বৈদিকী' গ্রন্থে ঋগ্‌বেদ হইতে যে সূক্তগুলির বাংলা কবিতানুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষ্ণু-সূক্ত, রাত্রি-সূক্ত, ঊষা-সূক্ত, বরুণ-সূক্ত, অগ্নি-সূক্ত, পর্জন্য-সূক্ত, সূর্য-সূক্ত, ইন্দ্র-সূক্ত, মিত্র-সূক্ত, সোম-সূক্ত, হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত, দেবী-সূক্ত ও সৃষ্টি-সূক্ত।

অনুবাদ সহজ, ভাষা আধুনিক। দুরূহ শব্দ সাবধানতা-সহকারে বর্জন করা হইয়াছে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ সুন্দর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন গ্রন্থটির একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে লেখক ঋগ্‌বেদ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তকটি পাঠ করিলে ঋগ্‌বেদের সময়ে ভারতীয় চিন্তাধারা ও উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা হইবে।

বাংলায় উপনিষৎ—(প্রথম খণ্ড): অনুবাদক ও সম্পাদক—শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু। প্রকাশক: শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু, পি. ৩৭৮ কেয়াতলা লেন, কলিকাতা। পরিবেশক: সায়ান্স বুক এজেন্সি, ১৩৩-বি লেক টেরেস, কলিকাতা ২৯; পৃষ্ঠা ৩৭০ + ১৮৵০; মূল্য মূল্য ছয় টাকা।

উপনিষৎ জ্ঞানের ভাণ্ডার। উপনিষদের এমন কোন অনুবাদ নাই, যাহা পাঠে মূল সংস্কৃতের সহায়তা ব্যতীত উপনিষদের ভাবরাশির সহিত পরিচিত হওয়া যায়। এই অভাব দূরীকরণের জন্যই লেখকের 'বাংলায় উপনিষৎ' লিখিবার প্রচেষ্টা। এই গ্রন্থে ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষিতকি, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, শ্বেতাশ্বতর এই দশখানি উপনিষদের সরল বাংলা অনুবাদ এবং আচার্য শঙ্কর রামানুজ ও মধ্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উপনিষদ্ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণনের অভিমত দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থটির মুখবন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: যাঁরা বাংলাভাষাভিজ্ঞ, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মূল উপনিষৎপাঠে অসমর্থ বা শঙ্কান্বিত, তাঁদের পক্ষে 'বাংলায় উপনিষৎ' অত্যন্ত উপযোগী হবে। এতে তাঁরাও উপনিষদের আলোক দেখতে পাবেন এবং জীবনে কিছু প্রসাদ ও প্রশান্তি লাভ করবেন।

আমাদের সহিত পাঠকবর্গও ইহা সমর্থন করিবেন, আশা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৬০ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

গত ২৬শে নভেম্বর বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সভায় সাধারণ সম্পাদকের যে বিবৃতি পঠিত হয়, নিম্নে তাহার সারানুবাদ প্রদত্ত হইল :

নূতন নির্মাণ-কার্য

সারগাছি আশ্রমে বহুমুখী বিদ্যালয়, রেঙ্গুন সেবাশ্রমে কর্মী-ভবন (block for Auxiliary Staff-Quarters) এবং পরিবেবিকা-ভবনের বর্ধিত অংশ, কামারপুকুর আশ্রমে গ্রন্থাগার-ভবন, নরেন্দ্রপুরে লাইব্রেরি ও স্কুলের ছেলেদের জন্য ৩টি ছাত্রাবাস, মাদ্রাজ স্টুডেন্টস্ হোমে শিল্পবিদ্যালয়ের ভবন (Technical Institute Building) এবং বেলুড় সারদাপীঠে জনশিক্ষা-মন্দিরের হল উদ্বোধন করা হয়। রাঁচি স্যানাটোরিয়ামে একটি নূতন ওয়ার্ডের উদ্বোধন এবং রোগী ও কর্মীদিগের জন্য নবনির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬০-৬১ খৃঃ হইতে বেলুড় বিদ্যামন্দির ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হইয়াছে। ১৯৬৩ খৃঃ স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হইতেছে। আসানসোলে বহুমুখী বিদ্যালয়ের নূতন ব্লক এবং রহড়া বালকাশ্রমে দুইটি বিদ্যার্থী-ভবন উদ্বোধন করা হয়। নূতন স্থানে বৃন্দাবন সেবাশ্রম-হাসপাতালের নির্মাণ-কার্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে।

গভর্নিং বডির নূতন সদস্য

স্বামী কৈলাসানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী তেজসানন্দ, স্বামী বিমুক্তানন্দ, স্বামী ভাস্বরানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গত ৩০শে মার্চ, ১৯৬১ বেলুড় মঠের নূতন ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মিশনের গভর্নিং বডির সদস্যও হইয়াছেন।

সদস্য-সংখ্যা

১৯৬০ জানুআরি হইতে ১৯৬১ মার্চ, এই সময়ের মধ্যে মিশনের ৫ জন সাধু-সদস্য ও ৪ জন ভক্ত-সদস্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। বর্ষশেষে মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৩২ (সাধু ৩২১, ভক্ত ৩১১)।

কেন্দ্র-সংখ্যা

বেলুড়ের মূল কেন্দ্র ধরিয়া '৬১ মার্চ মাসে মিশনের মোট কেন্দ্র-সংখ্যা ছিল ৭৩ ; তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ৮, ব্রহ্মদেশে ২ ; ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে ১টি করিয়া, বাকী ৫৯টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রগুলি রাজ্য-হিসাবে : পশ্চিমবঙ্গে ২৪, মাদ্রাজে ৯, উত্তর প্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ২, ওড়িশ্যায় ২ ; দিল্লী, রাজস্থান, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মহীশূর ও কেরালায় ১টি করিয়া। [মঠ-কেন্দ্রগুলি ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।]

কার্যবিভাগ

মিশনের কার্যধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ : (১) রিলিফ, (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাহায্য, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম।

(১) রিলিফ: ১৯৬০ জুলাই মাসে অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ অবস্থার মধ্যে বহুসংখ্যক নরনারী নিরাশ্রয় হইয়া আসাম হইতে নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। আশ্রয়প্রার্থীদের অনেককে জলপাইগুড়ি ক্যাম্পে রাখা হয়। মিশন হইতে জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা, সলিসাবাড়ি, আলিপুর-দুয়ার জংশন ও আলিপুরদুয়ার শহরে সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হয়। শিলং, নওগাঁ, গৌহাটি এবং দোমোহানিতেও সেবাকেন্দ্র খুলিতে হয়। কলিকাতার পৌরপ্রধানের সাহায্য-ভাণ্ডারের (Mayor's Relief-Fund) ১০,০০০ টাকা সমেত প্রায় ২৬,০০০ টাকা আসাম-রিলিফে ব্যয় করা হয়।

যখন আসামে রিলিফ চলিতেছিল, তখনই মিশনকে ওড়িশায় রিলিফ-কেন্দ্র খুলিতে হয়। বন্যার ফলে কটক ও বালেশ্বর জেলা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। বালেশ্বর জেলায় বাসুদেবপুরে ৩রা সেপ্টেম্বর মিশনের সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হয়। এখানে সরকার চাল ও অন্য জিনিসপত্র সাহায্য দেন। মিশন, হইতে ধুতি ও শাড়ি, ছেলেদের পোশাক বিস্কুট ও বার্লি, চিনি, পশু-খাদ্য ও নগদ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। কটক জেলায় জেনাপুর হইতে গুঁড়া দুধ হইতে দুধ তৈয়ার করিয়া খাওয়ানো হয়। ওড়িশায় বন্যার্ত-সাহায্যে মোট ১৪,০৮২ টাকা ব্যয় করা হয়, ওড়িশার প্রধানমন্ত্রীর তহবিলের ৩,০০০ টাকা ইহার অন্তর্গত।

মে মাসে কাঁথি আশ্রম হইতে এবং অক্টোবর মাসে লখনৌ আশ্রম হইতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করা হয়। সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় সব টাকা বেলুড় প্রধান কেন্দ্র হইতেই পাঠানো হয়।

সুরাটে বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হরিজন ও ভাঙ্গীদের জন্য কলোনি-নির্মাণের কার্য আরম্ভ হয় ১৯৫৯ খৃঃ এবং '৬০ খৃঃ মে মাসে শেষ হয়। কলোনি-নির্মাণের কার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২,৫৭,৮২৭ টাকা।

(২) চিকিৎসা: ভারত, পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশে মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রেই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান—বারাণসী, বৃন্দাবন, কনখল ও রেঙ্গুন সেবাশ্রম, রাঁচির যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান। রেঙ্গুন সেবাশ্রমে রেডিয়াম ও এক্স-রে সাহায্যে ক্যান্সার-চিকিৎসাও হইতেছে।

১৯৬০ খৃঃ মিশনের তত্ত্বাবধানে ৮টি অন্তর্বিভাগযুক্ত হাসপাতালে মোট শয্যা-সংখ্যা (bed) ছিল ৮৮৮; ২৩,৯৯৪ রোগী ভরতি করা হয়। ৫২টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে ৩০,২৭,৮৬৮ (পুরাতন সহ) রোগী চিকিৎসিত হয়। বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে দিল্লী এবং রাঁচিতে কেবলমাত্র টি.বি. চিকিৎসা হয়; সালেম ও বোম্বাই-এ বহির্বিভাগের সহিত যথাক্রমে ৬টি ও ১২টি শয্যা আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে রাখা হইয়াছিল।

(৩) শিক্ষা: মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মপ্রসার নিম্নলিখিত তালিকায় পরিস্ফুট:

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা
কলেজ	মাদ্রাজ	
" (আবাসিক)	বেলুড়, নরেন্দ্রপুর	১,৬৩২
বি. টি কলেজ	বেলুড়, তিরুপ্পারাইতুরাই ও কোয়েম্বাতুর	১৬৩
বেসিক ট্রেনিং কলেজ	৩	১২৯
শারীর শিক্ষা "	কোয়েম্বাতুর	৬৯

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা	
গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ	কোয়েম্বাতুর	২০৭	
কৃষি-শিক্ষণ বিদ্যালয়	„	৫১	
সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র	„ ও বেলুড়	২৯৭	
ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল	৪	১,৩৪৫	
জুনিয়র টেকনি স্কুল	৭	৪৬১	৩২৭
ছাত্রনিবাস (অনাথাশ্রম সহ)	৭২	৫,৮৮৯	৫১৬
চতুষ্পাঠী	২	২৪	
বহুমুখী বিদ্যালয়	১০	৩,৮৭৪	৮০৮
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২	৭৭৭	
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৪	৯,৭৩৫	৪,২৮৫
সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয়	৮	৮৫৯	৯৩০
জুনিয়র „ „	২০	২,৩০১	৬৪১
নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়	১০২	১৩,১১০	৮,৪৪২

কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান ও রেঙ্গুন সেবাশ্রমে পরিষেবিকা-শিক্ষণের (Nurses' Training Centre) ব্যবস্থা আছে, আলোচ্য বর্ষে ১৩৪ শিক্ষার্থিনী শিক্ষালাভ করিয়াছে। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে মোট ৪০,৯৯১ ছাত্র এবং ১৬,২৮৩ ছাত্রী শিক্ষা পাইয়াছে। বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুর বেলুড়, সরিসা, রহড়া, মেদিনীপুর, চেরাপুঞ্জি, কলিকাতা, জামসেদপুর, আসানসোল, দেওঘর, পুরুলিয়া, কানপুর, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাতুর, তিরুপ্পারাইতুরাই, কালিকট এবং সিংহলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছাত্রাবাস, স্কুল বা কলেজ মিশনের শিক্ষাবিভাগীয় কার্যের নিদর্শন।

(৪) সাহায্য: প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে প্রদত্ত সাহায্য :

	পরিবার	ছাত্র	বিদ্যালয়
নিয়মিত :	৯৩	১৬২	
সাময়িক :	৪৪৭	১১৫	২

এই জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৪,৯০১ টাকা। ইহা ছাড়া ৮০০ টাকা মূল্যের বস্ত্র উদ্বাস্তুদিগকে দেওয়া হয়। কয়েকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারকে যে সাহায্য প্রদত্ত হয়, তাহার পরিমাণ ৫,০৪৭৲।

(৫) কৃষ্টি ও সংস্কৃতি: মিশনের কেন্দ্রগুলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেন, এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সর্ব ধর্ম সত্য' এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন।

জনসভা, আলোচনা-সভা, ক্লাস, পুস্তক ও পত্রিকা-প্রকাশন প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন-ধর্মের ব্যক্তির সহিত সংযোগ স্থাপিত হয়; গ্রন্থাগার পাঠগৃহ ও চতুষ্পাঠীগুলি কৃষ্টিবিস্তারের সহায়ক। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের (Institute of Culture) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্যান্য দেশের বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে কৃষ্টিগত সহযোগিতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

* * *

বার্ষিক সভার কার্য শেষ হইলে অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ ভাষণ দেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সকল কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে যাহাতে সকল কর্মই উপাসনা—এই আদর্শ যথাযথ রূপায়িত হয়, তাহার জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের জীবনালোকে কাজ করিতে বলেন।

বক্তৃতা-সফর

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত ২৭শে মে হইতে ১১ই অগস্ট পর্যন্ত রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রম, চূড়ামন, খামরুয়া, তপন, গঙ্গারামপুর, পতিরাম, কুড়াহা, বালুরঘাট, কড়দহ, মারনায়, চাঁচোল, বগচড়া, মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদহ শহর, বুলবুলচণ্ডী, আইহো, মিলকী, শোভা-নগর, মানিকচক, ধরমপুর, কাটিহার রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং কাটিহার রলারাম ইন্স্টিটুউশনে 'ধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরাম-কৃষ্ণের অবদান', 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ', 'নারীর আদর্শ ও মাতা সারদাদেবী', 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ছাত্রজীবনের কর্তব্য' সম্বন্ধে মোট ৪৭টি বক্তৃতা দেন; তন্মধ্যে ৪২টি আলোকচিত্র যোগে প্রদত্ত হইয়াছিল।

স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১৬ই নভেম্বর বৈকাল ৫-১৫ মিনিটের সময় স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দ নাগপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি রক্তচাপ-বৃদ্ধিতে ভুগিতেছিলেন, গত ১লা অগস্ট মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনের ফলে তিনি শয্যাগত হন।

১৯২৮ খৃঃ নাগপুরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। ১৯৩১ খৃঃ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন, তাঁহারই নিকট হইতে তিনি মন্ত্রদীক্ষাও লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদানের পূর্বে তিনি ব্যবহারজীবী (pleader) ছিলেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। নাগপুর আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ছিল। ঐ অঞ্চলে তিনি 'ডাক্তার মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী বশিষ্ঠানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৪শে নভেম্বর বেলা ৪টার সময় স্বামী বশিষ্ঠানন্দ (সমর মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে ৬৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৭ই নভেম্বর সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইলে তাঁহাকে সেবাশ্রমে ভরতি করা হয়, ২৩শে নভেম্বর সূর্যোদয়ের পূর্বে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনের ফলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়।

১৯২৪ খৃঃ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩০ খৃঃ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। কিছুকাল তিনি এলাহাবাদ আশ্রমে ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে যতীন্দ্রনাথ সরকার

প্রখ্যাত সাংবাদিক যতীন্দ্রনাথ সরকার কিছুকাল রোগভোগের পর গত ২৯শে নভেম্বর ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সহযোগী সম্পাদক ছিলেন এবং এই পত্রিকার সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের। তাঁহার ধর্মপ্রাণতা, মধুর ব্যবহার, শান্ত ও সরল প্রকৃতি সকলকেই মুগ্ধ করিত। যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বন্ধুস্থানীয় হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন সেবা- ও প্রচার-কার্যে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণকালে তিনি সেখানকার বেদান্ত-কেন্দ্রগুলিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'উদ্বোধনে' সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। যতীন্দ্রবাবু অকৃতদার ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

ভারতে শিক্ষার হার

১৯৫১ খৃঃ ভারতে শিক্ষিতের হার ছিল ১৬'৬% ১৯৬১ খৃঃ উহা ২৩'৭% হইয়াছে। লিখিতে পড়িতে সমর্থ লোকের মোট সংখ্যা ১০৩,২১৫,৭৮০। ১০ বৎসরে দিল্লীর শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাইয়া সর্বাধিক হইয়াছে। ১৯৫১ খৃঃ কেরালার শিক্ষিতের হার ছিল সর্বাধিক (৪০'৭)।

রাজ্যহিসাবে শিক্ষিতের হার

রাজ্য	মোট শিক্ষিত	শিক্ষিতের হার
অন্ধ্র প্রদেশ	৭,৪৮৮,৬১৮	২০'৮
আসাম	৩,০৫৫,৫৭৬	২৫'৮
বিহার	৮,৪৭০,৪২৬	১৮'২
গুজরাট	৬,২৪৩,৭৮৮	৩০'৩
জম্মু ও কাশ্মীর	৩৮১,৭৫৩	১০'৭
কেরালা	৭,৮০০,২৮৪	৪৬'২
মধ্যপ্রদেশ	৫,৪৭২,২৮৬	১৬'৯
মাদ্রাজ	১০,১৬৮,০৯৫	৩০'২
মহারাষ্ট্র	১১,৭৩১,২৭২	২৯'৭
মহীশূর	৫,৯৫৫,৯৫৫	২৫ ৩
ওড়িষ্যা	৩,৭৭৯,৫৬৫	২৭'৫
পাঞ্জাব	৪,৮১৪,৯১১	২৩'৭
রাজস্থান	২,৯৫২,৫৩৩	১৪'৭
উত্তরপ্রদেশ	১২,৮৯১,০৯৯	১৭'৫
পশ্চিম বঙ্গ	১০,১৮০,৬৮৫	২৯'১
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	২১,৩১৪	৩৩'৬
দিল্লী	১,৩৪৯,৪১৪	৫১
হিমাচলপ্রদেশ	১৯৭,৫৩৩	১৪'৬
ত্রিপুরা	২৫৩,০৩৩	২২'২

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ১০৯তম শুভ জন্মতিথি আগামী ১৪ই পৌষ, ২৯শে ডিসেম্বর, শুক্রবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৬৩-তম বর্ষ

(১৩৬৭-মাঘ হইতে ১৩৬৮-পৌষ)

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

সম্পাদক

স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা

প্রতি সংখ্যা ৫০ ন.প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ—১৩৬৭ হইতে পৌষ—১৩৬৮)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখক-লেখিকা			বিষয়		পৃষ্ঠা
শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী	...	...	বৌদ্ধ কর্মবাদ	...	১৯০
			ত্রিশরণ-মহামন্ত্র	...	২৩৯
			লঙ্কাদ্বীপ-পরিক্রমা	...	১৯৩
স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ	...	...	'ভয় হতে তব অভয় মাঝে'	...	৩৭৭
শ্রীশুভ গুপ্ত	...	...	স্বামীজীর শতবার্ষিকী (ভাষণ)	...	৪০৯
শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়	...	...	স্মৃতি-কুসুমাঞ্জলি		২৬৮, ৩১৮
ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়	...	...	চিরকালের আশ্রয়	...	২৫
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	...	...	জগন্মাতার বালিকামূর্তি	...	৪৬৫
			রবির আলোকে তিনটি নারীচরিত্র	...	১৮৩
শ্রীসংযুক্তা মিত্র	...	...	বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধারা	...	১৭
ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	...	চল্লিশ বছর পরে	...	৬১৭
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	...	তৃতীয় পরিকল্পনা	...	৫১৫
ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন	...	...	মাতৃসঙ্গীত	...	৬৯৪
স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ	...	...	বহ্নি-ললাটিকা (কবিতা)	...	৪৬৪
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	...	...	মনের রহস্য	...	৩০৬
স্বামী সুন্দরানন্দ	...	...	সূক্ষ্ম শরীর	...	৬০৯
			সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব	...	৯৭, ১৩৬
শ্রীমতী সুধা সেন	...	...	সিঁথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ		২৬৫, ৩৬৯
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	...	...	শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোপ্রসঙ্গে	...	৪৯৭
সেখ সদর উদ্দীন	...	...	নারায়ণ-সেবা (কবিতা)	...	১৮২
অন্যান্য :			স্বামী তুরীয়ানন্দের দুইখানি পত্র	...	৪৭
			উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব	...	১০৪
			সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম (সঙ্কলন)	...	২২৫
			বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় (বিজ্ঞপ্তি)		২৩০
			মাস্টার মহাশয়ের পত্র	...	৩৫১
			বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী প্রস্তুতি	...	৩৮৪
			বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী (প্রস্তাবিত কর্মসূচী)	...	৩৯৭
			স্বামী শিবানন্দের একটি পত্র	...	৬৮৭
			আবেদন		৫৩১, ৫৯২, ৬৫৬
			স্বামীজীর একটি চিঠি (অনুবাদ)	...	৫৪৫
			নিবেদন	...	৬৪৮